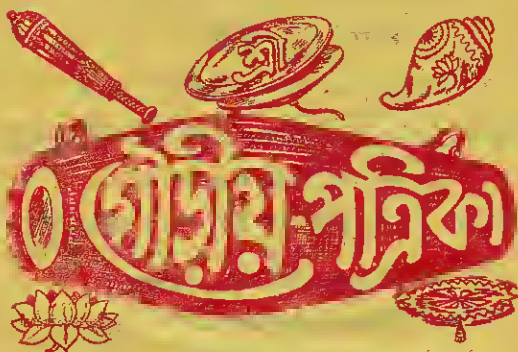


শ্রীকৃষ্ণগোপালো নমঃ



৩২শ বর্ষ

চৈত্র, ১৩৮৩

২য় সংখ্যা



শিলিগুড়ি-শ্রীকেশবগোপালস্বামী গোড়ীয়মঠের নিম্নায়মান শ্রীমন্দির

সম্পাদক—ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমন্তক্ৰিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

কার্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রতিষ্ঠাতা—নিত্যানীলাশ্রমিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি—পরিব্রাজকাচার্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত বামন মহারাজ

—(*)—

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি—পরিব্রাজকাচার্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রোতী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত নারায়ণ মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত উদ্ধমহী মহারাজ

পণ্ডিত শ্রীযুত সুদর্শন দাসাধিকারী, বি. এ, বি. ট., কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত মধুসূদন বিদ্যানিধি, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত রসিকরঞ্জন দাসাধিকারী, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত বিশ্বরূপদাস ব্রহ্মচারী, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত বৃন্দাবনবিহারী ব্রহ্মচারী, বি. ই.

পণ্ডিত শ্রীযুত স্বপ্নকুশা ব্রহ্মচারী, ভক্তদেবক, ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত জিতকুমার দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

পণ্ডিত শ্রীযুত রমাপতি দাসাধিকারী, ভক্তসুন্দর

পণ্ডিত শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

—(ক)—

প্রচার-সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত হরিজন মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ

কার্যাব্যাহার

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত পর্যটক মহারাজ

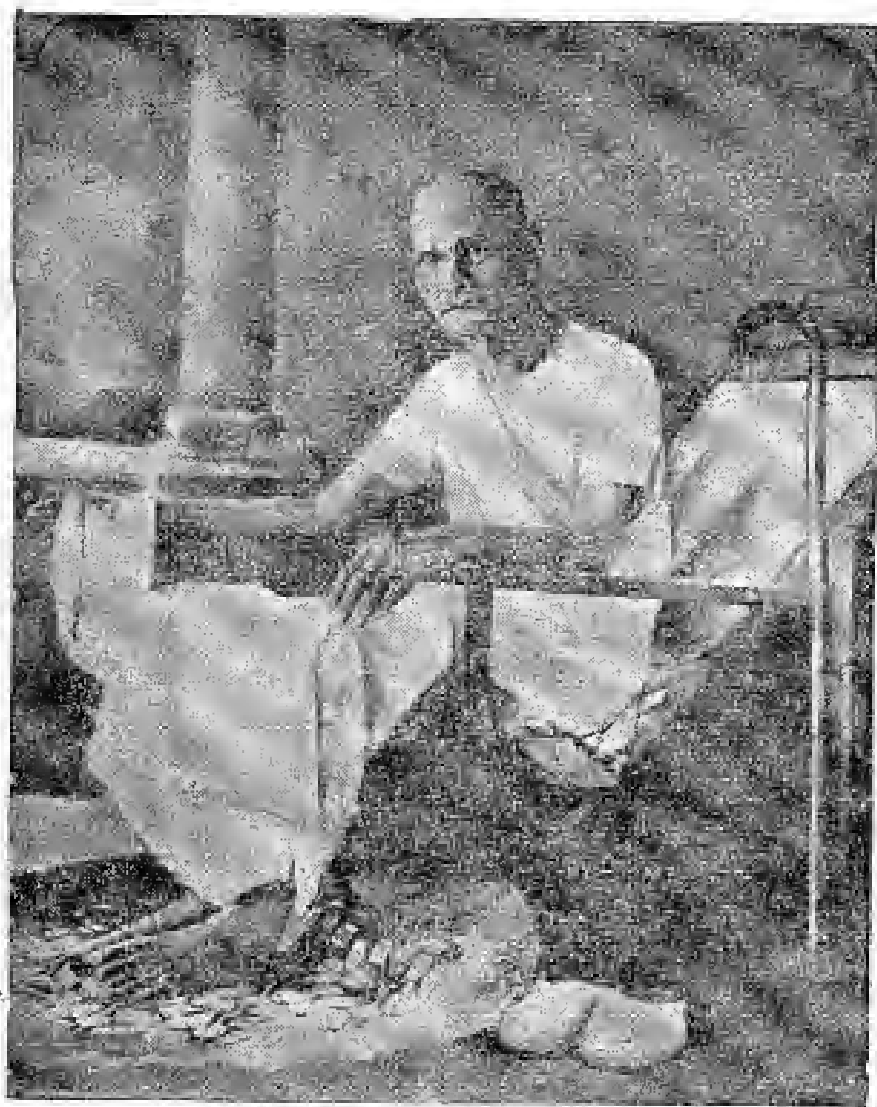
শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী, ভক্তিবাদান্ত-কর্তৃক শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,

তেঘরিপাড়া; পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত ও নবদ্বীপস্থ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস হইতে তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

॥ শ্রী শ্রী গুরুগোবিন্দো জয়তঃ ॥

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-
আচার্য্যবর্য্য পরমহংস অষ্টোত্তরশত শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ



নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে ।
শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব ইতি নামিনে ॥

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
শ্রীধাম নবদ্বীপ (নদীয়া) ।

॥ শ্রী শ্রী গুরুগোবিন্দো জয়ন্তঃ ॥

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

(মাসিক)

দ্বাত্রিংশ-বর্ষ (১ম-১২শ সংখ্যা)

[শ্রীগৌরাক্ষ ৪৯৪ বিষ্ণু হইতে ৪৯৫ গোবিন্দ,
বঙ্গাব্দ ১৩৮৬ ফাল্গুন হইতে ১৩৮৭ মাঘ,
খ্রীষ্টাব্দ ১৯৮০ মার্চ হইতে ১৯৮১ ফেব্রুয়ারী]

প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক—

পরমহংসস্বামী শ্রী শ্রীমন্তুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-আচার্য—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

সম্পাদক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

প্রকাশক—

শ্রীনবযোগেন্দ্র অন্নচারী, ভক্তিবান্ধব

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া) ।

॥*॥ বার্ষিক ভিক্ষা—৮.০০ টাকা ॥*॥

দ্বাত্রিংশ-বর্ষ ত্রীণ্ডী-পত্রিকার

সূচী-পত্র

বিষয়	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
১। অক্ষয় দীপো বধিরস্ত গীতম্	৬।২১৪, ৭।২৫০, ৮।২৯২
২। অরুণোদয়বিদ্ধা (সাময়িকী)	২।৬৯
৩। অষ্ট মহাছাদশী	৭।২৫৫, ১১।৩৯৪
৪। আচার্য্য-সন্তান	৫।১৮৯
৫। আত্মতিক মঙ্গলার্থীর জ্ঞাতব্য	১।২১
৬। আন্তঃজাগ-নারায়ণাষ্টাদশকম্	১১।৩৭১, ১২।৪০৭
৭। আশা	৫।১৬৬
৮। ঈশ্বর	১।২৩
৯। উজ্জ্বলকালে ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা	১২।৪৩৬
১০। এ কোন্ রোগের হাসপাতাল ?	৬।২১১
১১। কল্লীর কণাকড়ি	১২।৪১১
১২। কার্তিকব্রত-মাহাত্ম্যম্—শ্রী	৯।২৯৯
১৩। কার্তিকব্রতে বিধিনিষেধঃ	১০।৩৩৫
১৪। গার্ভস্তোত্র বা সঙ্কল্পস্তোত্র চন্দ্রিকা	১১।৩৭৮
১৫। গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম	৬।১৯৫
১৬। গুরু-কৃপা—শ্রী	১০।৩৪৮
১৭। গুরুদাস	১১।৩৭৪
১৮। গোবর্দ্ধনবাস-প্রার্থনাদশকম্—শ্রী	৫।১৫১
১৯। গোড়ীয়ের দ্বাত্রিংশ-বর্ষ	১।৩৪
২০। গৌরাস্তোত্ররত্নম্—শ্রী	৩।৭৭
২১। চাতুর্মাস্ত	৭।২২৪
২২। চৈতন্যলীলার সংক্ষিপ্ত পরিচয়—শ্রী	৩।১০২, ৫।১৬৭, ৬।২০২, ৭।২৪১, ৮।২৮৪, ৯।৩১২

বিষয়

সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক

২৩। ছয় গোস্বামী	৪।১২২, ৪।১৭৩
২৪। জগন্নাথদেবের রথযাত্রা-শ্রীশ্রী	৪।১৪৯
২৫। জগন্নাথাক্ষকম্—শ্রীশ্রী	৪।১১৩
২৬। জগন্নাথ-স্তোত্রম্—শ্রীশ্রী	৬।২২৩
২৭। জয়দেব গোস্বামী—শ্রীশ্রী	১।২৬
২৮। জন্মাক্ষমী-মহোৎসব—শ্রীশ্রী	৮।২২৫
২৯। জন্মাক্ষমীতিথিতে বজ্রতার মার—শ্রীশ্রী	৮।২২৫
৩০। জীব	৭।২৩৬
৩১। দেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে ব্যানপূজা-কালে—শ্রী	১১।৪০১
৩২। নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনা—শ্রীশ্রী	১০।৩৩৭
৩২(ক)। নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা (নিমন্ত্রণ-পত্র)	১২।৪৩৯
৩৩। নিন্দা	৭।২৪০
৩৪। পঞ্চ-সংস্কার	৩।৮২
৩৫। পত্রোত্তর (পূর্ণচন্দ্র পঞ্জিকা)	২।৭১
৩৬। পরমগুরুদেবের বিরহ-বাসরে বজ্রতা	১২।৪৩১
৩৭। প্রকট-তিথিতে কুদুমাজলি	২।৫৩
৩৮। প্রভুপদে মিনতি	১২।৪২১
৩৯। প্রতিবন্ধক	৮।২৬১
৪০। প্রমোত্তর (গৃহী বৈষ্ণবের বিবাহ)	২।৬৬
৪১। প্রমোত্তর-স্তম্ভ (গৌর-জন্মতিথি উপবাসের বিধি)	৫।১৮১
৪২। প্রমোত্তর-স্তম্ভ (বৈষ্ণব শিবপূজা করিবেন কি না ?)	৬।২০০
৪৩। প্রমোত্তর-স্তম্ভ (যে-কোন দেবতাকে দর্শন করিলেও বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুরই স্মরণ করেন)	৯।৩২১
৪৪। প্রাপ্ত-পত্র (চারিদিকপ্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মত)	৪।১৩৯
৪৫। প্রার্থনা	১০।৩৫২
৪৬। বলদেব স্তোত্র —শ্রীশ্রী	৬।১৮৭
৪৭। বলরাম-স্তোত্রম্—শ্রীশ্রী	৮।২৫৯
৪৮। বর্ষ-প্রবেশ	৩।৭৯

বিষয়	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
৪৯ বর্ষ-শেষে নিবেদন	১২।৪৩৭
৫০। বাউল-মতের বিচার	৫।১৬০
৫১। বিরহ-মহোৎসবে নিমন্ত্রণ-পত্র	৮।২৯৮
৫২। বিরহ-বাসরে ভক্তিপ্রস্নাঞ্জলিঃ	১২।৪১৮
৫৩। বিরহ-মহোৎসব (সাময়িকী)	৯।৩২৭
৫৪। বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা-দিবসে মহোৎসব	৪।১৪৬
৫৫। বৈষ্ণব	১।১৯
৫৫(ক)। বৈষ্ণব-বংশ	৪।১৫৫
৫৬। বৈদিক ভারতীয় চিন্তাধারা ও তৎকালীন আধুনিক সভ্যতা	৩।৭৯
৫৭। বৈষ্ণব-মহিমা—শ্রীশ্রী	৬।১২৪
৫৮। বৈদিক আরাধ্যের শ্রেষ্ঠতা	১০।৩৪৩
৫৯। ব্যাসপূজা-মহোৎসব (পত্র)	১১।৬০৪
৬০। ব্যাসপূজা-মহোৎসবে কৃপাবঞ্চিতের নিবেদন (সাময়িকী)—শ্রীশ্রী	২।৭৪
৬১। ব্রজমণ্ডল-পরিভ্রমণ	৯।৩২৯, ১০।৩৫৬, ১১।৩৮৬, ১২।৪২২
৬২। ভক্তপরিচর্যা-মাহাত্ম্য	৮।২৭৯
৬৩। গুণবান্ আচার্য্য—শ্রী	১২।৪১৫
৬৪। ভজ্ঞন	৮।২৭১
৬৫। ভক্তিপূরিত কুসুমাজলি	১১।৩৮৪
৬৬। মনুষ্য-সমাজ ও বৈষ্ণব-ধর্ম	১।১২, ৫।১৯১, ৭।২৩০, ৮।২৬৬
৬৭। মহাভিষেক-কৃতং শ্রীবিষ্ণুস্তোত্রম্	১।১, ২।৮১
৬৮। মহারাজ চিত্রকোত	১০।৩৫৩
৬৯। রঘুনাথ গোস্বামী প্রভু—শ্রীশ্রী	৯।৩০৭
৭০। রথযাত্রা-মহোৎসব—শ্রীশ্রী (সাময়িকী)	৭।২৫৭
৭১। রাজা বীরহাসীর	৮।২৭৭, ৯।৩০৯
৭২। রিক্সাওয়ালা	৩।৯০
৭৩। শুভাবির্ভাব-তথিপূজায় ভক্তিপ্রস্নাঞ্জলি	৪।১২৮
৭৪। শৌক ও ব্রহ্মগত বর্ণভেদ	১।৪
৭৫। শ্রীকৃষ্ণ কি বস্তু ?	১।২৯, ২।৫৫, ৩।৯২, ৪।১২২, ৫।১৬২

বিষয়

সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক

৭৬।	শ্রীব্যাসপূজা	১০।৩৬৭
৭৭।	শ্রীগৌরাজ	৯।৩০২
৭৮।	শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব (উৎসব-সংবাদ)	২।৭২
৭৯।	সঙ্গত্যাগ	২।৬১, ৪।১৩৪
৮০।	সত্যাহুসন্ধান ও লোক-প্রিয়তা	৯।৩১৭
৮১।	সদাচার	৪।১১৬
৮২।	লাধুগঙ্গে শ্রীভক্তমণ্ডল-পরিক্রমা (আহ্বান-পত্র)	৩।১১০
৮৩।	সনাতন ধর্ম	৬।২২০
৮৪।	সমজ্ঞান বা সমদর্শন	১০।৩৬৩
৮৫।	সমাজে মানবতার রূপ-সৌন্দর্য	১১।৩৯৮
৮৬।	Remarks of the Superintendent, Nabadwip General Hospital	
৮৭।	Statement about Ownership of the Patrika.	৪।১৪৮ ১।৪০

মান্বনয় আবেদন

সবিনয় নিবেদন এই যে, শ্রীপত্রিকার বার্ষিক দেয় ভিক্ষা এখনও
যাঁহারা জমা দেন নাই তাঁহারা পত্রিকা পাওয়া মাত্রই দয়া করিয়া বাকী
টাকা ও আগামী বৎসরে জ্ঞাত দেয় ১০'০০ সমেত সমস্ত টাকা
পাঠাইয়া আমাদিগকে সেবার সহায়তা করিতে অনুরোধ জানাই।

বিনীত—

শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী

প্রকাশক,

শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়ন্তঃ



সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম ।
অধোদ্বজে অহৈতুকী ভক্তি বিষমুগ্ধ ।

অন্য ধর্ম সূচকপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ।

৩২শ বর্ষ

গর্ভোদশায়ী, ১৩ বিষ্ণু, ৪২৪ গৌরাঙ্গ
শুক্লাব্দ, ৩০ ফাল্গুন, ১৩৮৬ ; ইং ১৪, ৩।১৯৮০

১ম সংখ্যা

সান্ন্যাসাদং

মহর্ষিভৃগু-কৃতং শ্রীবিষ্ণুস্তোত্রম্

[পদ্মপুরাণে শ্রীব্যাসদেব-বিরচিতম্]

যেহর্চয়ন্তি সুরানচ্যাস্ত্বাং বিনা পুরুষোত্তম ।

তে পাষণ্ডত্বমাপন্যঃ সর্বলোকবিগহিতাঃ ॥১॥

হে পুরুষোত্তম ! যে-সকল মহাশয় আপনা বাতীত অজ্ঞান দেবতাগণের
অর্চন করে, তাহারা পাষণ্ড প্রাপ্ত হইয়া সকলের নিন্দার পাত্র হইয়া
থাকে ॥১॥

বিপ্রাণাং বেদবিজ্ঞাং তমেবেজ্যো জনার্দন ।

নাচ্যঃ কশিচৎ সুরাণ্যন্ত পূজনীয়ঃ কদাচন ॥২॥

হে জনার্দন ! বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের আপনিই পূজনীয় । দেবগণের মধ্যে
অন্য কেহ কখন পূজনীয় নহেন ॥২॥

অনর্হা ব্রহ্মরুদ্রাচ্ছা রজন্তমো বিমোহিতাঃ ।

তং শুক্লসত্ত্বগুণবান্ পূজনৌয়োহগ্রজন্মনাম্ ॥৩॥

ব্রহ্মা ও মহেশ্বর রজোগুণ ও তমোগুণে অভিভূত, এই কারণে উঁহারা অশুদ্ধ । আপনি শুক্লসত্ত্বগুণসম্পন্ন, অতএব আপনি ব্রাহ্মণদিগের পূজ্য ॥৩॥

ত্বংপাদসলিলং সেব্যং পিতৃণাঞ্চ দিবৌকসাং ।

সর্বেষাং ভূমুরাণাঞ্চ মুক্তিদং কল্যাণপহম্ ॥৪॥

আপনার পাদোদক দেব ও পিতৃগণের সেবনীয় এবং ব্রাহ্মণদিগেরও মুক্তিপ্রদ ও পাপনাশক হইয়া থাকে ॥৪॥

তত্ত্বক্তোচ্ছিষ্টশেষং বৈ পিতৃণাঞ্চ দিবৌকসাং ।

ভূমুরাণাঞ্চ সেব্যং স্মান্নান্নোষান্ত কদাচন ॥৫॥

আপনার ভুক্ত-উচ্ছিষ্টের অবশেষ পিতৃগণ, দেবগণ ও ব্রাহ্মণদিগেরও সেবনীয়, কিন্তু অগ্ন্যাগ্ন দেবগণের উচ্ছিষ্ট কখন সেবাযোগ্য নহে ॥৫॥

ইতরেষান্ত দেবানামন্নং পুষ্পং জলং তথা ।

অস্পৃশ্যন্ত ভবেৎ সর্বং নির্মালাং সুরয়া সমন্ ॥৬॥

ইতর দেবভাগণের অন্ন, পুষ্প ও জল অস্পৃশ্য হয় এবং সেই সকল নির্মালা সুরার ছায় অশবিত্ত হইয়া থাকে ॥৬॥

তস্মাষ্টৈ ব্রাহ্মণো নিত্যং পূজয়িত্বা সনাতনং ।

ত্বতীর্থং ভুক্তমন্নঞ্চ ভজেতৈবানিশং বুধঃ ॥৭॥

অতএব জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণ নিত্য-সনাতন হৃদির পূজা করিয়া তাঁহার ভুক্ত অন্ন ও জল নিরন্তর সেবন করিবেন ॥৭॥

নান্যং দেবং নিরীক্লেত ব্রাহ্মণো ন চ পূজয়েৎ ।

নান্যপ্রসাদং ভুঞ্জীত নান্যশ্রায়তনং বিশেষং ॥৮॥

ব্রাহ্মণ আপন। হিন্ন অন্য দেবতার দর্শন, অর্চন, প্রসাদভোজন এবং অস্ত্র দেবালয়ে প্রবেশ করিবেন না ॥ ৮ ॥

ন দদাতি হি যো বিপ্রঃ পিতৃণাং শ্রাদ্ধকর্ম্মণি ।

তত্ত্বক্তমন্নতীর্থঞ্চ তং সর্বং বিফলং ভবেৎ ॥৯॥

যে ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধকার্য্যে পিতৃলোকের উদ্দেশে আপনার ভুক্ত অন্ন ও জল দান না করেন, তাঁহার সেই শ্রাদ্ধ বিফল হইয়া থাকে ॥৯॥

কল্পকোটিসহস্রাণি কল্পকোটিশতানি চ ।

পতন্তি পিতরস্তস্য নরকে পুয়শোণিতে ॥১০॥

তাহার পিতৃগণ শতকোটি কল্প ও সহস্রকোটি কল্প পূজ ও শোণিত-পূর্ণ নরকে নিমগ্ন থাকেন ॥১০॥

নিবেদিতং তব বিভো যো জুহোতি দদাতি বা ।

দেবতানাং পিতৃণাঞ্চ তৃপ্তিরানন্ত্যমশূতে ॥১১॥

হে বিভো! যে ব্যক্তি আপনাকে অগ্রে নিবেদন করিয়া সেই নিবেদিত বস্তু যদি দেবতাদের উদ্দেশে ছোম এবং পিতৃলোকের উদ্দেশে দান করেন, তাহা হইলে সেই দেব ও পিতৃগণ অনন্তকাল তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥১১॥

তস্মাত্তমেব বিপ্রাণাং পূজ্যো নাশ্চোহস্তি কশ্চন ।

মোহাদ্-যঃ পূজয়েদগ্ধান্ স পাষণ্ডী ভবেদ্ধুবম্ ॥১২॥

অতএব ব্রাহ্মণগণের আপনিই পূজ্য, অস্ত্র কোন দেবতা পূজনীয় নহেন। যে ব্যক্তি অজ্ঞানবশতঃ অন্যান্য দেবগণের পূজা করে, সেই মনুষ্য নিশ্চয়ই পাষণ্ড হইয়া থাকে ॥১২॥

ত্বং হি নারায়ণঃ শ্রীমান্ বাসুদেবঃ সনাতনঃ ।

বিষ্ণুঃ সর্বগতো নিত্যঃ পরমাত্মা মহেশ্বরঃ ॥১৩॥

আপনি নারায়ণ, আপনি শ্রীমান্ এবং আপনি বাসুদেব ও সনাতন। আপনি বিষ্ণু, সর্বব্যাপী, নিত্য, পরমাত্মা ও মহেশ্বর ॥১৩॥

উপাস্ত্যঃ সেব্য্য বিপ্রাণাং ব্রাহ্মণ্যঃ শুদ্ধসত্ত্ববান্ ।

পূজ্যত্বাদ্ব্রাহ্মণানাং বৈ শুদ্ধসত্ত্বগুণাদপি ॥১৪॥

ত্বং হি কেবলং দেবানাং ব্রাহ্মণত্বমবাপু হি ।

তমেব হি সদা বিপ্রা ভজন্তি পুরুষোত্তমং

ব্রাহ্মণান্তে বভূবুস্তে নাহুে তত্র ন সংশয়ঃ ॥১৫॥

ব্রাহ্মণগণের কেবল আপনিই উপাস্ত্য, কারণ। আপনি ব্রাহ্মণ্য এবং আপনি বিদ্বৎসত্ত্বগুণসম্পন্ন। ব্রাহ্মণগণের পূজনীয় বলিয়া এবং বিদ্বৎসত্ত্বগুণ থাকায় সমস্ত দেবতাগণের মধ্যে আপনি ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ব্রাহ্মণগণ সর্বদাই আপনি যে পুরুষোত্তম, আপনার আরাধনা করেন, আপনার অমুগ্রহে তাহারাই ব্রাহ্মণ হইয়া থাকেন, অপরে ব্রাহ্মণ হইতে পারে না, ইহা অবধারিত ॥১৪-১৫॥ (ক্রমশঃ)

শৌক্ৰ ও বৃত্তগত বর্ণভেদ

বর্ণ কাহাকে বলে ও তাহার উৎপত্তি-কাল

দর্শনেত্রিয়-দ্বারা বস্তু-বিষয়ক নির্ণয়নের বিশেষত্ব উপলব্ধি যে-পরিচয়ে সিদ্ধ হয়, তাহাকে বর্ণ বলে। দ্রষ্টার অভাবে বা দর্শনের বিশিষ্ট-জ্ঞানা-ভাবে বিশিষ্টলক্ষণ-গত বর্ণের উপলব্ধি নাই। সৃষ্টির প্রারম্ভে জীবগণের বর্ণ-বিচারে নির্বিশেষ-ভাবে প্রবল ছিল। ক্রমশঃ সত্য-যুগাবসানে ত্রেতা-যুগে চারিটি বর্ণ বিভাগ লক্ষিত হয়। এবিষয়ে শ্রীমহাভারতে শাস্তিপর্ক-মোক্ষধর্মে ১৮৮ অধ্যায়ে নিম্নলিখিত প্রমাণ পাওয়া যায়,—

ন বিশেষোহস্তি বর্ণানাং সৰ্ব্ব-ব্রাহ্মণমিদং জগৎ।

ব্রহ্মণা পূৰ্ব্ব-সৃষ্টং হি কৰ্ম্মভির্বৰ্ণতাং গতম্ ॥ ১০ ॥

ব্রহ্মাকর্তৃক পূর্বে সৃষ্ট সমগ্র জগৎই ব্রাহ্মণময় ছিল, জীবের মধ্যে বর্ণগত পার্থক্য ছিল না; পরে কর্ম্মদ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ-সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে।

সত্যযুগে সকলেই এক ‘হংস’-বর্ণে অবস্থিতি এবং

ত্রেতাযুগ হইতেই স্বভাবানুসারে বর্ণের উৎপত্তি

শ্রীমদ্ভাগবত একাদশস্কন্ধ, ১৭ অধ্যায়ে,—

আদৌ কৃতযুগে বর্ণো নৃণাং হংস ইতি স্মৃতঃ ॥ ১০ ॥

ত্রেতামুখে মহাভাগ প্রাণানু মে হৃদয়ালয়ী ॥ ১২ ॥

বিপ্রকৃত্রিয়বিট্ শূদ্রাঃ মুখবাহুরুপাদজাঃ।

বৈরাজাং পুরুষাজ্জাতা য আত্মাচার লক্ষণাঃ ॥ ১৩ ॥

সত্যযুগের আদিতে মানবগণের একমাত্র বর্ণ ছিল এবং উহা ‘হংস’ নামে কথিত হইত। হে মহাভাগ, আমার প্রাণ ও হৃদয় হইতে বেদত্রয় আবির্ভূত হইয়াছিল। আমার বিরাট ব্রহ্মরূপের মুখ, বাহু, উরু ও পদ-দেশ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি বর্ণ স্ব-স্ব আচার-জ্ঞাপক স্বভাব-ভেদে উৎপন্ন হইল।

বিভিন্ন বর্ণের বিভিন্ন লক্ষণ, বৃত্তি ও স্বভাব

যে-যে লক্ষণ, বৃত্তি, স্বভাব বা প্রকৃতি অবলম্বন করিয়া নির্দিষ্ট বর্ণ পার্থক্য লাভ করিয়াছে, তাহা বিবেচ্যে শ্রীমদ্ভাগবত, সপ্তমস্কন্ধ একাদশ অধ্যায়ে নিম্নোক্ত প্রমাণ পাওয়া যায়,—

শমো দমন্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জবং ।
 জ্ঞানং দয়াচ্যুতাত্মত্বং সত্যঞ্চ ব্রহ্মলক্ষণম্ ॥ ২১ ॥
 শৌর্য্যং বীর্য্যং ধৃতিস্তেজস্ত্যাগশ্চাত্মজয়ঃ ক্ষমা ।
 ব্রহ্মণ্যতা প্রসাদশ্চ সত্যঞ্চ ক্ষত্রলক্ষণম্ ॥ ২২ ॥
 দেবগুরুর্বাচ্যতে ভক্তিস্ত্রিবর্গপরিপোষণং ।
 আস্তিক্যমুত্তমো নিত্যং নৈপুণ্যং বৈশ্যালক্ষণম্ ॥ ২৩ ॥
 শূদ্রেস্ত সন্নতিঃ শৌচং সেবা ষাণ্মিত্যায়মা ।
 অমন্ত্রযজ্ঞো হস্তেয়ং সত্যং গোবিপ্রেরক্ষণং ॥ ২৪ ॥
 যন্তা যন্ত্রলক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যাজকম্ ।
 যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তন্তেনৈব নিনির্দ্দেশেৎ ॥ ২৫ ॥

ব্রাহ্মণের লক্ষণ—শম, দম, তপ, শুদ্ধাচার, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, দয়া, অচ্যুতাত্মতা এবং সত্য । ক্ষত্র-লক্ষণ—শৌর্য্য, বীর্য্য, ধৃতি, তেজ, ত্যাগ, দ্বিতেজিয়ত্ব, ক্ষমা, ব্রহ্মণ্যতা, প্রসাদ এবং সত্য । বৈশ্য-লক্ষণ—দেবগুরু ও ভগবানে ভক্তি, ত্রিবর্গ পরিপোষণ, আস্তিক্য, উচ্চম নিত্যনৈপুণ্য । শূদ্রের লক্ষণ—সাদুদিগের নতি, শুদ্ধাচার, প্রভুর নিকট-সেবা, যজ্ঞহীনতা, যজ্ঞহীনতা, অচৌর্য্য, সত্য ও গো-বিপ্রেয় রক্ষা । এই সকল কথিত লক্ষণ পুরুষের বর্ণ নির্দেশ-কারক । যদিও অন্য লক্ষণ-বিশিষ্ট ব্যক্তির গৃহে পূর্বোক্ত লক্ষণ-বিশিষ্ট মানবক দৃষ্ট হয়, তাহার লক্ষণ দ্বারা অর্থাৎ বৃত্ত, স্বভাব বা প্রকৃতি অনুসারে বর্ণের বিশেষ নির্দেশ করিবে । অন্যথা অকরণে নির্দেশকারী আচার্য্যের প্রত্যয়বায় হইবে ।

মানবের তিন প্রকার জন্ম—মাতৃ, সাবিত্র্য ও দৈক্ষ

মানবের জন্ম ত্রিবিধ । শৌক্রে, সাবিত্র্য ও যাজিক । মনুসংহিতা দ্বিতীয় অধ্যায়, ১৬৯ শ্লোক :—

মাতুরগ্রেহবিজননং দ্বিতীয়ং যোজ্জিবন্ধনে ।

তৃতীয়ং যজ্ঞ-দীক্ষায়াং বিজ্ঞস্ত ঋতি-চোদনাং ॥

মাতা হইতে সর্বাগ্রে মানবকের জন্ম হয়, যোজ্জিবন্ধন বা উপনয়ন সংস্কারে দ্বিতীয় জন্ম । দ্বিতীয় জন্ম-লব্ধ বিজ্ঞ জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ-দীক্ষায় বেদ-শ্রবণ (সম্বন্ধজ্ঞান) হইতে তৃতীয় জন্ম লাভ করেন ।

শ্রীমদ্ভাগবত চতুর্থস্কন্ধ, ৩১ অধ্যায়, ১০ম শ্লোক এবং দশমস্কন্ধ ২৩ অধ্যায়, ৪০ শ্লোক—

কিং জন্মভিস্ত্রিভির্বেহ শৌক্ৰ-সাবিত্র্য-যাজ্ঞিকৈঃ । (ভাঃ ৪।৩।১০)

ধিগ্ জন্ম নস্ত্রিবদ যজ্ঞধিগ্ ত্রতং ধিগ্ বহুজ্ঞতাম্ । (ভাঃ ১০।২৩।৪০)

শ্রীধরস্বামী, শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ ও চক্রবর্তীঠাকুর টীকায় লিখিয়াছেন,—

“উক্তসম্বন্ধিজন্য বিগুহ্যমাতাপিতৃভ্যাংপত্তিঃ । সাবিত্র্যমুপনয়নেন, যাজ্ঞিকং দীক্ষয়া । ত্রিবৃৎ শৌক্ৰং সাবিত্র্যং দৈক্ষ্যমিতি ত্রিগুণিতং জন্ম ।”

অর্থাৎ বিশুদ্ধ পিতামাতা হইতে জন্মের নাম শৌক্ৰ-জন্ম । উপনয়ন-সংস্কার-দ্বারা আচার্য্য ও গায়ত্রী হইতে দ্বিতীয় সাবিত্র্য-জন্ম অর্থাৎ বিজ্ঞ লাভ ঘটে । দীক্ষা দ্বারা যাজ্ঞিক জন্ম, ইহাই পারমার্থিক ব্রাহ্মণ-জন্ম ।

ত্রিবিধজন্ম-মধ্যে কোন্ জন্মে কাহার অধিকার

ব্রাহ্মণের একমাত্র দৈক্ষ্য বা যাজ্ঞিক জন্মের যোগ্যতা । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সাবিত্র্য বা উপনয়ন-সংস্কারময় দ্বিতীয় জন্মে যোগ্যতা । বর্ণ চতুষ্টয়ের শৌক্ৰজন্ম-যোগ্যতা আছে । শূদ্রের সংস্কার, মন্ত্র ও যজ্ঞ-ক্রিয়া নাই । শৌক্ৰজন্ম লাভ করিয়া ভীষের আচার্য্যের কৃপায় দ্বিতীয় জন্ম-যোগ্যতা লাভ করিবার পর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বৃত্তগত বর্ণ লাভ্য হয় । সাবিত্র্য জন্ম লাভ করিয়া দ্বিজ মনুদীক্ষা-প্রভাবে তৃতীয় বা যাজ্ঞিক-জন্ম লাভ করেন । শৌক্ৰ-জন্ম লাভ করিয়া অসংস্কৃত মানব দীক্ষার পরিবর্তে পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা লাভ করেন । পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষাফলে তাঁহার দ্বিতীয় জন্মের অভাব বা অপূর্ণতা থাকে না ।

শৌক্ৰজন্ম-বিচারে যে সংস্কার, তাহা অশুদ্ধ

যামল বলেন,—কলিকালে শৌক্ৰ-বর্ণগত বিচার অবলম্বন করিয়া যে সাবিত্র্য সংস্কার দেওয়া হয়, উহা প্রকৃতপ্রস্তাবে সংস্কার শব্দবাচ্য নহে । উজ্জ্বল পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা সম্পন্ন হইলে দ্বিতীয় জন্ম-যোগ্যতা বা উপনয়ন-সংস্কারের অযোগ্যতা বিষয়ে পূর্বপক্ষের সম্ভাবনা নাই । যামল বলেন,—

অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ ।

(হঃ তঃ বিঃ মে বিঃ, ৩ সংখ্যাস্থত)

কলিকালে শৌক্রেবিচারে যে সাবিত্র্য সংস্কার হয়, তাহা অসংস্কৃত শূদ্রের সংস্কার-রাহিত্যের তুল্য।

দীক্ষাপ্রভাবে শৌক্রেশূদ্রেরও ব্রাহ্মণত্ব লাভ

পঞ্চরাত্র আরও বলেন :—

যথা কাঞ্চনতাং য়াতি কাংসং রস-বিধানতঃ ।

তথা দীক্ষা-বিধানেন বিজত্ব জায়তে নৃণাম্ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ২য় বিঃ, ৭ম সংখ্যাবৃত্ত)

যেদ্রুপ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার বলে কাংস স্বর্ণত্ব লাভ করে, সেইরূপ মানবগণের পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা (সম্বন্ধজ্ঞান) বিধানক্রমে বিজত্ব লাভ ঘটে।

শ্রীমহাত্মারত অনুশাসনপর্ব ১৬৩ অধ্যায়, ৪৬, ৫০-৫১ শ্লোক—

এতৈঃ কৰ্মফলৈর্দেবী ন্যূন-জাতিকুলোদ্ভবঃ ।

শূদ্রোহপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ ॥

ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন ক্রতং ন চ সন্ততিঃ ।

কারণানি বিজত্ব বৃত্তমেব তু কারণম্ ॥

সর্কোহয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃন্তেন তু দিধীয়তে ।

বৃন্তে-শ্চিত্তস্ত শূদ্রোহপি ব্রাহ্মণত্বং নিযচ্ছতি ॥

নিম্নকুলোদ্ভূত শৌক্রেশূদ্রও হইঙ্গীবনে এইসকল কৰ্মফল-প্রভাবে আগম-সম্পন্ন হইলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। দীক্ষিত অসংস্কৃত মানব উপনয়ন-সংস্কারে সংস্কৃত হইলে দ্বিজ হন। ‘শৌক্রেজন্ম’, ‘প্রাণহীন ক্রিয়াপন্ন সংস্কার’, ‘সম্বন্ধজ্ঞানরহিত বেদাধ্যয়ন’, ‘আধস্তনিক শৌক্রে-পারম্পর্য’ প্রভৃতি সংস্কার-গ্রহণে যোগ্যতা প্রদান করে না। দ্বিজত্বের একমাত্র কারণ বৃত্ত, স্বভাব, লক্ষণ বা প্রকৃতি। স্বভাব-ক্রমেই পৃথিবীতে ব্রাহ্মণের সংস্কার বিধান হইয়া থাকে। শূদ্রও ব্রাহ্মণ বৃত্ত, স্বভাব, লক্ষণ বা প্রকৃতিবিশিষ্ট হইলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন।

লক্ষণদ্বারাই ব্রাহ্মণ-নির্ণয়ের অথবা শাস্ত্রানুমোদিত

ছানোগ্য মাধ্বতান্ত্রিক সাম-সংহিতাবাক্য—

আর্জ্জবং ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ শূদ্রোহনার্জ্জবলক্ষণঃ ।

গৌতমস্তিতি বিজায় সত্যকামমুণানয়ং ॥

ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ সরলতা এবং শূদ্রে সাক্ষাৎ কুটিলতা।
গৌতম ইহা জানিয়াই সত্যকাম-জীবালকে সাবিত্র্য উপনয়ন-সংস্কার দিয়া
ব্রাহ্মণ নির্দেশ করিয়াছিলেন। সামবেদীয় বজ্রসূচিকোপনিষৎও লক্ষণ-দ্বারা
ব্রাহ্মণ নির্ণয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন—

“তর্হি কো বা ব্রাহ্মণো নাম। যঃ কশ্চিৎ * * * কাম-রাগাদি
দোষ-রহিতঃ শম-দমাদি-সম্পন্নো ভাব-মাৎসর্য-তৃষ্ণা-আশা-মোহাদি-রহিতো
দস্তাহঙ্কারাদিত্তিরসংস্পৃষ্টচেতা বর্ততে। এবমুক্তলক্ষণো যঃ স এব ব্রাহ্মণ ইতি
শ্রুতি-স্মৃতি-পুর্বাণেতিহাসানামভিপ্রায়ঃ। অন্যথা হি ব্রাহ্মণত্বমিহ নির্ণায়তব্যম্।”

তাহা হইলে ব্রাহ্মণ কে? যিনি কাম-রাগাদি দোষ-বর্জিত শম-
দমাদি-গুণ-বিশিষ্ট ভাব-মাৎসর্য-তৃষ্ণা-আশা-মোহহীন দস্তাহঙ্কারাদি তাক
হইয়া বর্তমান থাকেন এতাদৃশ লক্ষণ-বিশিষ্ট ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ, ইহাই শ্রুতি-
স্মৃতি-পুরাণ ও ইতিহাসের অভিপ্রায়।

বুদ্ভিদ্ধারাই ব্রাহ্মণ হওয়া যায়, অন্য উপায়ে নহে

বৃহত্তম বর্ণবিচার শ্রীমহাভারতে অনেকস্থলেই প্রমাণিত আছে। বন-
পর্ব, ২১৫ অধ্যায়,— ব্রাহ্মণো ব্যাধায়

সাম্প্রতঞ্চ মতো মেহসি ব্রাহ্মণো নাত্ত সংশয়ঃ।

ব্রাহ্মণঃ পতনীয়েষু বর্তমানো বিকর্ম্মসু ॥ ১৩ ॥

দান্তিকো দুষ্টতঃ প্রাজ্ঞঃ শূদ্রেণ সদৃশো ভবেৎ।

যন্ত শূদ্রো দমে সত্যে ধর্ম্মে চ সততোখিতঃ ॥ ১৪ ॥

তং ব্রাহ্মণমহং মন্যে বৃত্তেন হি ভবেদ্বিজঃ ॥ ১৫ ॥

ব্রাহ্মণ ধর্ম্মব্যাধকে বলিলেন—আমার বিনির্দেশে তুমি সাম্প্রতিও ব্রাহ্মণ
ইহাতে সংশয় নাই। কারণ যে-ব্রাহ্মণ দান্তিক ও বহুল দুষ্টকার্য-পরায়ণ
হইয়া পতনীয় অসংকর্ম্মে লিপ্ত থাকে সে শূদ্রতুল্য; যে-শূদ্র ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ,
সত্য ও ধর্ম্মবিষয়ে সতত উত্তম-বিশিষ্ট, তাহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া
বিনির্দেশ করি। কারণ বৃত্ত-বিচারই ব্রাহ্মণ-নির্দেশের একমাত্র কারণ।

গুণহীন শৌক্রে-ব্রাহ্মণকে শূদ্র প্রতিপন্ন না করিলে

প্রত্যবায় হয়

বর্ণপর্ব ১৮০ অধ্যায়েও বৃত্তবিচার লক্ষিত হয়—

যত্নৈতল্লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।

যত্নৈতন্ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্রমিতি নির্দেশেৎ ॥ ২৬ ॥

যুধিষ্ঠির সৰ্প-তনুদৃক্ নল্লষকে বলিলেন—হে সৰ্প! যাঁহাতে ব্রাহ্মণ-লক্ষণ—সত্য, দান, অক্রোধ, অহিংসা, অনিষ্ঠুরতা, পাণে ঘৃণা প্রভৃতি লক্ষিত হয়, তিনি ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দিষ্ট হন। ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত ব্যক্তিতে উপময়ন-সংস্কারাদি চিহ্ন থাকিলেও তাহাকে বৃত্ত-বিচারে শূদ্র বলিয়া নির্দেশ করিবে। না করিলে সত্যব্রংশ-জনিত বিধি লঙ্ঘিত হইয়া প্রত্যাঘাত ঘটিবে।

শূদ্রের দ্বিজত্ব লাভের উপায়

অমুশাসন পর্ব, ১৬৩ অধ্যায়—

ত্রয়ো বর্ণাঃ প্রকৃতোহ কথং ব্রাহ্মণ্যমাপ্নুযুঃ।

স্থিতো ব্রাহ্মণবর্ণশ্চৈব ব্রাহ্মণ্যমপভীততি।

শূদ্রো ব্রাহ্মণতাং যাতি বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়তাং ব্রজেৎ।

স্বভাবঃ কৰ্ম্ম চ শুভং যত্র শূদ্রেইপি তিষ্ঠতি।

বিশিষ্টঃ সন্ধিভাতেইব বিজ্ঞেয় ইতি মে মতিঃ॥

উমা ভিজাসা বলিলেন—ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র কোন্ বৃত্ত-বিশিষ্ট হইলে এই জন্মেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারেন, তাহা বলুন। মহেশ্বর তদ্বস্তরে বলিলেন,—ব্রাহ্মণাচারে অবস্থিত হইয়া ব্রহ্ম-বৃত্তিতে জীবন বাপন করিলে শূদ্র শূদ্রাচার ও বৃত্তিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ হইতে পারেন এবং বৈশ্য-বৈশ্য-বৃত্তি ছাড়িয়া ক্ষত্রিয়-বৃত্তি গ্রহণ করিলে ক্ষত্রিয় হইতে পারেন। যেখানে শূদ্রে শুভকৰ্ম্ম ও ব্রহ্মস্বভাব বর্তমান, তিনি দ্বিজ-জাতির মধ্যে বিশিষ্ট জানিতে হইবে, ইহাই আমার ধারণা।

বৃত্তগত ব্রাহ্মণতা সম্বন্ধে নীলকণ্ঠাচার্য্য

শ্রীনীলকণ্ঠ বৃত্তগত ব্রাহ্মণ বিষয়ে (মঃ ভাঃ রঃ পঃ ১৮০২৫ টীকায়) এইরূপ বলিয়াছেন:—

শূদ্রলক্ষ্যকামাদিকং ন ব্রাহ্মণেহস্তি। নাপি ব্রাহ্মণলক্ষ্য-শমাদিকং শূদ্রেহস্তি। শূদ্রেইপি শমাদ্রাপেতো ব্রাহ্মণ এব। ব্রাহ্মণোপি কামাদ্রাপেতঃ শূদ্র এব।

অর্থাৎ, শূদ্রের বৃত্তগত চিহ্ন কামাদি ব্রাহ্মণে নাই, থাকিতে পারে না। ব্রাহ্মণের বৃত্তগত চিহ্ন শমাদি শূদ্রে নাই, থাকিবার সম্ভাবনা নাই। শমাদি-গুণযুক্ত শূদ্রাভিহিত মানব নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ। কামাদিযুক্ত বিপ্রপরিচয়াকাজ্ঞী মানব নিশ্চয়ই শূদ্র।

শ্রীশীলকণ্ঠ ও বৃত্তগত ব্রাহ্মণ বিনির্দেশে একটী ক্ষুতিমস্ত্র উদ্ধার করিয়াছেন—

ন চৈতদ্বিদ্যো ব্রাহ্মণাঃ স্মো বয়মব্রাহ্মণা বেতি ।

আমরা জানিনা, আমরা ব্রাহ্মণ কি অব্রাহ্মণ ।

বৃত্তগত বর্ণ নিরূপণে শ্রীধরস্বামী

বৃত্তবিচারে বর্ণ নিরূপণে শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন :—

“শমাদিত্তিরেব ব্রাহ্মণাদি ব্যবহারো মুখ্যঃ, ন জাতিমাত্রাদিত্তি । যস্যোতি
যদ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেহপি দৃশ্যেত তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণ-নিমিত্তেনৈব
বর্ণেন বিনির্দিশেৎ, ন তু জাতিনিমিত্তেন ।” (ভাঃ ৭।১।১৩৫ টীকা)

শমাদি গুণদ্বারা বৃত্তগত প্রণালী হইতেই ব্রাহ্মণাদি স্থির করাই প্রধান
ব্যবহার । সাধারণতঃ শৌক্ৰ-বিচারে যে ব্রাহ্মণাদি নির্দিষ্ট হয়, তাহাই
কেবল বর্ণনির্দেশের হেতু নহে । যদি শৌক্ৰ-বিচার-নির্দিষ্ট ব্রাহ্মণ বাতীত
অন্য অশৌক্ৰ ব্রাহ্মণে শমাদি গুণ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহাকে শৌক্ৰ-
জাতি-নিমিত্তে বাধ্য না করিয়া লক্ষণ-হেতুন্মূলে বর্ণ নিরূপণ করিবে ।

বৃত্তগত বর্ণনির্দেশে মনুসংহিতা

মনু দ্বিতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে বৃত্তগত বর্ণনির্দেশ সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

যোহনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে ভ্রমং ।

স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাস্ত গচ্ছতি সাধ্বয়ঃ ॥ (২।১৬৮)

উত্তমামুত্তমান্ গচ্ছন্ হীনান্ হীনান্শচ বর্জয়ন্ ।

ব্রাহ্মণঃ শ্রেষ্ঠতামেতি প্রত্যবাসেন শূদ্রতাম্ ॥ (৪।২৪৫)

যোহনুথা সন্তমাত্মানমনুথা সংস্র ভাবতে ।

স পাপকৃত্তমো লোকে স্তেন আত্মাপহারকঃ ॥ (৪।২৫৫)

যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ ।

যশচ বিপ্রোহনধীযানব্রথস্তে নাম বিভ্রতি ॥ (২।১৫৭)

যিনি উপনীত হইয়া বেদাধ্যয়নে পরাঙ্গুখ হইয়া অন্যান্য
বিষয়ে শ্রম করেন, তিনি জীবদ্দশায় সবংশে সত্ত্বর শূদ্রতা
লাভ করেন । উত্তমোত্তম অধমাদম বর্জন করিয়া অগ্রসর হইলে ব্রাহ্মণ
শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন, আবার তদ্বিপরীতে প্রত্যয়বায় দ্বারা শূদ্রতা লাভ হয় ।
যিনি একপ্রকার স্বভাববিশিষ্ট হইয়া সাধুর নিকটে অন্যপ্রকার প্রতিপন্ন
হইবার কথা বলেন, ইহলোকে তিনি পাপকারীর অগ্রগামী, আত্মবঞ্চক ও

চোর। যেক্রপ কাঠের হস্তী, মৃগচৰ্ম্মাচ্ছাদিত মৃগপুতলি, হস্তী ও মৃগ বলিয়া গৃহীত হয় না, সেক্রপ অণষ্ঠিচ-বেদ-ব্রাহ্মণ নামে ব্রাহ্মণ হইলে, কার্য্যে লাগে না। শাস্ত্রে বৃত্তগত বর্ণবিচার ও বর্ণ নির্দিষ্ট থাকাসত্ত্বেও শৌক্ল-পন্থাবলম্বনে বর্ণ-নির্ণয় প্রবলতা লাভ করিয়াছে।

কলির প্রাবল্যে বংশগত বর্ণবিচার প্রচলিত

বৃত্তগত বর্ণনির্দেশ-প্রণালী আবহমানকাল প্রচলিত ছিল, কিন্তু কলি-প্রাধিলাভেতু ন্যায়ের মৰ্যাদা ক্ষুণ্ণ হওয়ায় অজ্ঞানপূৰ্ব্বক স্বার্থপরতাই সমাজের মেরুদণ্ড বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। শৌক্লপন্থায় যোগ্যব্যক্তিরই অব্যভিচার বর্ণ সংজ্ঞা লাভ হইত। পুরাকালে যখনই পারম্পর্য্যাপন্থায় বিভিন্ন লক্ষণ দেখা দিত, তখনই পাতিতা বা উচ্চবর্ণাধিকার লাভ হইত। উদাহরণ-স্বরূপ সামান্য কয়েকটি প্রসঙ্গ এস্থলে আলোচনা করিতেছি।

স্বভাবের উন্নতি ও অবনতিক্রমে বর্ণের উচ্চাধচ-গতি এবং

তাঁহাদের শাস্ত্রীয় উদাহরণ

হরিবংশ ১০ অধ্যায়ে, 'নাভাগাদিষ্টপুত্রাশ্চ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যতাং গতঃ।' নাভাগ ও অরিষ্টপুত্র প্রভৃতি ক্ষত্রিয় হইয়া বৈশ্যবর্ণ হইয়াছিলেন। ভাগবত ৯ম স্কন্ধ, ২য় অধ্যায়ে, 'নাভাগো দিষ্টপুত্রোহন্যঃ কৰ্ম্মণা বৈশ্যতাং গতঃ।' কৰ্ম্মবশে নাভাগ ও দিষ্টপুত্র বৈশ্য হইয়াছিলেন। হরিবংশ ১১ অধ্যায়ে, 'নাভাগাদিষ্টপুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ।' আবার নাভাগাদিষ্ট-তনয় বৈশ্য হইতে ব্রাহ্মণতা লাভ করেন। ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যবর্ণে অবনতি এবং বৈশ্য হইতে ব্রাহ্মণবর্ণে পরিণতি, বর্তমান শৌক্লবর্ণ-বিচারে অস্তিনব মনে হইতে পারে, কিন্তু পূর্বকালে এক্রপ বহু ঘটনা উল্লিখিত আছে।

বৃত্তগত বর্ণতা প্রাপ্তির শাস্ত্রীয় অম্যান্য উদাহরণ

বিষ্ণুপুরাণ, - হরিবংশ, - মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত - আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, (১) বলিরাক্ষের পাঁচটি ক্ষত্রিয় পুত্রব্যতীত বাল্যে ব্রাহ্মণ পুত্র হইতে ব্রাহ্মণ বংশ উদ্ভূত হইয়াছে। (২) গুণ্ডমদেবের শৌনকাদি ব্রাহ্মণ পুত্রব্যতীত ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রপুত্র ছিল। (৩) অম্বভদ্রেবের একশত সন্তানের মধ্যে ৮১ জন ব্রাহ্মণ, নয় জন ক্ষত্রিয় এবং নয় জন বৈশ্যব পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (৪) ক্ষত্রিয় গর্গ হইতে শিনি তৎপুত্র গার্গ্যগণ ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। (৫) ক্ষত্রিয় ভূরিতক্ষয়ের পুত্র ত্রয়্যাকুণি,

কবি ও পুরুষাকুণী ব্রাহ্মণ হন। (৬) আজমীর বাজের বংশে প্রিয়মেধা প্রভৃতি ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হন। (৭) মুদগলরাজ হইতে মৌদাল্য ব্রাহ্মণ বংশের স্রষ্টি। (৮) পুরুষাঙ্গবংশে বহু ব্রহ্মর্ষি ব্রাহ্মণগণ জাত হইয়াছেন। (৯) চন্দ্রবংশীয় যযাতি-পৌত্র কথ-বংশে মেধাতিথি হইতে প্রস্কন্ন ব্রাহ্মণ বংশের উদয়। (১০) ক্ষত্রিয় দেবদত্তের পুত্র অগ্নি বেশ্মায়ন ব্রাহ্মণ বংশের উৎপত্তি-কারক ক্ষত্রিয় ধার্মিকগণ ব্রাহ্মণ হন। (১১) ক্ষত্রিয় স্বীতিহব্য এবং বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। (১২) গুৎসমদ হইতে বহু ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হন। (১৩) পৃথ্বী ক্ষত্রিয় হইলেও অজ্ঞাত গোবধ জন্ম শূত্র হইয়াছিলেন।

বর্তমান যুগে শৌক্ৰ-সাবিত্র্য অপেক্ষা দৈক্ষ্য-সাবিত্র্য ব্রাহ্মণতারই শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রয়োজন

শৌক্ৰপারম্পর্যাক্রমে ব্রাহ্মণ-তনয়গণ অনেক সময় উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিতেন। আবার বৃত্তগত উপনয়নাদি দ্বারা দ্বিজ এবং দীক্ষা সংস্কার ব্রাহ্মণ হইবার ইতিহাস তৎকালিক ব্রাহ্মণ সমাজ গঠনের সাহায্য করিয়াছে। শৌক্ৰ-সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্য-সাবিত্র্য উভয় প্রকারেই বর্ণ-নির্দেশের কারণ ছিল এবং এক্ষণেও তাহা নূনাধিক বিলুপ্ত হইলে পুনঃ স্থাপিত হইবার বাধা নাই। বৈষ্ণবগণ বৃত্তগত বর্ণভেদ স্বীকার করেন, তাহাতে জাতি-সামান্যের দোষ স্পর্শ করেন না।

—শ্রীল প্রভুপাদ

মনুষ্য-সমাজ ও বৈষ্ণব-ধর্ম (১)

মুক্তজীবের শুদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম বদ্ধ-জীবে বিকৃত

আমরা বারম্বার বলিতেছি যে,—যাহাকে পবিত্র জৈবধর্ম বলে, তাহারই নাম বৈষ্ণবধর্ম। জীবের নিত্যধর্মের নাম—জৈবধর্ম। জীব যখন উপাধি-শূন্য হয়, তখন তাহার স্বরূপ—শুদ্ধ চিন্ময়। তখন তাহার নিত্যধর্ম কি?—নিরুপাধিক প্রেম। যখন জড়গ্রন্থিরূপ উপাধিযুক্ত হয়, তখন তাহার ধর্ম—বিকৃতপ্রেম বা জড়োপাধি-মিশ্রিত প্রেম। শুদ্ধ জীবের বৈষ্ণবধর্ম বদ্ধ-জীবে অনেকটা বিকৃতভাবে প্রকাশ পায়।

স্ব-স্বরূপ লাভ করিতে হইলেও জড়বিধি অপরিহার্য

বদ্ধজীব জড়দেহে আবদ্ধ হইয়া জড়বিধির অধীন। শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক যত প্রকার বিধি আছে, সকলই জড়বিধিময়। জড়-সম্বন্ধ তাগ করিয়া স্ব-স্বরূপ লাভ করিতে হইলেও জড়বিধি সহসা পরিত্যাগ হইতে পারে না। এই জড়শরীরে অবস্থিত ইহাই জীবকে জড়ত্যাগের উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। জড়-সম্বন্ধ ভাল ময় বলিয়া জড়দেহ নাশ করিলে কোন লাভ হইবে না। বরং আত্মধাত-পাপে অধিকতর বন্ধনের আশঙ্কা আছে। অতএব স্ব-স্বরূপ-লাভেচ্ছু জীবের পক্ষে দেহরক্ষার কার্য নিতান্ত প্রয়োজন। কেবল দেহরক্ষা নয়, দেহের পুষ্টি-বর্দ্ধন ও দৈহিক নানাবিধ অভাব নিবৃত্তির জন্যও যত্ন করা আবশ্যিক।

নিষ্পাপ দেহ-যাত্রায় আশ্রম ও সমাজের আবশ্যিকতা

উত্তমরূপ দেহযাত্রা নির্বাহ করিতে হইলে অর্থোপার্জনের একটি উপায় অবলম্বন করারও নিতান্ত প্রয়োজন। দেহযাত্রা নিষ্পাপরূপে নির্বাহিত হয়, তজ্জন্য একটি আশ্রম ও সংসার স্বীকার করা আবশ্যিক। বিবাহিত হইয়া গৃহেই থাকুন বা অবিবাহিত অবস্থায় বৃহৎসঙ্ঘচর্য বা সন্ন্যাস-গ্রহণই করুন, একটি আশ্রম অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। সেই আশ্রম-উপযোগী একটি সমাজকে অবশ্যই পত্তন করিতে হইবে। অতএব বিষয়ী, মুমুকু ও মুক্ত সকলেরই একটি একটি সমাজ আছে।

বিষয়ী, মুমুকু ও মুক্তভেদে সমাজ তিন প্রকার

কেহ কেহ মনে করেন যে, সামাজিক লোককে বৈষ্ণব বলা যায় না।—এরূপ সিদ্ধান্ত ভ্রম। সমাজ বাস্তবিক তিনপ্রকার অর্থাৎ বিষয়ী-সমাজ, মুমুকু-সমাজ ও মুক্ত-সমাজ। জীব কোন সময়েই সমাজশূন্য হয় না। জীবের স্বভাব সামাজিক। জড়-মুক্ত হইলে জীবের শুদ্ধ-ভক্ত-সমাজ অনিবার্য। অতএব জীব বনেই থাকুন, বা গৃহেই থাকুন, বা বৈকুণ্ঠে থাকুন, তিনি সর্বদাই সামাজিক। বৈষ্ণব-জীব ও ইতর-জীবে ভেদ এই যে, বৈষ্ণব-জীবের বৈষ্ণব-সমাজ এবং ইতর-জীবের ইতর-সমাজ। এখানে এই মাত্র সিদ্ধান্ত হইল যে, বৈষ্ণব-ধর্ম ও বৈষ্ণব-সমাজের কোন ভেদ নাই।

বৈষ্ণব-সমাজ ও ইতর-সমাজে ভেদ

বৈষ্ণব-সমাজ ও ইতর-সমাজের ভেদ এই যে, বৈষ্ণব-সমাজের একমাত্র চরম উদ্দেশ্য—ভগবৎপ্রেম এবং ইতর-সমাজের উদ্দেশ্য—স্বার্থপর কাম। ইতর-সমাজে বাঁহারা অবস্থিত, তাঁহারা দেহপুষ্টি, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি, নীতি, জড়ীয় বিজ্ঞান আলোচনা দ্বারা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকারক বিষয়াবিকার এবং জড়ীয় ক্রেশের ক্ষণিক নিবৃত্তি—এইরূপ কার্যকেই জীবনের ও সমাজের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া জানেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ মরণান্তর সুখকে, কেহ কেহ পারত্রিক ভোগকে এবং কেহ কেহ জীবের অস্তিত্ব নাশরূপ নির্বাণকে বহুমানন করিয়া থাকেন। বৈষ্ণব-সমাজস্থিত জীবসকল দেহপুষ্টি, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, বিজ্ঞান নীতি ও জড়সুখ-নিবৃত্তির দ্বারা ভগবৎপ্রীতি অনুশীলনের আত্মকুণ্ড লাভ করেন। উভয় সমাজের আকৃতি এক, কিন্তু প্রকৃতি ভিন্ন।

বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থাই বদ্ধজীবের সামাজিক ব্যবস্থা

বাঁহারা সমাজ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা এক বাক্যে ইহাই সিদ্ধান্ত করেন যে, বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থাই সর্বোৎকৃষ্ট সামাজিক ব্যবস্থা। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে অবস্থিত হইলে জীবের প্রকৃতি লোপ হইতে পারে না, বরং তৎসাহায্যে অনেক অবকাশ ও সুবিধার সহিত ভগবৎ-প্রেমালোচনার কার্য্য হইতে পারে। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মই বৈষ্ণবের বদ্ধ-দশায় একমাত্র সমাজ। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম কি-প্রকার তাহা ‘শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামূর্ত্তে’ প্রথম ও দ্বিতীয় বৃষ্টিতে বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে। অতএব ঐ ধর্ম্মের যথার্থ ভাব এস্থলে পুনরালোচিত হইল না। কেবল এই মাত্র জ্ঞাতব্য যে, মনুষ্য নিজের স্বভাববশতঃ একটী বর্ণ এবং অবস্থাবশতঃ একটী আশ্রম স্বীকার করিয়া জীবন নির্বাহপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়কে পরিতুট করিবে। নানা কর্ম্ম ও ‘ঘটনা-দ্বারা’ স্বভাব নিশ্চিন্ত হয়। তন্মধ্যে জন্মও একটী ‘ঘটনা’ বিশেষ।

জন্ম বা বংশক্রমে বর্ণ-নির্ণয়ে বর্ণাশ্রম অপদস্থ

ঘটনাক্রমে, আপাততঃ কেবল জন্ম-দ্বারা বর্ণ নির্ণীত হওয়ায় বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম অপদস্থ হইয়াছে। তাহাতে ফল এই-হইয়াছে যে, সেই ধর্ম্মে অবস্থিত ব্যক্তিগণের কোন কার্য্যের সাফল্য হয় না। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের এই প্রকার ব্যতিক্রম দৃষ্টি করিয়া অনেক সজ্জন লোকে ভারতের

ভাবী মঙ্গলের বিষয়ে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছেন। এইজন্যই কৃতবিদ্য ভারতবাসীগণ বর্ণ-ধর্মের উৎসর্গ কল্পনার নানাবিধ চেষ্টা করিয়া থাকেন। আমরা দেখিতেছি, বর্ণ-ধর্মের বিনাশ দ্বারা জগতের উন্নতি হইতে পারে না। বর্ণ-ধর্মই সামাজিক মানবের জীবনস্বরূপ। বর্ণাশ্রম দূর হইলে মানবের বৈজ্ঞানিক সমাজ বিনষ্ট হইবে। মানব 'পুনর্মুখিকো ভব' এই পুরাতন অভিশাপ প্রাপ্ত হইয়া স্বেচ্ছাচারী স্লেচ্ছদিগের দ্বারা অবৈধ জীবনের সুবিধা লাভ করিবে। বর্ণাশ্রম-ধর্ম বিনাশ করা কোন 'দেশহিতৈষী' ব্যক্তির অভিপ্রেত নয়। বর্ণাশ্রম-ধর্মে যে মল প্রবেশ করিয়াছে, তাহাই দূর করা কর্তব্য।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম পুনঃ সংস্থাপনের ১০টি উপায় নির্দেশ

বর্ণাশ্রম-ধর্মকে পুনরায় স্বাস্থ্য-লক্ষণে আনিতে হইলে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিধিকে পুনঃ প্রচলিত করিতে হয়; যথা :—

- ১। কেবল জন্মবশতঃ কোন ব্যক্তির বর্ণ নির্ণয় করা হইবে না।
- ২। বালা-সঙ্গ ও জ্ঞান সংগ্রহক্রমে যে স্বভাব যাহাতে প্রবল দেখা যায়, সেই স্বভাব অনুসারে প্রতি ব্যক্তির বর্ণ নির্ণয় করা উচিত।
- ৩। বর্ণ নির্ণয়-কালে স্বভাব রুচির সহিত পিতামাতার বর্ণ-সম্বন্ধ একটু বিচার করিয়া বর্ণনির্ণয় করিতে হইবে।
- ৪। পুরুষের উপযুক্ত বয়স হইলে অর্থাৎ ১৫ বৎসর বয়সের পর কুল-পুরোহিত, ভূস্বামী, পিতামাতা ও গ্রামের কতিপয় নিঃস্বার্থ বিদ্যাবান ব্যক্তি বসিয়া বর্ণ নির্ণয় করিবেন।
- ৫। প্রাপ্ত-বয়স্ক পুরুষের কি বর্ণ হওয়া উচিত, এরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হইবে না। কিন্তু প্রাপ্ত-বয়স্ক পুরুষ পিতৃবর্ণ-প্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ করিয়াছে কিনা, এইরূপ প্রশ্ন উঠিবে।
- ৬। যদি দেখা যাইবে যে, পিতৃবর্ণের যোগ্যতা হইয়াছে, তদনুরূপ সংস্কার করা যায়। যদি দেখা যায়, উচ্চবর্ণ-লাভের যোগ্যতা লাভ করিয়াছে, তাহাতেই তাহার সংস্কার

হইবে। যদি দেখা যায় যে, পিতৃবর্গের অধম বর্গের উপযোগিতা হইয়াছে, তবে বাজককে আর দুই বৎসর সময় দেওয়া যাইবে।

৭। দুই বৎসরের পর পুনরায় পূর্ববৎ বিচারপূর্বক তাহার বর্ণ নিরূপণ হইবে।

৮। প্রতি গ্রামে একটি সমাজ-সংরক্ষক-বিধান ভূস্বামী ও পণ্ডিতগণ-কর্তৃক প্রচলিত রাখিতে হইবে।

৯। এই সমস্ত কার্য যথাবিধি প্রচলিত থাকে, তজ্জন্ত সন্ন্যাসীদের সাহায্য লইতে হইবে। সন্ন্যাসীই বাস্তবিক বর্ণাশ্রম-ধর্মের রক্ষক।

১০। যাহার যে বর্ণ হইবে, তাহার তদনুরূপ বিবাহাদি সংস্কার ও অন্যান্য অধিকার হইবে। তদব্যতিক্রম-কারীর রাজদণ্ড বিধান করিতে হইবে।

বিশুদ্ধ-বর্ণাশ্রম স্থাপনের বর্তমান প্রতিবন্ধক

এখন দেখা যাউক যে, এইপ্রকার সমাজ-সংস্কার আজকাল হইতে পারে কি না; আমাদের বিবেচনায় এইরূপ কার্য হইবার সুবিধা নাই। আদৌ রাজ-সাহায্য পাওয়া কঠিন। দ্বিতীয়তঃ রাজসাহায্য পাওয়া গেলেও তাহা সহসা গ্রহণ করা উচিত নয়; যেহেতু রাজা যে-পর্যন্ত বর্ণাশ্রম-ধর্মের আশ্রয়-গ্রহণ না করেন, সে-পর্যন্ত তাহার তদ্বিষয়ে নিরপেক্ষ সাহায্য পাওয়া অসম্ভব। নিরপেক্ষ এবং সরল সাহায্য ব্যতীত একরূপ বহু সংস্কার কোনক্রমেই ঘটতে পারে না। ভারতবাসীদিগেরও এই বিষয়ে সম্যক সাহায্য পাইবার আশা নাই। স্বার্থপরতাক্রমে অনেকেই এই প্রার্থনীয় পরিবর্তনে মত দিবেন না; বরং সংস্কার-সময়ে অনেক প্রকার ব্যাঘাত উপস্থিত করিবেন। নিম্ন-বর্গের লোকেরা মূর্থতা ও অজ্ঞানতাবশতঃ বর্তমান কুসংস্কারকে সহসা পরিত্যাগে অক্ষম হইবে। অতএব কতিপয় সজ্জন ব্যক্তি মিলিত হইলেও এই বহু কার্য সহসা ঘটনীয় নহে।

যে-স্বভাব যাহাতে প্রবল দেখা যায়, সেই অনুসারে প্রতি ব্যক্তির বর্ণ নির্ণয় করা উচিত।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বর্ণাশ্রম-স্থাপনের অসীম আকাঙ্ক্ষা-

সত্ত্বেও বিপদাশঙ্কা ও হতাশাজ্ঞাপন

এখন দেখুন, দুই দিকেই বিপদ। একদিকে—কুগংঙ্গার কীট আমাদের সমাজকে নিঃসার করিতেছে। চূর্ণ করিয়া থাকিলে অমঙ্গল বই মঙ্গল নাই। আমাদের সামাজিক বল-বীৰ্য্য ও সৌভাগ্য সকলই ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হইতেছে। যে আৰ্য্য-বংশের প্রতাপে বহুকালাবধি বসুকরা কম্পমানা ছিল, সেই—

আৰ্য্য-সন্তানগণ এখন স্লেচ্ছগণ অপেক্ষাও হীন হইয়াছে। এবং ক্রমে ক্রমে অধিকতর হীন হইতেছেন। যাঁহার হৃদয় আছে, তিনি এইসকল কথা আলোচনা করিয়া ক্রন্দন করিতে-ছেন, যাঁহার হৃদয় নাই, তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া ক্রমশঃ অধোগতি লাভ করিতেছেন।

অন্যদিকে দৃষ্টি করিলেও নানাবিধ বিপদ দেখা যায়। যদি বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা ত্যাগ করিয়া নূতনরূপে সমাজ স্থাপন করি, তাহা হইলে আর আমাদের আৰ্য্যত্ব থাকে না। যেহেতু বৈজ্ঞানিক সমাজ তিরোহিত হয়। উদাহরণ-স্থল দৃষ্ট হইবে যে, বৌদ্ধ-সমাজ, জৈন-সমাজ, দেশীয় খ্রীষ্টান-সমাজ প্রভৃতি বর্ণাশ্রম-রহিত ব্যবস্থাপন করিয়া কখনই ভারতভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল না। বৌদ্ধ-সমাজ ও জৈন-সমাজ পর্বতগুহা মধ্যে লুক্কায়িত হইল। দেশীয় খ্রীষ্টান-সমাজ কেবল স্লেচ্ছানুগত্যে বৃত্ত হইল, ব্রাহ্ম-সমাজ কুটীরস্থ হইয়া পড়িল। তন্মধ্যে আর কাহারও সামাজিক স্বাধীন জীবন নাই। কোথায় বা বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতা, কোথায় বা নববিধান? কেহই কোন কাজে লাগিল না! কখনই এই বিজ্ঞানপীঠ ভারতে কোন কাজে লাগিবে না—যদি আমরা সহসা বর্ণাশ্রম-ধর্মের সংস্কার আরম্ভ করি, তবে আরো ‘ছলছুল’ পড়িয়া যাইবে। সকলদিকে অন্ধকার দেখা যাইতেছে।

নানাবিধ বিপদ ও প্রতিবন্ধক-সত্ত্বে ভগবানের নিকট

দৈববর্ণাশ্রম স্থাপনের প্রার্থনা।

এখন উপায় কি? মঙ্গলের প্রয়োজন। কিন্তু মঙ্গল কিসে সহজে লভ্য হয় তাহা বিবেচনা করা উচিত। বর্ণাশ্রম-ধর্ম যে-পর্য্যন্ত সংস্কৃত হইয়া প্রকৃতিস্থ

না হয়, সে-পর্যন্ত সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও পারমাণ্বিক অমঙ্গলসমূহ আমাদিগকে জর্জরিত করিবে। সমস্ত মঙ্গলের নিধান-স্বরূপ ভগবানই সেই মঙ্গল বিধান করিবেন, সন্দেহ নাই।

সত্য সত্য বর্ণাশ্রম স্থাপনের শাস্ত্রীয় আপত্তি খণ্ডন

পুরাণ অবলম্বনপূর্বক কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, কলির অবসানে শ্রীশ্রীকল্কিদেব অবতীর্ণ হইয়া মরু ও দেবাপি রাজ্যদ্বয়ের সাহায্যে বর্ণাশ্রম-ধর্ম পুনর্ব্বার সংস্থাপন করিলে সত্যযুগের উদয় হইবে। কিন্তু আমরা বলি যে, এই কলিযুগ সাধারণ কলিযুগ নয়। ইহাকে পূর্ব্ব মহাস্বাগণ ‘ধন্য কলি’ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সাধারণ কলিযুগেই কেবল কলি-কালের অবসানে ধর্ম সংস্থাপিত হয়। ‘ধন্য কলিযুগে’ আর কল্কি-অবতারের অপেক্ষা নাই। যে কলিযুগে পরিপূর্ণশক্তি, পরম-কারুণিক, পরমপ্রেমমুগ্ধ শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইয়াছেন, সে-কলিযুগের আর কথা কি? সেই করুণাময় মহাপ্রভুর কৃপায় অবিলম্বে সমস্ত সামাজিক অমঙ্গল দূরীভূত হইবে, সন্দেহ নাই। অকৃত্রিমরূপে সেই মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় করিলে আর কোন বিষয়ের চিন্তা থাকিবে না।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম-সংস্থাপনই প্রধান ধর্মসংস্কার

এই সংখ্যায় আমরা এই পর্য্যন্ত বলিলাম, সামাজিক মঙ্গল সাধন ও ‘বর্ণাশ্রমরূপ প্রধান ধর্মের সংস্কার-বিষয়ে’ যে উৎকৃষ্ট উপায় আছে, তাহা আগামী সংখ্যায় আমরা প্রস্তাব করিব। আশা করি যে, সহৃদয় পাঠকবর্গ বিশেষ মনোনিবেশপূর্ব্বক আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া আগামী সংখ্যায় দ্বিতীয় প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্ত প্রস্তুত হইয়া থাকুন। যে-বিষয়ে আমরা হস্তক্ষেপ করিলাম তাহা অত্যন্ত গভীর। সংঘত অন্তঃকরণে এই বিষয়টির আলোচনা করা আবশ্যিক। অনেক নিগূঢ় কথা ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে থাকিবে। সংক্ষেপতঃ আমরা এই বলি যে, বঙ্গীয় সমাজের পক্ষে আর অধিকতর গুরুতর বিষয় ইহা অপেক্ষা নাই।

(সজ্জনতোষণী ২য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা)

—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

বৈষ্ণব

প্রণতি করিয়া, তুণ ধরিয়া দশনে ।

কান্দিয়া কান্দিয়া কৃপা মাগিব চরণে ॥

পতিত অধম মুই কিছু গুণ নাই ।

নিজ গুণে কর দয়া বৈষ্ণব গোসাত্ত্বি ॥

অহৈতুকী কৃপা আর কেহ নাহি করে ।

তোমা সম দাতা নাহি জগত সংসার ॥

তব গুণ বর্ণিবারে অনন্ত দেবগণ ।

নাহি পারে, মুই কি বলিব শিশুজন ॥

বৈষ্ণবের দেহ সদা চিদানন্দময় ।

যেই নিন্দা-হিংসা করে অশেষ দুঃখ হয় ॥

বৈষ্ণবের দেহ-দেহী কভু ভেদ নাই ।

অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণ ভজে সর্বথাই ॥

বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা দেবে নাহি জানে ।

অমুর-মূর্থ-কুতর্কিক জানিবে কেমনে ॥

শচীমাতার অভিনয় শ্রীঅবৈত-সনে ।

চাপাল-গোপাল, দেবানন্দ, শ্রীবাসের সনে ॥

এ সব ঘটনা মহাপ্রভুর অবতারে ।

বৈষ্ণব-অপরাধে প্রেম না দেন কাহারে ॥

যে বৈষ্ণবের কাছে হয় যার অপরাধ ।

কৃপা করি' সেই যদি করেন প্রসাদ ॥

তবে তার অপরাধ খণ্ডন-উপায় ।

অনুথা হইলে তার বিনাশ নিশ্চয় ॥

শূলপাণি সম যদি কেহ শক্তি ধরে ।

বৈষ্ণব-নিন্দায় তারে অবশ্য সংহারে ॥

সূর্য্য হইতে তেজোময় বৈষ্ণব ঠাকুর ।

তার পদ-ছায়া-তলে আনন্দ প্রচুর ॥

বৈষ্ণব-গুণের আমি কি দিব উপমা ।

ব্রহ্মা আদি দেবগণ নাহি পায় সীমা ॥

শ্রীঅনন্তদেব সদা অনন্ত বদনে ।

বৈষ্ণবের গুণ-গান করেন ব্যাখ্যানে ॥

বৈষ্ণব-অপরাধ ছাড়ি' সেব ভগবান্ ।

মায়াবদ্ধ হইতে তবে পাবে পরিত্রাণ ॥

কৃষ্ণে ভক্তি, নাহি করে বৈষ্ণব-সেবন ।

সর্বগুণ থাকিলেও অসুরে গণন ॥

সহজে করুণাসিন্ধু বৈষ্ণব-গোসাঞি ।

তার কৃপা হইলে পাই চৈতন্য নিতাই ॥

বৈষ্ণবের কৃপা-দৃষ্টি যারে নাহি পায় ।

অনন্তকাল আরাধিলে কৃষ্ণ নাহি পায় ॥

বৈষ্ণব-সেবা, কৃষ্ণ-সেবা দুইত সমান ।

কৃষ্ণ-সেবা হইতে বৈষ্ণব-সেবা সে প্রধান ॥

বৈষ্ণব-সেবা কৈলে কৃষ্ণ অবশ্য মিলিবে ।

ইথে অবিশ্বাস হইলে নরকে মজিবে ॥

ইহাতে বৈষ্ণব-পদে যত অপরাধ ।

সব ক্ষমি' প্রভু মোরে করহ প্রসাদ ॥

বৈষ্ণব-প্রসাদ বিনা কেবা কোন্ যুগে ।

পাইয়াছে কৃষ্ণ-প্রেমা জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগে ॥

জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ জীবের বন্ধন-কারণ ।

অশেষ দুঃখ পায়, করে নানা যোনি ভ্রমণ ॥

আত্মান্তিক মঙ্গলার্থীর জ্ঞাতব্য

সেবক সর্বদা সেবাই করিবেন, ভুলক্রমেও ভোগ বা ত্যাগের মধ্যে যাইবেন না। সেবক প্রভুর নিকট হরিকথা শ্রবণ করিবেন; তিনি যাহা শ্রবণ করিবেন, তাহা নিজ জীবনে পালন করিবেন। হরিকথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার সেবাংসাহ বদ্ধিত হয় এবং সেবা করিতে করিতে আরও শ্রবণাকাঙ্ক্ষা জাগে। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের প্রতি তাঁহার যেরূপ মমতা, তাঁহাদের সেবা-উপকরণের প্রতিও সেবকের সেইরূপ মমতা হইবে। সেবকের প্রভুত্ব-কামনা নাই। যিনি বিষ্ণুসেবা করেন, তিনিই বুদ্ধিমান; আর যাহারা প্রভুত্বকামী, তাহারা মূর্খ। যে মায়ায় উপর প্রভুত্ব করিতে চায়, সে অন্তর্ভুক্ত বা অচেতন।

সেবক শ্রীগুরুপাদপদ্মতলে—শ্রীধামে বাস করেন। তিনি অন্য কোথাও যাইতে চাহেন না বা অস্থল কাহাকেও আশ্রয় করেন না। শিষ্যই সেবক বা দাস। শিষ্য বা সেবক সাধুগুরুর পরিচর্যা ও তাঁহাদের প্রিয় ও হিতকর কার্য্য করিবে। সাধুগুরুর নিকটে পাদপ্রসারণ, অনুমতি ব্যতীত অন্যত্র গমন, আশ্রয়লাভ, উচ্চবাক্য, প্রতিবাদ বা মন্তব্য প্রকাশ উচিত নয়, যে সাধুগুরুর কথার উপর কটাক্ষ করে, সে ত' স্বতন্ত্র—অশ্রদ্ধালু। নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির স্নেহ-কৃপাময় শাসন বা কথা যাহার ভাল লাগে না, যে তাহা অমান্যবদনে সহ্য করিতে পারে না, এটরূপ অসহিষ্ণু ব্যক্তি হরিভক্তন কি করিয়া করিবে? বিশ্বের যাবতীয় তিরস্কার, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সব সহ্য করিতে না পারিলে কি কেহ হরিভক্তনে অগ্রসর হইতে পারে? সেবক বা সেবালিপ্সু শরণাগত; তাহার দম্ভ বা অহঙ্কার নাই। তিনি কাহারও মর্যাদা লঙ্ঘন করেন না। তিনি নিজেই লঘু বলিঘাই জানেন। সেবা-লিপ্সু ব্যক্তিমাঝেরই দীন, কাজাল ও সহিষ্ণু হওয়া দরকার। শরণাগতি বা প্রভা না থাকিলে সহিষ্ণুতা থাকে না। হৃদয়ে অমৃত্যুভিলাষ থাকিলে কেহ সহ্যগুণসম্পন্ন হইতে পারে না।

সেবক সর্বত্রই গুরুদর্শন করিয়া সকলকে দণ্ডবৎ-প্রণাম করেন। জগতের সকল লোকই জড়-দর্শন বা মাংস দর্শন করে; কিন্তু ভক্ত বেদদৃক, তাঁহার মাংস দর্শন নাই। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—“ভক্ত সর্বত্রই

ভগবৎ-সম্বন্ধই দর্শন করেন—শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে যাবতীয় বস্তু দর্শন করেন। যেকোন দুইটি পৃথক স্থানীয় পুরুষ ও স্ত্রী পতী-পত্নী-সম্বন্ধে আবদ্ধ হইলে সতী স্বামীর সম্বন্ধে তাঁহার সকল সম্বন্ধ ঠিক করেন, তদুপ চেতন দর্শনে সেই response হয় ; যেমন স্তম্ভের সহিত প্রহ্লাদের response হইয়াছিল, প্রহ্লাদ জড় দর্শন করেন নাই, বিভূচিৎ দর্শন বা দেব্য-দর্শন করিয়া-ছিলেন। ভক্তের সর্বত্র গুরুদর্শন, কোথাও ভোগ্যদর্শন নাই, সর্বত্র প্রেমদর্শন—আনন্দময় দর্শন। ইহাই পরমহংস দর্শন, আত্মদর্শন বা চিদদর্শন। ভক্তের সহিত ভগবানের নিরন্তর প্রেম-সেবা হইতেছে। অভক্ত লোক চর্য্যচক্ষু দিয়া ভোগ্য দর্শন করেন, আর ভক্তগণ সেবানুখ কর্ত্তব্য ভগবান্কে দর্শন করিয়া থাকেন।”

সেবক প্রত্যহ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উত্থান করিবেন। সাধু-গুরুর তাড়না ও ভর্ৎসনায় তাঁহাদিগকে অবহেলা ও অপ্রিয় বাক্য বলিবেন না। তাঁহাদের গমন, বচন ও ক্রিয়ার অনুকরণ করিবেন না। আমি যাহা, সাধু-গুরুও তাহা—একপ অহংভাব দেখাইবেন না। সাধুগুরুর আদেশ কখনও লঙ্ঘন করিবে না। সাধুগুরুর আগমনে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইবে। কায়-মনো-বাক্যের দ্বারা তাঁহাদের প্রিয়কার্য্য সাধন করিবে। সেবা ভগবান্ কৃষ্ণ গুরুশরীরে সর্বক্ষণ অবস্থিত জানিবে। গুরুবৈষ্ণব-নিন্দকের সহিত বাক্যা-ল্লাপ ও সঙ্গ করিবে না। হরিবাসরে উপবাস করিবে। উর্দ্ধপুণ্ড্রধারণ শ্রীচরণামৃত পান, শ্রীতুলসীসেবা, শ্রীমন্দির-পরিক্রমা, আরাট্রিক দর্শন ও অর্চনাদি করিবে। পূজার সময় ভূতশুদ্ধি ও ন্যাস করিবে। প্রত্যহ হরিকথা শ্রবণ ও তদনুসারে জীবন-যাপন করিবে। শ্রীএকাদশী, অষ্টমহাদ্বাদশী ও জন্মাষ্টম্যাদি তিথি পালন করিবে। গুরুতে ঈশ্বরবুদ্ধি করিবে। সমর্থ-পক্ষে প্রত্যহ স্নান করিবে। উরুর উপর পদ-স্থাপনপূর্ব্বক সাধু-গুরুর নিকট বসিবে না। ময়ূরীন্দ্র তিলক ও আচমন করিবে না। বৈষ্ণব-বিদ্বেষীর সহিত বন্ধুত্ব করিবে না। উত্তর সন্ধ্যায় শয়ন করিবে না। তুচ্ছ সঙ্গ-সুখাসক্তি পরিত্যাগ করিবে। কখনও শোকের অধীন হইবে না। সমর্থ-পক্ষে শ্রীএকাদশীতে অনুকল্প করিবে না। দ্বাদশীতে দিবানিদ্ৰা, তুলসী-চয়ন ও বিষ্ণুস্থান নিষিদ্ধ। চঞ্চলচিত্তে অর্চন করিবে না। একহস্তে প্রণাম ও একবার মাত্র প্রদক্ষিণ নিষিদ্ধ।

গুরু ও শিষ্য উভয়েই নিত্য। সেবাও নিত্য, সেবকও নিত্য। সাধু-গুরুকে এজগতের ব্যক্তিবিশেষ মনে করিলে সেবক হওয়া যায় না। গুরু-শিষ্যসম্বন্ধ নিত্য। দ্বিতীয়াভিনিবেশ দূর হইলে নিজেকে শুদ্ধ কৃষ্ণদাস বলিয়া উপলব্ধি হয়। সেবক সর্বক্ষণ ভগবানকে মনে রাখিবেন। গুরুস্মৃতি থাকিলেই কৃষ্ণস্মৃতি থাকিবে। সর্বক্ষণ হরিনাম করিবার যত্ন করিলে—হরিচিন্তা হৃদয়ে থাকিলে কোন বাধাই সেবকের কোন ক্ষতি করিতে পারে না। সেবক সর্বক্ষণ সেবার চিন্তা করিবেন। তিনি জাগতিক অভিমান বা জড়াহঙ্কার পরিত্যাগ করিবেন। সেবক সর্বক্ষণ সাধুসঙ্গ করিবেন। সাধুসঙ্গ না করিলে হরিসঙ্গ হইবে না।

শুদ্ধভক্তিসাধনেচ্ছা সকলেরই সর্বপ্রথম অত্যাৱশ্যক কৃত্য—পঞ্চবিধ বা নববিধা ভক্তির অকপট অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে প্রকৃত উচ্চাধিকারী অর্থাৎ নিজের প্রতি অকপট কৃপামঙ্গলকাজী সাধুর প্রকৃষ্ট সঙ্গে চিন্তে শ্রদ্ধা হয় অথবা রুচির উদয় পর্য্যবেক্ষণ করা এবং শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে মনন অর্থাৎ কৃত বিষয়ের পর্যালোচনা-দ্বারা প্রতিকূল-বিষয় পরিত্যাগপূর্বক অহুকূল গ্রহণের চেষ্টা করা।

—ত্রিদণ্ডিয়ামী শ্রীমন্ত্ৰিবেদান্ত হরিশজন মহারাজ

ঈশ্বর

কঃ ঈশ্বরঃ অর্থাৎ ঈশ্বর কে? ইহার উত্তরে শাস্ত্রে দেখা যায়,—
“কর্তৃমকর্তৃম্ অন্যথা কর্তুং যঃ সমর্থঃ স ঈশ্বরঃ।” অর্থাৎ ‘হয়’কে ‘নয়’, ‘নয়’কে ‘হয়’ অথবা খেয়াল-খুসী মাফিক যাহা ইচ্ছা করিতে যিনি সমর্থ, তিনিই ঈশ্বর। ঈশ্বর বলিতে পরমেশ্বরকে বুঝায়। ঈশ্বররাণাং যঃ পরমঃ (শ্রেষ্ঠঃ) অর্থাৎ ঈশ্বরদিগের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনিই পরমেশ্বর। এখানে ব্রহ্মা-শিবাদিকে ঈশ্বর বলা হইয়াছে, সুতরাং তাঁহাদিগের অপেক্ষা স্বয়ং ভগবান্ পরমেশ্বর শ্রেষ্ঠ।

গোলোকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চৌষট্টিগুণে সমন্বিত, বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণ—যিনি শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-বিগ্রহ, তিনি ষষ্টিসংখ্যকগুণে বিভূষিত এবং

অন্যান্য দেবতাগণ পঞ্চান্নটি গুণযুক্ত। অতএব একমাত্র গোলোকবিহারী
কৃষ্ণ সর্বেশ্বরেশ্বর। শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতায় তাঁহার স্বরূপের উল্লেখ দেখিতে
পাওয়া যায়; যথা,—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।

অনাদিরাদির্গৌবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥—(ব্রঃ সং ৫।১)

অর্থাৎ সং. চিৎ ও আনন্দময় বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর। তিনি স্বয়ং-
রূপ, অনাদি, সর্ববিষয় ও বৈষ্ণবতত্ত্বের আদি এবং সর্বকারণের কারণ।

যিনি বিরাট পুরুষ, তিনিই বিষ্ণু, বাসুদেব, অচ্যুত ও হরি। তিনি
হিরণ্য, ভগবান্, অমৃত, নিত্য এবং তিনিই শিব অর্থাৎ মঙ্গলময়। তিনি
সকল জগতের অধিপতি, সকললোকের ঈশ্বর এবং তিনি প্রভু অর্থাৎ নিগ্রহ
ও অনুগ্রহ করিতে সমর্থ।

ভগবান্ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ শাস্ত্রে দেখা যায়। যথা,—

ঐশ্বর্য্যস্ত সমগ্রস্য বীর্য্যস্ত যশসঃ শ্রিয়ঃ।

জ্ঞানবৈরাগ্যায়োশ্চৈব যশ্চ ভগ ইতীদৃশা ॥

—(বিষ্ণুপুরাণ ৬।৫।৪৭)

অর্থাৎ সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, শ্রী অর্থাৎ সৌন্দর্য্য, সমগ্র
জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই ছয়টির সমষ্টি ‘ভগ’ নামে বিখ্যাত; এই ছয়টি
অচিন্ত্যগুণ স্বাধাতে অঙ্গাঙ্গিভাবে তত্ত্ব, তিনিই ভগবান্।

শ্রীকৃষ্ণই যে স্বরাট পুরুষ, তাহা আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথম স্কন্ধে প্রথম
শ্লোকে জানিতে পারি। এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশকার্য্য অম্বয়
ও ব্যতিরেকভাবে ঐ স্বতন্ত্র পুরুষ হইতে সাধিত হয়। যিনি আদি কবি
ব্রহ্মার বুদ্ধিবৃত্তি প্রবর্ত্তন করিয়া মনের দ্বারা তত্ত্ববস্তু প্রকাশ করিয়াছিলেন।
স্বাধাতে কপটতার কোন স্থান নাই, সেই সত্য-স্বরূপলক্ষণময় পরমেশ্বরকে
যান করা কর্তব্য।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের উল্লেখ দেখিতে পাই, যথা,—

কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচার, শুন সনাতন।

অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥

সর্ব-আদি, সর্ব-অংশী, কিশোরশেখর।

চিদানন্দ-দেহ, সর্বাশ্রয়, সর্বেশ্বর ॥

স্বঃ ভগবান্ কৃষ্ণঃ, গোবিন্দ-‘পর’-নাম।

সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ ঈশ্বর গোলোক-নিত্যধাম ॥—

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৫২, ১৫৩, ১৫৫)

শ্রীপদ্মপুরাণ বলেন,—

ভগবান্ বিষ্ণুই জগদীশ্বর, পরমাত্মা এবং জগতের বন্ধু। তিনি স্বাবর-
জ্ঞমাত্মক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা এবং তিনিই একমাত্র সম্যাসীদিগের পরমা-
গতি। মুনিগণ তাঁহাতেই ‘ঈশ্বর’ শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। নিকৃপাধি
অর্থাৎ উপাধিশূন্য ঈশ্বরত্ব বাসুদেব কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত আছে। সনাতন
বেদবাক্যদ্বারা তিনি আত্মা এবং ঈশ্বর বলিয়া কথিত হইয়াছেন। এই
কারণে বাসুদেবে মহেশ্বরত্বও প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। শ্রী, ভু ও লীলা—
এই সকলের যিনি পতি, তিনি অচ্যুত বলিয়া উক্ত হন। এই বাসুদেব
যজ্ঞের ঈশ্বর, যজ্ঞস্বরূপ, যজ্ঞভোক্তা, যজ্ঞকারী, যজ্ঞধারী এবং যজ্ঞপুরুষ
এবং ইনিই পরমেশ্বর।

যিনি সমস্ত জীবদ্বারা বিরাট মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছেন এবং যিনি
এই ত্রিভুবন সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন, সেই নারায়ণই পরমেশ্বর।

তিনিই সর্বৈশ্বরের, ঈহার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয় হইতে ক্ষত্রিয়,
উরুযুগল হইতে বৈশ্য, চরণদ্বয় হইতে শূদ্র ও পৃথিবী এবং মস্তক হইতে
দ্বর্গ যথাক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে। তাঁহার মন হইতে চন্দ্র, চক্ষু হইতে সূর্য্য,
মুখ হইতে অগ্নি ও প্রাণ হইতে বায়ু সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহার নাভি
হইতে অন্তরীক্ষেরও উৎপত্তি হইয়াছে।

এ কারণে সর্বময় বিষ্ণু পরমেশ্বর বা নারায়ণ বলিয়া কথিত হইয়া
থাকেন। যেকোন উর্বনাভি (মাকড়সা) আপনার তন্তুসকল বিস্তার করে
ও পুনরায় গ্রাস করে, সেইরূপ পরমেশ্বর হরি আপনার লীলাসমূহদ্বারা
জগৎ সৃষ্টি করিয়া পুনর্বার তাহা কবলিত করিয়া থাকেন।

অতএব এই বিষ্ণু পরমেশ্বরের পাদপদ্ম-সেবন মহন্ত্যমাত্রেই একান্ত
কর্তব্য। কারণ তিনি সমস্ত প্রাণীর প্রিয়, আত্মা, ঈশ্বর ও সুখ্য।

—ত্রিদণ্ডিষামী শ্রীমন্ত্তিবোদান্ত উর্দ্ধমন্ত্রী মহারাজ

শ্রীল জয়দেব গোস্বামী

ভগবৎপার্শ্বদ শ্রীল জয়দেব গোস্বামী প্রভু বীরভূম-জেলার অন্তর্গত কেন্দুবিষ্ণু-গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হন। এই কেন্দুবিষ্ণু অজয়-নদীর তীরে অবস্থিত। সাধারণের নিকট এই স্থান জয়দেব-কেন্দুলী বলিয়াও পরিচিত। শ্রীজয়দেবের পিতার নাম—শ্রীভোজদেব এবং জননীর নাম—শ্রীবামাদেবী। শ্রীজয়দেব-সরস্বতী নবদ্বীপাধিপতি লক্ষ্মণসেনের সভা-পণ্ডিত ছিলেন। প্রায় আট শত বৎসর পূর্বে শ্রীজয়দেবের আবির্ভাব-কাল।

জুনা যায়, স্বপ্নে শ্রীজগন্নাথ-দেবের কৃপাদেশে শ্রীল জয়দেব প্রভু পরমা ভক্তিমতী শ্রীপদ্মাবতীদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। স্বপ্নে তিনি শ্রীরাধামাধবের সেবাও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একদিন শ্রীল জয়দেব প্রভু তদ্বিচিত-শ্রীগীত-গোবিন্দ গ্রন্থটি লিখিতে লিখিতে “স্মর-গরল-খণ্ডনং মম শিরসি যন্তুনং” —এই শ্লোকটি কিঞ্চিৎ লিখিয়া ইহা চিন্তাবে পূরণ করিবেন, তাহা চিন্তা করিতে করিতে উহা অসম্পূর্ণভাবে রাখিয়া গঙ্গাস্নানে গমন করেন। শুক্ল-বৎসল শ্রীকৃষ্ণ শ্রীজয়দেবের বেশে তাঁহার গৃহে শুভবিজয় করিয়া দ্বহস্তে “দেহি পদ-পল্লবমুদারম্”—এই পংক্তিটি লিখিয়া শ্লোকটি পূরণ করিয়া দেন। গঙ্গা-স্নানান্তে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া শ্রীপদ্মাবতীদেবীর নিকট যথাযথ বস্তান্ত শ্রবণ ও গ্রন্থের অসম্পূর্ণ-শ্লোকটি পূরণ হইতে দেখিয়া শ্রীজয়দেব বিস্মিত ও পরমানন্দিত হন। আরও জুনা যায়, কেন্দুবিষ্ণু হইতে প্রত্যাহ ১৮ ক্রোশ পথ হাঁটিয়া শ্রীজয়দেব নিত্য গঙ্গাস্নান করিতেন। একদিন গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া গঙ্গায় অবতরণ করা মাত্র তিনি আকাশ-বাণীতে শ্রীগঙ্গাদেবীর কৃপাদেশ শ্রুতিতে পান,—‘তোমার প্রত্যাহ এতদূর হাঁটিয়া গঙ্গা-স্নানে আসার দরকার নাই। কল্য হইতে আমি তোমার জন্ত অজয়ে গিয়া যখন উজান বাহিব, তখন তুমি স্নান করিবে।’

শ্রীল জয়দেব গোস্বামী প্রভু শ্রীজগন্নাথ-ক্ষেত্রে অনেক-কাল অতিবাহিত করেন। শ্রীজয়দেবের স্মরণার্থ এখনও প্রতিবৎসর পৌষ-সংক্রান্তিতে কেন্দুলীতে বিরাট মেলা হইয়া থাকে। এই মহাপুরুষ শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে ‘মহাজন’ বলিয়া নিতাপূজিত। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নীলাচলে শ্রীমুকুণ্ড-রামানন্দাদি অন্তরঙ্গ ভক্তগণসহ শ্রীজয়দেবের শ্রীগীত-গোবিন্দ আশ্বাদন করিয়াছেন। ঐচৈতন্যচরিতামৃতে—

চণ্ডিদাস, বিজ্ঞাপতি, রাঘের নাটক-নীতি,
 কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ ।
 স্বরূপ-রামানন্দ-সনে মহাপ্রভু রাত্রি-দিনে,
 গায়, শুনে পরম-আনন্দে ॥ (মধ্য ২।২৭)

বিজ্ঞাপতি-জয়দেব-চণ্ডিদাসের গীত ।
 আত্মদেব রামানন্দ-স্বরূপ সচিত্ত ॥ (আদি ১৩।৪২)
 যেই যেই শ্লোক জয়দেব, ভাগবতে ।
 রাঘের নাটকে, যেই আর কর্ণামৃতে ॥
 সেই সেই ভারে শ্লোক করিয়া পঠনে ।
 সেই সেই ভাবাবেশে করেন আত্মদনে ॥ (অন্ত্য ২০।৬৭-৬৮)

গৌরজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীল জয়দেব গোস্বামী প্রভুর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—“শ্রীজয়দেব একজন অপূর্ব কবি। বীণভূমের অন্তর্গত কেন্দু-বিল্ব-গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া সাধুসঙ্গে অপ্রাকৃত কৃষ্ণতত্ত্বে তাঁহার বিশেষ রুচি হয়। গৃহত্যাগপূর্বক তিনি নবদ্বীপ-সম্রাট লক্ষণসেনের সভায় প্রধান কবিরূপে পুজিত হইয়াছিলেন। সেই সময় শ্রীজয়দেব ‘চন্দ্রালোক’ বলিয়া একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। ব্যাকরণ-শাস্ত্রে ও অলঙ্কার-শাস্ত্রে তিনি একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। পাণ্ডিত্য অপেক্ষা তাঁহার কবিত্বশক্তি অধিক ছিল—ইহা সকলেই স্বীকার করেন। শ্রীনবদ্বীপ-সম্রাটের সভা পরিত্যাগপূর্বক সমস্ত তীর্থভ্রমণপূর্বক অবশেষে তিনি শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে অবস্থান করেন। ঘটনাক্রমে তাঁহাকে শ্রীপদ্মাবতী-দেবীর পাণিগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। তিনি শ্রীগীতগোবিন্দ রচনাপূর্বক গুরুভক্তগণের করকমলে অর্পণ করিয়াছিলেন।”

শ্রীগীতগোবিন্দ কৃষ্ণদাসী-প্রতিপাদক অপ্রাকৃত শৃঙ্গার-রসময় কাব্য-বিশেষ। জগতে এইরূপ কাব্যগ্রন্থ আর নাই। এই শ্রীগীতগোবিন্দ-পাঠে অনর্থযুক্ত ব্যক্তির অধিকার নাই। তবে শ্রীজয়দেব-কৃত শ্রীদশাবতার-স্তোত্র—যাহা শ্রীগীতগোবিন্দের প্রারম্ভে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা সাধারণের পাঠ্য ও কীর্তনীয়। ভারতের এবং বিদেশের বহুভাষায় শ্রীগীতগোবিন্দ ভাষান্তরিত হইয়াছে। বহু পণ্ডিত শ্রীগীতগোবিন্দের টীকা লিখিয়া প্রশিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। শ্রীল জয়দেব গোস্বামী প্রভু শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীযোগপীঠের

সম্মিষ্টবর্তী শ্রীনাথপুরে অবস্থান করিয়া শ্রীরাধামাধবের সেবা করিতেন। শ্রীগীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকে তিনি শ্রীরাধামাধবের বামুনকেলির যে জয়গান করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীরাধামাধব-মিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় তিনি যে উদ্ভাসিত হইয়াছিলেন, তাহাই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। শ্রীরাধা-মাধব-মিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার হৃদয়ে উদ্ভিত হইয়া শ্রীগীত-গোবিন্দের মঙ্গলাচরণে তাঁহার আগমনী-গীতি গান করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের নিতাপার্বদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,— “যদিও শ্রীমদ্গৌরাঙ্গদেবের বাহ্যপ্রকাশ তখন হয় নাই, তথাপি শ্রীজয়দেব, শ্রীবিষ্ণুমঙ্গল, শ্রীচণ্ডীদাস, শ্রীবিদ্যাপতি, শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদ প্রভৃতি শুদ্ধভক্ত-গণের হৃদয়ে মহাপ্রভুর ভাবোদয় ছিল।”

কথিত আছে, শ্রীগীতগোবিন্দ-রচয়িতা কবিবর শ্রীল জয়দেব গোস্বামী-প্রভু লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালে ঋতুদ্বীপস্থ চম্পকহটে শ্রীপদ্মাবতীদেবীর সহিত অবস্থান করিয়া রাগমার্গে শ্রীরাধামাধবের ভাবসেবা করিতে করিতে পুণ্ড্রসুন্দরত্বাতি শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন-সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

আমরা যেন শ্রীগুরু-নিত্যানন্দের কৃপায় নিবৃত্তানর্থ ও শুদ্ধচিত্ত হইয়া কখনও শ্রীজয়দেব-সরস্বতীর প্রণারাম চিল্লীলামিথুনের সেবায় অকৃত্রিম লৌল্য লাভ করিতে পারি, তাঁহার কৃপায় যেন আমাদের শ্রীগুরুগৌরাঙ্গে অচলা ভক্তি ও প্রীতি হয়, শুদ্ধচিত্ত হইয়া শ্রীজয়দেব প্রভুর শ্রীগীতগোবিন্দ গুরুানুগত্যে আলোচনা-মুখে আত্মদনের সৌভাগ্য যেন আমরা কোন দিন পাই, তাঁহার অনুক্ষণ হরিসেবাময় অলৌকিক পুত্চরিতামৃত যেন আমা-দিগকে শ্রীকৃষ্ণ-কাঞ্চ-পাদপদ্মে আকৃষ্ট করে—ইহাই ভগবত্তিষ্ঠজন শ্রীল জয়দেব গোস্বামী প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে আমাদের আন্তরিক নিবেদন ও কাতর প্রার্থনা।

দ্ব-একটি কথা

শ্রীগীতার পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, ধর্ম-জগতে তিনপ্রকার মতভেদ অনাদিকাল হইতে বর্তমান। কর্ম-পথের পথিক সুখ-দুঃখ-ভোগী, জ্ঞান-পথের পথিকগণ সুখ-দুঃখত্যাগী এবং ভক্তিপথের পথিক ভোগী বা ত্যাগী না হইয়া ভগবানের নিত্যসেবাপর। ভগবানের সেবায় কর্ম ও জ্ঞানের সাহায্য লইতে হয় না।

শ্রীকৃষ্ণ কি বস্তু ?

অজের জন্ম, বিরুদ্ধ গুণের অপূর্ব সমন্বয়

শ্রীকৃষ্ণ অজ বস্তু হইয়াও জন্মের আবিষ্কার করিয়াছিলেন,—

“জ্ঞো জন্ম-বিহীনোহপি ভাতো জন্মাবিরাচরৎ।”

(শ্রীলঘুভাগবতামৃত)

একই পুরুষের অজত্ব ও জন্মিত্ব—এই বিরুদ্ধ ব্যাপার কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? তৎসম্বন্ধে শাস্ত্র বলিতেছেন,—

প্রমাণ-যুক্তি

নন্বেকস্ত কিলাজ্জত্বং জন্মিত্বঞ্চ বিরূধ্যতে ।

ইত্যশঙ্কাহ ভগবান্ অচিৎপ্রাশ্চর্য্যবৈভবঃ ॥

তত্র তত্র যথা বহিস্তেজোরূপেণ সন্নিপা ।

জায়তে মণি-কাষ্ঠাদেহেতুং কঙ্কিদবাণ্য সঃ ॥

জনাদিমেব জন্মাদিলীলামেব তথাজুতাম্ ।

হেতুনা কেনচিৎ কৃষ্ণঃ প্রাপ্তক্ষুর্য্যাং কদাচন ॥

স্বশীলাকীর্তিবিস্তারাং লোকেষু নৃজিঘৃক্ষুতা ।

অস্ত জন্মাদিলীলানাং প্রকাটো হেতুরুত্তমঃ ॥

তথা ভয়ঙ্করতরৈঃ পীড়্যমানেষু দানবৈঃ ।

প্রিয়েষু করুণাপাত্রে হেতুরিত্যুক্তমেব হি ॥

ভূমিভারাপহারায় ব্রহ্মদৈত্যজৈদশেশ্বরৈঃ ।

অভার্পনস্ত যৎ তস্ত তদুভবেদাহুযজ্জিকম্ ॥ (শ্রীলঘুভাগবতামৃত)

অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যশালী ভগবানে সমস্তই সম্ভব । তাহাতে মানব-চিন্তায় ‘বিরুদ্ধ’ বলিয়া প্রতিভাত ব্যাপার-সমূহের যদি অবিরোধ সমন্বয় না হইত, তাহা হইলে ভগবানের অবিচিন্ত্য শক্তিমত্তা বা পরাংপরত্বের স্বর্কত্ব সাধিত হয় । মানব-মনীষা যাহাকে মাপিয়া লইতে পারে, ভগবানের ‘এই টুকু’ সামর্থ্য, তদ্ব্যতীত তাঁহার কোন সামর্থ্য নাই—এইরূপ জাগতিক বিচারের সম্ভব অসম্ভবের গুণী যাহার উপর প্রযুক্ত হইতে পারে অর্থাৎ মানব-চিন্তা যাহার উপর প্রভুত্ব করিতে পারে, তিনি কিরূপে পরম প্রভু ও পরাংপর-তত্ত্বরূপে নির্দিষ্ট হইবেন ? অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য-বৈভব শ্রীকৃষ্ণে ঐরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ গুণ অর্থাৎ অজত্ব ও জন্মিত্ব দুগপৎ সমন্বিত হইয়াছে । অগ্নি যেমন তত্তৎ স্থানে তেজোরূপে নিত্য বর্ত্তমান থাকিয়াও কোন হেতুবশতঃ পাষাণবিশেষ বা কাষ্ঠাদি হইতে আবির্ভূত হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণও কখনও

কোন কারণবশতঃ অজুত ও অনাদি জন্ম-লীলা প্রকাশ করিয়া থাকেন। স্বীয় লীলা-কীর্তি-বিস্তার-জন্য, সাধকমণ্ডলীকে কৃপা করিবার অভিলাষই শ্রীকৃষ্ণের জন্মাদিলীলা প্রকাশের মুখ্য হেতু। আর ভগবৎ দাবানল কর্তৃক পীড়্যমান বসুদেবাদি প্রিয়তমগণের প্রতি কৃপাও তাঁহার আবির্ভাবের হেতু। পৃথিবীর ভার-হরণার্থ ব্রহ্মাদি দেবতাগণের প্রার্থনা—প্রাজুর্ভাবের আনুষঙ্গিক গোণ কারণ মাত্র। কারণ সাধু-পরিত্ৰাণ ও দুষ্কৃত-বিনাশ প্রভৃতি কার্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের নহে।

অবতারী শ্রীকৃষ্ণের দেহে অবতারগণের নিত্যস্থিতি

অবতারী কৃষ্ণের অবতরণ-কালে কৃষ্ণের সহিত অবতার বিষ্ণুর আবির্ভাব হয় এবং শ্রীকৃষ্ণের দেহস্থিত অংশ বিষ্ণুর দ্বারা জগতের ভার-হরণ ও পালন-লীলা হইয়া থাকে, ইহাই ভাগবতের সিদ্ধান্ত।

পারকীয় নন্দনন্দনত্ব ও স্বকীয় বসুদেব-ভনুজত্ব

পারকীয় নন্দ-যশোদানন্দনত্ব ঠিক স্বকীয় বসুদেব-ভনুজত্ব নহে। যে-কালে দেবকী স্বীয় তনুজের চতুর্ভুজের রূপ সংবরণ করিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সেইকালে ভগবান্ চতুর্ভুজ রূপ আচ্ছাদন করিয়া যশোদার হৃদয়স্থ দ্বিভুজরূপে প্রকাশিত হন। শ্রীকৃষ্ণ দেবকীকে দ্বার করিয়া দেবকীর হৃদয়স্থিত চতুর্ভুজরূপে এবং যশোমতীকে দ্বার করিয়া যশোদার হৃদয়স্থ দ্বিভুজরূপে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। এই জন্ম বসুদেব যশোমতীর হৃদয়ধন নরাকৃতি দ্বিভুজ-মুক্তি পরব্রহ্মকে যশোদার শয্যায়া জ্ঞাপন করিয়া তদীয়া গর্ভাবিভূতা যোগমায়াকে কংস-বধনার্থ আনয়ন করিয়াছিলেন।

অহৈতুক বাৎসল্যপ্রেমবিশেষই শ্রীকৃষ্ণের

পুত্রত্বের হেতু

যশোমতীর গর্ভ-প্রবেশাদি বাতীতও শ্রীকৃষ্ণ নন্দ-যশোদার পুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। বাৎসল্যপ্রেমবিশেষের দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ নন্দ-যশোমতীর নিত্য পুত্ররূপে আবিভূত হইয়া থাকেন। সাধারণ ভক্তিবিশেষের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অনাঙ্ঘ আনির্ভাব একটি হইলে তদ্বারা বাৎসল্যপ্রেমের লাল্য-পাল্য নন্দনন্দন-কৃষ্ণের আবির্ভাব হয় না। কাহারও দেহ হইতে নির্গত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন না। যদি দেহ হইতে নির্গত হইলেই ভগবানের পুত্রত্ব-বিচার প্রতিষ্ঠিত হইত, তাহা হইলে হিরণ্যকশিপু সত্যপুত্র হইতে আবিভূত

নৃসিংহদেবের উক্ত স্তম্ভে এবং ব্রহ্মার নামাদেশ হইতে প্রকটিত বরাহদেবের ব্রহ্মাতে পিতৃত্বের প্রয়োগ প্রসিদ্ধ থাকিত। অধিক কি, কাহারও গর্ভ হইতে আবির্ভূত হইলেও শ্রীকৃষ্ণ পুত্রত্বের আরোপ নাই; কারণ শ্রীকৃষ্ণ পরীক্ষিতকৈ রক্ষা করিবার জন্য উত্তরার গর্ভে প্রবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া উত্তরাতে শ্রীকৃষ্ণের মাতৃত্ব প্রযুক্ত হয় নাই। সুতরাং একমাত্র বাৎসল্য-প্রেমই শ্রীকৃষ্ণের পুত্ররূপে আবির্ভাবের হেতু, গর্ভ-প্রবেশাদি হেতু নহে। সেই বাৎসল্যপ্রেম একান্ত ঐশ্বর্যজ্ঞানাদি-বিহীন পূর্ণ উদ্ধরূপে ব্রজরাজ ও ব্রজরাজেশ্বরীতে নিত্যকাল উদ্ভিত। এজন্ত শ্রীকৃষ্ণ নিত্য নন্দ-বশোদাহুলাল।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবসুদেব-দেবকীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হইলেও প্রাকৃত ব্যক্তি যেরূপ চরম ধাতু প্রভৃতিতে প্রবিষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণ করে, শ্রীকৃষ্ণ সেক্ষপ-ভাবে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি বিশুদ্ধ-সত্ত্বরূপ দেবকী-বসুদেবের অপ্রাকৃত চিত্তে আবিষ্ট হইয়াই জন্ম-লীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন,—

ততো জগন্মূলমচ্যুতাংশং সমাহিতং শূরসুতেন দেবী

দধার সর্বাঙ্গকগান্ধভূতং কাষ্ঠা যথানন্দকরং মনস্তঃ ॥ (ভাঃ ১০।২।১৮)

অর্থাৎ বসুদেব কর্তৃক সমাহিত জগতের মূর্ত্তিমান মূলস্বরূপ সর্বাংশ-পরিপূর্ণ ভগবানকে দেবকীদেবী ধারণ করিয়াছিলেন। পূর্বদিক যেরূপ চন্দ্রকে ধারণ করে, দেবকীদেবীও তদ্রূপ বিশুদ্ধ সত্ত্বরূপ চিত্ত দ্বারা সর্বাঙ্গক গান্ধভূত শ্রীহরিকে ধারণ করিয়াছিলেন।

পরাম্পরতত্ত্বের ঐশ্বর্যগন্ধলেশহীন পুত্রত্বের বিচার একমাত্র নন্দনন্দনেই সমন্বিত। দশরথাত্মজ রাগে, এমন কি, বসুদেব-তত্ত্বজ্ঞেও তাহা নাই। পরমেশ্বর-তত্ত্বের পুত্রত্ব-বিচার কিরূপে সমন্বিত হয়, তদ্বিষয়ে ধর্মীয় সম্প্রদায় স্বল্পবিচারপরায়ণ।

শ্রীকৃষ্ণই—বেद्य বাস্তব বস্তু অদ্বয়জ্ঞান; অদ্বয়বস্তুর

ত্রিবিধ প্রতীতি—(১) ব্রহ্ম, (২) পরমাত্মা ও

(৩) ভগবান্; বস্তুর অদ্বয়ত্ব থাকিলেও

ত্রিবিধ প্রতীতি এক নহে

শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র বেद्य বাস্তব বস্তু এবং অদ্বয়জ্ঞান। সেই অদ্বয়বস্তু ত্রিবিধ অভিধেয়ে ত্রিবিধ প্রতীতিতে প্রতীত হন; বস্তুতঃ কৃষ্ণ প্রতীতিই—অদ্বয় বাস্তব পূর্ণ প্রতীতি। নির্দিশেষজ্ঞানে ব্রহ্মপ্রতীতি—কৃষ্ণের অসম্বা

প্রতীতি, আর যোগমার্গে পরমাত্ম-প্রতীতি—কৃষ্ণের আংশিক প্রতীতি মাত্র, ইহা শাস্ত্রমূলা যুক্তি এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও ভাগবতাদি পুরাণ হইতেই জানি যায়।

দৃষ্টান্ত

যেদূরপ একই হিমালয় পর্বতকে ত্রিবিধ দ্রষ্টা ত্রিবিধ ভূমিকা হইতে দর্শন করিয়া ত্রিবিধ প্রতীতি লাভ করেন, যিনি অত্যন্ত দূর হইতে হিমালয়কে দর্শন করেন, তিনি বিচিত্রতা বা বিশেষত্বহীনরূপেই হিমালয় দর্শন করিয়া থাকেন, যিনি আরও সমীপস্থ হন, তিনি একটী আকারিত বস্তুমাত্র দর্শন করেন, আর যিনি হিমালয়ের অত্যন্ত সম্মুখস্থ হইবার সামর্থ্য লাভ করেন, তিনি হিমালয়স্থ বনস্পতি-সমূহ, পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গের বিচিত্রতা, হিমালয়ের বিভিন্ন শৃঙ্গ, গহ্বর, প্রপাত প্রভৃতি পুছানুপুছরূপে দর্শন করিতে পারেন। তদূর্ণ অদ্বয়বস্তুকে অত্যন্ত দূর হইতে দর্শন—ব্রহ্মদর্শন বা কৃষ্ণের অঙ্গকান্তি দর্শনাভাস মাত্র। আর যাঁহারা কৃষ্ণকে আর একটুকু অগ্রসর হইয়া দর্শন করেন, তাঁহারা অস্পষ্ট প্রমাণ পুরুষ বা পরমাত্মা দর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা অত্যন্ত সন্নিকটস্থ হইয়া অদ্বয়বস্তু দর্শন করেন, তাঁহারা তত্ত্ব-বস্তুকে নাম-রূপ-লীলা-পরিকরবৈশিষ্ট্যাদিযুক্ত রিচিত্র বিলাসময় অদ্বয়বস্তুরূপে দর্শন করিয়া থাকেন।

জড়নির্ব্বিশিষ্ট চিন্মাত্র, কিন্তু চিদ্রিলাসের

অবিরোধী ব্রহ্মজ্ঞান—গুহ্য, পরমাত্মজ্ঞান—

গুহ্যতর, নারায়ণাদি বিমলক জ্ঞান—

গুহ্যতম, শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক জ্ঞান—

সর্বগুহ্যতম

এইজন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগীতায় হেতুতায়ুক্ত জড়বিশেষ-তিরস্কৃত ব্রহ্মজ্ঞানকে—গুহ্য, পরমাত্মজ্ঞানকে—গুহ্যতর এবং নারায়ণ বা চতুর্ভূতাহ্নক গুহ্যতম ভগবজ্-জ্ঞান অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক চরমজ্ঞানকে—সর্বগুহ্যতম জ্ঞান বলিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মের পরমাত্মায়, গীতা-প্রমাণ—

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্যুততাব্যয়স্য চ।

শাস্ততস্য চ ধর্মস্য সুখৈস্য কাঙ্ক্ষিকস্য চ ॥ (গী: ১৪।২৭)

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতেছেন, তোমার সমুখস্থ আনন্দ-পূর্ণ চিদ্বন-বিগ্রহ আমি চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ পরমাত্ম্য। ঘনীভূত তেজো-বিগ্রহ স্বর্ষ্য যেক্রপ প্রভারাশির আশ্রয়, তদ্রূপ চিদ্বন-বিগ্রহ আমিও চিদ্রাত্নস্বরূপ প্রভামাত্র ব্রহ্মের পরমাত্ম্য। নিত্যমুক্তি, ভাগবতবর্ণা, মোক্ষ-স্বখ-তিরস্কারী প্রেমভক্তি বসোৎসব আমার এই শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপকেই আশ্রয় করিয়া নিত্য অবস্থিত। ব্রহ্মসংহিতাও এই সিদ্ধান্ত কীর্তন করিয়াছেন,—

শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গপ্রভাই—নির্কিংশেষ ব্রহ্ম

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-

কোটিবিশেষবসুধাদি বিভূতিভিন্নম্।

তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনস্তমশেষভূতং

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

বাহার প্রভা হইতে উৎপত্তি-নিবন্ধন নির্কিংশেষ ব্রহ্ম কোটি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত বসুধাদি বিভূতি হইতে পৃথক হইয়া নিষ্কল-অশেষ-অনন্ত তত্ত্বরূপে প্রতীত হন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। শ্রীমদ্ভাগবতের—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ঞজ্ঞানমদ্বয়ম্।

ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবান্নিত শব্দাতে ॥

—শ্লোকের স্তম্ভে অর্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব প্রকাশ করিয়াছেন। অনেকে এই শ্লোকের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানকে একই তাৎপর্য্যাপর প্রতিশব্দ মাত্র বলিয়া মনে করেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে।

‘ব্রহ্ম’, ‘পরমাত্মা’দি—গৌণ নাম, ‘শ্রীকৃষ্ণ’ নামই—মুখ্য নাম

‘ব্রহ্ম’,—‘পরমাত্মা’দি—গৌণ নাম। উহাতে স্বরূপের পরিচয় নাই। ‘ব্রহ্ম’ শব্দ—জড়তিরস্কৃত নির্কিংশেষভাববিশেষ। ‘পরমাত্মা’—শব্দ—জগতের সর্বকণ্ঠ জড়ানুপ্রবিষ্ট একদেশস্থিত চিহ্নিভূতি-বিশেষ। “একাংশেন স্থিতো জগৎ” প্রভৃতি গীতোরূপ বাক্যে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সূর্য্যের উপমা দ্বারা ইহা বুঝাইয়াছেন।

সূর্য্যের দৃষ্টান্তে ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবৎ-প্রতীতি ব্যাখ্যা

চন্দ্রচন্দ্রে স্বর্ষ্য যেক্রপ নির্কিংশেষ বলিয়া প্রতিভাত হয়, জ্ঞানমার্গেও তদ্রূপ অদ্বয়তত্ত্বরূপ ভগবানের নির্কিংশেষ অসমাকৃ ভাব-মাত্র প্রকাশিত

হইয়া থাকে। কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যে ব্রহ্মের বিভূতি, সেই ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকাস্তি মাত্র। অনন্ত স্ফটিক-বণ্ডে যেক্রপ একমাত্র স্বর্ষ্যই প্রতিফলিত হইয়া পৃথক পৃথকরূপ প্রকাশিত হয়, সেইরূপ এক অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের অংশই অনন্ত সংখ্যক ব্যষ্টি জীব ও ব্যষ্টি জড় পরমাণুতে প্রতিফলিত হইয়া তদন্তর্যামী পরমাত্মারূপে প্রকাশিত হন। আর দেবতাগণ যেক্রপ স্বর্ষ্যকে দ্বিগ্রহরূপে দর্শন করেন, তদ্রূপ ভগবন্তকৃষ্ণগণও শ্রীকৃষ্ণকে নিত্য-নাম-রূপ-গুণ-লীলা-বিশিষ্ট ভগবানরূপে দর্শন করিয়া থাকেন।

শ্রীল রূপ গোষাঙ্গাদি শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত ভাগবতীয় সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিয়া বলিতেছেন,—

ভক্তিশোভে ভগবানের ধারণাই সমগ্র

ও সম্পূর্ণ ধারণা

যথেন্দ্রিয়ৈঃ পৃথগ্‌দ্বারৈরর্থো বহুগুণাশ্রয়ঃ।

একো নানৈয়তে তদ্বদভগবান্ শাস্ত্রবজ্জ্যতিঃ ॥

(ভাঃ ৩।৩২।৩৩) (ভ্রমশঃ)

গৌড়ীয়ের দ্বাত্রিংশ-বর্ষ

পত্রিকার অপ্রাকৃতত্ব ও বৈশিষ্ট্য

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা দ্বাত্রিংশ-বর্ষে শুভ প্রবেশ করিলেন। এই নববর্ষ-প্রবেশকে বর্ষোদ্যাত বা হায়নোদ্যাত বলা যাইতে পারে। অপ্রাকৃত বস্তু প্রাকৃত কাল-গণনা বা সময়-সীমার অতীত বা উর্দ্ধে অবস্থিত। মায়াবদ্ধ জীব জায়গু, নশ্বর, ধ্বংসশীল এই জগতের ছায় অধোক্ষজ তত্ত্বকেও মাণিতে চায়। তাহার “অনয়ারাধিতঃ” বিচার গ্রহণ না করিয়া “অনয়া যীয়তে”—সুবিধাবাদের আশ্রয় লইয়া সমগ্র বিশ্বের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতে বদ্ধ-পরিকর। “জগৎ আমাদের ইন্দ্রিয়ভূতির যোগানদার”—এইরূপ বুদ্ধিধারাই সংসার বা প্রাকৃত বিষয়-বন্ধনদশার উৎপত্তি হয়। কর্মকাণ্ড, জ্ঞান-কাণ্ডাদিতে স্থূল-সূক্ষ্ম ভোগবাদ অবস্থিত এবং তাহাই মানবের অন্যাভিলাষ-রূপে বিপর্যায় আনিয়ন করে। এই নশ্বর দুনিয়া ঈর্ষা, হিংসা, মাৎসর্য,

প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা, ভোগবাদ-রোগে আক্রান্ত হইয়া ক্লিষ্ট ও জর্জরিত। জগতের তথাকথিত নেতৃবৃন্দ ও কর্ম-জ্ঞান-যোগবীরগণ এই অচিদ্রুত্তিগুলিকে ধ্বংস করিতে অসমর্থ। মনোধর্ম্মিগণ যতদিন পর্য্যন্ত জগৎ-ভোগের বিচার বাদ দিয়া ত্রীজগন্নাথের সেবায় আত্মনিয়োগ না করিবেন,— অমন্দোদয়-দয়-বিতরণকারী শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার নিম্নজনগণের নির্বালিক আশ্রয় না লইবেন, ততদিন বিশ্বের সামগ্রিক কল্যাণ ও বিশ্বশান্তি সম্ভব নহে।

শ্রীমঠ ও মন্দির-স্থাপনের আবশ্যিকতা

এবংসর শ্রীপত্রিকা শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-পরিচালিত শুদ্ধভক্তি-প্রচারকেন্দ্রের অন্যতম শিলিগুড়িষ্ট শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠের নব-নির্ম্মাণম'ন শ্রীমন্দির বক্ষে (বহিঃ প্রচ্ছদপটে) ধারণ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত মন্দিরাভ্যন্তরে গত বৎসর অক্ষয়-তৃতীয়া-দিবসে গুরু-পাদপদ্ম শ্রীন কেশব গোস্বামী মহারাজ, শ্রীশ্রীগৌর-বাধা-বিনোদবিহারী-জীউ এবং শ্রীশ্রীজগন্নাথ-বলদেব-অভদ্রাদেবী অর্চাবিগ্রহরূপে পৃথক্ পৃথক্ সিংহাসনে অবিষ্টিত হইয়া সম্পূজিত হইতেছেন। শ্রীবিগ্রহগণের অধিষ্ঠান বা নিবাসস্থানকে দেবালয়, দেবগৃহ বা শ্রীমন্দির বলা হয়। মঠ ও মন্দির—এক তাৎপর্য্যাপর শব্দ। “মঠস্তি বসন্তি ছাত্রাঃ”—যেখানে পারমাধিক ছাত্র বা শিষ্যগণ বসবাসপূর্ব্বক বেদাদি-শাস্ত্রাধ্যয়ন করেন, তাহাই ‘মঠ’ নামে প্রসিদ্ধ। আর তাঁহাদের উপাসনা-স্থল—উপাস্যগণের অবস্থিতি-ক্ষেত্রই শ্রীমন্দির। পৃথিবীর সর্বত্র এইরূপ সনাতনধর্ম্ম-প্রচারকেন্দ্র গড়িয়া উঠিলেই মঙ্গল।

শ্রীপত্রিকার তিন শ্রেণীর পাঠক ও তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গি

পারমাধিক সাময়িক পত্র “শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা”দি সাধারণতঃ তিন শ্রেণী ব্যক্তির আলোচ্য। (১) প্রথমতঃ ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকগণ স্ব-স্ব কৌতুহল চরিতার্থ করিবার জন্য ইহা আলোচনা প্রাপ্ত হন; (২) তথাকথিত গবেষকগণ তাঁহাদের যথেষ্ট রুচি ও ভাবধারার অনুকূল বা প্রতিকূল সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া ইহা পঠন-পাঠন করিয়া থাকেন এবং (৩) শেষোক্ত শ্রেণীর ব্যক্তিগণ স্ব-পর বাস্তব আত্ম-কল্যাণের নিমিত্ত ইহার অহুশীলনে প্রযত্নশীল। সাধু-গুরু-শাস্ত্রবাক্য হইতে জানা যায়, অচৈতন্য বিশ্বে জড়বাদের চিন্তায় তরপুর হইয়া তাঁহাদেরই বহুমানন করিলে পার-

মার্বিক কলাগ বা তাহার অন্তর্নিহিত ভাব উপলব্ধির বিষয় হয় না। আধুনিক যুগে দেশী-বিদেশী বহু মনীষী তাঁহাদের প্রাকৃত স্বাধীন চিন্তা, মনীষা ও প্রতিভা লইয়া অপ্রাকৃত তত্ত্ব আলোচনা করিতে গিয়া বিফল-মনোরথ হইয়া অবশেষে বঞ্চিতই হইয়া থাকেন। তাঁহার সর্বত্র ভাবোচ্চাস, ঐতিহাসিকতা, সাহিত্যিকতা, প্রত্নতাত্ত্বিকতা ও শ্রুতিমধুর কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া নিজ নিজ মতবাদ স্থাপন ও প্রকাশ করিতে ব্যস্ত হন। সনাতন আশ্রয়ণী সম্বন্ধে আজ বহু শিক্ষিত ব্যক্তি অনেক কল্পিত, শ্রাস্ত ও দিকৃত মত পোষণ করেন; কেহ কেহ এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও উদাসীন, ইহা বিশেষ দুঃখের বিষয়। আজকাল সংজ্ঞা ও সূত্রপাঠ্য ভাষা, আখ্যান-উপাখ্যান এবং কাল্পনিক তথ্যাদিতে পাঠকগণ অধিকভাবে আকৃষ্ট। দার্শনিক বিচার ও তত্ত্বসিদ্ধান্ত স্বভাবতঃই কঠিন ও তুচ্ছ; এ সম্বন্ধে আলোচনা উপস্থিত হইলেই সরল কথা-সাহিত্যের আলোচনাকারিগণের শিরশীড়া উপস্থিত হয়। বাস্তব সত্যানুসন্ধানে এরূপ অনীহা ও উদাসীনতা আশ্রয় আমাদের প্রগতির নামে অধোগতিতে নিক্ষেপ করিয়াছে।

এই জড়প্রগতি ও প্রভুত্বাকাজকা আজ বিশ্ববাপী সংঘর্ষ ও বিবিধ জগজ্জঞ্জাল সৃষ্টি করিতেছে। পশ্চাত্যের পরস্পর বিবদমান গোষ্ঠীর ক্রম-বর্ধমান অসন্তুষ্টি ও আত্মাশয় বর্ধমানে প্রাচ্যেও সময়ানল সৃষ্টি করিয়া তাহার লেলিহান শিখা বিস্তার করিতে চলিয়াছে। আজ তাহার প্রচণ্ডতা সকল বিশ্ববাসী অনুভব করিয়া বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কায় তুচ্ছত্যাগ্রস্ত হইতেছেন। জড়ীয় বৈজ্ঞানিক উন্নতি বিশ্বশান্তির ধারক-বাহক না হইয়া ব্যক্তিগত সুখ-স্বচ্ছন্দ্যেরও নূনতম স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় অক্ষম। Automation ও Computer আজ সাধারণ মেচনটী মানুষের মুখে অন্নগ্রাস কাড়িয়া লইয়া তাহাকে জড় পশু করিয়া দিতেছে। জড়বিজ্ঞানের এই তথাকথিত উন্নতি ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মনুষ্য-সমাজকে তাহার মৌলিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতেছে।

শ্রীমদ্রহস্যপ্রভুর বিমল প্রেমধর্ম্যই বিশ্বশান্তি আনয়নে সমর্থ

ভৌতিকবাদ বা তর্কযুগের এই মহাসঙ্কটে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নিজজনগণ তাঁহার অপ্রাকৃত শিক্ষামৃতধারা ও অসমোদ্ধি করণার কথা সমগ্র জগৎকে বিতরণের দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাই অনন্ত বিশ্বে প্লাবিত করিবে এবং বিশ্বশান্তি আনয়নে সমর্থ, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই।

শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষার তুলনা নাই; ইহা একাধারে সহজ, সরল ও গভীর। নিরক্ষর মানব হইতে আরম্ভ করিয়া তর্ক-বিচার-শাস্ত্রজ্ঞান-পারদর্শী পণ্ডিত-মণ্ডলী, গৃহস্থ, ত্যাগী, বালক-বৃদ্ধ-যুবা, স্ত্রী-পুরুষ, জাতি-বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলেই ইহা আচরণপূর্বক আত্যন্তিক মঙ্গল লাভ করিতে পারেন। নিরপেক্ষ ও নির্বালীক হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত-প্রচারিত ধর্মকেই পরমধর্ম-রূপে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। তজ্জন্ম শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী জানাইয়াছেন,—“চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার। বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার।”, “নিরপেক্ষ হঞা বিচারিলে আছে তর-ভমা।” পরাশাস্ত্র-পিপাসু জনগণ শ্রীগৌরসুন্দরের বিমল প্রেমধর্মের আচার-প্রচারের দ্বারা অবশ্যই কৃতকৃতার্থ হইবেন।

শ্রীগৌরহরি ও ভক্তগণের দয়া অতুলনীয়।

“ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম বীর। জন্ম সার্থক করি’ কর পর-উপকার।” শ্রীভগবানের বিভিন্ন অবতারাди ও আখ্যায়িক-অধ্যুষিত আবির্ভাবস্থলী সনাতন ধর্মক্ষেত্র—ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণকারী মানবজাতিরই মনুষ্যগণকে কৃষ্ণোন্মুখী করা অবশ্য কর্তব্য। এ সম্বন্ধে জগদগুরু শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ জানাইয়াছেন,—“শ্রীমন্মহাপ্রভু উপদিষ্ট ‘উপকার’ সকল দেশে—সকল পাত্র—সকল কালে সর্বশ্রেষ্ঠ উপকার। এ’ উপকার কোন দেশ-বিশেষের উপকার, অষ্টদেশের অপকার নহে; এ’ উপকার সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের উপকার। স্তবরাং সঙ্কীর্ণ, সাম্প্রদায়িক, নশ্বর উপকারের প্রস্তাব শ্রীমহাপ্রভু ও তাঁহার ভক্তগণ কখনও করেন না। শ্রীগৌরসুন্দরের উপকার কোনদিন কাহারও ‘মন্দ’ প্রসব করে না। তাই গৌরহরির দয়া ‘অমন্দোদয়া দয়া’—তাঁহি মহাপ্রভু মহাবদান্য—তাঁহি তাঁহার ভক্তগণ ‘মহা-মহা-বদান্য’। ‘এসকল গল্পের কথা নয়, কাব্য-সাহিত্যের কথা নয়,—সবচেয়ে বড় সত্যকথা।”

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুমোদিত দৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম

শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু জাতি-বর্ণধর্ম-নির্বিশেষে আপামর জনগণকে শ্রীনাম-প্রেম বিতরণ করিয়াছেন। তিনি শাস্ত্রীয় বিস্তৃত দৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম স্বীকার-পূর্বক ভক্ত ও বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত স্বরূপোপলব্ধির কথা জানাইয়াছেন। আদি-সত্যযুগে সকলেই একজাতি এবং পরে গুণ-প্রকৃতি-স্বভাবানুসারে বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা শাস্ত্রীয় সত্য। পুরাকালে লক্ষণদ্বারা বৃত্তি-

অনুসারে বর্ণ নিরূপণ করা হইত। শৌক্য, সাবিত্র্য ও দৈক্ষ—এই ত্রিবিধ জন্মের মধ্যে তৃতীয় জন্মে—পাক্ষরাত্রিকী দীক্ষার ফলে মানবের লক্ষ্যজ্ঞানের উদয় হয় এবং ইহাই তাঁহার পারমার্থিক ব্রাহ্মণ-জন্ম। সরলতা-কুটিলতা-লইয়া ব্রাহ্মণত্ব-শূদ্রত্বের বিচার এবং ইহাই লৌকিক-পারমার্থিক উভয়ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আত্মকল্যাণ-চিন্তা বা স্বরূপোপলব্ধির ক্ষেত্রে গুণাতীত তগবদ্বাসাই প্রার্থনীয়।

তথাকথিত ধর্মসংস্কারকবৃন্দ ও শ্রীচৈতন্যদেব

সাধারণ মনুষ্যগোষ্ঠী ও বৈষ্ণব-সমাজে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান। বৈষ্ণবগণের চরম লক্ষ্য—ভগবৎপ্রেম লাভ, আর ইতর সমাজের উদ্দেশ্য—জড়েন্দ্রিয়-তর্পণের কামনা-বাসনা। কস্মিজড স্মার্ত্তি-সমাজ তাঁহার কাণাকড়ি-সর্বদা ‘বাঙ-এর আধুলি’ লইয়াই ব্যস্ত; আর মহাবদান্ত পরহঃখতুঃখী মুনি-ঋষি, সাধু-মহাপুরুষ, নিত্যসিদ্ধ মহাত্মগণ উদারনৈতিক মনোভাবাপন্ন হইয়া অনন্ত জীবাত্মার স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠায় কৃতসঙ্কল্প। সনাতন-ধর্মের কোনরূপ পরিবর্তন-পরিবর্জন হইতে পারে না। তথাকথিত ধর্মসংস্কারকগণ ধর্মের সংস্কার করিতে গিয়া “নির্কিশেষ ব্রহ্ম”রূপ নৈতা-দানবগ্ৰন্থ হইয়া পরিশেষে স্বেচ্ছাচার গ্রহণপূর্বক চরম দুর্দশা বরণ করিয়াছেন। ‘ধন্য বলিযুগে’ স্বয়ং তগবান্ প্রেমবন-মূর্ত্তি শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু তাঁহার সর্বশক্তি প্রয়োগপূর্বক জীবের যাবতীয় সামাজিক অকল্যাণ দূরীভূত করিয়াছেন।—“ব্রাহ্মণে চণ্ডালে করে কোলাকুলি, কবে বা ছিল এ রঙ্গ!”

শ্রীল জয়দেবের হৃদয়ে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমধর্মের প্রকাশ

শ্রীচৈতন্য পূর্বযুগের স্বভাব-কবি অপ্রাকৃত প্রেমবসিক শ্রীল জয়দেব গোস্বামী শ্রীমদ্ব্যাসপ্রভু গৌরসুন্দরের মনোহতীষ্ট পূরণ করিয়াছেন। শ্রীগীত-গোবিন্দের “দেহি পদ-পঙ্কজদারম্” পাদপূরণে তিনি রাগমার্গে শ্রীরাধা-নাথের অপ্রাকৃত সেবাধিকার লাভ করিয়াছিলেন; জানিতে পারা যায়। পদ্মাবতী দেবীর সহিত এই মহাপুরুষ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে মহাজনরূপে সমাদৃত ও সম্প্রসিদ্ধ। শ্রীচৈতন্যদেব কবি জয়দেব গোস্বামীর হৃদয়ে উদ্ভিত হইয়া শ্রীগীতগোবিন্দের মঙ্গলাচরণে তাঁহার আগমনী গীতি গাহিয়াছেন বলিয়া ইঙ্গিত পাওয়া যায়। শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—“গৌড়ীয়গণের আরাধ্য শ্রীরাধাকৃষ্ণভিন্নতত্ত্ব শ্রীগৌরসুন্দর অপ্রাকৃত বৃন্দাবন-লীলায় যে-সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবত ও গীতগোবিন্দের

পূর্ণতম বিকাশ।" শ্রীল ভক্তিগিনোদ ঠাকুর জানাইয়াছেন,—“শ্রীজয়দেব, শ্রীবিল্বনঙ্গল, শ্রীচণ্ডীদাস, শ্রীবিদ্যাপতি, শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদ প্রভৃতি শুদ্ধ-ভক্তগণের হৃদয়ে মহাপ্রভুর ভাবোদয় ছিল।” কবি জয়দেব শ্রীমদ্বীপধামে শ্রীরাধামাধবের ভাবসেবা করিতে করিতে শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। সেই ভগবান শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীনামব্রহ্মরূপে জগতে প্রকটিত।

ষোলনাম-বত্রিশাক্ষর শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্রই জপ্য ও কীর্তনীয়

শ্রীপত্রিকার দ্বাত্রিংশ বর্ষে প্রবেশ দেখিয়া আমাদের ষোলনাম-বত্রিশ-অক্ষরাত্মক শ্রীনামব্রহ্মের আরাধনার কথা স্মরণ হইতেছে। কলিযুগের তারকব্রহ্ম মহামন্ত্রের সাধনাদ্বারাই নামী পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণাশ্রম গৌড়ী-বৈষ্ণবগণ বিশেষভাবে জানাইয়াছেন। “হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥”—এই মহামন্ত্র হরিনাম নিত্য জপ্য ও কীর্তনীয়, সে-বিষয়ে বিভিন্ন শাস্ত্রে ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। “নাম-সঙ্কীৰ্ত্তন’দেব তারকং ব্রহ্ম দৃশ্যতে,” “হরি-নাম-মহামন্ত্রৈর্নশ্চেৎ পাপ-পিপাচকম্। হরেঃপ্রে স্বৈরৈর্গৈচ্চ-নৃত্যংস্তন্যগঃকরঃ ॥” “এতন্নামানি হর্ষণে কীর্তয়িত্বা মুছমূৰ্ছঃ। সর্বেষু মন্ত্রবর্গেষু শ্রেষ্ঠং শ্রীহরি-নামকম্ ॥” প্রভৃতি শাস্ত্রবাক্যে ইতার উচ্চৈষরে কীর্তনের বিধান রহিয়াছে। হরিনাম-মহামন্ত্রের জপ হইতে ধ্যান শ্রেষ্ঠ, ধ্যান হইতে কীর্তন শ্রেষ্ঠ,—সে বিষয়েও প্রমাণের অভাব নাই। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তি ঠাকুরের শ্রীহরি-নামার্থ-দীপিকা” গ্রন্থে লিখিত আছে,—“শ্রীমতী রাধা ঠাকুরাণী শ্রীকৃষ্ণ-অদর্শনজনিত বিরহে কাতর হইয়া বহু চিন্তার পর অবশেষে এই তারকব্রহ্ম নামকেই শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির এক্ষুণ্ণ উপায় মনে করেন এবং শ্রীমতী তদনুসারে কলিকালের মহামন্ত্র তারকব্রহ্ম নাম গ্রহণ করিতে থাকেন।” ‘হরে’, ‘কৃষ্ণ’, ‘রাম’—শব্দের ব্যাখ্যাও এইরূপ পাওয়া যায়,—“কৃষ্ণমন হরে যেই আত্মাদ-ক্রপিনী। ‘হরে’ শব্দে হয় সেট রাধা ঠাকুরাণী ॥ কৃ-আদি গোপীজগের বহু পুষ্টি করে। অতএব ‘কৃষ্ণ’নাম বলি যে তাহারে ॥ রাধিকার সঙ্গে সদা করয়ে রমণ। অতএব ‘রাম’ নাম কহি যে কারণ ॥ সুতরাং শ্রীকৃষ্ণাশ্রম গুরুবর্গ আনুগত্যে চিল্লালা-শিখুন শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারীজীউর ও শ্রীগৌর-সুন্দরের অপ্রাকৃত সেবাধিকার আমাদেরকোনদিন লাভ হইবে, হৃদয়ে এই অভিলাষ গোষণপূর্বক নববর্ষের নিবেদন সমাপ্ত করিতেছি।

FORM—IV

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND
PARTICULARS ABOUT NEWSPAPER

“SHRI GOUDIYA-PATRIKA”

[Under Rule 6 of the Registration of Newspapers
(Central) Rules, 1956]

1. Place of Publication—Shri Devananda Goudiya Math,
Tegharipara, P. O.—Nabadwip (Nadia), W. B.
2. Periodicity of its Publication—Last day of every
Bengali month i. e. once in a month.
3. Printer's Name—Shri Nabajogendra Brahmachari,
Bhakti-Bhandhav.

Nationality—Indian—Goudiya-Vaishnava.

Address—Shri Devananda Goudiya Math,
Tegharipara, P. O.—Nabadwip (Nadia), W. B.

4. Publisher's Name—Do
Nationality—Do
Address—Do

5. Editor's Name—Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti
Vedanta Trivikram Maharaj.

Nationality—Indian—Goudiya-Vaishnava.

Address—Shri Devananda Goudiya Math.

Tegharipara, P. O.—Nabadwip (Nadia), W. B.

6. Name and address of individuals who won the newspapers and partners or share holders holding more than one percent of the total capital. Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti Vedanta Baman Maharaj President-Acharya, on behalf of Shri Goudiya Vedanta Samiti.

I, *Nabajogendra Brahmachari*, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd./-Nabajogendra Brahmachari

Dated—25. 2. 80

Signature of Publisher.

শ্রীশ্রীভূষণগোবিন্দো জয়তঃ

ন বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিপ্রদোক্ষজে ।

ধর্মঃ কথ্যঃ পুংসাং বিষক্লেম কথ্যঃ যঃ ।



নোংপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ।

অহৈতুকাপ্রতিহতা বয়স্য স্প্রশনীদতি ।

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরম্ম ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিরশূন ।

অন্ত ধর্ম সূচকপে পালে যেই জন ।
হরি-কথার রতি নৈলে পও সেই শ্রম ।

৩২শ বর্ষ } বাসুদেব, ১৩ মধুসূদন, ৪৯৪ গোবিন্দ
রবিবার, ৩০ চৈত্র, ১৩৮৬ ; ইং ১৩।৪।১৯৮০ { ২য় সংখ্যা

সান্ন্যাসাদং

মহাষিভূত-কৃতং শ্রী শ্রীবিষ্ণুস্তোত্রম্

[পদ্মপুরাণে শ্রীব্যাসদেব-বিরচিতম্ ।]

ব্রহ্মণ্যো দেবকীপুত্রো ব্রহ্মণ্যো মধুসূদনঃ ।

ব্রহ্মণ্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষো ব্রহ্মণ্যো বিষ্ণুরচ্যুতঃ ॥১৬॥

ব্রহ্মণ্যো ভগবান্ কৃষ্ণো বাসুদেবোহবায়ো হরিঃ ॥১৭॥

ব্রহ্মণ্যো নরসিংহঃ স্মাত্তথা নারায়ণোহক্ষরঃ ।

ব্রহ্মণ্যঃ শ্রীধরঃ শ্রীশো গোবিন্দো বামনস্তথা ॥১৮॥

ব্রহ্মণ্যো যজ্ঞবাহরঃ কেশবঃ পুরুষোত্তমঃ ।

ব্রহ্মণ্যো রাঘবঃ শ্রীমান্ নামো রাজীবলোচনঃ ॥১৯॥

ব্রহ্মণ্যঃ পদ্মনাভঃ স্রাস্তথা দামোদরঃ প্রভুঃ ।

ব্রহ্মণ্যো মাধবো যজ্ঞস্তথা ত্রিবিক্রমো বিভুঃ ।

ব্রহ্মণ্যশ্চ হৃষীকেশঃ পীতবাসা জনার্দনঃ ॥২০॥

দেবকীর পুত্র ব্রহ্মণ্য, মধুসূদন ব্রহ্মণ্য, পুণ্ডরীকাক্ষ ব্রহ্মণ্য, বিষ্ণু এবং অচ্যুত ব্রহ্মণ্য, ভগবান্ কৃষ্ণ, নরসিংহ, নারায়ণ এবং অক্ষর ব্রহ্মণ্য, শ্রীধর, শ্রীপতি, গোবিন্দ ও বামন ব্রহ্মণ্য, যজ্ঞবরাহ, কেশব এবং পুরুষোত্তম ব্রহ্মণ্য, রাঘব, শ্রীমান্ রাজীবলোচন রামচন্দ্রই ব্রহ্মণ্য, পদ্মনাভ এবং প্রভু দামোদর ব্রহ্মণ্য, মাধব, যজ্ঞ, ত্রিবিক্রম, বিভু ব্রহ্মণ্য, হৃষীকেশ, পীতাস্বর এবং জনার্দন ব্রহ্মণ্য ॥২০॥

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ ।

জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥২১॥

ব্রহ্মণ্যদেব এবং গোব্রাহ্মণের হিতকারীকে নমস্কার । জগতের হিতকারী শ্রীকৃষ্ণ এবং গোবিন্দকে বারংবার নমস্কার করি ॥২১॥

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় বাসুদেবায় বিষ্ণবে ।

কল্যাণগুণপূর্ণায় নমস্তে পরমাত্মনে ॥২২॥

আপনি ব্রহ্মণ্যদেব, বাসুদেব এবং বিষ্ণু, আপনাকে নমস্কার । আপনি কল্যাণগুণে পরিপূর্ণ এবং পরমাত্মা, অতএব আপনাকে নমস্কার করি ॥২২॥

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় সর্গস্থিত্যন্তহেতবে ।

প্রজ্ঞায়ানিরুদ্ধায় তথা সঙ্কর্ষণায় চ ॥২৩॥

আপনি ব্রহ্মণ্যদেব, সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ, আপনি প্রজ্ঞা, অনিরুদ্ধ এবং সঙ্কর্ষণ, আপনাকে নমস্কার ॥২৩॥

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় সর্বভূতস্বরূপিণে ।

বরাহবপুষে নিত্যং ত্রয়ীনাথায় তে নমঃ ॥২৪॥

আপনি ব্রহ্মণ্যদেব ও সমস্ত ভূতস্বরূপ, আপনি বরাহমুদ্ভিদারী এবং আপনি ত্রয়ীনাথ, আপনাকে নিত্য নমস্কার করি ॥২৪॥

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় নাগপর্ষাক্ষশায়িনে ।

রাজীববক্ত্রুনেত্রায় রাঘবায় নমো নমঃ ॥২৫॥

আপনি ব্রহ্মণ্যদেব, আপনি অনন্তশয়ার শয়ন করিয়া থাকেন, আপনার মুখ ও চক্ষু কমলের তুল্য এবং আপনি রাঘব, আপনাকে বারম্বার নমস্কার ॥২৫॥

মায়ায়া মোহিতাঃ সর্বৈ দেবাশ্চ ঋষয়স্তব ।

ন জানন্তি মহাত্মানং সর্বলোকেশ্বরং প্রভুং ॥২৬॥

হে শ্রোতা! আপনার মায়ায় মোহিত হইয়া সমস্ত দেবতা এবং ঋষিগণ সকললোকের অধীশ্বর এবং মহাত্মা যে আপনি, আপনাকে জানিতে পারেন না ॥২৬॥

ত্বাং ন জানন্তি ভগবন্ সর্ববেদবিদোহপি হি ।

নামরূপগুণৈঃ শ্রীণ চারিত্রৈরপি ত্বকরৈঃ ॥২৭॥

হাঁহারা সকল বেদের পারদর্শী, তাঁহারাও কমলাপতির (আপনার) নাম, রূপ, গুণ এবং ত্বকরচিত্র-দ্বারা আপনাকে তাঁহারা জানিতে পারেন না ॥২৭॥

পরত্র সূচকং সত্ত্বং তব বেদিতুমীশ্বর ।

মহর্ষিভিঃ প্রেষিতোহহমাগতোহস্মি তবাস্তিকম্ ॥২৮॥

হে ঈশ্বর! পরকালের স্তম্ভসূচক আপনার সত্ত্বগুণ জানিবার নিমিত্ত মহর্ষিগণ আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। সেই সত্ত্বগুণ জানিতেই আমি আপনার নিকট আগমন করিয়াছি ॥২৮॥

তব শীলং গুণান্ জাতুং চরণং মম কেশব ।

দত্তং বক্ষসি গোবিন্দ তৎ ক্রান্তব্যাং কৃপানিধে ॥২৯॥

হে দয়াময়! হে কেশব! আপনার শীলতা এবং গুণ জানিবার জন্য আপনার বক্ষঃস্থলে আমার চরণ নিক্ষেপ করিয়াছি। হে গোবিন্দ! আমার এই অপরাধ ক্ষমা করিবেন ॥২৯॥

বসিষ্ঠ উবাচ—

এবমুক্ত্বা ভৃগুর্বিষ্ণুং প্রণম্য চ মুহুমূর্ছঃ ।

দিবৌর্মহর্ষিভিস্তত্র পূজ্যমানো মহাত্মভিঃ ।

পুনর্জগাম হৃষ্টাত্মা যজ্ঞভূমিং শুভাবহাম্ ॥৩০॥

বসিষ্ঠ কহিলেন,—ভৃগুর্বিষ্ণুকে এই কথা বলিয়া এবং বারম্বার প্রণাম করিয়া পুনর্বার আজ্ঞাদিত মনে মঙ্গলদায়িনী যজ্ঞভূমিতে গমন করিলেন ॥৩০॥

স্বাগতং মহাত্মানং তত্র দৃষ্ট্বা মহর্ষয়ঃ ।

প্রত্যাখ্যায় নমস্কৃত্বা পূজাঞ্চক্রুবিধানতঃ ।

তেষাং বিজ্ঞপয়ামাস তৎসর্ব্বং মুনিপুঞ্জবঃ ॥৩১॥

গমনকালে তথায় যে সমস্ত দিব্য মহাত্মা মহর্ষি ছিলেন, তাঁহারা ভৃগু-মুনির স্তব করিতে লাগিলেন। তথায় মহর্ষিগণ মহাত্মাকে উপস্থিত দেখিয়া প্রত্যাখ্যান এবং নমস্কার করিয়া যথাবিধানে পূজা করিলেন। মুনিগণ তাঁহাদিগকে সেই সকল বিষয় নিবেদন করিলেন ॥৩১॥

ঐকান্তিক ও ব্যভিচারী

ঐকান্তিকতা কাহাকে বলে ?

“একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভূত। যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য।” একটা মাত্র অস্ত্র যাহার, তিনি ঐকান্তিক বা ভক্ত-ভূতা। একটা বলিতে—সংখ্যাগত যাবতীয় নানাত্বের বিপরীত-ভাব প্রকাশ করে।

শ্রীগীতার ভগবান্ বলিয়াছেন—

ব্যবসায়ান্ত্রিকা-বুদ্ধিরেকেহ কুরু-নন্দন।

বহুশাখা হুনস্তাশ্চ বুদ্ধয়োহব্যবসায়িনাম্ ॥ (গী: ২।৪১)

হে অর্জুন! একমাত্র ব্যবসায়ান্ত্রিকা বুদ্ধি করিবে; অব্যবসায়ীগণ নানা প্রকার বুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়া অসংখ্য বিষয় সৃষ্টি করে। লক্ষ্যবস্ত্র এক না হইয়া বহু বা দুই হইলে, দুই নৌকায় দুই পা দিলে অকল্যাণ প্রসব করে।

ব্যভিচারের লক্ষণ

ঐকান্তিকতার অভাবে জীব বহু বিষয়ে আসক্ত হইয়া ব্যভিচারী হন। ব্যভিচার আচারের অপব্যবহার; লক্ষ্য ভ্রষ্ট জীবের তাহাই উপাস্য। অসংযত ব্যক্তিগণ বহুলক্ষ্যের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া কোন বস্তুই লাভ করিতে পারেন না। যেখানে স্বজাতীয় আশয়ে স্নিগ্ধ ব্যক্তিগণ সমবেত না হন, সেইখানেই বিষম জাতীয় সংহতিতেই ব্যভিচার। অদ্বয়জ্ঞান ভগবান্, পরমাত্মা ও ব্রহ্ম একই বস্তু কিন্তু ব্যবসায়ান্ত্রিকা বুদ্ধির অভাবে

ব্যাভিচারক্রমে সেই বস্তু বিভিন্ন বলিয়া উপলব্ধ হয়। ঐকান্তিকতার অভাবই এই ব্যাভিচার আনিয়ন করে।

পঞ্চোপাসনা—ঐকান্তিকতা ও অদ্বয়জ্ঞানের ব্যাভিচার

আবার এই প্রকার ব্যাভিচার পোষণ করিয়াও কাল্পনিক পঞ্চদেবতার উপাসকবৃন্দ বিবর্তবাদ অবলম্বনপূর্বক এক মাত্র নির্বিশেষ ব্রহ্ম কল্পনা করেন। বহুঈশ্বরবাদের ব্যাভিচার হইতে রক্ষা পাইতে গেলে একমাত্র নির্বিশেষ কল্পনাই ঐকান্তিকতা পোষণ করে। ঐকান্তিকতার অভাবে এক-জ্ঞানের পরিবর্তে পাঁচ প্রকার কৃষ্ণেতর বাহুল্যক্ষেপে লক্ষীভূত বস্তুকে ঈশ্বর স্বীকার ও তাহাদের ঈশ্বরত্বের বিলোপ সাধন করিয়া বস্তুস্বরকে অদ্বয়-জ্ঞানে পর্যাবসিত করিলে ঈশ্বরগুলির বিশেষত্ব ধ্বংস হয়; সেইকালে কৃষ্ণেতর বাহ্যদর্শন-জন্ম পঞ্চোপাসনাগত ব্যাভিচার আর থাকিতে পারে না।

বহু ঈশ্বরবাদিগণ অসৎ সাম্প্রদায়িক

একজন সেবক যেক্রপ বহু প্রভুর সেবা করিতে অসমর্থ, তদ্রূপ ঐকান্তিক বহুঈশ্বর-বাদের প্রশ্রয় দেন না। ব্যাভিচারের প্রশ্রয় দিলে উদারতা হয়—যাহারা বলেন, তাহারা কখনই অসাম্প্রদায়িক হইতে পারেন না। উপাস্ত-বস্তু কখনই বহু হইতে পারেন না। অনুরাগের অভাব হইতে 'ও বিরোধের স্বভাব হইতে বহুঈশ্বরের প্রবর্তন। স্ত্রীমন্তাগবত বলেন—

'ভঃ দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্মাদীশাদপেতস্ত বিপর্যায়োহন্যুতিঃ'।

(ভাঃ ১১।২।৩৭)

উপাস্ত বস্তুকে বহুজ্ঞান হইলে ভয়ের উৎপত্তি হয়

অদ্বয়-কৃষ্ণ-জ্ঞান হইতে ভ্রষ্ট হইয়াই মানব দ্বিতীয়-বস্তুতে অভিনিবিষ্ট হন। এই অভিনিবেশই তাঁহাকে অভয়পদ-ঐকান্তিকতা বিন্মরণ করাইয়া ভয়রূপ ব্যাভিচারের হস্তে নিক্ষেপ করেন। ঐকান্তিকগণের উপাস্ত বস্তুকে বহুজ্ঞান হইলে ভয়ের উৎপত্তি। বিষয়ের বহুত্ব-জ্ঞানই ভয়ের কারণ। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরমেশ্বর কৃষ্ণই একমাত্র বিষয়।

বহু ঈশ্বরবাদীই ব্যাভিচারী

যাহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া ব্যাভিচার-ক্রমে কামনানুসারে নিজ নিজ কাম-পুষ্টি-জন্ম স্বর্ঘ্য, গণেশ, শক্তি ও রুদ্র উপাসনা প্রবর্তন করেন, তাহারা ই বহুঈশ্বর বাদী ও ব্যাভিচারী। ভগবৎ-তত্ত্ব হইতেই বিমুক্তাক্রমে বাহ্যবিচার ও বাহ্য-দর্শনদ্বারা পঞ্চদেবতার কল্পনা হয়।

কৃষ্ণোপাসক ও পঞ্চোপাসকের পার্থক্য

বহু কামনার হস্ত হইতে পরিচাণ পাইলে জীব কৃষ্ণকাম বা অদ্বয়-জ্ঞান লাভ করেন। সেকালে তাঁহার বাসনাবশে বিভিন্ন উপাসনা থাকে না। ব্যক্তিচারী-সম্প্রদায় এই যুক্তাবস্থাকেও গর্হণ করিতে পশ্চাৎপদ হন না। ব্যক্তিচারীর দল বলেন, কৃষ্ণভক্তগণ স্বার্থপর ও ব্যক্তিগত স্বার্থে বিজড়িত, তাঁহারা ভগবানকে ব্যক্তিগত (personal) করিতে ব্যর্থ। সুতরাং ঐকান্তিক ভক্তের সহিত গণেশ পূজকের মতভেদ আছে। গণেশ পূজা করিলে অর্থসিদ্ধি অবশ্যজ্ঞাবী, কিন্তু কৃষ্ণপূজা করিলে পার্থিব অর্থকে অনর্থ-জ্ঞান হইয়া যায়। তাহা হইলে আর জড়ের ব্যক্তিগত স্বার্থ স্বার্থপরের চমৎকারিতা পোষণ করে না। জড়ার্থকামী ব্যক্তিচারীদল পঞ্চোপাসনার প্রতি আদর করিয়া ঐকান্তিকতা বিনাশ করে এবং ঐকান্তিক কৃষ্ণভক্তকে তাহারই জায় ব্যক্তিগত জড় স্বার্থের দাস বলিয়া মনে করে।

কৃষ্ণভক্তের স্বার্থপরতাই ঐকান্তিকতা,

কিন্তু পঞ্চোপাসকই ব্যক্তিচারী

এখানে বিচার্য বিষয় এই যে—কৃষ্ণ-বস্তুটি জড়ের অন্ততম নহে। কৃষ্ণ-দাস্যে যে ঐকান্তিকতা ও স্বার্থপরতা ব্যক্তিচারীদল দেখিতে পান, উহা তাহাদিগের জায় হেয়-পূর্ণ স্বার্থপরতা নহে। গণেশ-পূজকের স্বার্থ অর্থ-সিদ্ধি। তাদৃশ অর্থের দ্বারা কুইয়োক-শরণের স্বার্থ বিলোপসাধন ও নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণাদি ঘটে। অনন্য-কৃষ্ণভক্তের কৃষ্ণপূজা, অনন্য-কৃষ্ণভক্তের ইন্দ্রিয়-তর্পণও ব্যক্তিগত ঘৃণিত স্বার্থ নহে।

উপাস্ত্রের বহুত্বে ভোটাধিক্য হইলে

ঐকান্তিকতার অভাব হয়

গণেশ পূজক তাহা বুঝিতে না পারিয়া মনে করেন যে, জগৎ 'পঞ্চাইতী শাসনে' প্রতিষ্ঠিত হওয়াই উচিত। ভক্তগণের ঐকান্তিকতা ঘুচাইয়া দিয়া আমরা পাঁচজনে ভোট দিয়া ব্যক্তিচার আনয়ন করিব। জড়জগতে পাঁচের অধিকার থাকুক; কিন্তু ঐকান্তিকতা ও অনুরাগের স্বরূপ যাহারা বুঝিয়াছেন, তাঁহারা নানান্ন, বস্ত্র ও সাধারণী ভাবের আদর না করিয়া ভগবান আমারই স্বায়ত্তীকৃত বস্তু—ইহাতে ব্যক্তিচারীর, সাধারণের বা অন্যের স্বরূপতঃ কোন অংশ নাই জানেন। ঐকান্তিকতার মধ্যে অপরের কোন অংশ থাকিতে পারে না।

ঐকান্তিক ভক্তের স্বভাব বা লক্ষণ

ঐকান্তিক ভক্ত একল সেবাপরায়ণ, আবার তাঁহার স্বজাতীয়শয়-মুক্ত উদ্দেশ্যের অমূল্য সহচরগণকে নিজ হইতে অপৃথক্ বুদ্ধি করেন। ‘সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আশাদয়’ প্রভৃতি ভক্তির পরমোচ্চস্তরের ভজন-প্রভাবের কিছু কিছু উপলব্ধি বাহার হইয়াছে, তিনিই ঐকান্তিকের নিষ্ঠা বুদ্ধিতে সমর্থ। তৎপূর্বে নানা অনর্থ ও জঞ্জাল আসিয়া তাঁহার অন্তর-স্বরূপ-জ্ঞানে বিপৎপাত ঘটাইবে। কৃষ্ণভক্তই ঐকান্তিক ও শাস্ত্র; ভক্তি বুদ্ধি সিদ্ধি-কামী সকলই অশাস্ত্র।

পাঁচ মিশালী মত পরিত্যাগ করিয়া

ঐকান্তিক হইবার উপদেশ

যেখানে ক্রোধের অন্য বস্তুতে জীবের অহুরাগ ও মহামুভূতি দেখা যায়, সেখানে কৃষ্ণভক্তি নাই। কৃষ্ণভক্ত কখনই সাধারণী বহ্নীশ্বর-সেবীর মঙ্গল করেন না। তাঁহাদিগকে সংপথে আনয়নের জন্ত, তাঁহাদের বিষয় উন্মুক্ত করিবার জন্য যত্ন করেন, কিন্তু তাদৃশ সাধারণী ক্রোধের দেবো-পাসকের বিমুখ চেষ্ঠার আদর করেন না। শুদ্ধবৈষ্ণবকে স্বার্থপর মনে করিয়া তাহাকে পাঁচমিশালী মতবাদী করিয়া তুলিবার চেষ্টা ব্যভিচারিদলে আদর পাইতে পারে; কিন্তু তাদৃশ দল যখন নিজ নিজ অসৎচেষ্ঠা ছাড়িয়া দেন, তৎকালে তিনিও ঐকান্তিক হইতে পারেন। ঐকান্তিকতা বিনাশ-প্রবৃত্তি প্রবল থাকিলে তাহার কোন মঙ্গল হয় না।

— জগদগুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ

ভেক-ধারণ

আশ্রম-চতুষ্টয় ও তাহার লক্ষণ

কোন মহাত্মা বৈষ্ণব এই বিষয়ে আমাদেরকে কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছেন। সেই প্রশ্নগুলি এখানে না দিয়া কেবল উত্তর প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

‘ভেক’-শব্দে ভিক্ষুদিগের আশ্রমকে উদ্দেশ্য করে। যানবের আশ্রম শাস্ত্র ও যুক্তিমত চারিটি মাত্র—গৃহস্থশ্রম, ব্রহ্মচর্যাশ্রম, বাণপ্রস্থশ্রম

ও সন্ন্যাসাশ্রম। বিজ্ঞানের চক্ষেই দেখুন বা শাস্ত্রের চক্ষেই দেখুন, উক্ত চারিটি আশ্রম ব্যতীত অন্য আশ্রম মানব-জাতির সম্ভব নহে। আশ্রমের সংখ্যা লঘু করিতেও পারিবেন না। এইসমস্ত আশ্রম-বৃত্তের বিচার 'শ্রীশ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত'-গ্রন্থে [২য় বৃষ্টি, ৪র্থ ধারায়] সম্পূর্ণরূপে লক্ষিত হইবে। সম্প্রতি সংক্ষেপে বলিয়া প্রকৃত প্রস্তাব গ্রহণ করিব। বিবাহ করিয়া সমাজবদ্ধ ব্যক্তিগণই গৃহস্থ আশ্রমে স্থিত। স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতঃ নিঃসঙ্গ ভ্রমণকারী ব্যক্তিগণই সন্ন্যাসাশ্রমী। ব্রহ্মচর্যা ও বাণপ্রস্থ ইহাদের মধ্যবর্তী। ব্রহ্মচারিগণ দার-পরিগ্রহ করিয়া গৃহস্থ হইতে পারেন অথবা একেবারে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারেন। বাণপ্রস্থ আশ্রমে স্ত্রী কোন কোন স্থলে সঙ্গে থাকিতে পারেন। সন্ন্যাসাশ্রমের নামই ভিক্ষু-আশ্রম। সন্ন্যাসীব্যক্তি আর এজীবনে স্ত্রীসঙ্গ করিতে পারেন না। তিনি ভিক্ষার দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবেন।

ভেক-ধারিগণের আশ্রম নিরূপণ

এখন বিজ্ঞাস্য এই যে, ভেকধারী বৈষ্ণবগণ কোন্ আশ্রমে অবস্থিত করেন? আমরা যতদূর শাস্ত্র ও শ্রীমহাপ্রভুর উপদেশ আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে এই পর্য্যন্ত স্থির করিয়াছি যে, নিঃসঙ্গ বৈষ্ণবগণ ভিক্ষুদিগের আশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। স্ত্রী-সঙ্গ তাঁহাদের পক্ষে যখন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ, তখন তাঁহাদের আশ্রমের নাম সন্ন্যাস। সন্ন্যাসের চিহ্নই কোপীন। তাহা তাঁহারা গ্রহণ করেন। অতএব তাঁহারা ভিক্ষুদিগের আশ্রমে অবস্থিত হইয়া বৈষ্ণব-ধর্মের অনুশীলন করেন।

ভেক-ধারণে বা সন্ন্যাসে কোন্ বর্ণের অধিকার?

এস্থলে বিচার্য্য এই যে, বৈষ্ণবদিগের ভেকধারী ব্যক্তিগণ সকল বর্ণ হইতে চতুর্থীশ্রম গ্রহণ করেন—ইহা শাস্ত্র ও বুদ্ধিসিদ্ধি কি না? আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে,—শাস্ত্রমতে ব্রাহ্মণ-বর্ণ ব্যতীত কেহই সন্ন্যাসাশ্রমের অধিকারী নন। শাস্ত্রবাক্য সর্বদা নির্দ্বন্দ্ব। বেদসিদ্ধ শাস্ত্রে ভ্রম-প্রমাদাদি নাই। শাস্ত্রে ব্রাহ্মণবর্ণের যে-লক্ষণ করিয়াছেন, সেই সেই লক্ষণ যদি কোন পুরুষের না থাকে, তাহার সন্ন্যাস গ্রহণ করা বৃথা। যথা শম (অন্তবেশ্রিয়ের বশীভূততা) দম (বাহ্যেঞ্জিয়ের দমন) ইত্যাদি গুণগণ না থাকিলে সন্ন্যাসাশ্রম-গত পুরুষ অতি শীঘ্রই লাম্পট্য ও ভোগবাস্তুর দ্বারা উক্ত পবিত্রাশ্রমের কলঙ্ক-সংক্রম হইয়া উঠিবে।

অতএব ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কাহারও সন্ন্যাসাশ্রমের অধিকার নাই।

ব্রাহ্মণেতর বর্ণে ব্রাহ্মণ-লক্ষণ থাকিলে সন্ন্যাসের অধিকার

কলিকালে স্বভাব হইতে বর্ণ-নিরূপণ-প্রথা সম্পূর্ণরূপে স্থগিত হইয়াছে। এখন কেবল জন্মদ্বারা ব্রাহ্মণত্ব। এতলে ব্রাহ্মণজাতি হইতে সন্ন্যাসাশ্রমের অধিকারী পাওয়া হুলভ। কিন্তু স্বভাব গতিতে অত্যাচ্য বর্ণ হইতে উক্ত আশ্রমের অনেক অধিকারী পাওয়া যায়। এই নিগূঢ় শাস্ত্রবিচার হইতে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীরঘুনাথদাসাদি মহাজনগণকে ভিক্ষুদিগের আশ্রম গ্রহণের অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন।

অনধিকারীর পক্ষে ভেক বা সন্ন্যাস নিষিদ্ধ

সেই সময় হইতে এই ভেক-ধারণের পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে। শাস্ত্রের বা পদ্ধতির কোন দোষ নাই। যাহারা ঐ পদ্ধতি প্রথমে প্রচলিত করেন, তাহাদেরও দোষ নাই। কিন্তু সমস্তই কালের দোষ। জন্মাত্ম ব্রাহ্মণহু প্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে সন্ন্যাস যেক্রপ গহিত, অনধিকারী অপর বর্ণের নরণের পক্ষেও ভেকধারণ তদ্রূপ গহিত—ইহাতে সন্দেহ নাই। অধিকার লাভ করিয়া সকল ব্যক্তিই ঐ আশ্রম গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু অধিকার না পাওয়া পর্য্যন্ত সকলকেই গৃহস্থ-ধর্ম্মে থাকা কর্তব্য।

অবিবাহিত গৃহীর লক্ষণ

কি কি বিষয়ে ভেকধারণের অধিকার জন্মে, তাহা বিচার করা কর্তব্য। মানব যাত্রেই গৃহস্থ হইবার অধিকার আছে। গৃহস্থ হইলে জী পরিগ্রহ করা যায়, কিন্তু জী পরিগ্রহের সম্বন্ধে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয়তা আছে। জী পরিগ্রহ না করিয়াও অক্ষম ব্যক্তিগণ অত্যাচ্য গৃহস্থের সাহায্যে গৃহস্থ হইয়া থাকিতে পারেন।

ভেক-ধারণ বা সন্ন্যাসলাভের অধিকার নির্ণয়

ভেক-ধারণ বা সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে যে কয়েকটি অবস্থা উদয় হওয়া আবশ্যিক, তাহা বলিতেছি।—

১। শম, দম, তিতিক্ষা ও বৈরাগ্য—এই চারটি ধর্ম্ম উদয় হইলে ভিক্ষুদিগের আশ্রমে অধিকার হয়। তিতিক্ষা (ভুংখাদি সহনের অভ্যাস) ও বৈরাগ্য (সমস্ত নখর নস্ততে অবস্ত জ্ঞান) এই দুইটি সন্ন্যাসীর প্রধান ধর্ম্ম।

২। নখর বস্ত্র ও অবিনশ্বর বস্ত্রকে পৃথক্ করিয়া জানার প্রয়োজন।

৩। অবিনশ্বর বস্ত্র লাভের সম্যক্ উপায় লাভ।

এই তিনটি গুণ যে শরীরে উদয় হয়, সে শরীর সন্ন্যাস লিঙ্গ গ্রহণ করিবার অধিকারী।

সন্ন্যাস ও বৈষ্ণব-সন্ন্যাসের পার্থক্য

সামান্যতঃ সন্ন্যাস-ধর্ম হইতে বৈষ্ণব-সন্ন্যাসের একটু ভেদ আছে। সামান্য বার্ণিক সন্ন্যাসীদিগের শম, দম, তিতিক্ষা, বৈরাগ্য সদস্য জ্ঞান ও ব্রহ্মলাভের উপায় মাত্রই প্রয়োজন। বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীদিগের কেবল ঐ সকল গুণ থাকিলেই ভেকের অধিকার হয়, এমত নয়। আদৌ ভগবদ্বিষয়িণী শ্রদ্ধা, তদনন্তর সাধুসঙ্গ, তদনন্তর ভজন ও অনর্থ-নিবৃত্তি প্রভৃতি প্রক্রিয়ার দ্বারা যখন ভাগবতী রতি উদ্ভিত হয়, তখন বিরক্তি বলিয়া একটা ধর্ম বৈষ্ণবকে আশ্রয় করে। তাহা করিলে বৈষ্ণবের আর নিরর্থক কর্মময় গৃহস্থাশ্রম ভাল লাগে না। তখন বৈষ্ণব আপন অভাব স্বর্ক করিবার মানসে কৌশীনাদি ধারণ ও ভিক্ষাধারা জীবন নির্বাহ করেন। ইহার নাম—বৈষ্ণবদিগের ভেক। যিনি সরলতার সহিত ভেক ধারণ করেন, তিনি জগতের পূজনীয়। এবম্প্রকার ভেকগ্রহণ দুই প্রকারে হইয়া থাকে। কোন কোন ব্যক্তি ভাবজনিত বিরক্তি লাভ করিয়া কোন সাধুর নিকট ভেক গ্রহণ করেন, কেহ বা স্বয়ং ঐ প্রকার লিঙ্গদ্বারা লিজিত হইয়া বিচরণ করিতে থাকেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ভেক অতিশয় পবিত্র পদ্বিতি। আমরা শ্রদ্ধাবনত মস্তকের সহিত সেই পদ্বিতিকে বারম্বার দণ্ডবৎ করি।

স্বয়ং ভেক বা সন্ন্যাস গ্রহণ অবিধি ও দৌরাগ্ন্য বিশেষ

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, ব্রাহ্মণের সন্ন্যাসাশ্রমের ন্যায় ভেকাশ্রমও আজকাল অত্যন্ত দূষিত হইয়াছে। অধিকার বিচার একেবারেই উঠিয়া গিয়াছে। বাহার ভেক লইতে ইচ্ছা হইল, সে ক্ষণ-মাত্রের মধ্যে মস্তক মুণ্ডনপূর্বক কৌশীন ধারণ করিয়া বসিল। আজকাল বৈষ্ণব-সমাজে ভেক সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটা দৌরাগ্ন্য প্রচলিত হইয়াছে। সমস্ত সরল বৈষ্ণব ও শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ষথার্থ কৃপাপাত্র সাধুগণ ঐ সকল দৌরাগ্ন্যের অহুমোদন করা দূরে থাকুক, তাহা দেখিলে চক্ষুকে হস্ত-দ্বারা আচ্ছাদন করেন।

ভেক ও সম্মানসম্বন্ধে বর্তমান দৌরাভ্যের বিচার

১। গৃহস্থ বৈষ্ণবদিগের মধ্যে অনেকেই মন্তকমুগ্ধ ও কোপীনধারণ করিয়া স্বর্গে বাবাজী হইয়া থাকেন। ইহা অপেক্ষা আর অনর্থ কি আছে? তাঁহাদের এক্রপ আশ্রম-সাহস্র্যের প্রয়োজন কি? যদি বিরক্তি হইয়া থাকে তবে প্রকৃত-প্রস্তাবে নিঃসঙ্গ ভেক গ্রহণ করুন। যদি বিরক্তি না হইয়া থাকে, তবে এক্রপ লিঙ্গ-ধারণদ্বারা কি লাভ হইবে? কেবল বৈষ্ণবধর্মকে লোকের নিকট কলঙ্কিত করাই হইতেছে। অবশ্য পরলোকে ইহার ফলভোগ করিবেন।

২। আখড়াসারী বাবাজীদিগের আখড়ায় জীলোক সেবিকা রাখাও একটা ভয়ঙ্কর অমঙ্গলজনক প্রথা। কোন কোন আখড়ায় বাবাজীর পূর্বাশ্রয়ের বনিতা সেবিকারূপে অবস্থিতি করেন। যে আখড়ায় জীলোক না হইলে চলে না, সে আখড়ায় যথার্থ বিরক্ত পুরুষ কখনই থাকেন না; দেশসেবার ও সাধুসেবার চল করিয়া জীসঙ্গ করাট কেবল ঐসমস্ত কার্যের মূলীভূত তত্ত্ব।

৩। নিঃসঙ্গ বাবাজীদিগের জীলোভ, অর্থলোভ, খাণ্ডলোভ ও স্ত্রীলোভ অত্যন্ত বর্জনীয়। কোন কোন নিঃসঙ্গ লিঙ্গধারী বৈরাগীর সেই সকল দৌরাভ্যা থাকায় সমস্ত নিঃসঙ্গ পুরুষের প্রতি বৈষ্ণব-জগতের অবিশ্বাস হইয়া পড়ে। ফলকথা, ভাগবতী রতি-জগিত বিরক্তি না হইতে হইতেই যিনি বৈরাগ্য-লিঙ্গ ধারণ করেন, তিনি অবশ্যই জগতের উৎপাত ও বৈষ্ণব-ধর্মের কলঙ্ক-স্বরূপ।

অবৈধ ভেক ও সম্মানসম্বন্ধে বৈষ্ণব-ধর্মের অবমাননা ও অধঃপতন

ফলকথা এই যে, অবিবেচনা ও মগ্ন উদ্দেশ্যই এই সকল দৌরাভ্যের জনক-জননী। ভেক গ্রহণ করার পূর্বে সকলেই বিশেষ সতর্কতা-সহকারে আপন আপন অধিকার পবীক্ষা করিবে। ভেক গ্রহণ করিলেই হয়, তাহা নয়। ভেক 'যথাবিধি' গ্রহণ করিতে পারিলে সর্বার্থসিদ্ধি হয়। অবথা-বিধি ভেক গ্রহণ করিলে নিজের অধঃপতন ও বৈষ্ণব-ধর্মের অবমাননা হয়।

অধিকার-বিচার করার জন্য ঠাকুরের আবেদন

আমরা কৃতাঞ্জলিপূর্বক জগতের নিকট এইপ্রকার আবেদন করি,—হে মহোদয়গণ! অধিকার বিচারপূর্বক কার্য করুন। অধিকারই সকল-বিষয়ের মূল। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

যে যেহিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ।

বিপর্যায়স্ত দোষঃ স্যাদ্ভয়োরেব নির্ণয়ঃ ॥ (ভাঃ ১১।২১।২) .

নিজ নিজ অধিকারে যে নিষ্ঠা, তাহাই গুণ । তাহার বিপরীত আচরণের নাম দোষ । অতএব, অধিকার বিচার না করিয়া কোন কার্য করিবেন না । যে-পর্যায় বিরক্তি না হয়, সে-পর্যায় গৃহস্থ্য পালন করিতে করিতে কৃকভক্তির অহুশীলন করুন । বিরক্তি হইলে গৃহ পরিত্যাগপূর্বক বিচরণ করুন । একাদশ-স্কন্ধে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাস্ত্ৰ নির্বিধঃ সৰ্ব্বকৰ্ম্মসু ।

বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেহপানীশ্বরঃ ।

ততো ভজ্যেত মাং শ্রীঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ।

জুযমাংশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গৃহীন্ ॥ (ভাঃ ১১।২০।২৭-২৮)

যে-পর্যায় গৃহ পরিত্যাগ করিতে অক্ষম, সে-পর্যায় আমার কথাতে জাতশ্রদ্ধ হইয়া সকল কর্ম্মফলে নির্বেদ লাভ করুক । সমস্ত কামকে দুঃখাত্মক জানিয়া ও তাহাদের শেষ ফলকে মন্দ বলিয়া নিন্দা করিতে করিতে ও তাহাদিগকে আমার প্রতি শ্রদ্ধালু হইয়া স্বীকার করুক এবং আমাকে প্রীতিপূর্বক ভজনা করুক ।

ভেকধারী বা সন্ন্যাসীর নিজগৃহে অবস্থান নিষিদ্ধ

হে সাধুগণ ! ইহাই গৃহস্থ-বৈষ্ণবের লক্ষণ । “কটিং কৃচ্ছা বনং ব্রজে” — এই বৈষ্ণবী তন্ত্র হইতে স্থির হয় যে, ভেকধারণ করিয়া গৃহমধ্যে অবস্থিতি করা বৈষ্ণবের লক্ষণ নয় । ভেকধারণ করিয়া বিচরণ-করণ-সময়ে যে লক্ষণ, তাহা ভগবদ্ব্যদেশ দৃষ্টি করুন ।

“আজ্ঞারৈবং গুণান্ দোষান্ মদাদিষ্টানপি স্বকান্ ।” (ভাঃ ১১।১১।৩২)

ভেকধারী বা সন্ন্যাসীর পারমহংস্ত বৈষ্ণবোশ্রম

পুনশ্চ — “লিঙ্গান্ আশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধি-গোচরঃ ॥” (ভাঃ ১১।১৮।২৮)

বর্ণাশ্রম-ধর্মে গুণদোষ দৃষ্টিপূর্বক তাহা পরিত্যাগ করিয়া আমাকে ভজন করিবে । তখন সমস্ত লিঙ্গের সহিত আশ্রম সকলকে পরিত্যাগ করিয়া বিধিসকলের অতীত যে পারমহংস্ত বৈষ্ণবোশ্রম, তাহাতেই বিচরণ করিবে । এই বাক্যদ্বারা বৈষ্ণবোশ্রমকে পঞ্চমাশ্রম মনে করিবেন না । যে আশ্রমেই থাকুন, তাহাতে আসক্তি ত্যাগপূর্বক এবং

সেই আশ্রমের ঞ্জিতে নিষ্ঠা ছাড়িয়া কৃষ্ণ-কির দ্বারা উদ্বেজিত-হইয়া
উজ্জদিগের আচার স্বীকার করিবেন। এ বিষয়ে আর অধিক কথা
আপাততঃ বলিব না। আবশ্যিকমত পবে এবিষয়ের অনেক আলোচনা
হইবে। বৈষ্ণবধর্মকে পক্ষ হইতে উদ্ধার করিতে হইলে সমস্ত দৌরাভ্যা
দূর করিবার চেষ্টা অবশ্যই করিতে হইবে।

সেই অশ্রম করুণাময় শ্রীশচীনন্দন আমাদিগকে তখন যাহা বলাইবেন,
আমরা তাহাই বলিব। বৈষ্ণব-চরণে দণ্ডবৎ-প্রণতিপূর্বক অন্ত নিরন্ত হইলাম।

—ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীশ্রীগুরুদেবের ৮২তম বর্ষপূর্তি-প্রকট-তিথিতে

কুম্ভাঞ্জলি

জয় গুরুদেব শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান, জয় জয় প্রভু ভক্তবর,
আজিকে তোমার উদয়-তিথিতে পূজি তব পদ নিরন্তর।
গোবিন্দ কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথিতে তুমি আবির্ভূত হয়েছো ভবে,
পরমার্থময়ী এ' তিথিরে তাই প্রতিটি বছর পূজিছি সবে।
ম'ধবী মালতী কুম্ভাদি আজি বিতরে সুগন্ধ চতুর্দিকে,
পিকের কণ্ঠে মধুমাখা তান দিক্ মাতোয়ারা করিছে এবে।
শীতের তাণ্ডব ক্রমে ক্ষীণ আজ, মলয়ানিল-বহিছে ধীরে,
প্রকৃতিদেবী যেন এ' তিথিরে আজ বরণ করিছে হর্ষভরে।
গুরুদেব, তব চরণপূজার আজিকে যে গো বিশেষ তিথি,
শ্রীব্যাস-পূজার অনুবর্তনে তোমার পূজনই শাস্ত্র-বিধি।
তোমার পূজার উপায়ন জানি ব্যাস-মুখরিত ঋতির বাণী,
ঋতি-কীর্তনে মাতি' আজি তাই, দিতেছি তোমার জয়ধ্বনি।
গোলোক হ'তে তুমি আসি' এমর্ত্যে শত লতজীব করেছো ত্রাণ,
পাষণ্ড-দলন ও কৃষ্ণপ্রেম-দানে তোমার-মহিমা দীপ্যমান।
শ্রীচৈতন্যধর্মের বিজয়-পতাকা উড়ায়েছো দেশ-দেশান্তরে,
তোমার 'গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি' চির ভাস্বর ধরার 'পরে।

তোমার হৃদয়-তন্ত্রীতে সদা প্রভুপাদ-সুর উঠিত বেজে,
 শ্রীপ্রভুপাদের দাসরূপে তুমি পরিচিত ছিলে সবার কাছে।
 শ্রীপ্রভুপাদেরে বাঁচাতে একদা তুচ্ছ করেছো নিজের প্রাণ,
 ‘গুরুবে সর্বস্ব দত্তাৎ’—শ্লোকের তব আচরণে মিলে প্রমাণ।
 শ্রীপ্রভুপাদের নামোচ্চারণে তোমার নয়নে ঝরিত জল,
 তব গুরু-সেবার মহান আদর্শ আজিও জগতে সমুজ্জ্বল।
 শ্রীপ্রভুপাদের অপ্রকটে যবে চৈতন্য-ধর্ম্যে পশিল গ্লানি,
 সেইকালে তুমি জগজ্জাতারূপে ঘোষিলে আবার গৌর-বাণী।
 জানালে গৌর-নাগরীবাদাদি মায়াবাদেরই প্রচ্ছন্নরূপ,
 শ্রীচৈতন্যধর্মের নির্মলত্ব যুগ যুগ ধরি’ রয়ে অটুট।
 জ্ঞানীদের মতে ব্রহ্ম নিব্বিশেষ্য, সোহং বলি’ তারা গর্ব করে ;
 যোগীরা নিছক যোগ-প্রভাবে অলৌকিক কিছু দেখা’তে পারে।
 হেন জ্ঞানী-যোগী ভক্তির অভাবে শ্রীহরির দেখা কভু না পায়,
 ভক্তই শুধু হরি-পদ লভি’ হরি-গুণ-গাথা সতত গায়।
 তোমার শিক্ষার মহৎ মহিমা সারা ভূ-ভারতে ব্যাপ্ত আজ,
 জীবের সার্বিক কল্যাণ তরে সার্থক হয়েছে তব প্রয়াস।
 মোদের ভক্তনের উন্নতি লাগি’ শুনেছি তোমার শাসন-বাণী,
 আমাদের ভোগ-সুখের রুচিতে কভু ইক্ষন দাওনি তুমি।
 তব প্রিয়তম শিষ্যগণেরে রাগাশুগা ভক্তি করেছো দান,
 তব কৃপা-কণা পেয়েছে যে-জন, পুরিয়াছে তা’র মনস্কাম।
 তব প্রিয়তম সুযোগ্য প্রতিভূ মোদের পূজ্য আচার্য্যপাদ,
 এবে তাঁরই কণ্ঠে ধ্বনিত নিত্য তোমার সিদ্ধাস্ত-শঙ্খ-নাদ।
 কুমুদাঞ্জলি দিয়া তব পদে জানাই আজি মোর সাষ্টাঙ্গ নতি,
 প্রার্থনা মোর যেন নিত্যকাল তব চরণের দাস হ’য়ে থাকি।
 পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেবেরে তব অভিন্ন-হৃদয় জানি’
 তাঁর দাস্ত্রে রহি’ প্রণমি’ তাঁহারে গাহি তব গুণ, দিবস-যামী।
 —শ্রীচিত্তরঞ্জন কবিতুষণ

শ্রীকৃষ্ণ কি বস্তু ?

(পূর্বপ্রকাশিত ৩২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৩৪ পৃষ্ঠার পর)

তত্ত্বং শ্রীভগবতোব স্বরূপং ভূরি বিদ্যতে ।

উপাসনানুসারেণ ভাতি তত্ত্বরূপাসকে ॥

যথা রূপ-রসাদীনাং গুণানামাশ্রয়ঃ সদা ।

জীৱাদিরেক এবার্থো জ্ঞায়তে বহুধৈন্দ্রিয়ৈঃ ॥

দৃশা শুক্লো রসনয়া মধুরো ভগবাংস্তথা ।

উপাসনাতিবহুধা স একোহপি প্রতীয়তে ॥

জিহ্বায়েব যথা গ্রাহ্যং মাধুর্য্য তস্মা নাপরৈঃ ।

যথা চ চক্ষুরাদীনি গুরুত্বার্থং নিজং নিজসু ॥

তথান্য বাহ্যকরণস্থানীয়োপাসনাখিলা ।

ভক্তিস্ত চেষ্টঃস্থানীয়া তত্ত্বসংসর্কার্থলাভতঃ ।

ইতি প্রবরশাস্ত্রেষু তস্ম ব্রহ্মস্বরূপতঃ ।

মাধুর্য্যাদিগুণাধিক্যাং কৃষ্ণস্ত শ্রেষ্ঠতোচ্যতে ॥

(শ্রীলঘুভাগবতামৃত)

ছগুণাশ্রয় এক দুষ্কাদি দ্রব্য যেক্রপ চক্ষু প্রভৃতি বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিভিন্নরূপে গৃহীত হয়, তক্রপ একই ভগবান্ বিভিন্ন শাস্ত্রপথসমূহ-দ্বারা নানাক্রপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। কিন্তু তাই বলিয়া সমস্ত শাস্ত্রপথই সমান বা এক তাৎপর্য্যাপন্ন তাহা নহে। ভগবানের সেবানুকূল ও ভগবৎসেবা-প্রতিকূল—উভয় পথ এক নহে এবং ইহাদের প্রাপ্তব্য বস্তুও এক নয়। যেক্রপ রূপ-রসাদি বহুবিধ গুণের আশ্রয় এক দুষ্কাদি দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ে ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রতীত হয়, অর্থাৎ চক্ষু দ্বারা শুক্ল, হস্তের দ্বারা তরল, নাসিকা দ্বারা কোন বিশিষ্ট ঘ্রাণযুক্ত, জিহ্বা দ্বারা মধুর ইত্যাদি রূপে প্রতীত হয়, আবার যেমন দুষ্কাদির মাধুর্য্য একমাত্র জিহ্বাই গ্রহণ করিতে সমর্থ,—কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি অন্য ইন্দ্রিয় সমর্থ নহে, আর যেক্রপ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-সমূহ রূপ-রসাদির মধ্যে স্ব-স্ব বিষয় গ্রহণ করিতে সমর্থ, কিন্তু চিত্ত সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ই গ্রহণে যোগ্য, তক্রপ বাহ্য ইন্দ্রিয়-স্থানীয় অত্যান্য উপাসনা-সমূহ বা পথ কেবল স্বস্বোপযোগী তত্ত্বং স্বরূপে বিষয় গ্রহণ করিতেই সমর্থ; চিত্ত-স্থানীয় ভক্তি কিন্তু তত্ত্বরূপাসনার বিষয় সমস্ত স্বরূপই সর্ব্বতো-ভাবে গ্রহণ করিতে সমর্থ। অগৃহীত গুণক কৃষ্ণই—ব্রহ্ম এখানে কোন

বস্তুভেদ নাই, অর্থাৎ ব্রহ্ম ও ভগবত্তা দুইটাই পৃথক্ স্বরূপ নহে; কৃষ্ণই একমাত্র স্বরূপ, ব্রহ্ম একটী প্রতিহতদৃষ্টিযুক্ত অসম্যক্ প্রতিষ্ঠিত মাত্র। এজন্য প্রধান প্রধান শাস্ত্রে মাধুর্যাদি গুণের আধিক্য বশতঃ শ্রীকৃষ্ণেরই উৎকর্ষ কথিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত প্রভু বলিয়াছেন,—

‘ব্রহ্ম’ শব্দের মুখ্য অর্থ—ভগবানে পর্যাবসিত

‘ব্রহ্ম’-শব্দে মুখ্য অর্থে কহে ‘ভগবান্’।

চিদৈশ্বর্য্য, পরিপূর্ণ অনূর্দ্ধ-সমান।

নির্বিবশেষভাব—একদৈশীয়া অসম্যক্ বিচার মাত্র

তাঁরে ‘নির্বিবশেষ’ কহি, চিচ্ছক্তি না মানি।

অর্দ্ধ স্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি।

শ্রীকৃষ্ণ—অগ্র্য-নিরপেক্ষ স্বয়ংরূপ ভগবান্ তিনিই

মূল পরাৎপর-তত্ত্ব; শ্রীকৃষ্ণ হইতেই

যাবতীয় বিষ্ণুতত্ত্ব প্রকাশিত

শ্রীকৃষ্ণ নিরপেক্ষতাক স্বয়ংরূপ ভগবান্ অর্থাৎ তিনি মূল প্রদীপ; তাঁহা হইতেই অন্যান্য যাবতীয় প্রান্তবপ্রকাশ, বৈভবপ্রকাশ, তদেকান্তরূপ এবং তদন্তর্গত বিলাস, স্বাংশ, তাঁহাদের প্রান্তব-বিলাস, বৈভব-বিলাসরূপে আদি চতুর্বাহ ও আদি চতুর্বাহ হইতে প্রকাশিত সমগ্র চতুর্বাহরূপী বৈভববিলাসগণ, স্বাংশ ও শক্ত্যাবেশরূপ বিবিধ অবতার, কারণ-গর্ভ-ক্ষীরোদকশায়ী পুরুষাবতারত্রয় প্রকাশিত। আদি পুরুষাবতার মহাবিষ্ণুরূপে প্রকৃতির দৈক্ষণকর্ত্তা বা প্রকৃতির মূল নিমিত্ত কারণ কারণাক্ষিশায়ী মহাবিষ্ণুই আবার সমষ্টি জগতে প্রবিষ্টরূপে গর্ভোদকশায়ী এবং প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে প্রত্যেক জীবে প্রবিষ্টরূপে ক্ষীরোদকশায়ী, সেই ক্ষীরোদকশায়ী পুরুষ প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে এক একটী বৈকুণ্ঠ প্রকট করিয়া তাঁহাতে বিষ্ণু, পরমাত্মা, ঈশ্বরাদিরূপে বিরাজমান এবং ব্রহ্মাণ্ডের জলাংশে শেষশায়ী। এই শেষশায়ী—ব্রহ্মার পিতা। তাঁহারই এক অংশ বিরাটরূপে কল্পিত। সর্বকারণ-কারণ স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ হইতে স্বয়ং প্রকাশ বলদেব। কৃষ্ণলোকে—দারকা, মথুরা ও গোকুল, তথায় আদি চতুর্বাহ—বাসুদেব, মূল সঙ্কর্ষণ—বলদেব, প্রদ্যুম্ন—কামদেব এবং অনিরুদ্ধ। কৃষ্ণলোকের অধোভাগে পরব্যোম নামক বৈকুণ্ঠ, তথায় কৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি চতুর্ভুজ নারায়ণ বিরাজমান।

স্বয়ংপ্রকাশ বলদেব—মূল সঙ্কর্ষণ, তাঁহারই

বিলাসমূর্তি—বৈকুণ্ঠে মহাসঙ্কর্ষণ

কল্পলোকে যিনি বলদেব, তিনি—মূল সঙ্কর্ষণ, তাঁহার বিলাসমূর্তি—
পর্যোম বৈকুণ্ঠে মহাসঙ্কর্ষণ ; সেই পরব্যোমের বাহিরে জ্যোতির্ময় ধাম-
রূপ ব্রহ্মলোক । তাঁহার বাহিরে চিন্ময় জলবিশিষ্ট কারণ-সমুদ্র—যে
কারণ-সমুদ্রের এক কণ হইতে পতিতপাবনী গঙ্গা প্রকাশিতা হইয়াছেন ।
কারণ-সমুদ্রের অপর পারে এই দেবীধাম ।

মহাসঙ্কর্ষণ হইতে আদি পুরুষাবতার—কারণার্ণবশায়ী,

তাঁহা হইতে দ্বিতীয় পুরুষাবতার—গর্ভোদকশায়ী

বা চতুর্মুখ ব্রহ্মার পিতা

কারণ-সমুদ্রে মূল সঙ্কর্ষণের কলা এবং মহাসঙ্কর্ষণের অংশরূপ আদি-
পুরুষাবতার মহাবিশু বা কারণার্ণবশায়ী । ইনি সমগ্র জীবশক্তি এবং
প্রকৃতির কারণরূপে অনন্তকোটি ধামেরমূল কর্তা । কারণার্ণবশায়ী ব্রহ্মাণ্ড-
সংস্থিত হইয়া গর্ভোদকশায়ী ; ইনি চতুর্মুখ ব্রহ্মার অন্তর্য্যামী এবং পিতা ।
তাঁহার নাতিপুত্রদ্বয়ে ব্রহ্মার জন্ম এবং সেই পদ্যনাতে চৌদ্দ ভুবন ।

গর্ভোদকশায়ী হইতে তৃতীয় পুরুষাবতার ক্ষীরোদকশায়ী—

ব্যষ্টি জীবের অন্তর্য্যামী

গর্ভোদকশায়ী হইতে জগৎপালক অনিরুদ্ধ বিষ্ণুর প্রাকট্য । এই
অনিরুদ্ধ বিষ্ণুই তৃতীয় পুরুষাবতার ক্ষীরোদকশায়ী বা গুণাবতার বিষ্ণু ।
তিনি সত্ত্বাধিপত্যদেব হইয়াও স্বয়ং গুণমায়াতীত । গর্ভোদকশায়ী হইতে
জগৎ-সংহারক রুদ্রেরও উৎপত্তি অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—এই তিন
গুণাবতার গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু হইতেই প্রকাশিতা । তবে বিশেষ এই যে,
ব্রহ্মা ও শিবের ন্যায় জগৎপালক গুণাবতার বিষ্ণুকে বিষ্ণুমাত্রা আবরণ
করিতে পারে না ।

গুণাবতার সম্বন্ধে বিষ্ণু—ব্রহ্মা ও রুদ্রের ন্যায়

মায়াবশ-যোগ্য নহেন, তিনি—মায়াধীন

গুণাবতার ব্রহ্মা ও শিব—মায়ার অধীন ; কিন্তু বিষ্ণু সেরূপ নহেন ।
স্বাহাকে ‘অন্তর্য্যামী’, ‘পরমাত্মা’ কিম্বা ‘অদ্বৈতমাত্র পুরুষ’ প্রভৃতি বলা হয়,
তিনি তৃতীয় পুরুষাবতার ক্ষীরোদকশায়ী । আর ঋকসূক্ত স্বাহাকে সংস্র-

শীর্ষাদি বাক্যে স্তব করেন, তিনি হিরণ্যগর্ভ বা সমষ্টি জীবের অন্তর্ধ্যায়ী গর্ভোদকশায়ী দ্বিতীয় পুরুষাবতার ।

গর্ভোদকশায়ী হইতে মৎস্তাদি লীলাবতার

গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু হইতে মৎস্ত-কুর্মাাদি অসংখ্য লীলাবতার জগতে প্রকাশিত ।

শক্ত্যাবেশাবতার

তৃতীয় পুরুষাবতার অনিরুদ্ধ হইতে গোণ ও মুখ্যভেদে দুই প্রকার শক্ত্যাবেশাবতার । যাহাতে সাক্ষাৎ শক্তির অবতার, তিনি মুখ্য শক্ত্যাবেশাবতার, আর যে-যে স্থলে শক্তির আভাসমাত্র বিভূতি দেখা যায়, সে-স্থলে গোণ শক্ত্যাবেশাবতার । যেমন সনকাদিতে—জ্ঞানশক্তি, নারদে—ভক্তিপ্রচারশক্তি, ব্রহ্মায়—সৃষ্টিশক্তি, অনন্তে—ভূধারণশক্তি, শেষরূপী ভগবদবতারে—স্বীয় সেবারূপা শক্তি, পৃথুতে—পালনীশক্তি,—পরশুরামে—দুষ্টনাশ ও বীৰ্য্য-সঞ্চারিণীশক্তি অঙ্গিত হইয়াছে । আর যে-সকল জীব বিভূতিমান বা শ্রীমান্ সেই সকল জীব গোণ শক্ত্যাবেশাবতাররূপে কল্পিত ।

শ্রীকৃষ্ণ—সর্বকারণ-কারণ সর্বোৎকৃষ্ট

স্বতরাং শ্রীকৃষ্ণ নিখিল কারণ-তত্ত্বগণেরও কারণস্বরূপ । তিনি ব্রহ্মার কারণের কারণের কারণ, ব্রহ্মের কারণের কারণের কারণ, ব্রহ্মের কারণের কারণ, নারায়ণের কারণের কারণ, সকলের আদি কারণ । তিনিই সকলের কারণ, তাহার আর কারণ নাই বলিয়া তিনি অকৃত্রিম বেদান্ত-ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতে,—“কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্” ।

সিদ্ধান্তগ্রন্থরাজ শ্রীব্রহ্মসংহিতায়,—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।

অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥

অখিল রসামৃতসিদ্ধি—শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীকৃষ্ণ অখিল রসামৃতসিদ্ধি । শ্রীকৃষ্ণ অখিল রসের আশ্রয় বলিয়াই যখন শ্রীবলদেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণ কংসের রঙ্গালয়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন যাহার সেই রস, তিনি সেই রসে কৃষ্ণকে দেখিতে লাগিলেন । বীর-রস-প্রিয় মল্লগণ দেখিলেন,—যেন কৃষ্ণ তাঁহাদের নিকট সাক্ষাৎ বজ্র-স্বরূপে উদ্ভিত হইয়াছেন, মধুর রসপ্রিয় স্ত্রীগণ তাঁহাকে—সাক্ষাৎ মুণ্ডিতমান মন্থনরূপে দর্শন করিতে লাগিলেন, নর-সমূহ—জগতের একমাত্র নরপতি-

রূপে এবং সখা-বাৎসল্যপ্রিয় গোপসকল শ্রীকৃষ্ণকে—স্বজনরূপে দেখিতে লাগিলেন ; ভদ্রার্জ অসদ্-রাজগণ শ্রীকৃষ্ণকে—দণ্ডবিধাত্তরূপে দর্শন করিতে লাগিলেন ; মাতা-পিতা শ্রীকৃষ্ণকে—সুন্দর শিশুরূপে দর্শন করিলেন ; ভোজপতি কংস—দাক্ষাৎ মৃত্যুরূপে ; জড়বুদ্ধি ব্যক্তিগণ—বিরাতরূপে ; পরম যোগীসকল—শান্তরসের আশ্রয় পরতত্ত্বরূপে এবং বৃষ্ণিবংশীয় পুরুষগণ—পরদেবতারূপে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিলেন,—

ভাগবত-প্রমাণ

মল্লানামশনিমূর্খাং নরবর স্ত্রীণাং স্মরো যুক্তিমান্

গোপানাং স্বজনোহসতাং ক্ষিত্তিভূত্যাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ ।

মৃত্যুভোজপতেবিরাড়বিভূষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং

বৃক্ষীনাং পরদেবতোতি বিদিতো বহুং গতঃ সাগ্রজঃ ॥ (ভাঃ ১০।৪৩।১৭)

নিখিল ভগবদ্ৰূপ-মাহাত্ম্য শ্রীকৃষ্ণে বিরাজিত

নিখিল শ্রীভগবদ্ৰূপের অখিল মাহাত্ম্য একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই বিরাজিত আছে। কেহ বলেন,—বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণই শ্রীকৃষ্ণরূপে মথুরায় অবতীর্ণ হইয়াছেন, কেহ বলেন,—সহস্রশীর্ষ পুরুষ, কেহ বলেন,—সর-সখ নারায়ণ, কেহ বলেন,—ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুই মথুরায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ; এইরূপে বিভিন্ন লোকে বিভিন্নভাবে উক্তি করিয়া থাকেন। এইরূপ পরস্পর মতভেদ হইবার কারণ—যাঁহারা যে-যে লোকের বৃত্তান্তগ্রহণে তৎপর, তাঁহারা সেই সেই লোকে লোকনাথকে দর্শন করিতে না পারিয়া নিজ-নিজ মতি অনুসারেই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। মথুরায় অবতীর্ণ সেই শ্রীকৃষ্ণেই ঈশ্বরোপযুক্ত মাহাত্ম্য, মাধুর্য, বিতর্কতা, দুর্ভিতকাভাব, বিরুদ্ধ গুণের অপূর্ব সমন্বয় লক্ষ্য করিয়া সকলেই স্ব-স্ব মতানুযায়ী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই বলেন যে, আমাদেরই উপাস্য ভগবান্ মথুরায় অবতীর্ণ হইয়াছেন।

নিখিল হতারিগতিদায়ক

একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সর্বশ্রমোৎসর্গে অর্থাৎ ভক্তবেশ দেখিয়াই বাল-ঘাতিনী পুতনাকে ধাত্মচিহ্ন গতি প্রদান করিয়াছিলেন ; এমন কি, তিনি সেই বালঘাতিনীর বান্ধব বক এবং কংসাদিকেও পরম মধুর গোপবালকো-চিত মধুর ক্রীড়াধারা মুক্তিপদ প্রদান করিয়াছিলেন।

অন্য ভগবৎস্বরূপে—উর্দ্ধগতিমাত্র দান-সামর্থ্য

হতারিগতিদায়কত্ব গুণ অন্য ভগবৎস্বরূপে থাকিলেও তাঁহারা নিহত শক্তিকে স্বর্গাদি লোক-প্রাপ্তিরূপ সদগতি-পর্যন্ত দান করিতে পারেন। কিন্তু একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই নিজ অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবে নিহত শক্তিমাত্রকেই মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। জয়-বিজয় হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষ প্রভৃতিরূপে বিষ্ণুহস্তে নিহত হইয়াও মুক্তি প্রাপ্ত হন নাই, কেবল উর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন মাত্র; কিন্তু শিশুপাল ও দত্তবক্ররূপে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হইয়া তাঁহারা মুক্তি পাইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে না পাইলে অসুরগণেরও মুক্তি হয় না; তবে যে কোথায় কোথায়ও অন্য ভগবৎস্বরূপ কর্তৃক ভগবদ্দেবীর মুক্তিদান-প্রসঙ্গ শ্রবণ করা যায়, তাহার কারণ কেবল—ভগবদ্দেবী কর্তৃক বিদেষ-সহকারে নিরন্তর ভগবচ্চিন্তন। কিন্তু নিখিল ভগবদ্দেবীর মুক্তি-দানের কথা কোন অবতার বা অবতারীতে শুনা যায় না, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ আপনার অচিন্ত্যস্বভাব বশতঃ ভগবদ্দেবী অসুরগণকেও মুক্তি দান করেন, অসুরগণের মুক্তিদানের অন্য কোন কারণ নির্দেশ করা যায় না। পুতনাদির ধাতু-চিতা গতিলাভই তাহার প্রমাণ। শ্রীকৃষ্ণের স্বভাবই এই,—তাঁহাকে যৎকিঞ্চিৎ স্মরণ করিলেও আপনার নিরতিশয় প্রভাব-দ্বারা স্মরণকারীর চিত্তকে সর্বতোভাবে আকর্ষণ করিয়া থাকেন। এজন্যই তিনি সকলের মুক্তিদাতা! কিন্তু অন্য ভগবৎ-স্বরূপে কিঞ্চিৎ স্মরণমাত্রে স্মরণ-কারীর চিত্ত আকৃষ্ট করিবার স্বভাব নাই বলিয়া মুক্তিদাতৃত্বও নাই। বেণরাজা বিষ্ণু-দেবী ছিলেন বটে, কিন্তু কৃষ্ণের মত বিষ্ণুর সর্বাধিকার স্বর্ন না থাকায় শ্রীকৃষ্ণদেবীগণের আবেশের ন্যায় বেণরাজার শ্রীভগবানে আবেশের অভাব-হেতু মুক্তিলাভ হয় নাই। এই জন্য যেন কেন উণায়ে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই মনোনিবেশের কথা শাস্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন।

একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই আশ্চর্য্যতমা শক্তি বর্ত্তমান

নিখিল ভগবৎ-স্বরূপ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণই আশ্চর্য্যতমা শক্তি আছে, ইহাই শ্রীমদ্বাহ্যপ্রভু বা সম্ভবকারের সিদ্ধান্ত,—

“সর্বেষাং মুক্তিদাতৃষ্ণ তস্য কৃষ্ণস্ত নিজপ্রভাবাতিশয়েন যথা কথঞ্চিৎ স্মৃতি-চিন্তাকর্ষণাতিশয়স্বভাবাৎ। অন্যত্র তু তথা স্বভাবো নাস্তীতি নাস্তি মুক্তি-দত্বম্। অতএব বেণস্যাপি বিষ্ণুদেবিশস্তদদাবেশাভাবানুভাব ইতি। অতএবোক্তম্—তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন যনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েদাত। তস্মাদন্তোব সর্বতোহপ্যাশ্চর্য্যতমা শক্তিঃ শ্রীকৃষ্ণস্ত ইতি সিদ্ধম্।” (ক্রমশঃ)

সঙ্গত্যাগ

শ্রীউপদেশামৃত শ্রীকৃষ্ণগোপ্বামী বলিয়াছেন যে, উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য্য, তত্ত্বকর্ম্মপ্রবর্তন, সঙ্গত্যাগ ও সংবৃদ্ধি (সাধু-জীবন ও সাধুপ্রযুক্তি) হইতে ভক্তির উন্নতি হয়। তন্মধ্যে আমরা সম্প্রতি 'সঙ্গত্যাগ'-শব্দের তাৎপর্য্য আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

সঙ্গ—তুই প্রকার অর্থাৎ সংসর্গ ও আসক্তি। সংসর্গ দুইপ্রকার অর্থাৎ অভক্ত-সংসর্গ ও যোগিং-সংসর্গ। আসক্তিও—দুইপ্রকার অর্থাৎ সংস্কারাসক্তি ও দ্রব্যাসক্তি। যে-সকল মহাত্মা ভক্তিসিদ্ধি লাভ করিবার আশা করেন, তাঁহারা বিশেষ যত্নসহকারে সংসর্গ ও আসক্তিরূপ সঙ্গকে বর্জন করিবেন। সঙ্গ থাকিলে ক্রমশঃ সর্বনাশ অবশ্য অবশ্য ঘটিয়া থাকে। যথা গীতায়,—

সঙ্গাং সংগায়তে কামঃ কামাং ক্রোধেহুত্তিহায়াতে।

ক্রোধান্তবতি সন্মোহঃ সন্মোহাং স্মৃতিবিস্রমঃ।

স্মৃতিভ্রংশাদবুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাং শ্রবশ্চ্যতি ॥

এই ভগবদাজ্ঞা সর্বদাই সাধারণকে স্মরণ রাখিতে হইবে। সাধক যদি নিষিদ্ধ সঙ্গ করেন, তাহা হইলে অতি অল্পে অল্পে তাঁহার আসক্তি বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। যতই আসক্তি বৃদ্ধি হইবে, ততই পরমার্থনিষ্ঠা খর্ব্ব হইবে। তাৎপর্য্য এই যে, জীব চিন্ময়। মায়াবদ্ধ হইয়া অবিজ্ঞান-দোষে ভড়াতিমানে জীবের স্বরূপভ্রম হইয়াছে। ভুত্বাক্কার জীবের মায়া-সংসর্গ হয় না। সে-অবস্থায় তাঁহার কেবল চিংপ্রসঙ্গই থাকে। চিজ্জগতে জীবের সমস্ত সংসর্গই চিন্ময়। অতএব তদবস্থায় জীবের যে নিত্যসঙ্গ, তাহা বাঞ্ছনীয়। মায়াবদ্ধাবস্থায় জীবের যে সঙ্গ হয়, তাহা দূষিত। সেই দূষিত অবিজ্ঞানসঙ্গ অর্থাৎ অভক্তসংসর্গ, যোগিং-সংসর্গ, সংস্কারাসক্তি ও দ্রব্যাসক্তি—সমস্তই জীবের মঙ্গলের প্রতিকূল। চিংসঙ্গমাত্রই জীবের স্বজাতীয়-সঙ্গ এবং অচিংসঙ্গই জীবের বিজাতীয়-সঙ্গ। বিজাতীয়-সঙ্গ হইতে মুক্ত হওয়াই জীবের মুক্তি। এখন আমরা বিজাতীয় বিষয় বিচার করিতেছি।

প্রথমেই অভক্ত-সঙ্গের বিচার। অভক্ত কে? যাহারা ভগবানের অঙ্গুগত নহেন, তাঁহারাষ্ট অভক্ত। জ্ঞানবাদী পুরুষ কখনই ভগবানের অঙ্গুগত নহেন। তিনি মনে করেন যে, আমিও জ্ঞানবলে ভগবানের সমান হইব। জ্ঞানই সর্বোত্তম বস্তু। জ্ঞানকে যে লাভ করে, তাঁহাকে আর ভগবান্ অধীন করিয়া রাখিতে পারেন না। জ্ঞানবলেই ভগবানের ব্রহ্মতা; এবং জ্ঞানবলে আমিও ব্রহ্ম হইব। অতএব জ্ঞানবাদীর সমস্ত চেষ্টাই—

ভগবান্ হইতে স্বাধীন হওয়া। জ্ঞানে যে সায়ুজ্যমুক্তি হয়, তাহাতে আর জীবের উপর ভগবানের বিক্রম থাকে না। এই ত' ব্রহ্মজ্ঞানীদের চেষ্টা। আত্মজ্ঞানী ও প্রাকৃতজ্ঞানিগণও ভগবানের কৃপা অপেক্ষা করেন না। তাঁহারা জ্ঞান ও মুক্তিবলে সমুদয় লাভ করিতে চেষ্টা করেন। ঈশ-প্রসাদের জন্য তাঁহারা বিশেষ যত্ন করেন না। সুতরাং জ্ঞানিমাত্রেই অভক্ত। যদিও কোন জ্ঞানী সাধনকালে ভক্তিকে স্বীকার করেন, তথাপি তিনি সিদ্ধিকালে ভক্তিকে বিসর্জন দেন। তাঁহার সমস্ত কার্যোচ্চ নিত্য-ভক্তি বা ঈশানুগতোব কোনপ্রকার লক্ষণ দেখা যায় না। যাঁহারা জ্ঞানী বলিয়া একটি সম্প্রদায় গঠন করেন, তাঁহাদের সকলেরই এই লক্ষণ। তাঁহারা প্রকৃত-জ্ঞানের আভাসমাত্র লাভ করেন। সেই প্রকৃত-জ্ঞান শুদ্ধ-ভক্তির অবস্থানশূন্যমাত্র। তাহা কেবল ভগবৎপ্রসাদে শুদ্ধভক্তগণই লাভ করিয়া থাকেন, যথা শ্রীচরিতামৃত সনাতনের প্রণি প্রভুর উপদেশ,—

জ্ঞানী জীবনুরু দশা পাইয়ু করি' মানে।

বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে।

অতএব যাঁহারা জ্ঞানবাদে আসক্ত তাঁহাদিগকে অভক্ত মধ্যে গণনা করা হইয়াছে। 'মুক্তি' বলিয়া যে একটি সাধনফল আছে, তাহাও তাঁহাদের সাধনের চরম উদ্দেশ্য। ভগবৎসেবার দ্বারা ভগবৎপ্রসাদ লাভ তাঁহাদের জীবনের তাৎপর্য্য হয় না। কর্ম্মবাদী পুরুষগণও ভক্ত নহেন। অতএব তাঁহারাও অভক্ত। কৃষ্ণপ্রসাদ-লাভের জন্ত যদি কেহ কর্ম্ম করেন তবে সে-কর্ম্মের নাম 'ভক্তি'। যে-কর্ম্ম প্রাকৃত ফল বা বহির্নিগুণজ্ঞান দান করে, সে-কর্ম্ম ভগবদ্বিষ্য। কর্ম্মিগণ কেবল কৃষ্ণপ্রসাদ অনুসন্ধান করেন না। যদিও কৃষ্ণকে সম্মান করেন, তথাপি তাঁহাদের মূল-তাৎপর্য্য এই যে, কোনপ্রকার প্রাকৃত সুখ লাভ করা। স্বার্থপর-কর্ম্মকেই 'বশ্য' বলে। অতএব কর্ম্মি-ব্যক্তিকে অভক্ত বলা যায়। যোগিগণ কোন স্থলে জ্ঞানের ফল কৈশলা যোক এবং কোন স্থলে কর্ম্মের ফল বিভূতি (ঐশ্বর্য্য) অনুসন্ধান করিয়া বেড়ান। তাহাতে তাঁহাদিগকে অভক্তই বলা যায়। বহুদেব-পূজকগণের অনন্য-শরণাপত্তি না থাকায় তাঁহাদিগকেও অভক্ত বলা যায়। যাঁহারা কেবল শুদ্ধ ন্যায়াদি-বিচারে আসক্ত, তাঁহারাও ভগবদ্বিষ্য। 'যাঁহারা' একপ সিদ্ধান্ত করেন যে, ভগবান্ একটি কাল্পনিক তত্ত্বমাত্র, তাঁহাদের ত' কথাই নাই, তাঁহারাও অভক্তমধ্যে গণ্য। এই সকল অভক্তদিগের সংসর্গ অতি অল্পকালের মধ্যে বুদ্ধিনাশ হয় এবং তাঁহাদের

সমান প্রবৃত্তি আসিয়া হৃদয়ে আসন গ্রহণ করে। যদি কাহারও শুদ্ধভক্তি পাইতে বাসনা থাকে, তাহা হইলে তিনি বিশেষ সতর্কতার সহিত অভক্ত-সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন।

দ্বিতীয়তঃ যোষিং-সংসর্গ। যোষিং-সংসর্গেও বড় অনিষ্টকর। সনাতনের প্রতি প্রভুর উপদেশ এই,—

অসংসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার।

জীমদৌ—এক অশাধু, কৃষ্ণাভক্ত—আর।

গৃহস্থ ও গৃহত্যাগি-ভেদে বৈষ্ণব দুইপ্রকার। যাহারা গৃহত্যাগী, তাহাদের পক্ষে জীমাত্রই অসম্ভাবণীয়। অন্যরাং ‘যোষিংসঙ্গ ত্যাগ’ বলিলে তাহাদের পক্ষে জীলোকের সহিত কথোপকথনও নিষেধ হইয়াছে। যথা প্রভু-বাক্য,—

ক্ষুদ্র জীব-সব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া।

ইন্দ্রিয় চরাগ্রা বুলে প্রকৃতি সন্তাষিয়া।

বৈষ্ণবী ত্রী সম্বন্ধে,—

পূর্ববৎ কৈল প্রভু সবার মিলন।

জী সব দূর হইতে কৈল প্রভু দরশন।

গৃহস্থ-বৈষ্ণব-সম্বন্ধে এইরূপ বিধি,—গৃহস্থ ব্যক্তি পরস্ত্রী বা বেস্ত্রী সংসর্গ করিবেন না। নিজ বিবাহিতা জীর সহিত ধর্মশাস্ত্রানুমোদিত সংসর্গ ব্যতীত অন্যপ্রকার সংসর্গ করিবেন না। জৈবভাব একেবারে পরিত্যাগ করিবেন। স্মার্তব্যক্তিগণ সম্বন্ধে এইরূপ শাস্ত্রোপদেশ,—

ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।

তয়া হি সহিতং সর্বান পুরুষাণান্ সমশ্রুতে।

গৃহস্থ ব্যক্তির গৃহিণী আবশ্যিক। সেই গৃহিণীর সহিত একযোগে একমনে সমস্ত পুরুষার্থ সাধন করিবেন। সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে পুরুষার্থ চারি প্রকার অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। বর্ণাশ্রম-সম্বন্ধীয় শাস্ত্রে যাহাকে বিধি বলিয়াছেন, তাহাই ধর্ম। শাস্ত্রে যাহা নিষিদ্ধ বলিয়া উক্ত আছে, তাহা করার নাম—অধর্ম; সেই সমস্ত বিনিপালন ও নিষেধ-পরিত্যাগের কার্য্যসমূহ গৃহস্থ ব্যক্তি স্বীয় গৃহিণীর সহিত বা সাহায্যে সাধন করিবেন। ধর্ম্মাচারের দ্বারা যে লাভ হয়, তাহার নাম—অর্থ। গৃহের দ্রব্য, পুত্র-কন্যা, গো-পশু ইত্যাদি সমস্ত অর্থভোগের দ্রব্য ‘কাম’। ধর্ম্ম,

অর্থ ও কাম—এই তিনটিকে ত্রিবর্গ বলে। কর্মক্ষেত্রে ভ্রাম্যমান মায়াবন্ধ-
জীবের এই ত্রিবর্গ-সাধনই জীবন। গৃহিণীর সহিত একমনে ঐ ত্রিবর্গ-
সাধন করাই স্মার্ত গৃহস্থের কর্তব্য। গৃহস্থ ব্রাহ্মদীন স্ত্রীর সহিত একমনে
ত্রিবর্গ সাধন করিবেন। তীর্থযাত্রাদি-কার্যে গৃহিণী সঙ্গিনী থাকিতে পারেন।
জীবের যে পর্য্যন্ত পরমার্থ-চেষ্টা না হয়, সে পর্য্যন্ত ত্রিবর্গ-চেষ্টা বাতীত
ধর্মজীবনের অন্য উপায় কি? মোক্ষই জীবের চতুর্থ পুরুষার্থ। মোক্ষ
হই প্রকার অর্থাৎ অত্যন্ত-দুঃখ-নিবৃত্তি ও চিৎসুখপ্রাপ্তি। শুদ্ধজ্ঞান বা
মায়াবাদ যাহাদের ধর্মজীবনকে নিয়মিত করে, তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত-
দুঃখ-নিবৃত্তিই চরম উদ্দেশ্য। বিশুদ্ধজ্ঞান যাহাদের হৃদয়ে স্থান পায়,
তাহারা চরমে চিৎসুখকে অন্বেষণ করেন। অত্যন্ত-দুঃখ-নিবৃত্তিতে আবদ্ধ
থাকেন না। বৈষ্ণব গৃহী হউন বা গৃহত্যাগী হউন, তিনি চিৎসুখের
অভিলাষী। গৃহস্থবৈষ্ণব সর্বদাই চিৎসুখকে লক্ষ্য করিয়া স্বীয় গৃহিণীর
সহিত একযোগে সকল কার্য্য করেন। সকল কার্য্য করিয়াও তিনি স্তৈর্য
হন না। এক্রপ জীবনে তাহার যৌষিৎসংসর্গ হইতে পারে না। অবৈধ
স্তুতিসংগ এবং বৈধ-স্তুতিসংগে অপারমার্শিক স্তৈর্যভাব তিনি একেবারে
পরিত্যাগ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে সূতগোষামী সংক্ষেপে বৈষ্ণব-
গৃহস্থের নিয়মটিকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; যথা,—

ধর্মস্য হ্যাপবর্গস্ত নার্থোর্থোপেক্ষতে ।
নার্থস্ত ধর্মোক্তাস্তস্য কামলাভায় হি স্মৃতঃ ॥
কামস্ত নেদ্রিয়পীতিলাভো ভীবেত যাবতা ।
ভীঃস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্মভিঃ ॥
অতঃ পুংভির্হিতশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ ।
সহুষ্ঠিতস্ত ধর্মস্ত সংসিকির্হরিতোষণন্ ॥
তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্ততাং পতিঃ ।
শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ ধ্যায়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা ॥

তাৎপর্য্য এই যে, বিংশতি-কর্মশাস্ত্রে ত্রিবর্গধর্মের প্রাধান্যরূপে উপদেশ।
করণীয় ধর্মগণ কর্মাদিকারীর যাহাতে ভাল হয়, তজ্জন্য বিংশতি-ধর্ম-
শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন। কর্মগণের তাহাতে অধিকার।

তাবৎ কর্মণি কুর্বাণীত ন নিকির্ভেত যাবতা ।

মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥

এই ভগবদাক্ষের উদ্দিষ্ট কৰ্ম্মাধিকারীর পক্ষে ত্রিবর্গই ধৰ্ম্ম। নির্বেদ লাভ করিয়া বাঁহাদের জ্ঞানাদিকার হইয়াছে, তাঁহাদের পক্ষে ত্রৈবর্গিক কৰ্ম্মাধিকার থাকে না। তাঁহারা তাহা ত্যাগ করিয়া শুদ্ধজ্ঞানগত সন্ন্যাসের অধিকারী হন। বহুচন্দ্রাজিত মুকুতিবলে ভগবৎকৃপা লাভ করতঃ বাঁহাদের ভগবৎকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনে শ্রদ্ধা হয়, তাঁহাদেরও কৰ্ম্মাধিকার থাকে না। তাঁহারাও বৈষ্ণব। তন্মধ্যে বাঁহারা গৃহস্থ, তাঁহারা আপবর্গ্য-ধৰ্ম্মাশ্রয়ে যে অর্থ লাভ করেন এবং সেই অর্থ-ভোগ-বিষয়ে যে কাম প্রাপ্ত হন, সে সমস্তই ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশ্যে হয় না, কিন্তু চিৎস্বরূপ জীবের ভক্ত্যনুকূল পবিত্র জীবনযাত্রার সহিত তত্ত্বজিজ্ঞাসার সহকারী হয়। এই-স্থলে কৰ্ম্ম ও পরমার্থের ভেদ লক্ষিত হইবে। অতএব গৃহস্থবৈষ্ণব জীবন-যাত্রার কণ্ঠ বর্ণাশ্রম-বিভাগের দ্বারা স্বীয় গৃহিণীর সহযোগে ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ ভগবৎপ্রসাদ-লাভের উদ্দেশ্যে গৃহস্থজীবনে সাধন করিবেন। যখন তাঁহার গৃহ তৎসাধনে প্রতিকূল হইবে, তখন তাহাতে বিরাগ জন্মিলে গৃহত্যাগ করিবেন। সুতরাং গৃহস্থ-বৈষ্ণবের পক্ষে উত্তমরূপে অহঙ্কিত ত্রিবর্গ-ধৰ্ম্মলক্ষণ-ক্রিয়া তাঁহার নির্মূল চরিত্র গঠন করে। সেই চরিত্রের সহিত তিনি অনন্তশরণ হইয়া ভগবানের নিত্য নাম-রূপ-গুণ-লীলা শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি করিবেন।— এইরূপ অহরহঃ গৃহিণীর সহযোগে পরমার্থ সাধন করিবেন। গৃহিণী ও তদনুগতা অন্যান্য স্ত্রীলোকের অর্থাৎ ভগিনী কন্যা প্রভৃতির সাহায্যে তিনি পৰ্ব্বদা পরমার্থ চেষ্টা করিবেন। ইহাতে কোন প্রকার অবৈব আচরণ না থাকায় যোষিৎসঙ্গ হইবে না। অতএব গৃহস্থ, কি গৃহত্যাগী—সকল প্রকার সাধকের পক্ষেই যোষিৎসঙ্গ একেবারে পরিত্যাগ করা উচিত। ভক্তগণ বিশেষ যত্নসহকারে সংসর্গরূপ সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন।

এখন আসক্তিরূপ সঙ্গের বিচার করা যাউক। সংস্কারাসক্তি ও জড়-দ্রব্যাসক্তি-ভেদে আসক্তি দুই প্রকার। প্রথমে সংস্কারাসক্তির বিষয় আলোচনা করি। প্রাক্তন-আধুনিক-ভেদে সংস্কার দুই প্রকার। জীব যাব্যবদ্ধ হইয়া অনাদিকাল হইতে যে-সকল কৰ্ম্ম করিয়াছেন এবং যে-সকল জ্ঞান-চেষ্টা করিয়াছেন, সেই সমুদয় কৰ্ম্ম ও জ্ঞানের ফলে জীবের লিঙ্গশরীরগত যে সংস্কার জন্মিয়াছে, তাহাই প্রাক্তন সংস্কার। সেই সংস্কারকে ‘স্বভাব’ বলা যায়। যৎ শ্রীশ্রীভাঃ,—

ন কর্তৃত্বং ন কর্ত্ত্বাণি লোকস্য সৃষ্টি প্রভুঃ ।

ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ততে ॥

অনাদিপ্রবৃত্তা প্রধানাবাসনা অত্র স্বভাবশব্দেনোক্তা । প্রাধানিক
দেহাদিমান্ জীবঃ কারয়তি কর্ত্তা চেতি ন বিবিক্তস্য তত্ত্বমিতি ভাষ্যকারঃ
(শ্রীবলদেবঃ) ॥ পুনশ্চ,—

স্বভাবজেন কোন্তেষু নিবদ্ধঃ শ্বেন কর্মণা ।

কর্ত্ত্বং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যন্তবশোহপি তৎ ॥

জ্ঞানসংস্কার-বন্ধন-সম্বন্ধে শ্রীগীতা বসিয়াছেন,—

তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্ ।

সুখসঙ্গেন বদ্ধাতি জ্ঞানসংজ্ঞেন চানঘ ॥

তত্র ভাষ্যকারঃ—জ্ঞানহং সুখহমিতি অভিমানন্তেন পুরুষং নিবধ্বাতি ।

এই প্রকার স্বভাবজনিত কর্ম-জ্ঞানোদ্ভূত সংস্কার-প্রসূত আসক্তি হইতে
মানবদিগের কর্মসঙ্গ ও জ্ঞানসঙ্গ উদয় হয় । পূর্বোক্ত শ্লোকে মায়াবাদী-
দিগের পক্ষে যে জ্ঞান-বন্ধন, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে । কর্মসঙ্গীদিগের
কথা এইরূপে উক্ত আছে,—

ন বুদ্ধিভেদং জ্ঞনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্ ।

যোষয়েৎ সর্বকর্্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ । (ক্রমশঃ)

প্রশ্ন

১। গৃহী-বৈষ্ণবদিগের বিবাহক্রিয়া কিভাবে ও কি-প্রণালীতে সম্পন্ন
হওয়া উচিত ? আমাদের দেশপ্রচলিত বিবাহ গৃহী-বৈষ্ণবগণের পক্ষে
শাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থা কিনা ?

২। গৃহী-বৈষ্ণবদিগের শ্রাদ্ধাদি-ক্রিয়া কিভাবে ও কি-প্রণালীতে
সম্পন্ন করিতে হইবে ? ব্রহ্মোৎসর্গ শ্রাদ্ধ করণীয় কিনা ? মহাপ্রসাদ দ্বারা
শ্রাদ্ধ ব্রাহ্মণেতর বৈষ্ণবগণের পক্ষে করণীয় কিনা ?

৩। মহাপুরু নিপাতে মালা তিলক রাখা এবং সন্ধ্যা-বন্দনাদি করা
যায় কিনা ?

৪। শ্রীশ্রীএকাদশী-ব্রতদিনে আত্ম একোদিষ্ট শ্রাদ্ধ ও বৎসরান্তে
একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে কর্ত্তব্য কি ?

৫। অন্য দেবদেবীর পূজা কি-প্রণালীতে গৃহী-বৈষ্ণবগণের করণীয় ?

উত্তর

১। বিবাহাদি কার্য্য দশবিধ সংস্কারের অন্ততম। গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ এই সমস্ত কার্য্য বৈষ্ণবস্মৃতি-অনুসারেই করিয়া থাকেন। শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী তদীয় সংক্রিয়াসার-দীপিকার বলিয়াছেন,—“তত্রাপি শাল-গ্রামস্থ শ্রীমন্নারায়ণপূজনে বিবাহাদি সৰ্ব্বকৰ্ম্মণি নামাপরাধ-সেবাপরাধ-ভয়াৎ গণেশাদি পঞ্চদেবান্ আদিত্যাদি নবগ্রহান্ ইন্দ্রাদি-লোকপালান গোৰ্যাদি-মাতৃগণাদীনি চ ন পূজয়েৎ কিন্তু বৈকুণ্ঠাদীন্ পূজয়েৎ॥” অর্থাৎ শালগ্রামস্থ নারায়ণপূজা দ্বারাই বিবাহাদি সকল কৰ্ম্মে অপর দেবতার পূজা সিদ্ধ হয়; যেহেতু, নামাপরাধ ও সেবাপরাধ-ভয়ে গণেশাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি-নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি-লোকপালসমূহ, গৌরী প্রভৃতি মাতৃগণের পূজা করিবেন না, কিন্তু বৈষ্ণবদিগকে পূজা করিবেন। বিবাহাদিতে নামদীক্ষা আত্মাদি করা উচিত নহে।

২। আত্ম-তর্পণাদি কার্য্যও একমাত্র বিষ্ণু ও বৈষ্ণবপূজাই বিহিত হইয়াছে। এতৎপ্রসঙ্গে অধিক জানিতে ইচ্ছা করিলে শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী কৃত শ্রীহরিতত্ত্ববিলাস ৯ম বিলাস ও সংক্রিয়াসার-দীপিকা ২৫শ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

বৈষ্ণবকে পারমার্থিক-ব্রাহ্মণের তেলি, মালি প্রভৃতি বুদ্ধি করিলে বৈষ্ণবে জ্ঞাতিবুদ্ধিজনিত প্রবল বৈষ্ণবাপরাধে অনন্ত কালের জন্য নরক গমন করিতে হয়। যথা পদ্মপুরাণে—

অর্চো বিষ্ণো শিলাদীর্গকৃষ্ণ নরমতিবৈষ্ণবে জ্ঞাতিবুদ্ধিযন্ত নারকী সঃ।

মহাপ্রসাদ দ্বারা আত্মাদি ব্যবস্থা সৰ্ব্বগৃহস্থবৈষ্ণবের জন্যই সাস্তুত-শাস্ত্রে ব্যবস্থিত হইয়াছে। বৃষোৎসর্গ প্রভৃতি কর্ম্মভাণ্ডীয় মহাবস্ত্রে চিত্র আঁসক হইলে ভক্তিবৃদ্ধি শুরু হইয়া পড়ে; অতএব এই সকল কার্য্য ভক্তির প্রতিকূল জ্ঞানে পরিত্যাগ করা উচিত। এতৎপ্রসঙ্গে ভাঃ ৫।১৪ অধ্যায় আলোচ্য।

৩। গুরু, পরমগুরু, পরাংপরগুরু এই সকল কথার প্রয়োগই বৈষ্ণব-শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। “মহাগুরু নিপাত” প্রভৃতি বাক্য গুরুদেবে মর্ত্তাজীববুদ্ধিবিশিষ্ট অদৈব-সমাজে প্রচলিত থাকিতে পারে, কিন্তু শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণ ঐরূপ বাক্য কখনও ব্যবহার করেন না।

প্রাকৃতবুদ্ধিসম্পন্ন কর্মজড় স্মার্তগণ বাহ্যিকশুদ্ধিবিচার অপ্রাকৃত বস্তুর উপরও আনিতে গিয়া মহা-অপরাধে পতিত হন। শ্রীভুলসী প্রভৃতি প্রাকৃত বস্তু নহেন। মালাতিলক গুরুদাস-বৈষ্ণবগণের বিষ্ণুতে সমর্পিত অঙ্গে সর্বদা বিচার করিয়া কাষ্ঠবুদ্ধি করেন, অথবা শ্রীহরির মন্দিরস্বরূপ ছাদশ তিলককে বাঁহারা অস্ত্রবুদ্ধি করেন, তাঁহারা বৈষ্ণব-সদৃশের নিকট উপনীত হন নাই, আনিতে হইবে।

কর্মজড় স্মার্তগণের সন্ধ্যাবন্দনাদি নৈমিত্তিক কর্মবিধেব, কিন্তু শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণের সন্ধ্যাবন্দনাদি প্রাকৃত কর্মের অন্তর্গত নহে—উহা বৈধী ভক্তি। সুতরাং উহাতে কর্মজড় স্মার্তগণের ন্যায় অশৌচাদি কালাকালের অপেক্ষা নাই। বিশেষতঃ বৈষ্ণবের অশৌচ অর্থাৎ স্থূললিঙ্গদেহে আত্মবুদ্ধিজন্মিত শোক নাই।

৪। একাদশীর দিন শ্রাদ্ধদিবস উপস্থিত হইলে বৈষ্ণবগণ তৎপর দিবস বিষ্ণু ও বৈষ্ণব-পূজা করিয়া তদীয় নির্মালা দ্বারা পিতৃলোকের সম্ভর্পণ করিয়া থাকেন।

৫। বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুর পরমপদেরই নিতা আরাধনা করিয়া থাকেন। “ওঁ তদ্বিক্রোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।” বিষ্ণুই পরমতত্ত্ব—ইহাই নিখিল বেদবেদান্তাদি শাস্ত্র তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন। সুতরাং বিষ্ণুর পূজাদ্বারাই নিখিল দেবদেবী, পিতৃপিতামহের, মনুষ্যের, স্থাবর জঙ্গমের তৃপ্তি হয়। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

যথা তরোমূলনিষেচনেন তৃণান্তি তৎকৃত্তভূজোপশাখা।

প্রানোগহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্গাইনমচূতেজা ॥

বৃক্ষের মূলদেশে জলসেচন করিলে যেক্রপ উহার সমস্ত অঙ্গেরই তৃপ্তি সাধন হয়, পৃথক্ভাবে আর পাতায় পাতায়, শাখায় শাখায় জল দিতে হয় না, প্রাণে আহার প্রদান করিলে যেমন সমস্ত ইন্দ্রিয় সতেজ থাকে, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকাতে পৃথক্ভাবে আহার প্রদান করিতে হয় না, সেইরূপ অচূত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পূজা দ্বারাই সকলের তৃপ্তি হয়।

তবে বাঁহারা অশ্রদ্ধা দেবদেবীর পূজা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা দেবদেবীগণকে বিষ্ণুর দাসদাসীজ্ঞানে, বিষ্ণুর মণাপ্রদান নির্মালা দ্বারা পূজা করিতে পারেন। কিন্তু যদি ঐ সকল দেবদেবীতে স্বতন্ত্র ঈশ্বর বুদ্ধি হয়, তবে নামাশ্রয় হেতু শুদ্ধভক্তি হইতে বিচ্যুত হইতে হইবে। পঞ্চো-

পাসক, কৃষ্ণজড় স্মার্ত বা চিজ্জডনমতবাদিগণ যে অন্যান্য দেবদেবীর কল্পিত উপাসনা করেন, তাহা মাহাবাদ-হলাহল ও শ্রীগীতার “যেহপ্যানু-দেবতাভক্তাঃ”—এই বাক্যানুসারে ‘জর্জব’। তাহারা ঐরূপ উপাসনাকালে কখনও ভগবৎপ্রেম লাভ করিতে পারেন না। অন্য দেবদেবীর নিকট বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণভক্তি-বর ব্যতীত অন্য কোন কামনা করিবেন না।

যথা—সংক্রিয়াসার-লীপিকা ৩২শ সংখ্যায়—অমৃতদেবার্চনে মহান্ দোষঃ।
তথাহি শ্রীনারদীয়পুরাণে যথ—

ব্রাহ্মণোহপি ধূনিজ্জলানী দেবমন্ত্ৰেণ পূজয়েৎ।

মোহেন কুরুতে বস্ত সন্তুষ্টিশালতাং ব্রজেৎ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস ৯ম বিলাস, ৮৮ সংখ্যাহত পাণ্ডবচনে—

“বিস্কোনিবেদিতান্নেন যুক্তব্যং দেবতাস্তবম্।

পিতৃভাশ্চাপি তদ্রোয়ং তদানন্তান কল্পতে ॥”

অরুণোদয়বিদ্যা

[সাময়িকী]

আগামী ১৩৮৭ বাং ২১শে আশ্বিন, একাদশী তিথিতে কোন পঞ্জিকায় অরুণোদয়বিদ্যাত্বাৎ কোথাও বা শুধু গোষ্ঠামী-মতে পরাহে এই ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। বিচারে দেখা যায় ৫১১ মিঃ সূর্যোদয় হইলে তাহা হইতে ৪ দণ্ড বা ১১৩৬ মিঃ পূর্বেই অরুণোদয়ের সময়। সেগতে রাঃ ৩১৩৫ মিঃ সময়ে অরুণোদয় হয় এবং দশমী রাঃ ৩১২৪ মিঃ পর্যন্ত আছে প্রায় অর্ধ দণ্ড বা ১১১০ মিঃ পূর্বেই ছেড়ে যাচ্ছে। দৃকসিদ্ধ মতে রাঃ ১১২৮ মিঃ কালেই ছেড়ে যাচ্ছে। তাহা হইলে বাস্তবিক পক্ষে উহা অর্ধরাত্র-বিদ্যাই বলা যায়—অরুণোদয়বিদ্যা নয়। ঐ সনেরই ২২শে ভাদ্র ৫১২৩ মিঃ সূর্যোদয় ধরেই রাঃ ৩১৪৭ মিঃ সময়েই অরুণোদয় ধরা আছে। ২৭শে মাঘও সেরূপ রাঃ ৪১৪০ মিঃ অরুণোদয় বলা আছে। পূর্ণচন্দ্র পঞ্জিকায় আছে পঞ্জিকোক্ত সময়ের সঙ্গে কলিকাতার জন্য কোনও যোগ-বিয়োগ সংস্কার করিতে হইবে না। পি, এম, বাক্চীতেও কলিকাতা অক্ষরেই সূর্যোদয় ও তিথিমান মাত্র দেওয়া হইয়াছে—উল্লেখ আছে। এমতাবস্থায় উহাকে অর্ধরাত্র-বিদ্যা হাড়া। অরুণোদয়বিদ্যা বলার কোন যুক্তি খুঁড়িয়া

পাইতেছি না। (কেহ কেহ কলিকাতার স্থানীয় সময় জানিতে হইলে স্বর্যোদয়ের সঙ্গে ২৪ মিঃ যোগ করিতে হইবে ভ্রমে বিদ্বাকে সমর্থন করেন, যেহেতু ২৪ মিঃ পূর্বেই স্বর্যোদয় হইবে। কিন্তু তাহা হইলে ষ্ট্যান্ডার্ড টাইমের তিথিমানও স্থানীয় ঘড়ির-মতে অতুষ্ণ হইতে বাধ্য। আরও বক্তব্য তাহা হইলেও শুধুমাত্র একটীর জন্তই এব্যবস্থা হইতে পারে না। পারদ, ত্র্যাহস্পর্শ, স্বর্যোদয়বিদ্যা, বারবেলা, বিতাহাদিফলেও সেক্ষণই করিতে হয়। তাহা হইলে সমস্ত ত্রুত-ব্যবস্থাই ওলট-পালট করিতে হয়। অথচ সব পঞ্জিকায়ই বলা আছে, সমস্ত ব্যবস্থাই পঞ্জিকোক্ত সময়ে বর্তমানে কলিকাতার প্রচলিত-ষ্ট্যান্ডার্ড টাইমের ঘড়ির যথাসময়েই হইবে। এসব কথা স্বধীগণ স্থিরচিত্তে বিচার করিয়া দেখুন)।

অর্ধরাত্রি-বিদ্যা সম্বন্ধে—“কপালবেধ ইত্যাহ্বরাচার্য্যঃ যে হরিপ্রিয়াঃ। নতন্যমতং যস্মাৎ ত্রিযামা ঋত্বিকচ্যতে।” এই হরিভক্তি-বিলাসের বচনানুসারে তাহা ব্যাসের সম্মত না হওয়ায় আমাদের ত্যাজ্যই। ইহার টীকায়ও “এবং ত্রিযামারা রাতের্মধ্যে একাদশ্যাঃ প্রবেশ এব নাস্তি। যতো দশম্যা এব সারাত্রি……অতোইরুণোদয়ে একাদশী সদ্ভাবেন তৎসম্পূর্ণতা প্রতিপাদনাং তত্রৈব দশমানুবৃত্তৌ বেধঃ কল্প্যতে ইত্যর্থঃ……অনুথা রাত্রি প্রথমস্তাগেহপি নিয়মাতাবাং বেধঃ স্যাৎ” —এরূপ কথাই বলা আছে।

শ্রীকঙ্কাজুর্ন-সংবাদে যে ছায়াদি নববেধ ধরা হইয়াছে তন্মধ্যে পঞ্চ পঞ্চাশে অধিক বেধ, ষড়ধিকে মধ্যবেধ ইত্যাদি সম্বন্ধে টীকায়—“ইত্যা-দীনিচ বচনানিস্তত এব নিরস্তানি। অর্ধরাত্রি পক্ষস্তাপি নিরসনাং বিশেষ-তশ্চ প্রাচীনৈর্মহন্তিরভিঞ্জৈরসং গৃহীতত্বাত্তানুমুলান্যেব জ্ঞেয়ানি।” অর্থাৎ এমন বেধ অর্ধরাত্র্যবেধ নিরসনেই নিরস্ত হইল—এসব বচন অভিজ্ঞ প্রাচীন মহৎগণ ধরেণ নাই, স্মরণ্যং তাহা অমূলকই।

“উদয়াৎ প্রাক্ চতস্রধটিকা অরুণোদয়” —আবার “ত্রিযামাং রজনীং প্রাহস্ত্যাক্তাশ্চতুষ্টিং” এই বিচারেও ৪দণ্ড বা ১৩৬ মিঃ অধিককাল অরুণোদয় বলা যায় না। তার পূর্বের বেধ অর্ধরাত্রি বেধভিন্ন হইতে পারে না। “অরুণোদয়বেধঃ স্যাৎ সাদিগ্ধ ঘটিকারয়ং” —ইহার ব্যাখ্যায় “তত্র প্রাচীনেষটিকার্দ্রে দশমী সদ্ভাবে বেধঃ” অর্থাৎ স্বর্যোদয়ের পূর্বে ৩০ দণ্ড পর্যন্ত একাদশী থাকিলে পূর্ববর্তি অর্ধদণ্ডে দশমী আছে স্মরণ্যং বেধ হইল। তার পূর্বেও বেধ ধরিলে অর্ধরাত্রি বেধও ধরিতে হয়। “দ্বয়ো-

সিদ্ধতোঃ শ্রুত্বাদ্বাদশীং সমুপ স্বধেৎ” *বেধবাক্য বিরোধেন সন্দেহোজায়তে
যদা” এসব বিচারস্থলেও “দ্বাদশী দশমীযুক্তা যত্রশাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিতা” শ্লোকে
যুক্তা অর্থাৎ সংযুক্তা তার লক্ষণও “উদয়াৎ প্রাঙ্ মুহূর্ত্তেন ব্যাপিন্যেকাদশী
যদা” তাহাই বর্জন করিতে হইবে। অরুণোদয় বেধ মানিলে তার পূর্বেই
সন্দিগ্ধা বর্জন বিহিত আছে। কাজেই এখানে বেধবাক্য বিরোধ কিছুই
দেখা যায় না অথচ পরাহে বিধি এসব পঞ্জিকায় কি করে দেওয়া হইল
জানিলে আমাদের ভ্রম দূর হইবে। পঞ্জিকা অফিসে পত্র দেওয়াতেও
উত্তর পাই নাই। গ্রীষ্মক বর্ষজিৎ কুণ্ডু মহাশয়ের মাধ্যমে পূর্ণচন্দ্র পঞ্জিকার
গন্ধ হইতে যে-পত্র পাওয়া গিয়াছে তাহা আমারই সমর্থনে পাইয়াছি।
পাঠকবর্গের অবগতির জন্ত এতৎসহ সন্নিবিষ্ট করা হইল।

—শ্রীমত্তেজচন্দ্র পঞ্চভীর্থ, বি. এ. (অনাসর্গ)
প্রাক্তন অধ্যক্ষ, রাজকীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়,
নবদ্বীপ (নদীয়া)।

[পত্রোত্তর]

পূর্ণচন্দ্র ডাইরেটরী পঞ্জিকা

শ্রীরণজিৎকৃষ্ণ কুণ্ডু মহাশয় সমীপেষু—

শ্রদ্ধেয় রণজিৎবাবু!

আপনার পত্র পেয়ে খুবই আনন্দ পেলাম। কারণ আপনার
অনুসন্ধিৎসু বক্তব্য পড়িলাম। উহা ঠিকই ধরিয়াছেন। পঞ্জিকার বৃহৎ
কার্যে ২১টী ক্রটি থাকিতে পারে, মুদ্রাকর-প্রমাদ বশতঃ এক্রপ হইয়াছে।
২০শে শ্রাবণ দশমী তারি ৩২৪ পর্য্যন্ত, সামান্য ১১ মিনিটের জন্য অরুণোদয়-
বিদ্যা হ্রস্ব নাই তবে কপালবেধ হইয়াছে, নিম্বার্ক-মতে পরাহে হইবে। আপনার
হিসাব ঠিকই আছে। অরুণোদয়বিদ্যা হইলে গোস্বামী-মতে পরাহে এবং
কপালবেধ হইলে নিম্বার্ক-মতে পরাহে, ইহা ব্যতীত কোন কারণ নাই।
২১শে শ্রাবণ নিম্বার্ক-মতে পরাহে হইবে। অর্থাৎ ২২শে শ্রাবণ নিম্বার্ক-
মতে একাদশীর উপবাস হইবে। আপনার পত্রের জন্ত ধন্যবাদ। ভবিষ্যতে
এবিধে কড়া দৃষ্টি রাখিব। নমস্কার জানিবেন। ইতি—ইং ২৪/৩/৮০

শ্রীনারায়ণচন্দ্র স্তুতিজ্যোতির্বিদ্যারদ,

ফ. আর. এ. এস. লণ্ডন; গণক।

শ্রীনবদীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব

নিত্যলীলাপ্রসিষ্ট ঐ শিষ্যপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের পুনঃ প্রাপ্তিত শ্রীধাম নবদীপ-পরিক্রমা পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদিণ্ডি-
স্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের অধ্যক্ষতায় এই বৎসরও নবদীপস্থ
শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয়-মঠে যথারীতি অমুষ্ঠিত হইয়াছে।

রসসিদ্ধান্ত সংস্কৃত আচার্য্যকুল-ভিলক শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ যেক্রমে
পরম কারুনিক শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আত্মগতো তাঁহার অমুগামী হইয়া
শ্রীগৌরধাম-পরিক্রমণ করিয়াছিলেন, সেই ধারা স্মরণপূর্বক শ্রীল জীব
গোস্বামিপাদের পদাঙ্কানুসরণে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর জুবন-
মঙ্গলময়ী শুভবিভীকৃতিথিকে উপলক্ষ্য করিয়া সমিতির সেবকবৃন্দ
সপ্তাহাধিক-কালব্যাপী নবধাভক্তির পীঠস্থান শ্রীনবদীপধাম-পরিক্রমা ও ভক্তি-
যাজ্ঞনোদেশে এই মণ্ডলী অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

উক্ত মহোৎসব বিগত ১২ই ফাল্গুন (ইং ২৫।২।৮০) সোমবার হইতে
আরম্ভ হইয়া ১৮ই ফাল্গুন (ইং ২।৩.৮০) রবিবার পর্য্যন্ত বিশেষ আড়ম্বরের
সহিত সমাপ্তি হইয়াছে। এই বৎসরও অন্যান্য বৎসরের তুলনায় যাত্রী-
সংখ্যা অধিকমাত্রায় সমবেত হইয়াছেন।

সমাগত ভক্তবৃন্দকে স্বাগত জানাইবার জন্য ও শ্রীধাম-পরিক্রমার সঙ্কল্প
গ্রহণ-উদ্দেশ্যে মঠস্থ অবিচ্ছিন্নরূপ কীর্ত্তন-সদনে ১১ই ফাল্গুন সন্ধ্যারাত্রি-
কাল্পে এক মহতী সভার আয়োজন হয়। এই সভায় গৌরহিত্য করেন
সমিতির আচার্য্যপাদ শ্রীল ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ। সমিতির সাধারণ
সম্পাদক ত্রিদিণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ পরিক্রমার
প্রয়োজনীয়তা ও মানব-জীবনে ইহার অবদান-বৈশিষ্ট্য দার্শনিক-দৃষ্টিভঙ্গী
লইয়া ব্যাখ্যা করেন। সমিতির সহঃ সভাপতি ত্রিদিণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-
বেদান্ত নারায়ণ মহারাজ গৌড়ীয়-ধারায় ভজ্ঞন-রহস্য সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ
ভাষণ প্রদান করেন। সভাপতির ভাষণে শ্রীল আচার্য্যদেব সনাতন হিন্দু-
সমাজে বর্ত্তমানে যে অবিলম্বে তীব্রতা দেখা দিয়াছে—তাহা অপনোদনের
জন্য প্রচুর ধর্ম্মীয় সমাবেশ হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। সমাজ-জীবনকে
নিবন্ধে ও শান্তির আবাসস্থল গড়িতে হইলে যথার্থ ধর্ম্মীয়-ধারাকে

রূপায়ণ করিতে না পারিলে ইহ ও পরকাল—কোন স্থানেই সুখদায়ক বা আনন্দস্থল হইবে না। আত্মাস্তিক মঙ্গলাধিগণ অভিন্ন ব্রজজ্ঞানে শ্রীগৌর-ভূমি পরিক্রমণপূর্বক বিভিন্ন স্থানের মহিমা শ্রবণ-কীর্তন করিয়া যাহাতে ব্রজভাবের উদ্দীপনা হয় তজ্জন্মই গুরুবৈষ্ণবগণ শ্রীধাম-পরিক্রমার প্রবর্তন ও বাবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তাই এই পরিক্রমার জন্য আমাদের হার্দিক প্রচেষ্টা।

তৎপর দিবস হইতে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির ভক্তবৃন্দের বিপুল উদ্দীপনায় ১২ই ফাল্গুন (ইং ২৫।২।৮০) সোমবার হইতে ১৬ই ফাল্গুন (ইং ২৯।২।৮০) শুক্রবার পর্যন্ত যথাক্রমে শ্রীগৌড়মদ্বীপ (কীর্তনাখ্য), শ্রীমধ্যদ্বীপ (শ্রবণাখ্য), শ্রীকোলদ্বীপ (পাদ-সেবনাখ্য), শ্রীজতুদ্বীপ (অর্চনাখ্য), শ্রীজহুদ্বীপ (বন্দনাখ্য), শ্রীমোদক্ৰমদ্বীপ (দাস্যনাখ্য), শ্রীকুন্দদ্বীপ (সখ্যাখ্য), শ্রীসীমন্তদ্বীপ (শ্রবণাখ্য) ও শ্রীঅন্তদ্বীপ (শাস্ত্রনিবেদনাখ্য) প্রভৃতি নবদ্বীপাত্মক শ্রীগৌরধাম-পরিক্রমা সমাপ্ত হয়। উক্ত পরিক্রমাগুলি পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তকিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তকিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তকিবেদান্ত উর্ধ্বমন্তী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তকিবেদান্ত পর্যটক মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তকিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তকিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ প্রভৃতি সন্ন্যাসিব্রহ্ম ভাষণ-প্রদানাদি দ্বারা বিভিন্ন স্থান-মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন। একটি বিশেষ বেদনার্থ যে, শ্রীল আচার্য্য মহারাজ এই পরিক্রমা-কালীন শারিরীক অসুস্থতার জন্ত বিভিন্ন দ্বীপে ভ্রমণাদি করিতে পারেন নাই। তবে মঠে মাঝে মাঝে ভাষণ প্রদান করিতেন।

১৭ই ফাল্গুন (ইং ১।৩।৮০) শনিবার দিন শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে ব্রাহ্মমূর্ত্তে যথারীতি আরাত্রিক সম্পন্ন হইলে প্রাতঃকাল হইতেই শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠাষণ আরম্ভ হয়। সম্পূর্ণ দিবসই শ্রীগৌরলীলা পাঠ ও সঙ্কায় তদীয় আবির্ভাব উপলক্ষে বিশেষ অর্চনাদি অন্তে অহঙ্কল্পের ব্যবস্থা হয়।

উক্ত দিবসে সঙ্কায় মহন্তী সত্তার শ্রীমম্বহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষার বিষয় বিশ্লেষণ করিতে গিয়া পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তকিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ শ্রীরায় রামানন্দ-সংবাদ-প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক এক মনোজ্ঞ ও দার্শনিক দিগ্‌দর্শন প্রদর্শন করান।

১৮ই ফাল্গুন (ইং ২৪/৩/৮০) রবিবার সকাল ৬টা হইতে রাত্রি ১২টা পর্যন্ত আগত সকলকেই সমিতি হইতে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। উক্ত কয়েক দিবসে প্রায় ১৫ লক্ষাধিক ভক্ত তথা জনসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। এই মহতী অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে শুধু মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয় নাই—পরন্তু ছৎকর্ণরসাধন পরিতৃপ্ত করণে শ্রীহরিকথামৃত প্রচুর পরিমাণে বিতরণিত হইয়াছে—যাহা জীবের আত্যাত্মিক মঙ্গল করিতে সমর্থ।

— শ্রীসচ্চিদানন্দদাস ব্রজচারী

শ্রী শ্রীবাসপূজা-মহোৎসবে কৃপাবঞ্চিত অধর্মের নিবেদন

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে।

শ্রীশ্রীমন্ত্ৰিক্রিজ্ঞান-কেশব ইতি-নামিনে।

নারায়ণঃ নমস্কৃত্য নরৈকৈব নরোত্তমম্।

দেবীং সুরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীংরেৎ।

আজ শুক্লা মাঘী কৃষ্ণা-তৃতীয়া তিথিতে পরমারাধ্যতম অম্বদীয় গুরুপাদ-পদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিন্দ ও বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমন্ত্ৰিক্রিজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের আশ্রিত্য-তিনিধিবাসরে শ্রীশ্রীবাসপূজার আয়োজন করা হইয়াছে। এই শুভাবির্ভাব তিথিপূজা উপলক্ষে ভক্তগণ নানাবিধ পূজোপচার সঙ্গে করিয়া মনের আনন্দে নানাদেশ ও নানাপ্রান্ত হইতে আমিয়া উৎসবে যোগদান করিয়াছেন। আর কৃপাবঞ্চিত, পতিত, পামর, নরাদম, ঘৃণা কাজাল আমিও এই স্তম্বেষা তিথিবরাতে করুণাময়, পতিতপাবন পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুপাদপদ্মে কৃপাভিক্ষার-বুলি লইয়া প্রণত হইয়াছি।

হে করুণাময় শ্রীগুরুপাদপদ্ম! দীক্ষাকালে ভক্তগণ আত্মসমর্পণ করিয়া আপনার অর্হেতু নী কৃপালাভ করত বন্যাতিথ্য হইয়াছিলেন। আর স্বস্থকামী, অত্যাভিলাষী আমি আত্মনিবেদন করিতে পারি নাই বলিয়াই কৃষ্ণবহিন্যুৎ হইরা ক্রম্বী, জ্ঞানী-যোগীর পথকেই সর্বপ্রশেষ্ট মনে করিয়া বঞ্চিত হইয়াছি।

হে অশোক-অভয়-অমৃতধার শ্রীগুরুপাদপদ্ম ! আমি লোক-দেখান শ্রীগুরু-গৌরাজের পাদ-পদ্ম ভজিবার জন্য তিলক-মালা ধারণ করিয়া স্বকৰ্ম সাধনের চলে আপনার নিকট শ্রীহরিনাম-দীক্ষা গ্রহণ করিয়া-ছিলাম। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রীতিমূল্য সেবা করিবার-অচ্ছিন্নায় মঠ-মন্দিরে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিবার বাসনায় গুরু-বৈষ্ণবের আদেশ-নির্দেশ কপটতার সহিত পালন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। মাধুকে বঞ্চনা করিতে যাইয়া আমি ক্রমশঃ নিজেই বঞ্চিত হইয়াছি। হে গুরু-পাদপদ্ম ! আমি এমন পামর ও নবাবম যে আমার ভক্তির যে-সমস্ত বেশ ছিল ও বর্তমানে আছে, তাহা শুধু লোকবঞ্চনা ও প্রতিষ্ঠাশা লাভের ভূমিকা ছাড়া আর কিছুই নহে। আমি ইহকাল ও পরকাল দুইকালই নষ্ট করিয়া বসিয়া আছি।

হে কৃষ্ণাকর্ষিণী গুরুপাদপদ্ম ! কৃষ্ণপাদ-পদ্ম সেবাকর্মণের পরিবর্তে হৃদয় দেবদেবীর মায়াকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া লবুর রূপাভিকারী লবুর আকর্ষণের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছি। সেইহেতু, আমি আপনার বিশুদ্ধ সেবকবৃন্দের এবং অশ্রদ্ধা আশ্রিতজনের ঘৃণাই হইয়া সর্বপ্রকার সেবালভ হইতে বঞ্চিত হইয়া অতি দস্তুর সংসার-সিদ্ধিতে পড়িয়া নানাবিধ দুঃখআলায় নিমগ্ন হইয়া হাবুডুব খাটতেছি।

হে পতিতপাবন গুরুপাদপদ্ম ! আপনি পতিতকে উদ্ধার করিবার জন্যই জগতে শুভাবির্ভাব-তিথি প্রকট করিয়াছেন। আপনি রূপাপূর্বক এজগতে আগমন করিয়া হরি-বিমুখ-পতিত দুর্গত-জীবগণকে কৃষ্ণসেবা লাভের পরম সুযোগ প্রদান করিয়াছেন।

হে অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন শিকাদাতা গুরুপাদপদ্ম ! শ্রীকৃষ্ণ শক্তিমান আর আপনি কৃষ্ণের আকর্ষিণী-শক্তি। আপনি আকর্ষণ করিয়া সকলকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করেন।

“শ্রীবিগ্রহাধম-মিত্য-নানা-শৃঙ্গার-তনুন্দিরঃমার্জনাদৌ।

বুভুক্ষ্য ভক্তাংশ্চ নিযুক্তোহপি সন্দে গুরোঃ শ্রীচরণাবিন্দম্॥

শক্তিমান ভগবান্ হইতে শক্তি শ্রীগুরুদেবকে বাদ দিলে নিঃশক্তিক হইয়া পড়েন। সর্বশক্তিমান কৃষ্ণকে নিঃশক্তিক করিলে তাঁহার সেবায় জীবের কি মঙ্গল হইবে? হে গুরুপাদপদ্ম ! আপনি কৃষ্ণপ্রেম-ধনে ধনী কৃষ্ণ-আপনার প্রেম-বশ্ৰা। আপনি কৃষ্ণময়। আপনার সর্বত্র কৃষ্ণ দর্শন। মহাজন গাহিয়াছেন,—

কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার,
তোমার শক্তি আছে।
আমি ত' কাঙাল, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি,
ধাই তব পাছে পাছে ॥

হে ব্যাসাভিন্ন গুরুপাদ-পদ্ম! আমি আজনিবেদনে অসমর্থ বলিয়াই আপনার আবির্ভাব-দিবসই পূজার দিন বা বাসপূজা মনে করিয়াছি। বৎসরান্তে একদিন আপনার পাদপদ্মে পূজার অবসর পাওয়া যায়। সেইহেতু আপনারই প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সৈবকবৃন্দ মায়াবদ্ধজীব আশাদিগকে কৃপা করিয়া মাঘী কৃষ্ণা তৃতীয়া-তিথিতে আপনার শুভাবির্ভাব-তিথিপূজা বা শ্রীশ্রীব্যাসপূজার আয়োজন করিয়া আহব্রণ-লিপি পাঠাইয়াছেন। কিন্তু ইহাই কি সত্য? শুধু কি আজই বাসপূজার দিন? প্রকৃততে তাহা নহে। গুরুপূজা নিত্য। তাঁহার সৈবকও নিত্য। গুরুপূজা নিত্যকাল—অবিরাম গতিভে চলিবে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ হয় নাই বলিয়াই আমরা মনে করি, ইহা বৎসরে মাত্র একদিন। অথচ এই পূজা নিত্য। গুরুর সহিত শিষ্যের সঙ্ঘর্ষ নিত্য। গুরুর মনোভীষ্ট পূরণ শিষ্যের নিত্য ও সর্বক্ষণ কর্তব্য। সুতরাং বিশ্রুত সৈবক এক মুহূর্ত্ত সেবা বাদ দিয়া কি করিয়া থাকিবেন? সর্বক্ষণ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা বাতীত আর অন্য কোনও কৃত্য নাই। হরিভক্তির মূলেই শ্রীগুরুপাদপদ্ম। গুরুকে বাদ দিয়া হরিভজন হয় না।

তজ্জন্ম বলিতেছি, যখন আমার এইরূপ সংশ্লিষ্টা জাগে নাই, তখন আমি বঞ্চিত হতভাগ্য নহিত আর কি? আমার শ্রীশ্রীগুরুপূজা বা শ্রীশ্রীব্যাসপূজা একটা লোক দেখান আড়ম্বর ছাড়া আর কি?

তাই বঞ্চিত আমি আজ এই শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের পূজার দিনে কৃপার কাঙাল হইয়া সর্বক্ষণ শ্রীগুরুপূজার পূজারী কৃপায় বৈষ্ণবগণের নিকট কৃপা ভিক্ষা করিতেছি। তাঁহারা আমাকে শোধন করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের স্বরূপটি আমার হৃদয়ে প্রতিফলিত করুন—যাহাতে আমি আমার কীটদষ্ট জীবন-পুষ্পটি অর্পণ করিতে পারি।

আদানান্তঃ দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।

শ্রীআচার্য্য-পদান্তোজধূলিঃ স্তাং জন্ম-জন্মনি।

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবপদরেণুকাজী—

শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরাধিক্ষেপে ।



অষ্টতুকাপ্রতিহতা যরাহ্মা স্প্রসীদতি ।

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আর-পরসর ।
অধোক্ষজে অষ্টতুকী ভক্তি নিয়মশূন্য ।

অন্য ধর্ম সূচকপে পাজে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি মৈলে পণ্ড সেই শ্রম ।

৩২শ বর্ষ } ১৪ ত্রিবিক্রম, অনিরুদ্ধ, ৪৯৪ গৌরাক
৩১ বৈশাখ, বুধবার, ১৩৮৭; ইং ১৪।৫।১৯৮০ { ৩য় সংখ্যা

সামুদ্রাভিঃ

শ্রীগৌরান্তস্তোত্ররত্নম্

শ্রীরাধিকারূপগুণোন্মিচোরঃ প্রতপ্তকার্ত্তবরকাস্তগৌরঃ ।

বেদান্তবেদান্ত-পুরাণসারঃ জীয়াং স গৌরঃ করুণাবতারঃ ॥১॥

যিনি শ্রীরাধিকার রূপ ও গুণসমূহকে চুরি করিয়াছেন, প্রতপ্ত স্বর্ণের
ন্যায় যাহার উজ্জ্বল বাস্তু, বেদবেদান্ত-পুরাণসার করুণাবতার সেই
শ্রীগৌরসুন্দর জয়যুক্ত হউন ॥১॥

ব্রহ্মেন্দ্ররূপস্তপাদপদ্মঃ ঔদার্য্য-মাধুর্য্যগুণাক্সিসদ্ব্যঃ ।

রোমাঞ্চ-কম্পাশ্রুপ্রমোদভারঃ জীয়াং স গৌরঃ করুণাবতারঃ ॥২॥

যাহার পাদপদ্ম ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও শিব কর্ত্তক স্তুত, যিনি ঔদার্য্য ও
মাধুর্য্যসাগরের আধার, রোমাঞ্চকম্পাশ্রুপুলকান্বিত করুণাবতার সেই
শ্রীগৌরসুন্দর জয়যুক্ত হউন ॥২॥

স্বরূপরূপাদিক-প্রাণনাথঃ গোপাল-গোবিন্দমুকুন্দনাথঃ ।

দগিঅতুজ্জাত্যবহুঃখদারঃ জীয়াং স গৌরঃ করুণাবতারঃ ॥৩॥

যিনি স্বরূপ-রূপ-গোপালভট্ট-গোবিন্দ ও মুকুন্দাদি ভক্তগণের প্রাণনাথ,
দরিদ্র ও দুর্জাতিগণের হৃৎসদৃশকারী করুণাবতার সেই শ্রীগৌরসুন্দর
জয়যুক্ত হউন ॥৩॥

মায়ামতধ্বান্তনিকারহারী বারানসী-আনিসমূহতারী ।

বিভূত্বসম্ভক্তিপ্রসারকারী জীয়াং স গৌরঃ করুণাবতারী ॥৪॥

মায়াবাদস্বরূপ অন্ধকারবিনাশকারী কাশীবাসী সন্ন্যাসিগণের ত্রাণকর্তা,
বিভূত্ব ও নিত্যভক্তির প্রসারকারী করুণাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর জয়যুক্ত
হউন ॥৪॥

শ্রীদিগ্বিজ্যেতৃদ্বিজদর্পহারী শ্রীসার্বভৌমাতিপ্রসাদকারী ।

অষ্টাদশাব্দেদশপুরীবিহারী জীয়াং স গৌরঃ করুণাবতারী ॥৫॥

দিগ্বিজয়ী কেশবকাশ্মীরীর দর্পচূর্ণকারী, শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের প্রতি
সাতিশয় রূপালু, শ্রীশ্রীজগন্নাথ-পুত্রীতে অষ্টাদশবর্ষবিহারকারী করুণাবতার
শ্রীগৌরসুন্দর জয়যুক্ত হউন ॥৫॥

মহোজ্জ্বলপ্রেমরসপ্রদাতা শ্রীনামসর্বোত্তমভক্তিধাতা ।

গোলোকবৃন্দাবন-সদ্বিহারঃ জীয়াং স গৌরঃ করুণাবতারঃ ॥৬॥

উন্নতোজ্জ্বল প্রেমপ্রদাতা, সর্বোত্তম ভক্তি শ্রীনামসকৌর্ভনের বিধাতা,
গোলোক ও বৃন্দাবনে নিত্যবিহারী করুণাবতার শ্রীগৌরহরি জয়যুক্ত
হউন ॥৬॥

সদা হরেকৃষ্ণসুগানমতঃ যোগীন্দ্রমুনীন্দ্রসমাধিবিতঃ ।

দত্তব্রজপ্রেমসুখাসুসারঃ জীয়াং স গৌরঃ করুণাবতারঃ ॥৭॥

যিনি 'হরে কৃষ্ণ' এই নাম-গানে নিরন্তর প্রমত্ত, যিনি যোগী ও মুনি-
শ্রেষ্ঠগণের সমাধিসাগ্রভা সম্প্রতি, অমৃতের সার ব্রজপ্রেম যিনি বিতরণ
করিয়াছেন, সেই করুণাবতার শ্রীগৌরহরি জয়যুক্ত হউন ॥৭॥

কবাটবন্ধোদবপদ্বনেত্রঃ শ্রীসচ্চিদানন্দঘনাসুগাতঃ ।

স্বাক্ষপ্রভানিন্দিতকোটিসারঃ জীয়াং স গৌরঃ করুণাবতারঃ ॥৮॥

বাঁহার বন্ধ কপাটসদৃশ প্রশস্ত, নেত্র নবারবিন্দতুল্য, বাঁহার চিত্ত ও
শ্রীঅক্ষ সচ্চিদানন্দঘন, যিনি স্বীয় অক্ষপ্রভাধারা কোটী কন্দর্পকে হেয়
করিতেছেন, করুণাবতার সেই শ্রীগৌরহরি জয়যুক্ত হউন ॥৮॥

নীলাজি-শুভাংশু-সুধাচকোরঃ রথাগ্রসজ্জীতসুধাবিধুরঃ ।

শ্রীবৈষ্ণবব্রাতলসচ্ছরীরঃ জীয়াং স গৌরঃ করুণাবতরঃ ॥৯॥

যিনি নীলাচলচন্দ্রের কোণস্মার চকোরস্বরূপ, যিনি রথাগ্রে সজ্জীতনামুত লোলুপ, ইহার শ্রীঅঙ্গ বৈষ্ণবচিহ্নদ্বারা পরিশোভিত, করুণাবতার সেই শ্রীগৌরহরি জয়যুক্ত হউন ॥৯॥

ভক্তাবলীগানসরাজহংসঃ সন্ন্যাসিভূদেবকুলাবতংসঃ ।

শ্রীমজ্জগন্নাথশচীকুমারঃ জীয়াং স গৌরঃ করুণাবতরঃ ॥১০॥

যিনি ভক্তগণের চিত্তরূপ সর্বোববেব রাজহংস সদৃশ, যিনি সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণকূলের শিরোভূষণস্বরূপ, শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবীর নন্দন সেই শ্রীগৌরহরি জয়যুক্ত হউন ॥১০॥

গৌরস্তুতিং গায়তি ভক্তিপূর্বং প্রাপ্নোতি সুপ্রেমসুধাং সঃ সর্বম্ ।

ত্রিতাপদাবানল-তৃণমুক্তঃ প্রমোদতে কৃষ্ণপদাজভক্তঃ ॥১১॥

যিনি ভক্তিসহকায়ে শ্রীগৌরস্তুতি গান করেন, তিনি সমগ্র প্রেমামৃত লাভ করেন, ত্রিতাপ-দাবানলতৃণ হইতে মুক্ত হন এবং শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি লাভ করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হন ॥১১॥

বর্ষ-প্রবেশ

বিশ্বপ্রেমিক শ্রীগৌড়ীয় ভেদবুদ্ধিহীন,

স্মৃতরাং সর্বত্র সমাদৃত

শ্রীরাধা-ব্রজবনবিহারীর অভিন্নতরু গোড়ীঘের প্রাণের ঠাকুর শ্রীগৌর-সুন্দরের কৃপায় শুদ্ধভক্তি-ধর্মের মুখপাত্র 'শ্রীগৌড়ীয়' দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিলেন। আর্য্যাবর্তে প্রাকট্যালাভ করিয়া বিদ্বোদ দক্ষিণদেশবাসিগণ হইতে পার্থক্য স্থাপন করিলেও দ্রাবিড়ীয় ভগবন্তরূপের সহিত আর্য্যাবর্ত-বাসী গোড়ীয় অকৃত্রিম সৌহার্দ্যে বদ্ধ। কেবল ভারতবাসী কেন, জম্বু-দ্বীপের সকল মানবগণের একমাত্র উপাস্য ভগবানের মেবকস্বত্রে গোড়ীঘের সহিত জম্বুদ্বীপের অধিবাসিমাত্রের কোন বৈষম্য নাই। জম্বুদ্বীপবাসী কেন শক, প্লক, শাল্মলী প্রভৃতি সপ্তদ্বীপবাসিগণের সহিত গোড়ীঘের কোন

ভেদবুদ্ধি নাই। বিশ্বজনীন প্রেম, ঐহাদের ভিতরে বাহিরে দেদীপ্যমান, তাঁহারা যে দীপেরই অধিবাসী শুটন না কেন, তাঁহাদের সহিত গৌড়ীয় সমসূত্রে গ্রথিত। শ্রীগৌরসুন্দরের উদার প্রেমধর্ম্য সকল ভগতে চতুর্দশ ভুবনে বিরজা ও ব্রহ্মলোকে সর্বত্রই একবাক্যে সমাদৃত।

প্রেমধর্মের বিরোধহেতু ভেদ ও অশান্তির সৃষ্টি

যেখানে সকল সদগুণনিলায় প্রেমধর্মের সহিত বিরোধ বাসনা, সেখানেই অশান্তি, অপ্রসন্নতা ও ভেদনীতি প্রবল। অদ্বয়জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানদানের প্রেম-সেবা-তাৎপর্য্যাপন্ন হইয়া নিখিল জীবকুলকে শ্রীগৌড়ীয়ের উপাস্ত ভগবান্ গৌরসুন্দর একত্র মিলিত হইয়া ভগবৎ-প্রীতির সাহচর্য্য করিতে বুদ্ধিযোগ প্রদান করিয়াছেন। যেখানে প্রেমময়তম শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত মতভেদ করিয়া তাঁহার সহিত প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্নভাবে বিরোধ কল্পিত হইয়াছে, সেইখানেই প্রেমের অভাব।

অন্ততেরই গৌড়ীয় পত্রিকার সহিত মতভেদ

বঙ্গজীবকুল গৌড়ীয়ের সহিত প্রীতিরহিত হইয়াই নানাপ্রকার মত-বাদের অন্তরালে প্রেমকে ভোগ বলিয়া গ্রহণ করায় প্রীতির স্বরূপ-দর্শনে বঞ্চিত হইয়াছেন। শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের উৎসাহসূচক বাক্য ঐহাের কর্ণকুণ্ডরে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তিনিই জানেন যে, নরনাত্তেরই ভগবানের সেবা-ধর্মে যোগ্যতা আছে। ঐহাদের ভক্তিধর্ম্মে যোগ্যতা, তাঁহারা ই গৌড়ীয়ের অনুসরণ করিতে পারেন, আর ঐহারা ভগবৎ-প্রীতিরহিত তাঁহারা গৌড়ীয়ের সহিত মতভেদ করিয়া আপনাদিগের গৌড়ীয়ের আচরণ প্রচার করিয়া হরিপ্রেম হইতে বঞ্চিত হন ও প্রেমকে পশুপক্ষীর বা নখর মানবদম্পতির কামের সাক্ষ্য এক করিয়া ফেলেন।

গৌড়ীয়ের সঙ্গপ্রভাবেই প্রেম নবনবায়মান

নিত্যপ্রেমা নখর বস্ত্রসমূহের মধ্যে কখনই আবদ্ধ নহে। এই লোকাভীত নিত্যপ্রেমা নরনাত্তের হৃদয়ে অগুরু অবস্থায় লুক্কায়িত থাকিলেও প্রেমিক গৌড়ীয়ের সঙ্গপ্রভাবে কেবলমাত্র উন্মোচিত হয় না, অধিকন্তু অতুচ্ছ নব-নবায়মান হইয়া দৃষ্টান্ত হইতে থাকে। প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত রাজ্যে প্রেমের অক্ষুট প্রকাশ লক্ষিত হইলেও তাহা আবৃত হইয়া নখর ধর্ম্মান্তর্গত ধারণায় পর্য্যবাসিত হয়।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার প্রত্যেক প্রবন্ধই

সেবা-ধর্মের প্রকাশক

বিগত বর্ষে গৌড়ীষের নবানুদিত প্রকাশের মধ্যে অপ্রাকৃত বস্তুর উদ্দেশ্যে সেবা-ধর্মই প্রত্যেক প্রবন্ধে ও প্রস্তাবে কীর্ণিত হইয়াছে। যদিও কেহ কেহ নিজ নিজ যোগাতার অভাবে সমাক্রমে গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়াছেন, তথাপি তাহাদেও কৌতূহলোদ্দীপক বিজ্ঞান-রহস্য তাঁহাদিগকে নানাবিধ প্রেমরাজ্যে অগ্রসর করাইতে কৃষ্টিত হয় নাই।

শ্রীপত্রিকার অধোক্ষজ-সেবা অক্ষজ জ্ঞান-বহির্ভূত

অক্ষজ্ঞানের তাড়নায় অনেকে অধোক্ষজ-সেবার স্বরূপ-নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়াছেন এবং অধোক্ষজ-সেবাকে অক্ষজ্ঞানের জ্যেষ্ঠ বস্তুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি তাহাদের অবসাগরের প্রবল তরঙ্গ, ষাণ-প্রস্থান ফেলিবার জন্য নিম্নে হইবার পরিবর্তে উর্দ্ধদেশেই উত্তোলন করিয়াছে। যাহারা অক্ষজ্ঞানের বিডম্বনায় প্রতারিত, তাহাদিগকে আমরা মানুন্ময় নিবেদন করিতেছি যে, অধোক্ষজ বস্তু কিছু ভোগের বস্তু নহে। অধোক্ষজ-বস্তু-বিজ্ঞান কিছু ইন্দ্রিয়-তর্পণের কথা নহে যে, ইন্দ্রিয় জ্ঞানের সাহায্যে অপর বিষয় যোমাংসার দ্বারা নিজ নিজ অভিমত প্রকাশ করিয়া সত্য বস্তুকে বিকৃত করা যায়। গৌড়ীয়ে প্রকাশিত বিষয়সমূহ আমাদের পারম্পর্যাগত, সুতরাং প্রাকৃত বস্তুবিষয়ক জ্ঞান ভ্রমে তাহাকে পরিবর্তিত বা পরিবর্তিত করিবার প্রয়াস তাহাদিগের পক্ষে শোভনীয় নহে।

শ্রীগৌড়ীয় পাঠের অনুরোধ

বিগত বর্ষে গৌড়ীয়ে প্রধানতঃ শুদ্ধ বর্ণাশ্রমধর্ম সম্বন্ধে অধোক্ষজ-সেবা সম্বন্ধে, অক্ষজ ভোগি-সম্প্রদায়ের কার্যপ্রণালীর অকর্ণ্যতা দর্শিত হইয়াছে। যেহেতু বিষয়টী অভিনব, তজ্জন্ম আমরা ধীর পাঠকগণকে সর্বতোভাবে গৌড়ীয়ে প্রকাশিত চিত্রিকা শ্রবণ করিতে অনুরোধ করি। অবহিত চিত্তে প্রক্কার সহিত শ্রবণ করিলেই তাহারা জীবাত্মার নিত্যধর্ম ভক্তির স্বরূপ বুঝিতে সমর্থ হইবেন।

নির্মলংসর হরিকথাই হৃদয়ের অন্ধকার-নাশিকা

প্রবর্তমান বর্ষে আমরা বিগত বর্ষের আলোচিত বিষয়গুলি নানাপ্রকারে সুধী পাঠকবর্গের নিকট উপস্থাপিত করিতে ইচ্ছা করি। সকলের সহিত

যথাযোগ্য প্রারম্ভিক সম্ভাষণপূর্বক শ্রীমন্মঠাশ্রম-প্রচারিত হিতকর উপদেশা-
লী প্রচার কার্যই যেন আমাদের সম্মল হয়। নির্যাতনের সাধুদিগের কথা
আমাদিগের অসাধুচিত্তে আপাতবিষময় বোধ হইলেও উহাই পরিণামে
হিতকর হইবে জানিয়া আমরা অসাধুসঙ্গ-বর্জন এবং সাধুসঙ্গে আসক্তি-
প্রভাবে হৃদয়ের অন্তঃস্থলজিত অন্ধকারাশি বিদূরিত করিতে যেন প্ররত
হই। শাস্ত্র এবং গুরুবর্গই এষ্ট কার্যে আমাদের একমাত্র অবলম্বন।

আরোহবাদের মতবাদ কল্পিত ওদ্ভ্রমপূর্ণ

আরোহপথের পথিকের চেষ্টাসমূহ আমরা গ্রহণ করিতে না পারায়
কেত যেন আমাদের কার্যে বাধা না দেন। আরোহবাদী যে চেষ্টা
প্রদর্শন করেন, তাহাতে সত্য না থাকিতে পারে, কিন্তু সত্যের অবতরণ
বাদ স্বীকার করিলে আরোহবাদের দ্বায় ভ্রমে পতিত হইতে হয় না।
আমাদিগের কোন কথাই নিজের কল্পিত নহে, কিন্তু ঐগুলি নিরন্তর-কুহক
নিত্যসত্য মাত্র, তাহাই বৈষ্ণব ভগতে ভগবানের অভিযুক্তি :

— শ্রীল প্রভুপাদ

পঞ্চ-সংস্কার

পঞ্চ-সংস্কারের মহিমা ও তাহা কি কি ?

শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, পঞ্চ-সংস্কার-প্রাপ্ত ব্যক্তি দ্বিবিধ ভক্তি লাভ
করত ঈশ্বরের নিত্যধামে নিত্যানন্দ লাভ করেন। যথা ;—

অবাপ্তপঞ্চসংস্কারো লক্‌ষ্মদ্বিবিধভক্তিকঃ ।

সাংক্ষাৎকৃত্য হরিং তস্ত দ্ব্যম্নি নিত্যং প্রমোদতে ॥ (সংস্কার দীপিকা)

এই শাস্ত্রোপদেশ শ্রবণমাত্র অদ্বৈতানু জীবগণ পঞ্চসংস্কার শব্দের অর্থ
অনুেষণ করেন। তাহাদের সাহায্যার্থে আমরা পঞ্চসংস্কারের বাকার্থ ও
নিগূঢ় তাৎপর্য লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

পঞ্চসংস্কার কাহাকে বলে, তাহা স্মৃতিশাস্ত্রে এইরূপ কথিত হইয়াছে:—

তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম সন্তো যোগন্ত পঞ্চমঃ ।

অমী তি পঞ্চসংস্কারঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ ॥ (চন্দ্রপুরাণ)

১। তাপ, ২। পুণ্ড্র, ৩। নাম, ৪। সন্তো, ৫। যোগ—এই
পাঁচটিকে পঞ্চসংস্কার বলে। ইহারাই পরম ঐকান্তিকী ভক্তির হেতুস্বরূপ।

তাপ, পুণ্ড্র, নাম, মন্ত্র ও সংস্কার—এই পাঁচটির

কোনটী কি প্রকার ?

পঞ্চসংস্কারের বাক্যার্থ প্রদান করিয়া শ্রদ্ধাবান জীব কোন সাম্প্রদায়িক ঈশ্বর নিকট গমন করত দীক্ষাদান প্রার্থনা করিয়া থাকেন। গুরুদেব কৃপাপূর্বক শিষ্যের আশ্রয় বুঝিয়া তাঁহার অঙ্গ-সংস্কারের জন্য ‘তাপ’ ও ‘পুণ্ড্র’ বিধান করেন। কোন কোন সম্প্রদায়ে শুণ্ড-চক্রাদি দ্বারা তাপের বিধান হয়। শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম হিষ্ণু তন্ত্র লৌহ দ্বারা শিষ্যের শরীরে যথাস্থানে অঙ্কিত করা হয়। উর্দ্ধপুণ্ড্রকেই পুণ্ড্র বলিয়া সকলে স্বীকার করেন। হরিমন্দিরে, হরিপদারুতি প্রভৃতি নানাবিধ উর্দ্ধপুণ্ড্রের ব্যবস্থা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে যে-সম্প্রদায়ে যে-প্রকার পুণ্ড্রের নিয়ম আছে, তাহাই সেই সম্প্রদায়ের স্বীকার্য্য।

নামট তৃতীয় সংস্কার। গুরুদেব কৃপাপূর্বক শ্রদ্ধাবান শিষ্যের কর্ণে হর্দিনাম অর্পণ করেন। সেই নাম শিষ্যের জরহঃ জপ্য হয়। মন্ত্রই চতুর্থ সংস্কার। গুরুদেব কৃপাপূর্বক শ্রিয় শিষ্যকে অষ্টাদশ বর্ণাদি মন্ত্রের মধ্যে কোন মন্ত্র অর্পণ করেন। যাগই পঞ্চম সংস্কার। প্রাপ্ত মন্ত্র-দ্বারা শালগ্রাম-শিলা বা ত্রীমূর্তির তর্চন বিধানের নাম যাগ। এবং পিছ পঞ্চসংস্কার প্রাপ্ত হইয়া শ্রদ্ধাবান জীব ভজনক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হন। ভজন দ্বারা বিশুদ্ধ প্রেমরূপ প্রথম ফলের লাভ হয়।

ভজনের ক্রম ও পঞ্চ-সংস্কারের মূলত্ব

প্রেমলাভের ক্রম নির্ণয় করিলে ইহাট প্রতীত হয় যে, যে-পর্য্যন্ত শ্রদ্ধা হয় নাই, সে-পর্য্যন্ত তৎসম্বন্ধে জীবের কোন যোগ্যতা হয় নাই। শ্রদ্ধা উদ্ভিত হইলেই সাধুসঙ্গ হয়। অঙ্গবস্ত্র সাধুসঙ্গই গুরু-চরণাশ্রয়। গুরু-চরণাশ্রয় হইলেই পঞ্চসংস্কার ও বজ্জনিত ভজন-ক্রিয়া হয়। ভজন হইতে হইতেই জীবের সমস্ত অনর্থ নিবৃত্তি হয়। অনর্থ যত নিবৃত্তি হইতে থাকে, পূর্বলব্ধ শ্রদ্ধা ততই নিষ্ঠারূপে পরিণত হয়। নিষ্ঠা হইতে রুচি, রুচি হইতে আসক্তি, আসক্তি হইতে ভাব ও ভাব হইতে গেম হয়। অতএব গুরু-পদাশ্রয়পূর্বক পঞ্চসংস্কার লাভ করা সমস্ত জীবের কর্তব্য। পঞ্চসংস্কারই সমস্ত ভজন-ক্রিয়ার মূল। সংস্কার ব্যতীত যে ভজন, তাহা স্বাভাবিক হয় না। বরং সময়ে-সময়ে উৎপাত-জনক হইয়া পড়ে।

পঞ্চ-সংস্কার বৈষ্ণবমাত্রেরই অবশ্য গ্রহণীয়

কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন যে, যাহাদের প্রেমলাভ হইয়াছে তাঁহাদের সংস্কারের প্রয়োজন নাই। একরূপ বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রমাত্মক। বদ্ধজীব ভগবদ্ভৈরব ক্রমে এতদূর বৈমুখ্য লাভ করিয়াছে যে, তাহার পূর্ণ সংস্কার না হইলে সে স্বরূপ লাভ করিতে পারে না। স্বরূপ লাভ হইবার আর কি উপায় আছে? একমাত্র সংস্কারই তাহার মুখ্য উপায়। সংস্কার ব্যতীত বিবর্তি কিসের দ্বারা বিগত হইবে? যদি কাহারও বিকৃতি দেখা না যায়, তবে মনে করিতে হইবে যে, পুরুষজন্মে গুরুকৃপাক্রমে তাহার সংস্কার হইয়া গিয়াছে। সেই সংস্কারবশতঃ স্বরূপ লাভ দ্বারা দ্বিসুখ প্রেমোদয় হইয়াছে। অথবা ইহাও মনে করা যাইতে পারে যে, সে ব্যক্তি ভগবানের অবিচলিত্য শক্তিক্রমে ভগবৎ কৃপা দ্বারা অলক্ষিতরূপে সংস্কৃত হইয়াছে। যেকোন বিচারই করা যাউক, সংস্কার কখনই অস্বীকৃত হইবে না। তবে মুক্ত জীবদিগের প্রপঞ্চ-যাত্রা-স্থানে তাঁহাদের সম্বন্ধে সংস্কার নাই; যেহেতু তাঁহারা কখনই বিকৃত হন নাই। বদ্ধ জীবদিগের বিকারই তাহাদের বদ্ধতার হেতু ও স্বরূপ; এতদ্বিবন্ধন সংস্কার ব্যতীত বদ্ধ জীবের মঙ্গল সম্ভব হয় না। যদি কোন পুরুষ পুরুষজন্মের সংস্কার শতঃ ইহজন্মে প্রেমলাভ করিয়া থাকেন, ত্রিবিধ সংস্কারের আবশ্যকতা অস্বীকার করেন না; বরং সাধারণের মঙ্গল জন্য সংস্কার-পদ্ধতি ব্যয় স্বীকারপূর্বক জগতের আদর্শ হইয়া পড়েন।

বৈষ্ণব-ধর্মের সংস্কার-পদ্ধতি অন্যান্য ধর্মের সংস্কার

হইতে নির্মল ও সর্ববিশেষ

সর্বধর্মে সর্বধর্মে সংস্কার-পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয়। যে-ধর্ম যতদূর নির্মল, তাহার সংস্কার-পদ্ধতিও ততদূর নির্মল ও সম্পূর্ণ। সমস্ত ধর্মের সংস্কার-পদ্ধতির বিচার পরিবার অবকাশ অভাবে, আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতেছি যে, আর্ধ্য-ধর্মে যে সংস্কার-পদ্ধতি লক্ষিত হয়, তাহা অন্যান্য ধর্মের সংস্কার-পদ্ধতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, বিশেষতঃ আর্ধ্য-ধর্মের সারভূত বৈষ্ণব-ধর্মের সংস্কার-পদ্ধতি অপেক্ষা নির্মল ও সম্পূর্ণ পদ্ধতি আর নাই।

সংস্কারের ফল-বৈষম্যের কারণ

এস্থলে একরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, বৈষ্ণব-ধর্মের সংস্কার-পদ্ধতি যদি এত উৎকৃষ্ট, তবে তদুপাধীন; বক্তৃতা-ধর্মের মনোও বদ্ধ-বিকার এতদূর কেন দেখা

যায় ? উত্তর এই যে, সংস্কার-পদ্ধতি সর্বোৎকৃষ্ট বটে, কিন্তু সেই পদ্ধতি আশুকাল কেবল নামমাত্র পালিত হইতেছে। পদ্ধতির যে বাক্যার্থ পূর্বে করা হইয়াছে, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া গুরু ও শিষ্য উভয়েরই উন্নতি-দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে। পদ্ধতির যে তাৎপর্য্য, তাহার কোন আলোচনা দেখা যায় না। শিষ্য গুরুর নিকট উপস্থিত হইলেই গুরু তাহাকে পঞ্চ-সংস্কার করিয়া ছাড়িয়া দেন। এরূপ পঞ্চ-সংস্কারের দ্বারা কি ফল হইতে পারে ?

শিষ্যটিকে দেখিতে সুন্দর দেখায়, কিন্তু তাহার ভিতরে কিছুই হয় না। দিব্য শাস্ত্র, চক্র, গদা, পদ্ম, হরিনাম অঙ্গে অঙ্কিত আছে। মুখে হরিনাম উচ্চারিত হইতেছে। কোন সময়ে শালগ্রাম-শিলা বা ত্রীমূর্তিতে মন্ত্ৰোচ্চারণ-পূর্ব্বক অর্চনা হইতেছে। সেই শিষ্য নানাবিধ পাণে আসক্ত। রাজে মাদক-দ্রব্যের বশীভূত হইয়া লাম্পট্য আচরণ করিতেছে। আহা! গুরুদেব তাহার কি উপকার করিলেন ? দীক্ষার পূর্বেই তাহার কি ছিল না, এবং দীক্ষার পরেই বা তাহার কি হইল ; পরিবর্তন লক্ষিত হয় না, বৎ অপকৃষ্টতা বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। পূর্বে সে পাপ-করিয়া আপনাকে দীক্ষার করিত, কিসে এ পাপ দূর হইবে, তাহার কিছুমাত্র চিন্তা করিত। সম্প্রতি গুরুদেবকে আশ্রয় করিয়া তাহার সে-চিন্তা দূর হইয়াছে। সে নিশ্চিন্ত হইয়া পাপাচারণ করিতেছে ! কি দুর্ভাগ্য !!

গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ

এ-প্রকার ভুগতির হেতু কি ? গুরু-শিষ্যের অবৈধ সম্বন্ধই ইহার হেতু। গুরু-শিষ্য সম্বন্ধে শাস্ত্রে এই প্রকার নিদিষ্ট আছে,—শিষ্য যে-কালে সংসারানলে সন্তুষ্ট হইয়া বিচার করিতে করিতে সিদ্ধান্ত করিবে যে, এই সংসারের সহিত আমার সম্বন্ধ অনিত্য আমি ভগবচ্চরণ প্রাপ্তি হইবার জন্য গুরুদেবের চরণাশ্রয় করিব। তখন শিষ্যের শ্রদ্ধা উদয় হইয়াছে বলিতে হইবে। সে গুরুপদাশ্রয়ের যোগ্য বটে। গুরু তাহাকে বৎসরাধিক পরীক্ষা করিবেন।

‘তাপ’-রূপ প্রথম সংস্কারের গুঢ় তাৎপর্য্য

এস্থলে দৃষ্টি করুন—জীবের অল্পতাপকেই তাপ বলে। লব্ধতাপ জীব গুরুদেবের পরীক্ষাসময়ে অধিকতর তাপ প্রাপ্ত হয়। তাপ পূর্ণ হইলে গুরুদেব তাহাকে বিষ্ণুচক্রাদির তাপ-দ্বারা অধ্বিত করেন এবং সেই

অঙ্কন, শরীর থাকা পর্য্যন্ত ধারণ করিবার বিধান করেন। তাৎপর্য—এই সংসার-ক্লেশ-পঙ্খিল হইতে সত্বকে মরণ পর্য্যন্ত বিত্তক রাখিবে। ইহার নাম—তাপ। ইহাই শ্রদ্ধালু জীবের প্রথম সংস্কার। এই তাপ শব্দের নাম ইংরাজী ভাষায়—Repentance, atonement, and permanent impression of the higher sentiment on the soul [অর্থাৎ অনুতাপ, প্রায়শ্চিত্ত এবং আত্মার উপর উচ্চতর ভাবের স্থায়ী ছাপ পড়ার নাম তাপ] তাপ কেবল শারীরিক নয়, কিন্তু শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক। কেবল শরীর আশ্রয় করিয়া তাপের অর্থস্থিতি হয় না। যে-স্থলে তাপের কেবলমাত্র শরীরাত্মীয় লক্ষণ, সে-স্থলে ভগ্নতাই ধর্ম্ম। আজকাল ভগ্নতাই বৈষ্ণব-ধর্ম্মকে পদচ্যুত করিয়াছে। তাপশূন্য জীবন কখনই বৈষ্ণবধর্ম্ম আশ্রয় করিতে পারে না। তাপশূন্য সদা-সর্বদাই জড়ীভূত। তাপশূন্য মন সর্বদাই অমঙ্গলপূর্ণ। অতএব, হে সুধীবর্গ! যত শীঘ্র পার তপ্ত হও! বিলম্বে কার্য্য নাই।

পুণ্ড্র-রূপ দ্বিতীয় সংস্কারের গূঢ় তাৎপর্য্য

যখন শ্রদ্ধাবান শিষ্যকে গুরুদেব সমাক্ষ, তপ্ত হইতে দেখিবেন তখনই তিনি বিপুল কৃপা প্রদর্শনপূর্বক তাহাকে 'পুণ্ড্র দান' করিবেন। উর্দ্ধপুণ্ড্র কি শোভাঙ্কনক। উর্দ্ধপুণ্ড্রের অণ্ড নাম—উর্দ্ধগতি। তপ্ত হইয়া জীব সংসার হইতে উচিত বৈরাগ্য স্বীকার করেন, কিন্তু যে-পর্য্যন্ত উর্দ্ধপুণ্ড্র না গ্রহণ করেন, সে-পর্য্যন্ত তাপের ফল হয় না। এত ক্লেশ! এত বৈরাগ্য! এত স্বস্থ-তাগ! এত রিপু নির্ঘাতনা! এ সমুদয় কেবল পশুশ্রম হয়, যদি তাহার পর কোন উচ্চগতি না স্বীকার করা যায়। হরি-মন্দির অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ বা হরিপাদপদ্ম অর্থাৎ সচ্চিদানন্দের আশ্রয় গ্রহণ করার নাম—জীবের উর্দ্ধগতি। তাহা আত্মায়, মনে ও দেহে প্রকাশিত হইয়া উর্দ্ধপুণ্ড্র হয়। সংসারে বিরক্ত হইয়া পরমেশ্বরে অনুরক্ত হওয়ার নাম—তাপ ও পুণ্ড্র। এই অলঙ্কার দুইটি বন্ধ-জীবের অত্যন্ত আবশ্যক। উর্দ্ধপুণ্ড্রশূন্য শরীর শবতুল্য। দৃষ্টি করিলে অনুতাপ দ্বারা স্নাত হওয়া কর্তব্য। উর্দ্ধপুণ্ড্রশূন্য মন কেবল ক্ষুদ্রবিষয়ে বিচরণ করে, ক্ষুদ্র বিষয়ে আসক্তি করে, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের সমালোচনা করে। হে তপ্ত জীব! বিলম্ব না করিয়া শরীরে, মনে ও আত্মাতে উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ কর ও পরম বৈষ্ণব-ধামের অভিযুক্তি হও। উর্দ্ধপুণ্ড্রশূন্য আত্মার স্বরূপ নিলুপ্ত হইয়া থাকে। অতএব উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ কর।

তৃতীয় সংস্কার—নাম প্রদানের তাৎপর্য

প্রিয় শিষ্যকে তপ্ত ও উষ্ণ-পুণ্ড্র-শোভিত দেখিয়া গুরুদেব পরমানন্দ-সহকারে 'নাম-প্রদান' করেন। নাম অর্থাৎ হরিনাম প্রদান করেন। হরিনাম প্রদান করিয়া জীবের নিম্ন স্বভাবকে জাগরিত করেন। জীবের নিম্ন স্বভাব হরির নিম্ন দাস্য, নাম-রসামৃতে দীপ্ত করিয়া জীবকে পরমপদে নীত করেন। জীব তখন বলেন,—'আমি হরিদাস', আমি মায়া-ভোক্তা নই। কৃষ্ণদাস্ত্রে বৃত্ত হইয়া মায়াতেও নিত্য-কৃষ্ণসম্বন্ধে অবস্থিত। আমি কৃষ্ণদাস, আমি সমস্ত মায়াকে কৃষ্ণদাসী মানিয়া সমস্ত প্রপঞ্চকে কৃষ্ণসম্বন্ধী করিয়া ব্যবহার করিব। অনবরত জীব তখন হরি-নাম-গানে মুগ্ধ থাকেন। নামরূপ ভগবদ্ভস-বিগ্রহকে আশ্রয় করত চিদানন্দ-তত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য করিতে থাকেন। হে সুধীরবৃন্দ! বদনে সর্বদা হরিনাম গান কর, মনে সর্বদা হরিনাম স্মরণ কর, আত্মায় সর্বদা হরিনাম অঙ্কিত কর।

চতুর্থ সংস্কার—মন্ত্রোপদেশের তাৎপর্য

শিষ্যের প্রতি প্রীত হইয়া গুরুদেব জড়গত জীবের পক্ষে হরিনাম-রসপান সুলভ করিবার জন্য মন্ত্রোপদেশ করেন। হরিনামে বিভক্তি-সংযোগপূর্বক 'সম্বন্ধ'-যোজনা দ্বারা নাম-রসের আলোচনা-ভূমিকে বিস্তৃত করেন। 'হরয়ে নমঃ' বলিলে নাম-রসেরই আবাদন জন্য চতুর্থী-বিভক্তি-দ্বারা সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয়। এইরূপ সম্বন্ধদ্বারা উপাসক, উপাস্ত ও উপাসনা-রূপ তত্ত্বত্রয়ের পরস্পর ক্রিয়া সুদৃষ্ট হয়। তাহাতে রসের আবাদন সুলভ হইয়া পড়ে। মন্ত্রপ্রাপ্ত জীব আর আবাদন-স্বখের ইয়ত্তা দেখেন না। যে-সকল ভাগ্যবান ব্যক্তি অষ্টাদশ অক্ষর মন্ত্রের অর্থ বিচার করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, মন্ত্রই ভগবদ্ভসের একমাত্র সংক্ষিপ্ত নিদর্শন। গায়ত্র্যাদি বিচার করিলেও এরূপ সিদ্ধান্ত হইবে। বাহ্যিক মন্ত্র গ্রহণ না করিয়া ভগবদ্ভসের অন্তর প্রকার আলোচনা করেন, তাঁহাদের আলোচনা অনেক শিথিল ও অসংযুক্ত। যে-অংশ সংযুক্ত হইয়া ঈঙ্গিত ফলদান করে, সে-অংশ মন্ত্র-বিশেষ। অতএব মন্ত্র-গ্রহণ সর্ব্বতোভাবে কর্তব্য। মন্ত্র-গ্রহণ জীবের পক্ষে একটি প্রধান সংস্কার। সমস্ত তত্ত্ব অবগত হইয়াও অনেকে উপাসনা-তত্ত্বে স্থির-ভূমি লাভ করেন না। তাহার হেতু এই যে, তাঁহারা উপযুক্ত গুরুর নিকট হইতে তপ্ত, পুণ্ড্রিত, নামাঙ্কিত ও মন্ত্রোপদিষ্ট হয় নাই। সকল বিষয়েই ক্রম ও

পদ্ধতি আছে। ক্রম ও পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া ষাঁহারা উপাসনা করেন, তাঁহাদের উপাসনা কখন কখন উৎপাতের হেতু হইয়া পড়ে; যথা,—

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্র-বিধিঃ বিনা।

আত্মান্তিকী হর্ষেভুক্তিরূপাত্মারৈব কল্পতে ॥ (ব্রহ্মসামল)

অতএব, হে সুধীর ব্যক্তিগণ! তর্কাদি দ্বারা বুদ্ধিকে দূষিত না করিয়া পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেবের নিকট তাপ, পুণ্ড্র, নাম ও মন্ত্র গ্রহণ করুন। তাহাতে কেবল আপনাদের মঙ্গল হইবে এমন নয়, কিন্তু পরম পবিত্রসেতু বন্ধার দ্বারা আপনারা জগজ্জীবের মঙ্গলসাধন করিবেন।

পঞ্চম সংস্কার—‘যোমে’। তাৎপর্য

শিষ্যের প্রতি অধিকতর স্নেহ প্রকাশপূর্বক গুরুদেব তাঁহাকে যাগ-পদ্ধতি শিক্ষা দেন। যাগ-পদ্ধতি ব্যতীত বহুজীবের সম্যক মঙ্গল কোন-ক্রমেই সাধিত হইতে পারে না। তাপ, পুণ্ড্র, নাম ও মন্ত্র লাভ করিয়াও জীবের সহসা জড় সম্বন্ধ দূর হয় না। উপাসনা দ্বারা হরিতোষণ সাধিত হইলে, মরণান্তে জীব প্রপঞ্চ মুক্তি লাভ করে। অতএব মন্ত্রপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষেও মরণ পর্যন্ত অপেক্ষা অবশ্যই থাকে। সেই কালের মধ্যে জড়াসক্তি না থাকিলেও জড়কার্য্য অনবরত সম্ভব। অতএব জড়ের সহিত সম্যক ব্যবহার করিবার উপায়-স্বরূপ যে পদ্ধতি প্রস্তুত হইয়াছে তাহাকে ‘যাগ’ বলি। দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, আশ্রাণ, আশ্বাদন, মনন, বিবেচন ও ক্রিয়া—এই সমুদয় কার্য্যদ্বারা পরমার্থ অনুশীলন করিবার জন্য যে দেবপূজা-পদ্ধতি নির্মিত হইয়াছে, তাহারই নাম—যাগ। শালগ্রাম পূজাতে ঐ সমস্ত ব্যাপার পরমার্থকার্য্যে যোজিত হইয়াছে। শ্রীবিগ্ৰহ সেবা-পদ্ধতিই বৈষ্ণব-যাগ। সংসারে বর্তমান থাকিতে হইবে। সমস্ত কার্য্য না করিলে দেহযাত্রা নির্বাহ হইবে না। অতএব ভক্তিপূর্বক সমস্ত কার্য্য অর্চনবিধি দ্বারা ভগবানে অর্পণ করিয়া সমস্ত জীবন যাপন করা মন্ত্রোপাদিষ্ট-জীবের কর্তব্য কার্য্য। এই যাগবিধি উপদেশ করিয়া ককণাময় গুরুদেব শিষ্যকে সংসার-সমূহ হইতে সম্যক উদ্ধার করেন। যাগই পঞ্চম সংস্কার। যাগশূণ্য পুরুষ হয় জীৱনশূন্য হইবেন, নতুবা বহিষ্কৃত কর্ম্মদ্বারা সংসার ফলকে লাভ করিবেন। অতএব বৈষ্ণব যাগযুক্ত হইয়া সংসারে বর্তমান থাকিবেন। এই যাগ-তন্ত্রের বিশেষ-বিস্তৃতি বৈদীভক্তি বিচারে ‘শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত’ গ্রন্থে [তৃতীয় বৃষ্টি, দ্বিতীয় ধারায়] লক্ষিত হইবে।

কুল-গুরুগণের কুশিক্ষার প্রভাব

পঞ্চ-সংস্কারের বাক্যার্থ ও মূল-তাৎপর্য্য নির্দেশ করিলাম। এস্থলে একটী প্রশ্ন হইতে পারে যে, আপন শিষ্যদিগের প্রতি গুরুদিগের এপ্রকার উপদেশ কেন দেখা যায় না। উত্তর এই যে, কালদোষে গুরুসম্বন্ধে মানবগণের বিচার অত্যন্ত দূষিত হইয়াছে। অসুমান হয়—কুলগুরুর নিকট অথবা যে যে ব্যক্তির উপদেশ গ্রহণ করা হয়, তাহাকে পরমারাধ্য গুরুদেবের আশ্রয় হইতে পারে না।

সদগুরুর লক্ষণ ও তাঁহার আশ্রয় একান্ত কর্তব্য

শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে নিষ্ঠা ও আশ্রয়প্রাপ্ত গুরুদেবের নিকট আত্মার শ্রেয়-জিজ্ঞাস্ত ব্যক্তি গমন করত প্রাপ্তি ঘীকার করিবে। যথা,—

তস্মাদ্ গুরুং প্রাপ্তোক্ত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমমঃ।

শাস্ত্রে পরে চ নিম্নোক্তং ব্রহ্মণ্যুপসমাশ্রয়ম্ ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত)

যে-স্থলে একরূপ প্রাপ্তি হয়, সে-স্থলে ভবসিদ্ধি গোপ্যদ-তুল্য হইয়া পড়ে। যে-স্থলে নাম-মাত্র গুরুবিশেষ অবলম্বিত হয়, সে-স্থলে সমস্তই নিষ্ফল। আজ-কাল সাধারণের পক্ষে সদগুরুর আশ্রয় ঘটে না। কেবল বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি-গণ মংসারানল-তপ্ত হইয়া অনেক যত্নপূর্ব্বক সাধু অন্বেষণ করিতে করিতে সদ-গুরু লাভ করেন। অতএব জীবের পক্ষে সদগুরু অন্বেষণই কর্তব্য। যদি সদগুরু অপ্রাপ্ত হয় তাহাতেও ক্ষতি নাই; যেহেতু ভগবান্ স্বয়ং সদগুরু অন্বেষকের নিকট প্রকাশিত হইয়া তাহাকে উদ্ধার করেন। সদগুরু-লালসা যত প্রবল হয়, ততই মঙ্গল। লালসা-নিবৃত্তির জন্য যে-কোন ব্যক্তিকে গুরু বলিয়া বরণ করা উচিত নয়। অন্বেষণ করিতে করিতে যাহাকে সদগুরু বলিয়া বোধ হইবে, তাহাকে একবৎসর পর্য্যন্ত পরীক্ষা করত শ্রীগুরুদেব বলিয়া স্বীকার করিবেন। পরীক্ষা ব্যতীত যে গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ কেবল অনর্থের হেতু।

পঞ্চ-সংস্কার সম্বন্ধে ঠাকুরের মন্তব্য

পুত্ৰানুপুত্ৰ বিচারপূর্ব্বক ইহাই সিদ্ধান্তিত হয় যে, বদ্ধজীবের পক্ষে প্রকৃত প্রস্তাবে পঞ্চ-সংস্কার না হইলে ঐকান্তিকী ভক্তি কোনক্রমেই সম্ভব হয় না। অতএব পঞ্চ-সংস্কার নিতান্ত আবশ্যিক।

—ভগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

রিক্সাওয়ালা

বারবিশা হ'তে জড়াই যাই রিক্সায় ।

রিক্সাওয়ালা—বড় ছুখে বলিল আমায় ॥

“দাছ! আমি অনেক লোকেরে করি পার ।

পরপারের গতি কি হইবে আমার ? ?

ভবপারে যা'ব—কা'রে করিয়া আশ্রয় ।

তাকে, কেমন করে হইবে পরিচয় ॥

নাহিক সম্বল মোর বিজ্ঞা-ধন-জন ।

রিক্সা চালাইয়া করি জীবন-যাপন ॥”

তাহার ছুঃখ-শ্রবণে করিছু জিজ্ঞাসা ।

কিবা নাম তব ? কোন্ গ্রামে হয় বাস ?

তখন বলিল নাম,—‘নিহার বিশ্বাস’ ।

‘রামপুর’ গ্রামে মোর জীর্ণগৃহে বাস ॥

জানিলাম তোমার সমস্ত বিবরণ ।

শুন এবে—ভবপারে যেমতে গমন ॥

রিক্সায় পার কর পথ ক্রোশ ছ'-চার ।

ভবপারে ‘দেহ-তরি’ উপায় তোমার ॥

এ-তারির কাণ্ডারী হন ‘শ্রীগুরুদেব’ ।

যাঁহার কুপায় লাভে ‘দেব-আদিদেব’ ॥

সেই কৃষ্ণে করে যেবা আত্মসমর্পণ ।

সাধু-গুরু-সান্নিধ্য লাভ হয়ত তখন ॥

শ্রদ্ধা করি কৃষ্ণ-কথা—শ্রবণক্রমে ।

শরণাপন্ন যবে শ্রীগুরুপাদপদ্মে ॥

সৎসম্প্রদায়ী-বিচারে আচারবান ।

মায়ামুক্ত জীবের সেই করেন ভ্রাণ ॥

এ হেন 'গুরুদেবের' করিয়া আশ্রয় ।
 নিরপরাধে কর নাম তাজি সংশয় ॥
 দেব-দেবীপূজা আর বিষয়-বাসনা ।
 জীব-হিংসা কুটি-নাটি মনের কল্লনা ॥
 অনাচার যত ভজনের প্রতিকূল ।
 অনুকূল অনুশীলন ভক্তির মূল ॥
 শাস্ত্র-বিচারে 'ভক্তি' হয় দুই প্রকার ।
 'সাধনভক্তি'-রাগানুগা নাম যাহার ॥
 এবে সর্বেন্দ্রিয়ে কর সদা কৃষ্ণানুখ ।
 সাধনভক্তি-ক্রমে শ্রীকৃষ্ণ-রাগোন্মুখ ॥
 সাধকের হয় যবে রাগের উদয় ।
 সেইকালে সিদ্ধিলাভ হইবে নিশ্চয় ॥
 স্বরূপ সিদ্ধিলাভ হইয়াছে যাহার ।
 সেই ভাগ্যবান হইবেন ভবপার ॥
 অবশেষে শুন.—বলি নিকটে তোমার ।
 ভক্তিপথশ্রীয়ে জীব হয় ভবপার ॥
 নর-জন্মশ্রেষ্ঠ জ্ঞান জগত-ভিতর ।
 কৃষ্ণ-ভজনের যোগ্য নরকলেবর ॥
 মুখ-দুঃখ দুই, দেহের প্রাকৃত ভাব ।
 শরণাগত জনের ঘুচিবে ত্রিতাপ ॥
 হয় কি না হয়—আর তুল্য জন্ম ।
 আজ বা কাল হউক শতান্তে মরণ ॥
 হে ভাই ! কালক্ষয় করোনা অকারণ ।
 যত শীঘ্র পার ভজ শ্রীকৃষ্ণ-চরণ ॥

—শ্রীরমাপতি ভক্তসুহৃৎ

শ্রীকৃষ্ণ কি বস্তু ?

(পূর্ব প্রকাশিত ৩২শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৬০ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীকৃষ্ণের প্রপঞ্চে অবতরণের মুখ্য কারণ

“বৈকুণ্ঠাদিতে যে-যে লীলার প্রচার নাই, তত্তৎ লীলা এই কৃষ্ণাবতারে আমি প্রচার করিব, অধিক কি, এই লীলাতে আমিও স্বয়ং চমকিত হইব। আমার যোগমায়া স্বরূপশক্তি অবিচিন্ত্য প্রভাবক্রমে আমার ইচ্ছায় সচ্চিদানন্দতত্ত্ব, আমার নিত্যপ্রিয়া, সচ্চিদানন্দস্বরূপা গোপীদিগের হৃদয়ে উপপত্তির ভাব সঞ্চার করিবেন। আমিও তখন রসপুষ্টির জন্য তাহা জানিতে পারিব না অর্থাৎ আমার অবিচিন্ত্যশক্তি আমার সঙ্কল্পতাকে গোপন করিয়া তাহাতে একপ্রকার অদ্ভুত রস উৎপন্ন করিবে এবং সেই স্বরূপশক্তি-স্বরূপ হইয়াও গোপীগণ তাহা জানিতে পারিবেন না। আমি ও আমার গোপীগণের অদ্ভুত রূপ-গুণে পরস্পরের মন হরণ করিলে সামান্য ধর্ম-পথ পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ রাগমার্গে আমাদের পরস্পরের মিলন-সুখ উদ্ভিত হইবে; কখনও মিলন, কখনও বিচ্ছেদ দৈব ঘটনার ন্যায় উদ্ভিত হইবে। আমি এই সমস্ত রসের নির্যাস আশ্বাদন করিব এবং ভক্তগণকে প্রসন্ন হইয়া দান করিব। সর্ব ভক্তকে এই রস-দান করিবার প্রক্রিয়া এই যে, আমি ত্রজে যে নির্মূল রাগ প্রকট করিব, তাহা প্রবণ করিয়া ভক্তগণ যাবতীয় আর্খ্য-অনার্যধর্ম পরিত্যাগ-পূর্বক আমাকে রাগমার্গে ভজন করিবেন।” এইরূপ ইচ্ছা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ গোলোকের নরাকৃতি পরব্রহ্মস্বরূপ প্রপঞ্চে প্রকটিত করিয়াছিলেন। এই নিরুপাধিক প্রেম আশ্বাদনের জন্যই শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ।

বিষয়াশ্রয়-বিচার ও আশ্রয় আবলম্বন-বর্ণন

শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র বিষয়, আর সমস্তই তাহার আশ্রিত তত্ত্ব। অলঙ্কার শাস্ত্রে বিভাব, অনুভাব, সান্ত্বিক, ব্যক্তিচারী—এই চতুর্বিধ সামগ্রীর বিষয় উল্লিখিত আছে। ভরত মুনি কাব্য প্রকাশকার বা সাহিত্যদর্পণকার প্রভৃতি যে-সকল ব্যক্তি বিষয়াশ্রয়-বিবেকের কথা জানেন না, তাহা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীল রূপ গোদামী প্রভুর দ্বারা প্রচার করাইয়াছেন। আলম্বন দুই প্রকার,—বিষয়ালম্বন ও আশ্রয়ালম্বন। বিষয়ালম্বন—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ; আশ্রয়ালম্বন—শান্ত, দান্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসভেদে-প্রধানতঃ পঞ্চ প্রকার। ব্রজলীলারূপ চিত্রসংবর্ণনে অনেক সময় শান্তরস

পরিচালিত হয় না বলিয়া অর্থাৎ ভগবৎস্বরূপে যে মমতা—যাহা শুদ্ধারতিকে প্রেমরূপে পুষ্ট করাইয়া থাকে, সেই মমতা-গন্ধহীনতা বা নিরপেক্ষতা শাস্ত্রভাবে অবস্থিত থাকায় শাস্ত্রভাবে অনেক রসের অন্তর্গত করিতে চাহেন না। তথাপি ভ্রজের গো-বেত্র-বিষাণ-বেণু-শৃঙ্গ-যামুনতট-কদম্বক—ইহারা শাস্ত্ররসের আশ্রয়ালম্বনরূপে বিষয় শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। দাস্তরসের আশ্রয়ালম্বন ব্রজা, শকর, ইন্দ্র প্রভৃতি দাসগণ কৃষ্ণ-কুপায় অধিকার প্রাপ্ত হইয়া ‘অধিকৃত দাস’। শরণা, জ্ঞানিচর ও সেবানিষ্ঠ তিন প্রকার আশ্রিত দাসরূপ আশ্রয়ালম্বনের মধ্যে কালিয়, জরাসন্ধ ও বক্র নৃপসকল ‘শরণা আশ্রিত দাস’। শৌনকাদি ঋষি মুক্তি ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া ‘জ্ঞানিচর আশ্রিত দাস’ হইয়াছিলেন। চন্দ্রধ্বজ, হরিহর, বহলাশ্ব, ইক্ষাকু, হতদেব, পুণ্ডরীক প্রভৃতি প্রথমাবধিই ভজনাসক্ত থাকায় ‘সেবানিষ্ঠ আশ্রিত দাস’। উদ্ধব, দাক্ষক, নন্দ, উপানন্দ ও ভদ্র প্রভৃতি ‘পাতিষদ দাস’। সুচন্দ্র, মণ্ডল, শুভ্র, সূতর প্রভৃতি পুরুষ ‘অনুগত দাস’। বক্রক, পত্রক, পত্নী, মধুকর্ষ, মধুব্রত, রসাল, সুবিলাস, প্রেমকন্ধ, মকরম্ভক, আনন্দ, চন্দ্রহাস, পায়োদ, বকুল প্রভৃতি ব্রজস্ব ‘অমুগদাস’। লক্ষ্যরসের আশ্রয়ালম্বনের মধ্যে পুরবাসী ও ব্রজবাসী দুই প্রকার কৃষ্ণ-সখা। অর্জুন, ভীমসেন, দ্রৌপদী, শ্রীদাম ব্রাহ্মণ প্রভৃতি ‘পুরসম্বন্ধি সখা’। ইহাদের মধ্যে অর্জুন শ্রেষ্ঠ। ব্রজবাসী সখাগণ কৃষ্ণের সকল বস্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কেন না, তাঁহারা স্বর্ণকাল কৃষ্ণের সেবা-বিরহ সহ্য করিতে পারেন না। সুভদ্র, মণ্ডলীভদ্র, গোভট, ইন্দ্রভট, বিজয় ও বলভদ্রাদি কৃষ্ণের ‘সুভদ্র-সখা’। দেবপ্রস্থ, কুসুমাপীড়, মণিবন্ধ, করনম প্রভৃতি কৃষ্ণের ‘কেবল-সখা’। শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম, শ্যোককৃষ্ণ প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের ‘প্রিয়সখা’। সুবল, অর্জুন, গন্ধর্ব্ব, বসন্ত প্রভৃতি ‘প্রিয়নর্ষসখা’। বৎসল রসের আশ্রয়ালম্বন কৃষ্ণের গুরুবর্গ প্রসিদ্ধ। ব্রজব্রজেশ্বরী, ব্রজেশ্বর, রোহিণী; ব্রজা যে পুত্র-গণকে হরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের জননীগণ; দেবকী ও দেবকীর সপত্নী-গণ, কুন্তী, বসুদেব, সান্দীপনি মুনি প্রভৃতি বৎসল রসের আশ্রয়ালম্বন। ইহাদের মধ্যে ব্রজেশ্বরী ও নন্দমহারাজ সর্বপ্রধান। মধুর রসের আশ্রয়ালম্বনের মধ্যে স্বকীয় ও পরকীয় বিচার লক্ষিত হয়। কৃষ্ণের পূর্ববিনীতা-গণ—স্বকীয়া এবং ব্রজবিনীতাগণ—প্রায়ই সোটা অনুচাভেদেও পারকীয়া। এই ভগৎ অপ্রাকৃত পরমোপাদেয় চিন্তামের হয় প্রতিফলন। অনর্থময়

ইহ জগতে যে রস যৎপরোনাস্তি হয়, অর্থময় অবিকৃত বিশ্বরূপ চিদ্রামে অর্থাৎ যথায় অনুপাদেয়তার অবকাশ দৃষ্ট হয় না, তথায় সেই রসের অবিকৃত আদর্শ যৎপরোনাস্তি উপাদেয়।

তটস্থ বিচারে অপ্ৰাকৃত পঞ্চরসের তারতম্য

ইহ জগতে যে রস সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিচারিত, অপ্ৰাকৃত চিৎস্বরূপ জগতে সেই রসের আদর্শ সর্ব নিম্নে অবস্থিত। এই প্রতিফলিত জগৎ— জড়বিশেষবহুল; সুতরাং এখানে বাবর্তীয় জড়বিশেষভাব হইতে নিরপেক্ষতা-বিরতি-স্বরূপ শাস্ত্রভাবই শ্রেষ্ঠ; কিন্তু অপ্ৰাকৃত জগতে স্বভাবতঃই নিত্য জড়বিশেষতার চেয়তা না থাকায় সুবিশেষভাবের পূর্ণতার অবিধি-স্বরূপ পারকীয় মধুর রস সর্বশ্রেষ্ঠ। শাস্ত্ররসে নিরপেক্ষতা আছে, মমতা উৎপত্তি হয় না। মমতাই কৃষ্ণপীতির প্রথম অঙ্গুঃ; মমতাহীন শাস্ত্ররস এইজন্ত সর্ব নিম্নে। মমতাস্বক দাস্যরস তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; ইহাতে শাস্ত্ররসের সমস্ত সম্পদই আছে, অথচ তাহা মমতা-সংযুক্ত। এখানে হইতেই মধুর-জ্ঞানের ভূমিকা আরম্ভ হইয়াছে; কৃষ্ণের সহিত প্রভু ও দাস-স্বন্ধ। মমতা-স্বন্ধ না থাকিলে কোন বস্তুর জন্য বিশেষ আসক্ততা থাকে না। আবার দাস্য-রসের মমতা ও সকল সম্পদের সহিত যখন বিশ্রুতভাবরূপ প্রশান অলঙ্কারটি সংযুক্ত হইয়াছে, তখন সখ্যরস দাস্যরস হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া অনুভূত। সখ্যরসে দাস্যরসের সত্ত্বমকণ্টক নাই। সেখানে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতির মাত্রা ও জত্যন্ত রিখুতভাব প্রকাশিত হওয়ায় সখ্যগণ শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধদেশে আরোহণ ও শ্রীকৃষ্ণকে উচ্ছিকাদি দ্রব্য প্রদানাদির দ্বারা প্রীতিসেবা করিতে পারেন। সখ্যরসের সকল সম্পদের সহিত যখন লাল্য-লালক-ভাবটি সংযুক্ত হইয়াছে তখন রস আরও অধিকতর সম্পৎশালী হইয়া বাৎসল্য-রসরূপে প্রকাশিত। নিখিল জগতের পালনকর্তা ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতির পালনকারী শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজরাজ নন্দ ও ব্রজেশ্বরী যশোমতী; নিজ অলিন্দে বন্ধন করিয়া স্ব-স্ব লাল্য-পাল্যবোধ করিতেছেন। প্রীতির কিরূপ প্রগাঢ় পরিচয়!

অপ্ৰাকৃত মধুর রসের সর্বশ্রেষ্ঠতা

আবার শাস্ত্র-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যরসের সকল সম্পদের সহিত যখন সর্বাপেক্ষা সেবাসক্তি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তখন সেখানে মধুর রস

প্রকাশিত। পিতা-পুত্রের অনেক বিষয়ে গোপন থাকে, কিন্তু স্ত্রী-পুরুষে তাহা থাকে না, প্রীতিবদ্ধ পুরুষ ও স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের নিকট আপনা-দিককে পরিমুখস্বরূপে ও স্বভাবে প্রকাশিত করিয়া থাকেন।

পারকীয় অপ্রাকৃত রসই—প্রাকৃত মধুর রস ; স্বকীয় মধুর

রস—ন্যায়াধিক দাস্ত্রসের প্রকারভেদ

এই জ্ঞাত মধুর রস সকল রসের শিরোমণি। প্রকৃত বিচারে একমাত্র পারকীয় রসই মধুর রস বলিয়া নির্দিষ্ট হইতে পারে। স্বকীয় মধুর রস দাস্ত্রসেরই উন্নত প্রকার-ভেদ-মাত্র। পুরমহিষীগণ শ্রীকৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নী ; তাঁহারা ধর্ম-কর্ম-পুত্র-পৌত্র-গৃহাদিতে ব্যগ্রচিত্ত হইয়াই গৌরবের সহিত পতিভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। আর গোপীগণ ইহলোক ও পরলোকে সকল প্রকার সাধা ও সাধনে অপেক্ষারহিত হইয়া এবং অতিশয় বাগ্রতার সহিত পতি-পুত্রাদি পরিত্যাগের আদর্শ প্রদর্শন-পূর্বক বৃন্দাবনে রাসক्रीড়াদি অনির্বচনীয় বিলাস-সমূহের দ্বারা অগোপ্য রীতিতে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে যিনি যে-ভাবে ভজনা করেন, শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাকে সেইরূপ ভাবেই ভজনা অর্থাৎ তাঁহাদের ভজনানুরূপ ফল প্রদান করিয়া সম্বুট হন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বলেন,—“আমি ব্রজ-বাসিগণের প্রতাপকার করিতে অসমর্থ, তাঁহাদের সেবা-প্রবৃত্তির নিকট আমার সমগ্র স্বরূপকে বিক্রয় করিয়াও আমি তাঁহাদের নিকট চিরঞ্জীবী।” শ্রীকৃষ্ণ বলেন,—কৃষ্ণিণীকে দর্শন করিয়া তাঁহার কৃষ্ণিণীর প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি হইবার পরিবর্তে গোপীগণেরই স্মৃতি আরও উদীপ্ত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণ আরও বলেন,—“মৎপ্রাপ্তি-কামনাময়ী কাত্যায়নীব্রতপরা অষ্টোত্তর-শতাদিক ষোড়শসহস্র গোপললনার সহিত পূর্বব্রতগণের সংখ্যার সাদৃশ্য দেখিয়াই তদ্বারা স্বীয় চিত্তকে কিয়ৎপরিমাণে স্তম্ভ করিবার জন্য আমি পূর্বব্রতগণকে বিবাহ করিয়াছি।”

আত্মারামতা ও লীলারামতা

আত্ম ও পর দুইটা তত্ত্ব। আত্মনিষ্ঠ ধর্ম হইতে আত্মারামতা ; তাহাতে রসের পৃথক্ সহায় না থাকায় রস নাই। কৃষ্ণের আত্মারামতাধর্ম যেরূপ নিত্য, লীলারামতাধর্মও তদ্রূপ নিত্য। বিরুদ্ধধর্ম-সামঞ্জস্যময় পরমপুরুষের পক্ষে ইহা স্বাভাবিক ধর্ম,—

অপ্রাকৃত বিরুদ্ধ ধর্মের সমন্বয়

কৃত্তাবাস্তুমায়ানং যাবতী ব্রজযোষিতঃ ।

রবাম ভগবাংস্তাভিরাভারামোহপি লীলয়া ॥

কৃষ্ণভক্তের এক কেন্দ্রে আত্মারামতা, আর তবিশ্রীত কেন্দ্রে লীলা-রামতার পরাকাষ্ঠারূপ পারকীয়তা । আত্মারামতার দিকে যতটা আকর্ষণ করা যায়, ক্রমশঃই রসের তত শুদ্ধতা আসিয়া পড়ে । আর রসকে যত লীলারামতার দিকে আকর্ষণ করা যায়, রস ততই প্রফুল্ল হয় । সর্বকারণ-কারণ, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, অধিতীয় পুরুষ, নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময়, স্বরাট্ট লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই যেখানে একমাত্র নায়ক, সে-স্থলে পারকীয়তা কখনই গাম্পদ হইতে পারে না । কোন জীব বা প্রতিফলিত জগতের কোন পুরুষাভিমानी যেখানে নায়ক পদবী গ্রহণ করেন, সেখানেই ধর্ম্যধর্মের বিচার আসিয়া পড়ে ; সুতরাং পারকীয় ভাব সেখানে নিতান্ত হেয় ।

শ্রীমতী রাধারানী—সর্বশ্রেষ্ঠা ; তিনি আশ্রয়-

শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ-স্বরূপা

মধুর রসের আশ্রয়ালম্বনের মধ্যে আশ্রয়শিরোমণি শ্রীরাধাই রূপে-ভূপে সর্বশ্রেষ্ঠা । তিনি যুগ্মেশ্বরী প্রধানা । তিনি আশ্রয়-কৃষ্ণবিগ্রহ-স্বরূপা । শ্রীরাধার কায়বাহরূপে অষ্ট সখীর বিপ্রলকাদি অষ্ট ভাব পৃথক্ পৃথক্ লক্ষিত হয় ; কিন্তু শ্রীরাধার যুগপৎ অষ্টভাব-সমষ্টি দেদীপ্যমান ।

সর্ব অংশিনী

শ্রীমতী রাধারানী যাবতীর কৃষ্ণকান্তার অংশিনী এবং কৃষ্ণোচ্ছা-পরি-পূর্তিময়ী । কৃষ্ণাকর্ষিণী বলিয়া তিনি সর্বশ্রেষ্ঠা এবং সমগ্র ভক্ত ও ভক্তির পোষিকা ও মূল আকর । বিষয়-কৃষ্ণবিগ্রহ স্বরূপ অবতারণী হইতে যেক্রপ নিখিল ভগবদবতার বিস্তৃত হইয়াছেন, তদ্রূপ আশ্রয়-কৃষ্ণবিগ্রহ স্বরূপা অংশিনী হইতে ব্রজাঙ্গনাগণ, দ্বারকার মহিষীগণ ও নারায়ণ-বান্ধবোদির লক্ষ্মীগণ বিস্তৃত হইয়াছেন ।

(ক্রমশঃ)

বৈদিক ভারতীয় চিন্তাধারা ও তথাকথিত আধুনিক সভ্যতা

আজ সারা বিশ্বে ‘সভ্যজগৎ, বলিয়া অবস্থা’ একপ্রকার উচ্ছ্বসিত কোলাহল উঠিয়াছে। অনেকের ধারণা—‘মানব আজ কাল সভ্যতার চরম শিখরে উঠিয়া তাহার গৌরবের জয় নিশানা উড্ডীয়মান করিতেছে, আর কাল নক লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিতে পারিয়াছে এবং উন্মাদের জ্বাষ কল্পনা দ্বারা অঙ্কিত করিয়াছে যে, অতীতের সমাজ ছিল মূঢ়, অসভ্য, বর্বর। তাহারা সভ্যতার সন্ধান জানিত না এবং গরিষ্ট সংখ্যাকের বন্ধ ধারণা যে,—বর্ত্তমান মানুষ যতটুকু সভ্যতায় আগ্রস্ত, বিগতের জনসমাজ সে-চিন্তাধারায় পৌঁছিতে পারেন না।

আধুনিক যুগের চাক্চিক্যময় ব্যক্তিগণ আত্মাভিমানে অনুপ্রাণিত হইয়া ভোগের আত্মানে নিজেকে লেলিয়ে দিবে পরম ভূখিলাভ করিতে প্রয়াসী। জড়-বিজ্ঞান মত্ত হইয়া আত্মগরিমায় গৌরবান্বিত হ’তে বদ্ধপরিকর। নিয়ত ভোগ-বিলাস-ব্যসনে পরিপ্লুত হইতে বিশেষ ব্যগ্রতা দেখা যায়; কিন্তু সভ্যতা বলিলে কি বুঝায়? অথবা উহার সার্থকতা কোথায়? সে’ দিকে দৃষ্টিপাত করিতে চায় না।

‘সভ্য’ শব্দে ‘স্বাচ্’ প্রত্যয় নিম্পন্ন হইয়া ‘সভ্যতা’ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। অর্থাৎ সভ্য বলিবার যোগ্যতা—তাহা সরল ভদ্রতা। সরলতা ও ভদ্রতার পরিপূরকই সভ্যতার উৎস। এই বিচারে সভ্যজগৎ বলিতে বিশিষ্ট গুণ-সম্পন্ন সমাজকে বুঝায়। বর্ত্তমান সমাজ কোন্ চিন্তাধারায় অভিনিবেশিত হইয়াছে ও তাহার লক্ষ্যস্থল কি? সেদিকে দৃষ্টিপাত করিলেই বোঝা যেতে পারে যে, সমাজ সভ্যতায় আগ্রস্ত, না শঠতার ভূমিকায় দগ্ধায়মান হইয়া নীচতার গ্রাফিকে আত্মদান করে। শলভজুর বাসনা-কামনায় বিজড়িত হইতে নিয়ত আগ্রহী। মানুষের প্রকৃত মর্য্যাদা কি ও মানব নামের সার্থকতা কোথায় সেদিকে দৃষ্টিপাত করিবার অবকাশ রাখিতে বর্ত্তমান সমাজ কতটুকু আগ্রহান্বিত তাহা সহজেই অনুমেয়। শুধু স্তম্ভের পরিচ্ছদে বিভূষিত, নানা খাণ্ড-খাদকতায় ব্যাপ্ত থাকাকে যদি সভ্যতা বলে অভিহিত করা হয়, তাহা হইলে বারাদনা-সমাজও কি সভ্যতার পরাকাষ্ঠ-

বেদী? কারণ তাহার। সুন্দর পোষাক, অলঙ্কার আদিতে বিভূষিত। তাহার।ও নিতানব চর্কা, চুয়, লেহ, পেয় আদিতে বিভাবিত। তাহার।-দিগকে যদি সভ্য বলা হয় তবে নামধারী সভ্য-সমাজের চিন্তাধারাও যে তদনুরূপ ইহাতে আর সন্দেহ কি? আর এহা যদি ঠিক নয় তবে ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শুধু পরিচ্ছদ ও ভোগলালসাকেই কেন্দ্র করিয়া সভ্যতা থাকিতে পারে না।

আধুনিক সমাজের বহু ব্যক্তির অন্ধবিশ্বাস যে মানুষ শিক্ষা-দীক্ষায় সুদূর অতীত অপেক্ষা বর্তমান যুগে অনেক উন্নত। 'উন্নত' কি করে ধরা হয় অথবা উন্নত কাহাকে বলে, তাহা তাহাদের সীমাবদ্ধ অনুজ্ঞান অন্বেষণকারীগণ ভাবিবার সুযোগ পায় না বলেও অত্যাচার করা হয় না। তাহাদের ধারণা যে, সে চিন্তাধারার উর্দ্ধে আর কিছু থাকিতে পারে না। ইহা মুঢ় ব্যক্তির প্রাণ বসতি আর কি বলা যেতে পারে?

অগৎ অনন্ত জ্ঞান-ভাণ্ডার, তাহার মধ্যে আধ্যাত্মিক-জ্ঞান ও জড়জ্ঞান দুই প্রকার প্রতীয়মান হয়। জড়জ্ঞানের চিন্তাধারা কর্মের তৎপরতা সীমাবদ্ধ এবং তাহা ক্ষণভঙ্গুর। কিন্তু বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক-জ্ঞান শাশ্বত চিন্তার অতীত। তাহাকে কল্পনার মধ্যে সীমারিত করা যায় না। এক প্রকার অন্তর্জ্ঞ আধ্যাত্মিকতা আছে তাহা মানসিক কস্যৎ বিশেষ। এখানে সে-রূপ কথা বলা ইহাতেছে না। যে-আধ্যাত্মিক-জ্ঞান নিতা শাস্ত্রতঃ তৎসম্বন্ধেই আলোচ্য। কাল উহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। মানুষ অমোঘ বানেও জর্জরীত করিতে সক্ষম নহে। তাই মানুষধীন জীব যখন সে চিন্তালোকে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয় তখন তাহা অলীক বা কল্পনাময়-ভাবে মুচ্যতার পরিচয় দেয়। ভারতীয় বৈদিক চিন্তাধারার সেই যে সূমহান্ অল্পভূতি তাহার ফল-স্বরূপেই সুদূর অতীত ভারতীয়-সমাজ সভ্যতার চরম শিখরে বিরাজমান হইতে পারিয়াছেন। তদানন্তর যুগের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এমনই সুবৃন্দশী ছিলেন যে,—ভূৎ, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান তিনটি কালই তাহাদের সমাক্রমণে নবদর্পণে প্রতিভিত ছিল। মুহূর্তের মধ্যেই দেদীপ্যমান জগতের বিষয় অবগত হইতে পারিয়াছিলেন। তাহাদের সহস্র সহস্র বৎসরের পূর্বের ভবিষ্যদ্বাণী-গুলো আজও প্রতি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিকলিত হইতেছে।

বিশেষরূপে যে জ্ঞান তাহাই 'বিজ্ঞান'। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতমণ্ডলী পার্থিব বিচিত্র বস্তুর জ্ঞানকেই বিজ্ঞান বলে অভিহিত করিতেছেন। তাই

ভগবদ্গদ্যদর্শীগণ অতীতের 'বিজ্ঞান' শব্দ প্রয়োগ করিতে গিয়া আগে একটু 'জড়' শব্দ ব্যবহার করেন। তাহা যাহাট হউক, এক্ষণে আলোচ্য বিষয় যে, বিজ্ঞানের প্রাচীন প্রতীচ্ছবি অতীত ভারতীয় চিন্তা-ক্ষেত্রে উচ্চ-শিক্ষায় সজ্জিত ছিল কি না? নহা ভারতীয় (বিংশ শতাব্দীতে) তথাকথিত চিন্তাশীলগণ আজ নিজেদেরকে ভুলে পাশ্চাত্যের অনুগামী হইছেন আর সঙ্গে সঙ্গে বোল তুলিতেছেন যে অতীত ভারতীয়রা ছিল অসভ্য। হায়! কি আশ্চর্য্য; বাবা না কেনেই নিজের শিশুপুরুষগণকে অজ্ঞ, মূর্খ, বলিতে কুণ্ঠাবোধ করে না তারা 'সভ্য' বলে পরিচয় দিতে চায়— ইহা অপেক্ষা আর কি মূর্খাম্বী হ'তে পারে?

ইতিহাসের দিক্ থেকে আসলেও দেখা যায়, যখন সারাবিশ্ব অজ্ঞান-অন্ধকার-কুণ্ঠিনীর নিমিব গহবরে নিপতিত ছিল; অর্কাচীনের তীক্ষ্ণ কপাশে ক্ষতবিক্ষত, নিস্প্রাণ জনতা যখন অত্যাশ্চর্য্য আকর্ষণে আকর্ষিত হইয়া জিহ্বাস্বাস পরিপ্লুত হইয়া বকীতার মদীরায় নিবিষ্ট, তখনও 'ভারত সভ্যতার বিজয়-ভেরি' মিনাদিত করে বিশ্ববাসীকে মানব জুলন্ত সাধনার চরম সীমায় নিষেধিত করিতেছিলেন। ভারত তখনও এমন এক গভীর অহুত্বিতে পৌছিয়াছিলেন যাহার তুলনা আজও অপরিসীম।

প্রাচীনকালে ভারতীয়েরা জড়-বিজ্ঞানকে বড় একটা উচ্চস্থান দিত না। যত্বপূর্ণ আধুনিক যুগে এর মূল্য অদ্ভুত পরিমাণে দিতে চায়। কিন্তু তাই বলে সেই যুগে জড়-বিজ্ঞানে যে অজ্ঞ ছিল, ইহা নহে। বরং আধুনিক কালের বিজ্ঞানকে তাঁহারা বিজ্ঞানের প্রাথমিক অবস্থা বলিয়া মনে করিতেন।

তদানিন্তন কালের কাব্য, দর্শন, সাহিত্যাদিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বহুপ্রকার বিস্ময়কর ঘটনার উল্লেখ আছে। সেগুলি চিন্তা করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় তাঁহারা আধুনিকযুগীয় মানুষ অপেক্ষা বহুগুণে গুণী, মহীয়ান, সুচতুর, বিদ্বান, বৈজ্ঞানিক, সুদূরদর্শী ছিলেন। তাহারা এমন পর্য্যায় পৌছিতে পেরেছিলেন যাহার তুলনায় পাশ্চাত্যদেশের বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ আজও কিছুই করিতে পারেন নাই। ভারতীয়েরা তখনও আকাশ-মার্গে যথেষ্ট ভাবে পরিভ্রমণ করিতে পারিতেন। মূহর্তের মধ্যেই স্বদীর্ঘ পথকে অতিক্রম করিতে তাঁহাদের কোন অসুবিধাই হইত না। বিশ্বের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তের যাবতীয় সংবাদ এমনকি দর্শন পাওয়াতেও

কোন অসুবিধা হয় নাই। চন্দ্রলোকে যাওয়াটা তখনকার যুগে একটা সাধারণ ব্যাপার ছিল; কিন্তু বর্তমান যুগে তথায় যাওয়ার কতটুকু না অশেষ চেষ্টা চলিতেছে! পরিভ্রমণ, দর্শন ও অধ্যাত্ম কার্য্য-কলাপ আদির বিষয় যে প্রাচীন গ্রন্থাদিতে বর্ণনা করে গিয়াছেন সেগুলিকে আজ আজব ঘটনা বলে মনে করেন। কারণ যেই সু-উচ্চ চিন্তাধর্ম্মের চিন্তাধারা এতই গভীর যাত্রাকে অসম্ভব মানব কল্পনাট করিতে পারেন না। তাই কাল্পনিক বা আজব ঘটনা বলিতে ঘিণাবোধ করেন না। কিন্তু যদি স্বল্প ভাবে চিন্তা করা যায় তাহার সত্যতা প্রমাণের কোনই অসুবিধা নাই।

প্রত্যেকেই স্বীকার করেন—“সাহিত্যই জাতির দর্পণ” সাহিত্যের মাধ্যমেই জাতির ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, কৃষ্টি, কলা ইত্যাদি সবকিছুই জানা যায়। যে-জাতির সাহিত্য নাই তাহার জীবন্তের মৃতপ্রায়। বর্তমান ইতিহাস বাহার সন্ধান দিতে অক্ষম, সেই অজানা কালের গৌরবময় দিনের প্রতিচ্ছবি আভ্যন্তরীণ দর্শনে সজীবিত হইয়া আছে—যেগুলির পূর্ণ তথ্য আজও চিন্তার মধ্যে আনিতে পারিতেছে না। দেখিতে পাওয়া যায়, সেই গ্রন্থাদিতে যেগুলি ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়াছেন সেগুলি প্রতি অক্ষরে অক্ষরে আজকাল প্রতিফলিত হইতেছে। তাঁ হারা যে গভীর চিন্তাশীল ও সুদূরদর্শী ছিলেন সে-বিষয় সন্দেহের অবকাশ নাই। দেখা যায় কতগুলি কার্য্যের সমাবেশ ও সমাজের পারিপার্শ্বিকতাকে লক্ষ্য করে বা গণনা (হিসাব) আদির দ্বারা পরবর্ত্তী অবস্থা কিরূপ আকার ধারণ করিতে পারে তাহা অনুমান করত প্রতিরোধ উপযোগী ব্যবস্থার জন্য প্রায় প্রত্যেক দেশেই তার প্রতিকারের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করিতেছেন। এখনকার পণ্ডিতেরা পরবর্ত্তী ২০৩০ বৎসরের মধ্যে কি অবস্থা দাড়াবে পারে তার একটু অনুভূতি সমাজের সম্মুখে ধরিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সহস্র দশক বৎসর পূর্বেই যাহারা অসম্ভবের পরিস্থিতি জানিতেন তাঁহারা ইদানিন্তন চিন্তাশীলগণ অপেক্ষা যে অনেক স্থানে শ্রেষ্ঠ ও গভীর ভাবপ্রাণী তাহা সহজেই অনুমেয়।

কৃষ্টি, কলা, দর্শন, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, অল্প যে-কোন বিষয়েরই চিন্তাধারায় ভারত অদ্বিতীয় গণণ-চুন্দী। গণিত-শাস্ত্রের দিকে লক্ষ্য করিলেও দেখা যায় তাঁহারা সংখ্যা-গণনার পৃথিবীর গীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। পৃথিবীতে এমন একটা দেশ

নাই বাহারা ভারতের সমকক্ষ গণনায় পৌঁছিয়াছেন। ভাষার দিক্ থেকেও দেখিতে গেলে দেখা যায় সংস্কৃত ভাষার মত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রাচীন ভাষা আর দ্বিতীয় নাই। ইহা ব্যতীতও দর্শন, কলা, শিল্প ও ভূতির সমকক্ষই বা কোন্ দেশ ছিল? মহাভারতে দর্শনরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজত্বের যজ্ঞের বর্ণনা, হর্ষোদ্যনের জন্তু-গৃহ নির্মাণ; দণ্ডবেব দ্বারা দ্বুতরাষ্ট্রকে ভারত মহাসমুদ্রের ঘটমান অবস্থা ব্যাখ্যা ও রামায়ণে রামচন্দ্রের লঙ্কা প্রবেশের জন্তু সাগর-বন্দন ইত্যাদি জড়-বিজ্ঞানের অতুল্য নিদর্শন।

সমাজের মাঝে এমন একটি অশ্লীলতার মাদকতা দেখা দিয়াছে যাহা চিন্তা করিলে মানুষ ও পশুদের মধ্যে বড় একটা তফাৎ গোচরিত হইয়া না। অনেক ক্ষেত্রে পশু অপেক্ষাও মানুষ বহুখানি নিম্নতরে নেমে গিয়েছেন। মানুষের বিকাশের পরিবর্তে খল, শঠতায় পরিবাপ্ত। যাহা পশুদের মধ্যেও অতখানি নীচতা দেখা যায় না। যুগান্তকারী গ্লানীর বিভীষিকা যেন লেসিহান শিখায় বোহুশমান। চাকুস জড়বিশ্ব আজ মায়া-বিপনীর তটে জড়গড়। ছলনাময়ী কাহিনী-মণ্ডিকার-পানে ত্রিগীষু হইয়া ভবাটবীর তমোয় বেড়াছালের কুহকে আকৃষ্ট।

ভারতে প্রাচীন কালেও বিজ্ঞানের দিগন্তব্যাপী শিখা অতুল্যধারায় সমাক্রান্ত হওয়াতেও ওদানিষ্টন কালে মানুষ শুধু তাহাতেই আবদ্ধ হইয়া থাকেন নাই; পরন্তু এমন এক অশ্রান্ত অনুভূতির অতলতলে অচিন্ত্য অধোকক্ষ তত্ত্বের রূপান করিয়া মানব-জীবনের সর্বোত্তম চিরন্তন অভিলষিত সন্ধান ব্যাপ্ত হিলেন—যাহা আজ পর্যন্তও কোন দেশের মনীষিবৃন্দ তাহা দিতে সক্ষম হন নাই। ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতা এমন এক অমোঘ নিত্য আনন্দের সন্ধান দিয়াছেন যাহা মানব মাত্রেরই অমুসন্ধান করা সর্বোপরি কর্তব্য। তাহার যে বস্তুর সন্ধান দিয়াছেন তাহা কোন দেশ-বিদেশের উপকার বা অন্য দেশের অপকার নহে, এ উপকার সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপকার; সুতরাং নকীর্তাবাদীর নথর উপকারের প্রস্তাব নহে, ইহা গল্পের কথা নহ, নিছক বাস্তব সত্য।

সেই যে অসাক্ষ (জড় ভাষায় ব্যক্তাতীত) অচিন্ত্যের সন্ধান যাহার সঙ্গে কিছুই তুলনা হয় না, তাহাই বা কি? কি তাহারা পাইয়াছেন? মানব জীবনের বৈশিষ্ট্য কি ও তাহার উদ্দেশ্যই বা কি? জীব-

জগতের পরিণামের অন্তরালেই বা কি নিহিত রহিয়াছে, তারই সন্ধান দিয়াছেন মহাশি শ্রীমদ্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, বেদব্যাস—তাঁহার রচিত অসংখ্য গ্রন্থদগুহে। বহু অভিজ্ঞতার পুঞ্জীভূত জ্ঞানের বিকাশ-সাধন করিয়াছেন—জ্ঞান-নিবারণী মন্দাকিনী-সলিলা সদৃশ অসংখ্য লেখনির আলোখো; তাহার মধ্যে তিনি চূড়ান্ত গিথে “শ্রীমদ্ভাগবত” মাধ্যমে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন তাহাই নিত্য মঙ্গলকামী প্রত্যেকেরই একান্ত অনুশরণীয়—যাহার মাধ্যমেই মানব-জন্মের সার্থকতা জানঘন করে। বর্তমান জগতের পাঁচ হাজার বৎসরের সভ্যতা কেন, লক্ষ লক্ষ যুগ-যুগান্তরের সভ্যতার চরম সীমার সর্কশ্রেষ্ঠ স্রষ্টা মানবজাতি যাহা কল্পনাত্তর ধারণা করিতে পারেন না, তাহা অপেক্ষাও অনন্তকোটি জনে অসমোদ্রুত ভগবজ্জ্ঞানের কথা বৈষ্ণবদর্শন বা পৃথিবীর সর্কশ্রেষ্ঠ সার্কজনীন ধর্মগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে। সেই সন্ধানে নিয়োজিত হইলে জগতে প্রবাহিত হইতে পারে প্রকৃত শান্তির সুশীতল চিত্তাধারার সর্কোত্তম সর্কোচ্চ ক্ষুণ্ণ উৎস। কারণ ভাগবৎ ধর্মই নিত্যধর্ম বা স্থায়্য ধর্ম—উহাই জৈবধর্ম বা জীবমাত্রেয়ই একমাত্র শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

সময়ান্তরে আরও বিঘনভাবে আলোচনা করার আশা রাখিলাম।

—শ্রীনবমোহেন্দ্র ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্য-লীলার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

(পূর্বপ্রকাশিত ৩১শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ৪১৮ পৃষ্ঠার পর)

দক্ষিণভারতে শুভ বিজয়পূর্বক তদ্রাজ্যবাসীদের উদ্ধার করিতে ক্রমে উৎকল সাম্রাজ্যভুক্ত পশ্চিম গোদাবরী-দেশের রাজ্যপাল শ্রীল রামানন্দ রায়ের সহিত মিলন ও রাধাকৃষ্ণভক্ত আলোচনান্তে রসরাজ মহাত্মার স্বরূপ প্রদর্শন

তৎকালীন ভারতের শ্রেষ্ঠতম পণ্ডিত উড়িষ্যার বাহুবল্লভ সার্কভৌমকে উদ্ধার করার পর মহাপ্রভু ১৫১০ খৃষ্টাব্দে বৈশাখ মাসে ভক্ত নিত্যানন্দপ্রভু, জগদানন্দ, মুকুন্দ, দামোদর ব্রহ্মচারী প্রভৃতি কাহাকেও সঙ্গে

না লইয়া কেবলমাত্র কালাকৃষ্ণদাস নামে এক মরল কুলীন ব্রাহ্মণকে লইয়া আশালনাথের পথ দিয়া দক্ষিণদেশে যাত্রা করিলেন। মহাপ্রভুর দক্ষিণ ভারতে শুভ বিজয়কালে সার্বভৌম ভট্টাচার্য মহাপ্রভুর চরণে ক্ষণাইলেন,—‘প্রভু, গোদাবরী তীরে বিদ্যানগর নামক স্থানে উৎকল সাম্রাজ্যের অধীন পশ্চিম গোদাবরী প্রদেশের রাজ্যপাল শূদ্রকুলে আবির্ভূত শ্রীরামানন্দ রায়কে বিষয়ীজ্ঞানে উপেক্ষা না করিয়া অমূল্যবস্তুক তাঁহার সহি মিলিত হইবেন; তাঁহার সমান রসিকভক্ত পৃথিবীতে নাই। তিনি আপনার সঙ্গেই যোগ্য। তাঁহার সহিত আপ্যোনে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও ক্রমস উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আমি পূর্বে তাঁহার অলৌকিক বাক্য চেষ্টা বুঝিতে পারিয়া পরিহাস করিয়াছিলাম। এক্ষণে আপনার প্রসাদে তাঁহার মহত্ত্ব ও রসভক্তের অলৌকিকত্ব জানিয়া আপনার নিকট তাঁহার মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছি।’ সার্বভৌমের উক্ত নিবেদন মহাপ্রভু অঙ্গীকার করিয়া সার্বভৌমকে আলিঙ্গনপূর্বক কৃষ্ণদাস বিশ্রম সহ দক্ষিণদেশ উদ্ধারার্থে চলিলেন।

মহাপ্রভুর অচিন্ত্যশক্তিতে দক্ষিণদেশের মায়াবাদী, বৌদ্ধ, জৈন, পাশণ্ড, কর্মজড়-স্মার্ত্ত ও নানা মতবাদীগণ সকলেই কক্ষনামে উদ্ধৃত হইয়া বৈষ্ণব-ধর্ম গ্রহণ করিল। প্রভু প্রেমাবেশে নাম-সঙ্কীর্ণ করিতে যত্ন সিংহের জায় যে দেশ-গ্রামের উপর দিয়া যাত্রা করেন, সেই দেশ-গ্রামের সকল লোকেই তাঁহার দর্শন-কুপায় কক্ষনামে মাতিয়া উঠিল। আর যাহারা প্রভুর আলিঙ্গন পাইল তাঁহার্য্য তাহা ধন্যভাগ্য হইয়া দিব্য কৃষ্ণপ্রেমানন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। মহাপ্রভুর কৃপা-পাত্রদের উপদেশ ও সঙ্গ পাইয়া অগ্র গ্রামবাসী ও বৈষ্ণব হইয়া উঠিল। এইরূপে সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত সকল গ্রাম-নগরাদি মহাপ্রভুর কৃপায় কক্ষপ্রেমে উন্মত্ত হইল।

“নবধীপে যেই শক্তি না কৈল প্রকাশে।

সে শক্তি প্রকাশি’ নিস্তারিল দক্ষিণদেশে ॥”—(চৈঃ চঃ)

প্রভু গৌরহরি দক্ষিণদেশের নানাস্থান ভ্রমণ করিতে করিতে কুর্মক্ষেত্রে আসিয়া বাসুদেব, বিশ্রাম নামে এক কুষ্ঠ রোগীকে স্পর্শ করিয়া কুষ্ঠ-ব্যাধি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত করিলেন ও তথায় কুর্ম নামক এক বৈদিক ব্রাহ্মণকে দর্শন দিয়া কৃপা করিলেন।

মহাপ্রভু জিরড়-নুসিংহক্ষেত্রে যাঁহা প্রেমাবেশে নুসিংহদেবকে দর্শন-পূর্বক গোদাবরী নদীর তীরে উপনীত হইলেন। সেই সময় বহু বৈদিক ব্রাহ্মণ সহ পশ্চিম গোদাবরী প্রদেশের শাসনকর্তা রামানন্দ রায় দোলায় চড়িয়া গোদাবরীতে স্নান করিতে আসিলেন। পুরীধাম হইতে কিছুদূরে আলাননাথের নিকটবর্তী বেণ্টপুর নামক গলীতে করণ কুলে ভুবানন্দ রায়ের পঞ্চপুত্রের মধ্যে অন্যতম পুত্ররূপে রামানন্দ রায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা গ্রন্থের মতে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রের প্রিয়নন্দন সখা অর্জুন মিলিত হইয়া মহাপ্রভুর অঙ্গরূপ পার্শ্বদরূপে রামানন্দ রায় উদ্ভিত হইয়াছিলেন। রামানন্দ শুদ্ধ সখ্যভাবে মহাপ্রভুর হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। ভুবানন্দ রায়ের পঞ্চপুত্রই তথা রামানন্দ, বগীনাথ, গোপীনাথ, কলানিধি ও সুধানিধি সকলেই মহাপ্রভুর প্রিয়পাত্র ছিলেন। কেহ কেহ রামানন্দকে 'বিশাখাসখী' রূপে অভিহিত করেন। ভগবান্ মহাপ্রভু গোদাবরী-ঘাটে গৃহস্থ আশ্রমে অবস্থিত ভক্ত-রামানন্দকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন। এদিকে রামানন্দও স্নানান্তে মহাপ্রভুর শত সূর্য্যদয় কান্তি-বিশিষ্ট অরুণ-বসন পরিহিত সুবলিত কমণীর কলেবর ও কমললোচন দর্শন করিয়া চমৎকৃত ও অভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং মহাপ্রভুর নিকটে আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানাইলেন। প্রভু দানন্দে রামানন্দের পশ্চিম জানিবার আশায় কহিলেন,—“ওঠ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল। তুমিই কি রায় রামানন্দ?” তৎক্ষণে রামানন্দ বিনীতভাবে কহিলেন,—‘প্রভু, আমি শূদ্রাশয় আপনাদাস।’ প্রভু এইবার প্রেমোদগীরিত নয়নে রামানন্দকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন। প্রভুর আলিঙ্গনে রামানন্দ অষ্টদাত্তিক নিকারে ভূমিতে সংজ্ঞা-হারা হইয়া পড়িলেন। তখন দুইজনের মুখে গদগদ-স্বরে ‘কৃষ্ণ’ ‘কৃষ্ণ’ উচ্চারিত হইতে লাগিল। উপস্থিত ব্রাহ্মণগণ তাহা দেখিয়া বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেলেন। এস্থলে রামানন্দ রায় বর্ণাশ্রমগত সর্ক-নিয় বর্ণ শূদ্রকুলে আবির্ভূত হইলেও তিনি মহাভাগবত হওয়ায় তাহাকে সামান্য জ্ঞতিবুদ্ধি না করিবার শিকাপ্রদান চলে মহাপ্রভু আলিঙ্গন করিলেন। অতঃপর প্রভু হাসিতে হাসিতে দার্কীভৌমের কথায় যে তিনি রামানন্দের সহিত মিলিত হইয়াছেন তাহা জানাইলেন। রামানন্দও তাহা শুনিয়া দার্কীভৌমের ও মহাপ্রভুর কৃপার প্রশংসা করিলেন।

এই সময় এক বৈদিক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণে মহাপ্রভু আতিথ্য গ্রহণ করিলে রামানন্দ তথায় মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়া কৃষ্ণ-কথা আলোচনা করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর আদেশে রামানন্দ সাধ্যের নির্ণয় শ্লোক পাঠ করিতে গিয়া স্বধর্ম্মাচরণ, কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ, স্বধর্ম্মত্যাগ, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সন্থকে বর্ণনাকালে মহাপ্রভু তাহা “এহো বাহু” বলিয়া নির্ণয়পূর্ব্বক পুনরায় উন্নতধারা করিতে নির্দেশ দিলেন। রামানন্দ এইবার জ্ঞানশূন্য-ভক্তিকে সাধ্যসার বলিয়া বর্ণনা করিলে প্রভু তাহা সাধ্যবস্ত বলিয়া স্বীকার করিয়াও উচ্চাধিকার বর্ণনা করিতে আদেশ করিলেন। তখন রাঘ রামানন্দ প্রেমভক্তি, দাস্তপ্রেম, সখ্যাপ্রেম, বাৎসল্যাপ্রেম সম্পর্কে ব্যক্ত করিয়া অবশেষে কান্ত্য-প্রেমকে সর্ব্বসাধ্যসার বলিয়া নির্ণয় করিলেন। প্রভু এফণে কান্ত্যাপ্রেমকে সুনিশ্চয় সাধ্যাবধি বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং তার পরেও কি আছে জানিতে চাহিলেন। রাঘ রামানন্দ অতঃপর রাধিকার গুণাবলী কীর্ত্তন করিয়া জানাইলে রাধা-প্রেমই সাধ্যাশিরোমণি। এইভাবে সেব্য সাধ্যের নির্ণয় হইলে মহাপ্রভুর ইচ্ছায় ও আদেশে রামানন্দ কৃষ্ণের স্বরূপ, রাধিকার স্বরূপ, কৃষ্ণভক্তিতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব একে একে বর্ণনা করিলেন। রামানন্দের মুখে কৃষ্ণ-কথা শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু উল্লসিত হইয়া রামানন্দকে আলিঙ্গন করিলে উভয়ে গলাগলি করিয়া ক্রন্দন করিতে থাকিলেন। অনন্তর উভয়ে নিম্নতস্থানে বসিয়া আনন্দিত মনে ইষ্টগোষ্ঠী কৃষ্ণ-কথায় সেই রাত্রি যাপন করিলেন।

“প্রভু কহে, রামানন্দ করেন উত্তর।

এইমত সেই রাত্রি কথা পরস্পর ॥

প্রভু কহে, কোন্ বিদ্যা বিজ্ঞামধ্যে সার ?

রাঘ কহে, কৃষ্ণভক্তি-বিনা বিদ্যা নাহি আর ॥

কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি ?

কৃষ্ণ-প্রেমভক্তি বলি যার হয় খ্যাতি ॥

সম্পত্তি মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি ?

রাধা-কৃষ্ণ প্রেম যার, সেই বড় ধনী ॥

দুঃখ মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর ?

কৃষ্ণ-ভক্ত-বিরহ বিনু দুঃখ নাহি আর ॥

মুক্ত মধ্যে কোন্ জীব মুক্ত করি' মানি ?

কৃষ্ণ-প্রেম যার, সেই মুক্ত-শিরোমণি ॥

গান মধ্যে কোন্ গান জীবের নিজ স্বর্গ ?

রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকেলি—যে গীতের মর্ম ॥

শ্রেয়ো মধ্যে কোন্ শ্রেয়ঃ জীবের হয় দার ?

কৃষ্ণ-ভক্ত সঙ্গ বিনা শ্রেয়ঃ নাহি আর ॥

কাঁহার স্মরণ জীব করে অনুক্ষণ ?

কৃষ্ণনাম-গুণ-লীলা প্রধান স্মরণ ॥

ধোয় মধ্যে জীবের কর্তব্য কোন্ ধ্যান ?

রাধাকৃষ্ণ পদাযুক্ত ধ্যান সবার প্রধান ॥

সর্ব ত্যজি' জীবের কর্তব্য কাঁহা বাস ?

ঈশ্বরদাবন-ভূমি যাহা নিত্যলীলা-রাস ॥

শ্রবণ মধ্যে জীবের-কোন্ শ্রেষ্ঠ শ্রবণ ।

রাধা-কৃষ্ণ-প্রেম-লীলা কর্ণ-রসায়ন ॥

উপাস্তোর মধ্যে কোন্ উপাস্ত প্রধান ?

শ্রেষ্ঠ উপাস্ত যুগল রাধাকৃষ্ণ-নাম ॥

মুক্তি, ভুক্তি বাঞ্চে যেই, কাঁহা দৌহার গতি ?

স্বর্গ-দেহ, দেব-দেহ, যৈছে অবস্থিতি ॥

জরসজ্জ কাক চুষে জ্ঞান-নিষ্ক ফলে ।

রসজ্জ কোকিল খায় প্রেমাত্ম-মুকুলে ॥

অভাগিরা জ্ঞানী আশ্বাদয়ে শুদ্ধজ্ঞান ।

কৃষ্ণ-প্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান ॥

এইমত দুইজন কৃষ্ণকথা-বেশে ।

নৃত্য-গীত রোদনে হইল রাত্রি-শেষে ॥"—(চৈঃ চঃ)

এইভাবে রামানন্দ-মুখে "মহাপ্রভুর ইচ্ছায় ও কৃপায় শুদ্ধ ভক্তি-সিদ্ধান্ত বিবৃত হইল । রামানন্দের গাঢ় প্রেম দেখিয়া মহাপ্রভু অতীব কৃপা-পররশে হাসিতে হাসিতে রামানন্দকে নিজ স্বরূপ দেখাইলেন ;—

“তবে হাসি তাঁরে প্রভু দেখাইল স্বরূপ ।

‘রসরাজ’ ‘মহাভাব’—দুই একরূপ ॥”—(চৈঃ চঃ)

রসরাজরূপে সাক্ষাৎ রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাভাব স্বরূপা কৃষ্ণ-কান্তাশিরোমণি শ্রীরাধাঠাকুরাণী—এই দুই রূপের এক-তত্ত্ব সমন্বিত স্ব-স্বরূপ-প্রদর্শন করিলেন। রামানন্দ তাহা দেখিয়া প্রেমানন্দে মুচ্ছিত হইলে প্রভুর হস্ত স্পর্শে সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের তত্ত্ব-লীলারস ভক্ত রামানন্দের গোচরীভূত হইল।

পরদিন রামানন্দের নিকট হইতে বিদায় লইবার সময় প্রভু ভক্ত রামানন্দকে আলিঙ্গনপূর্বক করিলেন,—‘তুমি বিষয় ত্যাগ করিয়া নীলাচলে যাও। আমি তীর্থ-পরিক্রমা করিয়া অল্পকাল পরেই নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিলে সেথায় দুইজনে কৃষ্ণকথা-রঙ্গে কাল অতিবাহিত করিব।’

প্রভু চলিয়া গেলে রামানন্দ নিজ প্রভু বিবাহে বিহ্বল হইয়া তাঁহার ধ্যানে নিমগ্ন রহিলেন। কিছুদিন পরে উড়িষ্যা-সম্রাট প্রতাপরুদ্রের অহুমতি লইয়া রামানন্দ রায় নীলাচলে প্রভুর নিকট আগমন করেন। মহাপ্রভু তাঁহার প্রকট-লীলার শেষ দ্বাদশ বৎসর অন্তরঙ্গপার্বদ রামানন্দ রায়ের সহিত কৃষ্ণ-কথা-সংলাপে সর্বদাই তন্ময় হইয়া থাকিতেন। শ্রীল রামানন্দ রায় অপ্রাকৃত রসতত্ত্বের আচার্য্যরূপে অভিহিত।

“সুবল বৈছে পূর্বে কৃষ্ণের সহায়।

গৌর-সুখ দান হেতু তৈছে রাম রায় ॥”—(চৈঃ চঃ)

সাক্ষাৎ দর্শন-প্রভাবে দক্ষিণদেশবাসীদিগকে কৃষ্ণ-নামে
মাতিয়ারা করিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মে আনয়ন

মহাপ্রভু ক্রমশঃ দক্ষিণে বহুতীর্থ অতিক্রম করিয়া সিদ্ধবট-নামক স্থানে এক রাম-উপাসক বিপ্রকে দর্শন দানে কৃতার্থ করেন। প্রভুর দর্শন পাইবা-মাত্র সেই বিপ্র রাম-নাম ভুলিয়া কৃষ্ণনাম লইতে থাকেন। প্রভু ক্ষুদ্রক্লেত্র তীর্থাদি দর্শনপূর্বক পুনরায় সিদ্ধবটে আসিয়া সেই বিপ্রকে কৃষ্ণনাম লইতে দেখিয়া রাম-নাম ছাড়িবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বিপ্র জানাইলেন যে, কৃষ্ণ-নামের মধোই রাম-নাম অবস্থান করায় এবং সাক্ষাৎ কৃষ্ণ-স্বরূপ প্রভুর দর্শন পাওয়ায় বিপ্রের জিহ্বায় আজন্ম স্বভাব রাম-নামের স্মরণ না হইয়া নিরন্তর কৃষ্ণ-নাম ধ্বনিত হইতেছে। এইভাবে মহাপ্রভু তাঁহার দর্শনের প্রভাবে বিভিন্ন উপাসককে কৃষ্ণ-নামে উদ্ধৃত করিয়া উদ্ধার করেন। শাস্ত্রে

রাম-নাম ও বিষ্ণু-নাম অপেক্ষা কৃষ্ণ-নামের অধিক মাহাত্ম্য ঘোষিত হইয়াছে ।
যথা ‘পদ্মপুরাণ’ কহেন,—

“রাম রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে ।

সহস্র নামভিঙ্গলাং রাম-নাম বরাননে ॥”

অর্থাৎ, “রাম রাম রাম এই মনোহর রাম নামে আমি রমণ করি ।
হে বরাননে ! একটিমাত্র রাম-নাম সহস্র বিষ্ণু-নামের সদৃশ ॥”

‘শ্রীহরিভক্তি বিলাস’ বলেন,—

“সহস্র নাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ ফলম্ ।

একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি ॥”

অর্থাৎ “পবিত্র বিষ্ণু-সহস্র নামের ত্রিরাবৃত্তি-দ্বারা যে-ফল হয়, একবার
মাত্র উচ্চারিত কৃষ্ণ-নাম সেই ফল প্রদান করেন ॥”

উল্লিখিত শাস্ত্র-বচন অনুসারে প্রতীয়মান হয় যে, এক সহস্র বিষ্ণু-নামের
তুল্য এক রাম-নাম এবং তিন সহস্র বিষ্ণু-নামের তুল্য এক কৃষ্ণ-নাম অর্থাৎ
তিনবার রাম-নাম বলিলে যাহা ফল হয়, একবার কৃষ্ণনাম কহিলে সেই ফল
পাওয়া যায় ।

শাস্ত্রে আরও জানা যায় যে, ঐহিক দর্শনমাত্রে মনে ও জিহ্বায় কৃষ্ণ-নাম
উদিত হয় তিনিই উত্তম বৈষ্ণব । এস্থলে নামী স্বয়ং নিজ-নাম বিলাইতে
অবতীর্ণ । সুতরাং নামী তথা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ
দর্শনে স্বভাবতঃই লোকের মনে কৃষ্ণ-নাম উদিত হওয়ায় সকলেই বৈষ্ণব
হইয়া পড়িলেন ।

‘দক্ষিণ দেশের লোক অনেক প্রকার ।

কেহ জানী, কেহ কর্মী, পাষণ্ড অপার ॥

সেই সব লোক-প্রভুর দর্শন-প্রভাবে ।

নিজ নিজ মত ছাড়ি হইল বৈষ্ণবে ॥

বৈষ্ণবের মধো রাম-উপাসক সব ।

কেহো তত্ত্ববাদী কেহো শ্রী-বৈষ্ণব ॥

সেই সব বৈষ্ণব মহাপ্রভুর দর্শনে ।

কৃষ্ণ-উপাসক হঞা লয় কৃষ্ণ নামে ॥—(চৈঃ চঃ)

শ্রী রঙ্গমে উপস্থিত হইয়া জনৈক গীতাপাঠক ভক্ত বিপ্রেয়
অশুদ্ধ উচ্চারণকারীর প্রশংসা করিয়া অভক্তিপর
পণ্ডিতম্ভগ্ন গীতাপাঠকের লঘুত্ব প্রদর্শন

ক্রমশঃ মহাপ্রভু বৃদ্ধকালী প্রভৃতি স্থানে হরিনামের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া
বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে থাকিলে মহাপণ্ডিত বৌদ্ধাচার্যের সহিত ভীষণ
তর্কযুদ্ধ বাধিয়া যায় এবং পরে মহাপ্রভু কৃপা করত গনিষ্ঠ বৌদ্ধাচার্যকে কৃষ্ণ-
নামে উদ্বুদ্ধ করিয়া উদ্ধার করেন। তৎপরে শিবকাঞ্চী, বিষ্ণুকাঞ্চী, পক্ষী-
তীর্থ প্রভৃতি স্থান হইয়া শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বেঙ্গট ভট্টের আলয়ে উপস্থিত হইলেন
এবং তথায় চাতুর্মাস্ত্র উদ্‌যাপন করেন। এই সময় একদিন তিনি শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে
এক বিপ্রকে দেবালয়ে বসিয়া অশুদ্ধ উচ্চারণ হইলেও গীতাপাঠকালে সজ্জন
নয়নে আনন্দাক্রম বিসর্জন করিতে দেখেন। সংস্কৃত জ্ঞানহীন সেই গীতাপাঠক
ব্রাহ্মণের অশুদ্ধ উচ্চারণ লক্ষ্য করিয়া সে-স্থানে উপস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলী
ব্রাহ্মণকে নিন্দা ও উপহাসপূর্বক হাস্য করিতে থাকেন। কিন্তু তাহাতেও
সেই ব্রাহ্মণ কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া ভাবাবেশে পুলকিত হইয়া গীতাপাঠ
করিতে থাকেন। তদর্শনে মহাপ্রভু প্রসন্ন হইয়া বিপ্রেয় চৈতন্যের কারণ
জিজ্ঞাসা করেন,— “বিপ্র কহো—মুখ আমি শব্দার্থ না জানি।

শুদ্ধাশুদ্ধ গীতাপাঠ, গুরু-আজ্ঞা মানি ॥

অর্জুনের রথে কৃষ্ণ হয় রজ্জুধর।

বসিয়াছেন তাতে—যেন শ্যামল-সুন্দর ॥

অর্জুনেরে কহিলেন হিত-উপদেশ।

তারে দেখি' হয় মোর আনন্দ-প্রবেশ ॥

যাবৎ পড়ো, তাবৎ পড়ু তাঁর দরশন।

এই লাগি' গীতাপাঠ না ছাড়ো মোর মন ॥”—(১৫: ৮:)

তখন মহাপ্রভু সেই বিপ্রকে আলিঙ্গনপূর্বক কহিলেন,—‘গীতাপাঠে
কোমরই অবিকার আছে। কারণ তুমি পাণ্ডিত্য ছাড়া কেবলমাত্র শুদ্ধভক্তি-
যোগেই গীতার সার অর্থ বুঝিয়াছ। মহাপ্রভুর আলিঙ্গনে বিপ্রেয় হৃদয়ে
বিমল প্রেমভক্তির বিকাশ হইল এবং তিনি প্রভুকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ-জ্ঞানে পাদ-
পদ্ম বন্দনা করিলেন। এই প্রসঙ্গে শুদ্ধভক্তিযুক্ত চিত্তে গীতা অধ্যয়ন না করিলে
গীতার প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি না হওয়ার শিক্ষা প্রদর্শিত হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যরঞ্জন কবিভূষণ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাজ্যে জয়তঃ

শ্রীশ্রীদামোদরব্রত ও নিয়মসেবা উপলক্ষে

সাধুসঙ্গে শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

গৌর আমার যে-সব স্থান করল ভ্রমণ সঙ্গে ।

সে-সব স্থান হেরব আমি প্রণয়িতকত-সঙ্গে ॥

তীর্থদর্শন ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের অগ্ৰতম এবং সাধুসঙ্গে তীর্থযাত্রাই পরম মঙ্গলপ্রদ । ভক্তসঙ্গই মানবের চরম কল্যাণ প্রদান করে— ইহা নিখিল শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত । ভ্রমণচ্ছলে ভোগপর ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি-বিধান তীর্থযাত্রার প্রকৃত ফল নহে, সাধুসঙ্গই তীর্থদর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য । মহাজনবাক্যে দেখিতে পাই—“যে-তীর্থে বৈষ্ণব নাই, সে-তীর্থেতে নাহি যাই, কি লাভ হাঁটিয়া দূরদেশ ।”

আজকাল বহু প্রমোদভ্রমণ-সঙ্ঘ নামাবিধ ইন্দ্রিয়তর্পণপর সুযোগ-সুবিধাদানে ধর্মপিপাসু ব্যক্তিগণকে আকৃষ্ট করিয়া থাকেন ; কিন্তু ভক্তসঙ্গ ব্যতীত তীর্থদর্শনের যথাযথ ফল লাভ হয় না ।

আমাদের তীর্থদর্শনের বৈশিষ্ট্য—

- ১। মঠবাসী সম্যাসি-ব্রহ্মচারিগণ কর্তৃক তীর্থদর্শন-পরিক্রমাদির যাবতীয় পরিচালনার বন্দোবস্ত এবং তাঁহাদের শ্রীমুখে সর্বদা শ্রীহরিকথা, বিশেষতঃ প্রাতঃ ও সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি পাঠ, কীর্তন ও শ্রবণ ।
- ২। সাধুগণের নিকট দর্শনীয় তীর্থের শাস্ত্রীয় সাহিত্য শ্রবণ ।
- ৩। প্রত্যহ মহাপ্রসাদ সেবা ।
- ৪। সঙ্কীর্তনমুখে তীর্থাদি দর্শন ও পরিক্রমা ।
- ৫। রিজার্ভড্ গাড়ীতে স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ ।
- ৬। সর্বোপরি এই পরিক্রমায় সমিতির সভাপতি-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তকিবেদান্ত বামন মহারাজ

কৃপাপূর্বক সঙ্গে থাকিয়া ভক্তগণের মঙ্গল বিধান করিবেন এবং পূজাপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈদান্ত নারায়ণ মহারাজ তীর্থ-পরিভ্রমণ প্রভৃতি পরিচালনার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করিবেন।

সংরক্ষিত আসনসংখ্যা সীমিত, সুতরাং পরিভ্রমণে যোগদানেচ্ছু ভক্তগণ সত্বর আসন সংরক্ষণ করিবেন।

দর্শনীয় স্থানসমূহ :-

- ১। মথুরা—বিশ্রামঘাটে স্নান ও সঙ্কল্প গ্রহণান্তে ভূতেশ্বর মহাদেব, শ্রীকৃষ্ণ-জন্মভূমি, গোবর্ধনেশ্বর, দীর্ঘবিষ্ণু, ধ্রুবঘাট, বিশ্রামাদি ২৪ ঘাট, অঙ্গরীষটীনা, রুদ্রেশ্বর মহাদেব, কংসবধ-স্থলী, দ্বারকাধীশ, শ্বেতবরাহ প্রভৃতি।
- ২। মধুবন—তালবন, কুমুদবন, বহুলাবন।
- ৩। গোবর্ধন—শ্রীগোবর্ধন-পরিভ্রমণ, শ্রীগোবিন্দকুণ্ড, মানসগঙ্গা, হরিদেব, শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, কুসুম-সরোবরাদি।
- ৪। কাম্যবন—নিমলাকুণ্ড, চরণপাহাড়ী, বোমাস্বর-গুহা, ভোজন-খালী, পিছল-পাহাড়ী, ডীং প্রভৃতি।
- ৫। নন্দগাঁও—পাবন-সরোবর, কদম্বখণ্ডী, উদ্ধব-কেয়ারী, টের-কদম্ব; বর্ষাণা, খদীর বন, সঙ্কেত, কোকিলাবন, ঘাবটাদি।
- ৬। কোশী—চরণপাহাড়ী, ছোট-বড় বৈঠান, শেরগড়, খেলনবন, রামঘাট, বিহারবন, ছত্রবন।
- ৭। ভদ্রবন—ভাগীরথবন, বংশীবট, মাঠবন, দাউজী, ব্রজাণ্ডাট, মহাবন গোকুল, রাভেল ও লৌহবন।
- ৮। শ্রীবৃন্দাবন—পঞ্চকোশী-পরিভ্রমণ, শ্রীগোবিন্দ-গোপীনাথ-মদনমোহন, শ্রীরাধাদামোদর, শ্যামসুন্দর শ্রীগোকুশানন্দ, শ্রীরাধারমণ, নিকুঞ্জবন, নিধুবন, বংশীবট, গোপেশ্বর মহাদেব, কেশীঘাট, কালীঘদহ প্রভৃতি।
- ৯। বেলবন—শ্রীম-সরোবর।
- ১০। মহাবন গোকুল—ব্রজাণ্ডাট, চৌরানীখাষা, উত্থলে বন্ধনস্থলী, দাউজী ইত্যাদি।

—ঃঃ নিয়মাবলী ::—

আগামী ৮ই কান্তিক (ইং ২৫।১০।৮০) শনিবার দিবা ৮ ঘটিকায় হাওড়া স্টেশনের ৭নং প্লাটফর্ম হইতে শুভযাত্রা আরম্ভ হইবে। অতএব যাত্রিগণ ঐদিন সকাল ৭টার মধ্যে উক্ত প্লাটফর্মে উপস্থিত হইবেন। পরিভ্রমায় আনুমানিক একমাস সময় লাগিবে। রেলভাড়া, জুদুর্ভরতী স্থানের জন্য বাসভাড়া, কুলিভাড়া ও দুইবেলা মহাপ্রসাদাদির জন্য প্রতি যাত্রীকে ৩৫৫'০০ (চারশত পঞ্চাশ) টাকা ভিক্ষারূপ প্রদান করিতে হইবে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক-দিগের (১২ বৎসরের নিম্নে) হস্ত ৩৫৫'০০ (তিনশত পঞ্চাশ) টাকা দিতে হইবে এবং ১২ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্কদের সম্পূর্ণ টাকা লাগিবে। ১৩ই ভাদ্র (ইং ৩০।৮।৮০) মধ্যে অগ্রিম ২০৫'০০ টাকা জমা দিলে আসন সংরক্ষিত করা হইবে। অবশিষ্ট ভিক্ষা যাত্রার পূর্বেই অর্থাৎ ২০শে আশ্বিন (ইং ৭।১০।৮০) মধ্যে জমা দিতে হইবে। যাত্রিগণ একটি হাক্কা থালা, বাটী ও ঘটী সঙ্গে আনিবেন। বিছানা-পত্র ১২ কিলোর অধিক না হয়; বড় স্তুতিকেশ ও ট্রাক লইবেন না। সংক্ষেপে শীতোপযোগী বিছানা সঙ্গে লইবেন। পাণ্ডা-বিদ্যায়ের খরচ যাত্রিগণ বহন করিবেন।

ত্রিদিগ্ভিম্বামী শ্রীমন্ত্তিবেন্দান্ত নারায়ণ মহারাজের নিকট শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবছীপ, জিলা—নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ) —ঠিকানায় অর্থাৎ জমা দিয়া রসিদ সংগ্রহ অথবা পত্রালাপ করিবেন। ইতি— ৪ঠা বৈশাখ, ১৩২৭

তত্ত্বতত্ত্ব-কৃপালেশপ্রার্থী—

সত্যব্রন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

বিঃদ্রঃ— (১) অনিবার্য কারণে ও দৈব-দুর্ভাগ্যকে পরিত্রমা-পঞ্জী পরিবর্তিত ও বিয়িত হইলে কতৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। স্বল্প-দূরস্থিত দর্শনীয়-স্থানে যাইতে অক্ষম ব্যক্তি নিজব্যয়ে যানবাহন করিবেন।

(২) জয়পুর দর্শনে ইচ্ছুক ব্যক্তি অতিরিক্ত ৫১ (একান্ন) টাকা এবং প্রয়াগ, কানী ও গয়া দর্শনেচ্ছুক ব্যক্তিকেও পৃথক ৫১ (একান্ন) টাকা জমা দিতে হইবে।

শ্রীশ্রীজগন্নাথো জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তি-রোধকজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যরায়া সুপ্রসীদতি ।

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসর ।
অধোবক্ষে অহৈতুকী ভক্তি বিস্মৃতা ॥

অন্য ধর্ম সূচরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথার রতি নৈলে পও সেই শ্রম ॥

৩২শ বর্ষ

১৬ ত্রিবিক্রম, স্মীরোদশায়ী, ৪২৪ গৌরাক
৩১ জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, ১৩৮৭; ইং ১৮৬১১৮০

৪র্থ সংখ্যা

সান্ন্যাসাদং

শ্রীশ্রীজগন্নাথোষ্টকম্

(শ্রীগৌরচন্দ্র-মুখপদ্ম-বিনির্গতম্)

কদাচিত্ কালিন্দীতট-গিনিম-সঙ্গীত-ভরলো

মুদাতীরী-নারী-বদন-কমলাস্বাদ-মধুপঃ ।

রমা-শত্ৰু-ব্রহ্মামরপতি-গণেশাচ্চিতপদো

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথ-গামী ভবতু মে ॥১॥

যিনি কখনও কখনও যমুনা-তীরস্থ বন-মধ্যে সঙ্গীত করিতে করিতে
ভ্রমরের স্তায় আনন্দে ব্রজগোপীদিগের মুখারবিন্দের মধুপান করেন এবং
লক্ষ্মী, শিব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও গণেশ প্রভৃতি দেবদেবীগণ বাহার চরণযুগল
অর্চনা করিয়া থাকেন, সেই জগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক
হউন ॥১॥

ভুজে সর্বো বেণুঃ শিরসি শিখিপিচ্ছং কটিতটে
 দুকূলং নেত্রান্তে সহচর-কটাক্ষং বিদধতে ।
 সদা শ্রীমদ্বৃন্দাবন-বসতি-লীলা-পরিচয়ে
 জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথ-গামী ভবতু মে ॥২॥

যিনি বাম হস্তে বেণুঃ শিরে শিখিপুচ্ছ, কটিতটে পীতাম্বর ও নয়ন-
 প্রান্তে সহচরগণের প্রতি কটাক্ষ ধারণ করিয়া কর্কদা শ্রীকৃষ্ণাবনে বাস ও
 লীলা করিতেছেন, সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক
 হউন ॥২॥

মহাস্তোমেষুস্তীরে কনক-রুচিরে নীলশিখরে
 বসনু প্রাসাদান্তঃ সহজ-বলভঞ্জেন বলিনা ।
 স্তম্ভদ্রোণ-মধ্যস্থঃ-সকল-সুর-সেবাবসরদো
 জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথ-গামী ভবতু মে ॥৩॥

যিনি মহাসমুদ্রের তীরে কনকোজ্জ্বল নীল চল-শিখরে প্রাসাদান্তঃস্থে
 বলিষ্ঠ মহাদেব শ্রীবলদোঃ-সহ স্তম্ভদ্রোণকে মধ্যে রাখিয়া অবস্থান করত,
 সমস্ত দেবগণকে স্বীয় সেবা করিবার অযোগ প্রদান করিয়াছেন, সেই প্রভু
 জগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক হউন ॥৩॥

কৃপা-পারাবারঃ সজল-জলদ-শ্রেণি-রুচিরো
 রমা-বাণী-রামঃ সুরদমল-পঙ্কেকহ-মুখঃ
 সুরেন্দ্রৈরারাম্য শ্রুতিগণশিখা-গীতচরিতো
 জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথ-গামী ভবতু মে ॥৪॥

যিনি দয়ার সাগর, সজল জলধরের ন্যায় বাঁহার অঙ্গকান্তি, যিনি লক্ষ্মী
 সরস্বতীর সহিত বিহার করিতেছেন, বাঁহার বদন-মণ্ডল অমল কমলের
 ন্যায় শোভা পাইতেছে, যিনি সমস্ত দেবগণের আরাধ্য-ধন এবং বেদ ও
 পুরাণ-তন্ত্রাদি শাস্ত্রসমূহ বাঁহার চরিত্র গান করিতেছেন, সেই প্রভু জগন্নাথ-
 দেব আমার নয়নপথের পথিক হউন ॥৪॥

রথারূঢ়ো গচ্ছনু পথি মিলিত-ভূদেব-পটলৈঃ
 স্তুতি-প্রাচুর্ভাবং প্রতিপদমুপাকর্ন্য সদয়ঃ ।

দয়ামিকুবন্ধুঃ সকল জগতাং মিকু-সদয়ো

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথ-গামী ভবতু মে ॥৫॥

রথে আরোহণ করিয়া গমন করিতে থাকিলে পশ্চিমধ্যে ব্রাহ্মণগণ
যাঁহার স্তব করিতে থাকেন এবং সেই স্তব শ্রবণ করিয়া যিনি পদে পদে
প্রসন্ন হন, যিনি দয়ার সাগর, যিনি নিখিল জগতের বন্ধু এবং যিনি সমুদ্রের
প্রতি সদয় হইয়া তুঙ্গকূলে বিরাজ করিতেছেন, সেই প্রভু জগন্নাথদেব
আমার নয়ন-পথের পথিক হউন ॥৫॥

পরঃব্রহ্মাঙ্গীড়ঃ কুবলয়-দলোৎফুল্ল-নয়নো

মিবাসী নীলাঙ্গৌ মিহিত-চরণোহনন্ত-শিরসি ।

রসানন্দা রাধা-সরস-বপুর্গালিজন-সুখো

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথ-গামী ভবতু মে ॥৬॥

যিনি পরমার্চনীয় পরব্রহ্ম, যাঁহার নেত্র-যুগল নীল-কমল-দলের আয়
উৎফুল্ল যিনি নীলাঙ্গে অবস্থান করিতেছেন, যিনি অনন্তের শিরে পদার্পণ
করিয়া রহিয়াছেন, যিনি প্রেমানন্দময় এবং যিনি ঐরাধিকার রসগর-
দেহালিজন-সুখে সুখী, সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক
হউন ॥৬॥

ন বৈ যাচে রাজাং ন চ কনক-মানিকা-বিভবং

ন যাচেহহং রমাং সকল-জন-কাম্যাং বরবধুম্ ।

সদা কালে কালে প্রমথ-পতিনা গীত-চরিতো

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথ-গামী ভবতু মে ॥৭॥

আমি রাজ্য চাহি না, স্বর্ণ-মানিক্যাদি বিভব চাহি না, সর্বজনের
স্পৃহনীয় স্তম্ভরী নারীও চাহি না, কেবল এই চাহি যে, প্রমথনাথ মহাদেব
সর্বক্ষণ যাঁহার চরিত্র গান করেন, সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন-
পথের পথিক হউন ॥৭॥

হর ত্বং সংসার দ্রুতত্তরগমাং সুরপতে !

হর ত্বং পাপানাং বিভক্তিমপরাং বাদবপতে !

অহো দীনেহনাথে নিহিত-চরণো নিশ্চিতমিদং

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথ-গামী ভবতু মে ॥৮॥

হে সুরপতে! শীঘ্র আমাকে এ অসার সংসার হইতে উদ্ধার কর; হে বহুপতে! আমার দুঃসহ পাপভার বিমোচন কর। দীন ও অনাথ ব্যক্তি-গণকেই যিনি স্বীয় শ্রীচরণ সমর্পণ করিয়া থাকেন, সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক হউন ॥৮॥

জগন্নাথাস্টকং পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতঃ স্তুচিঃ ।

সর্বপাপং-বিশুদ্ধাত্মা বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥৯॥

যিনি সংযত ও শুদ্ধচিত্ত এই পরম পবিত্র জগন্নাথাস্টক পাঠ করেন, তাঁহার আত্মা সর্বপাপ হইতে-বিশুদ্ধ হইয়া থাকে এবং তিনি বিষ্ণুলোকে অর্থাৎ শ্রীবৈকুণ্ঠধামে গমন করেন ॥৯॥

সদাচার

ভক্ত ও অভক্তের আচার-ভেদ

মানবের কর্তব্য অনুষ্ঠানকে সাধারণতঃ আচার বলা হয়। মানব যথেষ্টদূরী হইলে তাঁহার আচার, সংকর্ষ-বিশিষ্ট হইলে তাঁহার আচার; জ্ঞানী হইলে তাঁহার আচার পরস্পর যেরূপ ভিন্ন, তদ্রূপ ভগবন্তের আচার ও অভক্ত-দলের আচারে ভেদ আছে। অন্যাভিলাষী, কর্ম্ম ও জ্ঞানীর আচরণ ভক্তের আচারের সঙ্গিত এক নহে, যেহেতু ভক্তের আচার নিত্য এবং অভক্তের আচার অনিত্য। ভক্তের আচারে তাঁহার এবং জগতের সকলের প্রয়োলাভ হয়, অভক্তের আচারে নিজের ও জগতের সর্বনাশ হয়।

অসদাচার

অভক্তগণের আচরণ অনিত্য বলিয়া তাঁহাদের আচার কখনও সদাচার বলিয়া সংজ্ঞিত হইতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীমুখে বলিয়াছেন;—

“অসংসঙ্গ ভাগ, — এই বৈকব-আচার ।

‘শ্রী-সঙ্গী’ এক অসাধু, ‘কৃষ্ণাভক্ত’ আর ॥” (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৮৪)

অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে প্রাকৃত জগতের প্রসূতি মুক্তিমতী যোষা কৃষ্ণ-দামকে স্বভোগ-বুদ্ধিতে নিযুক্ত করান। জীব যোষিং-সঙ্গক্রমে কৃষ্ণ-বিমুখ হইয়া যোষিং-সেবায় ব্যস্ত থাকেন। ইহাই জীবের প্রাকৃত দৃষ্টি-ক্রমে অসদাচার। আবার যোষিং-সঙ্গ ভাগ করিয়াও অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত না হইলে ভাক্ত-যোষিং-সঙ্গ জীবও অসদাচারী হইয়া পড়েন।

কৃষ্ণভক্ত ও মিছাভক্ত

অনুভূতিলাবী, কন্নী ও জ্ঞানী—এই তিন প্রকার কৃষ্ণভক্ত। যিনি কৃষ্ণ ব্যতীত অল্প ঈদেশ্বর বশবর্তী হইয়া কৃষ্ণভজন-ভাবমাত্র প্রদর্শন করেন, তাঁহাকে শুদ্ধ-ভক্তগণ ‘মিছা-ভক্ত’ বলেন। ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,—“কন্নী, জ্ঞানী মিছা-ভক্ত, না হবে তাতে অস্বরজ্ঞ”। যিনি অন্তরে বুদ্ধি, বাহিরে কৃষ্ণভজন-ভাব-প্রদর্শনকারী, তিনি মিছা-ভক্ত। আবার যিনি অন্তরে মুমুক্ষু বাহিরে ভজন-ভাব-মাত্র প্রদর্শন করিতে ব্যস্ত, তিনিও মিছা-ভক্ত। মিছাভক্তগণের আচার, বৈষ্ণবের সদাচারের সহিত বহির্দর্শনে এক হইলেও ভক্ত—হাসল, ও মিছাভক্ত মেকী।

মিছাভক্তের তালিকা

নকল বা মিছাভক্ত কৃষ্ণের সেবার সর্বক্ষণ নিযুক্ত, কেবল লোক-বঞ্চনার জন্য কপটতা প্রদর্শনপূর্বক বৈষ্ণব সদাচার প্রকাশ করিতে ব্যগ্র। মুমুক্ষুর উদাহরণ-স্বরূপ রামদাস বিশ্বাস, বুদ্ধি হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন মজুমদার, অনুভূতিলাবী কালাকৃষ্ণদাস ও ব্রজভট্টকে বঙ্গপ্রভুর লীলায় সত্যভক্তন-পথাপ্রিত বলিয়া আগবা লক্ষ্য করিতে পারি নাই। এতদ্ব্যতীত কমলাকান্ত বিশ্বাস, শ্রীমদৈত প্রভুপাদের সেবা করিতে গিয়া দুর্ভাগ্য সেবকপ্রায় ব্যক্তি-গণ কিরূপ বিপদসমূহ তাহার আদর্শ জগৎকে প্রদর্শন করিয়াছেন।

মিছাভক্ত ও অপসম্প্রদায়ের গুরুত্ববগণের অসদাচারের

প্রতিবাদ করাই শ্রীমদ্বাহাপ্রভুর প্রদর্শিত

শুদ্ধভক্তিপথ

শঙ্কর, নাথ, মায়াবাদী, নাগর প্রভৃতি শ্রীমদ্বৈতপূর্বানুচরণ, রূপ, কবিরাজ প্রভৃতি শ্রীনিবাস আচার্যের অনুগ-চরণ, অতিবাড়ী জগন্নাথদাস প্রভৃতি গৌর-পূর্বানুচরণ, মুকুন্দদাস প্রভৃতি কবিরাজ গোস্বামীকে অনুগ-মানিগণ শুদ্ধভক্তি ছাড়িয়া তদিতর কোনও দল স্বীকার করিয়াছেন। এই-সকল দলের আশ্রিত সেবকগণ যদি শ্রীমদ্বৈত প্রভুকে, শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুকে, শ্রীমদ্বাহাপ্রভুকে এবং কবিরাজ গোস্বামীকে শুদ্ধভক্তির সম্পূর্ণ বিরোধি-জ্ঞানে তাঁহাদিগের নিজ নিজ অসমীচীন গুরুর প্রতি অপরাধের সম্ভাবনা হইয়াছে জানিয়া মহাজন পথানুগমন-বৃত্তি ত্যাগ করেন, তাহা হইলে শ্রীমদ্বৈত, শ্রীনিবাস, শ্রীমদ্বাহাপ্রভু ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর

প্রকৃত আশ্রিত শুদ্ধগণের শুদ্ধা ভক্তির প্রতিই দিন দিন প্রজ্ঞা বর্ধিত হইবে, ধ্বংস হইবে না। যদি তাঁহার প্রাকৃত জড়-বসাস্থিত সহজিয়া, বাউলিয়া প্রভৃতি উপসম্প্রদায়ের যাজক গুরুগণের তীর্থ সমালোচনায় ভীত হইয়া, শ্রীমহাপ্রভু-প্রদর্শিত শুদ্ধভক্তি-পথ হইতে বিচ্যুত হওয়াকে শুদ্ধভক্তি বলিয়া ধারণা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের শোচনীয় অবস্থা সহজেই অন্বেষণে। তাদৃশ গুরুভক্ত পদাঙ্গীম অভ্যন্তরগণের দলপৃষ্টি কখনই শুদ্ধ-ভক্তগণের কোন অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না। শুদ্ধভক্তগণ কোন দিন প্রাকৃত ক্ষোভে ক্ষুব্ধ হইয়া বৈষ্ণব-বিরোধ করিয়া সদাচার-ভাগ করিবেন না। ষষ্ঠ গুরুদেবে যদি কেহ ব্রহ্মচর্যসবকে হস্ত যাত্কারী বলিয়া অভিযুক্ত করেন, গজায় যুক্ত-সংকার-কারীকে নরহত্যাপরাধে আক্রমণ করেন, তাহা হইলে নিরপেক্ষ সত্যপ্রিয় ব্যক্তি তাঁহার তাদৃশ অসদাচরণকে কখনই সমর্থন করেন না। আমরা গুনিয়াছি ভাগবত বলেন,—

গুরুনাম স্যাদ্ভক্তমোহনমস্যাং, পিতামহস্যাজ্ঞানগীমসাস্যাং ।

দৈবং ন তৎ স্যাং ন পতিশ্চ ন স্যাং, ন মোচযেদ্ যঃ সমুপেতযুক্তাম ॥

(ভাঃ ৪।৫।১৮)

সহিষ্যুতাই বৈষ্ণব-সদাচারের আদর্শ

কেহ মানেন, কেহ না মানেন, সব তাঁর দাস ।

চৈতন্যের দাস মুখি, তাঁর দাসের দাস ॥” (চৈঃ চঃ আঃ ৬।৮৩-৮৪)

এই অদ্বৈত প্রভুর বাণী শুদ্ধভক্তগণের কর্ণে সর্বদা সংকীর্ণিত হইতেছে। যখন স্বগদানন্দ ও মাধবানন্দ নিজ নিজ দম্ভাঙ্কুরে স্তম্ভিত হইয়া নিজ মহত্ব প্রকাশ করিতে করিতে আত্মলালন করিয়াছিলেন এবং পরম দয়াল শ্রীমদ্বিত্যানন্দ ও শ্রীচরিতাসকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন দয়াল প্রভুর মদোদত্ত অভিমানী দাস্তিকদ্বয়কে ক্ষমা করিয়াছিলেন ; যখন শ্রীগৌরসুন্দরকে পড়ুয়াগণ আক্রমণ করেন, তখন তিনি নববীণ নগর ত্যাগ করিয়া অন্তর্যম্বে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। এমনকি পাশ্চাত্য প্রদেশেও পারমার্থিক সত্য প্রচার করিতে গিয়া সাধু-স্বামী যিস্থখণ্ড যৎপরোনাস্তি নির্যাতন সহ্য করিয়াছিলেন। সহিষ্যুতাই বৈষ্ণবের ভূষণ। যখন শ্রীরামানুজকে চোলরাজ নির্যাতনকল্পে বৈষ্ণব ধর্মের উৎসাদনে যত্ন করেন, তখন বৈষ্ণবাচার্য্য কল্পপ সহিষ্যুতা অবলম্বন করিয়াছেন, সাম্প্রদায়িক

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ তাহা নাকলেই পরিজ্ঞাত আছেন। বৈষ্ণবাচার্য্য পূর্ণাচার্য্য এবং কুরেশাচার্য্য কিক্রপ বৈষ্ণব-মহিমুতার আদর্শ। বৈষ্ণবধর্ম্ম-বিশেষী, বৈষ্ণব-হৃদয়ী নিজের নিজের স্বকর্ম্ম-ফল ভোগ করিয়া থাকেন। তাদৃশ আদর্শ দেখিয়া প্রকৃতি-সম্পন্ন জীব সাবধান হউন।

এক বৈষ্ণবের পক্ষে অন্য বৈষ্ণবের নিন্দা—অসদাচার

“যে পাপিষ্ঠ এক বৈষ্ণবের পক্ষ হয়।

অন্য বৈষ্ণবেরে নিন্দে, সেই যায় ক্ষয় ॥” (চৈঃ ভাঃ মঃ ১৩।১৬০)

এই সকল উপদেশ বিস্মৃত হইয়া আমরা যেন কোনও দিন পরম দখাল নিত্যানন্দ-পাদপদ্ম হাড়িয়া না যাই। শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর উপদেশ যেন সর্বদা স্মরণ থাকে :—

“সর্বত্র যোগিয়ে কৃষ্ণচৈতন্য-প্রসাদ”

—শ্রীল প্রভুপাদ

মৎস্য-মাংস ভোজন

মৎস্য-মাংস-ভোজন-প্রবৃত্তিরূপ কুসংস্কারের কারণ

আজকাল কতকগুলি লোকের এমত একটি বদ্ধমূল বিশ্বাস হইয়াছে যে, মৎস্য-মাংস ভোজন না করিলে বহুদিন পর্য্যন্ত নরশরীরে বল ও ইন্দ্রিয়শক্তি থাকে না। বিলাতী ডাক্তারদিগের পরামর্শ, মৎস্য-মাংস-ভোজী-দিগের প্রবৃত্তি এবং নানাবিধ বৈদেশিক কুসংস্কার হইতে এই বিশ্বাসটী জন্মলাভ করিয়াছে। বিশেষতঃ অত্যন্ত ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র ব্যক্তিগণ ভোগ-লালসা-প্রযুক্ত এই মতের নিতান্ত পক্ষপাতী হইয়া অস্বাভাবিক যুবকবৃন্দের মৎস্য-মাংস-ভোজনে-প্রবৃত্তি উত্তেজন করেন।

আমিষ ভোজনের কুফল ও নিরামিষ-ভোজনের

প্রয়োজনীয়তার আলোচনা আরম্ভ

তাহাতে ফল এই হইতেছে যে, পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে আর্ঘ্য-সম্ভানগণ পৈত্রিক খাদ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বিজাতীয় দ্রব্যসকল আহাৰ করত ক্রমশঃ হীনবল ও বিগতবীৰ্য্য হইতেছেন। শীত-প্রধান দেশের ব্যবস্থার সম্বন্ধে আমরা আপাততঃ কিছু বলিতেছি না। কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষে নিরামিষ ভোজনের নিতান্ত প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহা সমস্ত ঐতিহাসিক

ও বৈজ্ঞানিক বিচার দ্বারা সহজে প্রতিপন্ন করা যায়। আমরা ক্রমশঃ এবিষয়ের অনেক আলোচনা করিব। সম্প্রতি যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া নিব্রুত হইব।

প্রাচীন ভারতীয় ভোজনের ত্রিবিধ ব্যবস্থা

আমাদের দেশে পুরাকাল হইতে পক্বাহারী ব্যক্তিদিগের পক্ষে তিন প্রকার ভোজনের ব্যবস্থা আছে। (১) হবিষ্যন্ত ভোজন, (২) নিরামিষ্যন্ত ভোজন ও (৩) সান্নিষ্যন্ত ভোজন।

(১) যাহারা হবিষ্যন্ত ভোজন করেন, তাহারা একবারমাত্র পাকে আতপ তণ্ডুল; কথেকপ্রকার মুদগাদি শ্রীহি, কথেকপ্রকার ফল, মূল, ঘৃত, দুগ্ধ ও গুড়বজ্জিত ঐক্য পক্ব করত যষ্টি দণ্ডের মধ্যে এক সময়ে আহার করিতে পারেন।

(২) যাহারা নিরামিষ্যন্ত ভোজন করেন, তাহারা আতপ বা সিদ্ধ তণ্ডুল এবং মংস্ত-মাংসবিহীন নানাপ্রকার বাজ্ঞন, ঘৃত, দুগ্ধ ও বহুবিধ মিষ্টান্ন ভোজন করিতে পারেন।

(৩) যাহারা সান্নিষ্যন্ত ভোজন করেন, তাহারা দেব-পিতৃ-ক্ৰিথাতে অর্পিত মাংস ও দেশভেদে মংস্ত ঐ সমস্ত দ্রব্যের সহিত ভোজন করিতে পারেন।

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক আহার এবং তত্ত্বং অধিকারী

এই প্রকার ত্রিবিধ পক্বাহার সত্ত্ব, রজঃ ও তমগুণ দ্বারা বিভক্ত। সাত্ত্বিক লোকগণ হবিষ্যন্ত, রাজসিক লোকগণ নিরামিষ্যন্ত এবং তামসিক লোকগণ সান্নিষ্যন্ত ভোজন করিয়া থাকেন। সমস্ত ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সাত্ত্বিক লোকদিগের অতি অল্প পীড়া হয়, এবং যোগাদি ক্রিয়া-সাধনে তাহাদের প্রভূত সামর্থ্য আছে। রাজসিক লোকদিগের তামসিক লোকাপেক্ষা অল্প পীড়া হয়। রাজসিক লোকেরা অতিশীঘ্র সাত্ত্বিকতা অবলম্বনপূর্বক উচ্চ উচ্চ আধ্যাত্মিক ক্রিয়ার উপযোগী হন। তামসিক লোকদিগের আহাৰাদি বিধান—কেবল তাহাদের তত্ত্বং প্রবৃত্তি অনুসারে আহাৰাদি দিয়া ক্রমশঃ তাহাদের প্রবৃত্তির উন্নতি সাধন করিবার অভিপ্রায়ে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে।

হরিবাসরাদি-ব্রত ও পর্কদিনে আমিষ-ভাগ-বিধি-লিখিবার কারণ

সংক্রান্তি, রবিবার, পর্কদিন, হরিবাসরাদি ব্রতদিনে যে মংস্ত্র-মাংসাদি নিষেধ করা হয়, তাহা কেবল তামসিক ব্যক্তিগণের পক্ষে। সাত্ত্বিক ও রাজসিক ব্যক্তিগণের পক্ষে সে-সকল বিধান তত্ত প্রয়োজন নাই। সাত্ত্বিক ও রাজসিক ব্যক্তিগণের প্রভেদ এই যে, সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ রাজসিক ও তামসিক খাদ্যাদি কোনকালেই স্বীকার করেন না। রাজসিক ব্যক্তিগণ নিমিত্তযোগে তামসিক দ্রব্যাদি কখন কখন স্বীকার করেন।

মানব-প্রকৃতির উন্নতির ত্রিবিধ কারণ নির্দেশ

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, কেবল সাত্ত্বিক আহার করিলেই যদি সমস্ত লাভ হয়, তবে কিছু দিবস সাত্ত্বিক আহার মাত্র করিয়াও আমরা কোন রোগশূন্যতা, যোগ-যোগাতা, আধ্যাত্মিক সামর্থ্য লাভ করি না? এই কথাটির উত্তর এই যে, মানব-প্রকৃতি কেবল আহাৰের উপর নির্ভর করে না। আহাৰ, ব্যবহার ও আধ্যাত্মিক চেষ্টা—এই তিন প্রকার কার্যের দ্বারা মানব-প্রকৃতির উন্নতি হয়।

সাত্ত্বিক আহাৰ, ব্যবহার ও আধ্যাত্মিক অনুশীলন

আদৌ সাত্ত্বিক 'আহার' দ্বারা সম্বৃদ্ধ হয়। 'সত্ত্ব' শব্দে শরীর ও মনকে বুঝিতে হইবে। সত্ত্ব শুদ্ধ হইলেও যদি ব্যবহার সকল সাত্ত্বিক না হয়, তবে শুদ্ধসত্ত্বও ক্রমশঃ অপদস্থ হয়। 'ব্যবহার' শব্দ দ্বারা আহাৰ ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত আচারকে বুঝিতে হইবে। স্বী-সঙ্গ পরিত্যাগ, সত্য, সরলতা, অহিংসা প্রভৃতি যম ও নিয়মগত সমুদায়ই ব্যবহার শব্দের অন্তর্গত। আহাৰ ও ব্যবহার সাত্ত্বিক হইলেও, মানব যে-পর্যন্ত নিয়মিত আধ্যাত্মিক অনুশীলন না করে, সে-পর্যন্ত মানব-প্রকৃতির সম্যক উন্নতি কিরূপে হয়? যদি কেহ সাত্ত্বিক উন্নতির ফল দেখিতে চান, তবে জন্মাবধি সাত্ত্বিক আহাৰ, সাত্ত্বিক ব্যবহার ও সাত্ত্বিক অনুশীলন করিয়া দেখুন। অবশ্যই ফল লাভ করিবেন। কোন অংশে ত্রুটি হইলে অবশ্যই ফলের ব্যাঘাত হইবে। ব্যবহার ও অনুশীলন করিবার যোগাতা লাভ করিতে হইলে প্রথমেই সাত্ত্বিক আহাৰের প্রয়োজন।

সাত্ত্বিক আহারাদির সুরক্ষতা—সর্ববাদী সম্মত

সাত্ত্বিক আহার, ব্যবহার ও অনুশীলন-দ্বারা যে মানব-উন্নতি সাধিত হয়, তাহার অনেক উদাহরণ আছে। যুবকবৃন্দ বৈদেশিক দর্শন বিজ্ঞার প্রতি অধিক শ্রদ্ধা করেন বলিয়া আমরা তাহাদিগকে থিয়সফিষ্ট ও মুসলমান-দিপের ফকিরদিগের চরিত্র দেখাইয়া দিতেছি। মুসলমান, বৌদ্ধ ও থিয়সফিষ্টগণ মানব-উন্নতির বিধি কিয়ৎপরিমাণে অবগত হইয়া অনেকস্থলে কার্য্যসিদ্ধি করিয়াছেন। সেস্থলে মকল্ আর্য্য ও বৈদিক সাত্ত্বিকতা যে আর অধিকতর কার্য্যকর ও ফলপ্রসূ ইহাতে আর সন্দেহ কি ?

নিরামিষ আহারের সুরক্ষতার উদাহরণ

আমাদের নব্য যুবকবৃন্দের উপকারার্থে আমরা অনেকগুলি উদাহরণ দিব। তন্মধ্যে অল্প একটী উদাহরণ দিতেছি, তাহা পরীক্ষা করিয়া লইতে পারেন।

উত্তরপাড়ানিবাসী প্রসিদ্ধ ব্যক্তি শ্রীযুক্ত চন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের এখন বাহান্ন বৎসর বয়স। তিনি দশ বৎসর বয়স হইতেই হবিষ্যান্ন-ভোজী। তাহার শরীরে ও সমস্ত ইন্দ্রিয়তে যথেষ্ট বল আছে। তাহার চক্ষের যথেষ্ট তেজ আছে। তাহার পুষ্ণতাত প্রেমনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ৭০ বৎসরেও নিরামিষ ভোজনবলে তাহার ছায়া দ্বাষ্টা ভোগ করিয়াছেন।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীকৃষ্ণ কি বস্তু ?

(পূর্বপ্রকাশিত ৩২শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ৯৬ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধার সহিতই মূল বিলাস

শ্রীরাধার ভাবকান্তি-মণ্ডিত হইয়া

শ্রীকৃষ্ণের গৌরাবতার

ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধার সহিতই মূল বিলাস, অল্প বাবতীয় বস্তু সেই মূল বিলাসের উপকরণ। সেই শ্রীরাধার প্রণয় মহিমা কিরূপ, শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত মধুরিমা—বাহা শ্রীরাধা আশ্বাদন করেন, তাহাই বা কিরূপ এবং শ্রীকৃষ্ণের মধুরিমার অনুভূতি হইতে শ্রীরাধারই বা কিরূপ

সুখের উদয় হয়—এই তিনটা বিষয় আত্মদানে লোভপরবশ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্র শচীগর্ভ-সমুদ্রে আবির্ভূত হন।

গৌরব-পথে বা প্রাকৃত-সাহজিক-পথে

কৃষ্ণপ্রেম অসম্ভব ও স্পর্শাতীত

জগৎ বৈদীভক্তি-দ্বারা চালিত, কাজেই কৃষ্ণপ্রেমে সম্পূর্ণ অনতিজ্ঞ। গৌরবভাবে শুদ্ধরাগ-প্ৰভা কৃষ্ণপ্রেম, কিংবা প্রাকৃত সাহজিক আনুকরণিক পথে অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রেম একান্ত সুদূর্লভ ও স্পর্শাতীত। গৌরবভাবময়ী বৈদী ভক্তির ফলে জীবের চতুর্বিধা মুক্তি এবং বৈকুণ্ঠে নারায়ণ-প্রাপ্তি পর্য্যন্ত শেষ দীয়া।

নিজ-ভজনমুদ্রা-প্রদানে ইচ্ছুক হইয়া

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচৈতন্যাবতার

নিজ-ভজনমুদ্রা প্রদানার্থ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা হইলে তিনি শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হন। যুগধর্ম প্রচারাদি বিষ্ণুর কার্য্য; কিন্তু কৃষ্ণ যাতীত অপর অংশবিষুতত্ত্বের কৃষ্ণপ্রেম-দান অসম্ভব। বিধিভক্তি প্রচারের জন্য বিষ্ণুর অবতার, আর রাগভক্তি প্রচারের জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাবতার। শ্রীরাধার ভাব-কান্তি অঙ্গীকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে শ্রীকৃষ্ণ নিজ-বাস্তা-ত্রয় পরিপূরণ করিয়াছিলেন। স্তবরাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের আশ্রিত ব্যক্তি-গণই শ্রীকৃষ্ণসেবামাধুরী-পরাকাষ্ঠা আত্মদান করিতে সমর্থ।

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

মাধুর্য্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের ঔদার্য্যবিগ্রহাবতারই—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে—মাধুর্য্যক্ৰোড়ীভূত ঔদার্য্য, আর শ্রীকৃষ্ণে—ঔদার্য্যক্ৰোড়ীভূত মাধুর্য্য।

শ্রীকৃষ্ণভজনে যোগ্যতা লাভ করিতে হইলে

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সেবা আবশ্যিক

অনর্থযুক্ত জীবের শ্রীকৃষ্ণভজনে যোগ্যতা নাই, অনর্থযুক্ত জীবের কৃষ্ণ-ভজনের অভিনয় বা চেষ্টা—শ্রীকৃষ্ণের অংশাবতার বা বিষ্ণুর অর্চন-মাত্র। অনর্থযুক্ত জীবের যোগ্যতায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব উদিত হইয়া জীবকে অনর্থ-নিম্মুক্ত করাইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিগূঢ় ভজন-সম্পদ অর্থাৎ নিজ ভজনমুদ্রা প্রদান করেন।

মহাবদান্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব

এজন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় 'মহাবদান্ত' ও 'কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা' বলিয়া বন্দিত হইয়াছেন।

শ্রীগৌরকৃষ্ণ—সর্ববিভু, সর্বান্তর্যামী ও সর্বভোক্তা

শ্রীনিত্যানন্দ ও অদ্বৈত বা নিমিত্ত ও উপাদানকারণ-দ্বয়েরও কারণ শ্রীগৌরকৃষ্ণ সমস্ত উপাদেয়তাকে ক্রোড়ীভূত করিয়া সর্ববিভু, সর্বান্তর্যামী ও সর্বভোক্তৃস্বরূপে নিত্য বিরাজমান।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য

পঞ্চতত্ত্বরূপী কৃষ্ণ-কাক্ষ-বিগ্রহগণের বিচিত্রবিলাস-প্রদর্শনই উদার্য-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য এবং সেই পঞ্চতত্ত্বরূপী কৃষ্ণ-কাক্ষ-বিগ্রহগণের বিচিত্র বিলাস-সেবাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপাদাশ্রয়লাভ ও শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য-সীমার উপলব্ধি হয়। যিনি কৃষ্ণ জানাইয়া অচৈতন্য জগতের চৈতন্য-সম্পাদন ও জগৎকে ধন্যতীত্ব করিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পাদপঙ্কজভূষণের পাদাশ্রয় ব্যতীত 'শ্রীকৃষ্ণ কি বস্তু', তাহা কাহারও গোচরীভূত হয় না।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দাসানুদাসগণের সেবা ব্যতীত

কৃষ্ণপ্রেম লাভ অসম্ভব

আচর্য্য ধর্ম্মং পরিচর্য্য বিষুং বিচর্য্য তীর্থানি বিচার্য্য বেদান্।

বিনা ন গৌরপ্রিয়পাদসেবাং বেদাদি-ভূস্প্রাপ্যপদং বিদন্তি ॥

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্)

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পরিপালন, বিষুয় অর্চন, শত শত তীর্থপরিভ্রমণ, নিখিল বেদশাস্ত্র বিচার প্রভৃতি করিয়াও গৌরপ্রিয়জনের পাদপদ্মসেবা-ব্যতীত কেহই বেদাদির তুল্য পদ (শ্রীরাধাগোবিন্দের চিহ্নবিলাসক্ষেত্র শ্রীধাম-বৃন্দাবনের লক্ষ্য) জ্ঞানিতে পারেন না।

নৈয়ায়িক হেতুবাদী, কৰ্ম্মজড়স্মার্ত্ত ও বৈদান্তিক-

ক্রমগণ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বাবধারণে অবোধ্য

নৈয়ায়িক হেতুবাদিগণ, কৰ্ম্মজড়স্মার্ত্তগণ, বৈদান্তিক-ক্রম প্রচ্ছন্ন হেতু-বাদিগণ শ্রীকৃষ্ণ কি বস্তু, তাহা কখনও উপলব্ধি করিতে পারেন না।

কারণ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের পদাশ্রিত নহেন। নৈয়ায়িক হেতুবাদি-
গণের সচ্চিদানন্দত্বের বিরোধ-বিচার নিম্নলিখিত ক্রিয়া অঙ্কত্রিম বৈদান্তিক
নৈয়ায়িকগণ অর্থাৎ ভাগবত-সেবকগণ শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দত্ব স্থাপন
করিয়াছেন। সেই শ্রীকৃষ্ণই নিখিলবেদের একমাত্র বিষয়-তত্ত্ব—

শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র বেদপ্রতিপাত্ত বস্তু

বেদৈশ্চ সর্বৈরংগৈব বেদো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্ ॥ (গী: ১৫।১৫)

আমিই সর্ববেদবেদ্য ভগবান্, সমস্ত বেদান্তকর্তা এবং বেদান্তবিৎ ও জীবের
নিত্যমঙ্গল বিধাতৃ-স্বরূপ কীলের উপদেষ্টা।

বেদে শ্রীকৃষ্ণ-লীলার ইঙ্গিত

তা বাৎ বাস্তুশাস্ত্রসি গম্যৈঃ যত্র গাণো ভূবিশৃঙ্গা অরাসঃ ।

অত্রাহ তত্বরূপাঃস্ত রক্ষঃ পরমং পদমবভাতি ভূঁর ॥ (১।৫৪ বৃক্ক শ্লোক)

(ঋগ্-মন্ত্রে ভগবানের নিত্যলীলা এইরূপে কথিত হইয়াছে)—তোমাদের
(রাধা ও কৃষ্ণ) সেই গৃহমকল প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ করি—যেখানে
সুসাবহ বিধিক্রম অর্থাৎ বাস্তিতার্থ-প্রদানে সমর্থ কাষধেনুসকল প্রস্তুত
শৃঙ্গবিশিষ্ট। ভক্তেচ্ছাপূর্ণকারী শ্রীকৃষ্ণের সেই পরমপদ প্রচুররূপে প্রকাশ
পাইতেছেন।

অপশ্যৎ গোপামনিপজ্ঞমানমা চ পরা চ পৃথিভিষ্চরন্তম্ ।

স সঙ্গীর্গঃ স বিষ্ণুচীর্বসান আবরীবস্ত্রিভুবনেন্দ্রতঃ ॥

(ঋগ্বেদ, ১ম মণ্ডল, ২২ অনুবাক, ১৬৪ সূক্ত, ৩১ শ্লোক)

দেখিলাম, এক-গোপাল তাঁহার কখনও পতন নাই, কখন নিকটে,
কখন দূরে - নানা-পথে ভ্রমণ করিতেছেন ; তিনি কখনও বহুবিধ বস্ত্রাবৃত,
কখনও বা পৃথক্ পৃথক্ বস্ত্র-দ্বারা আচ্ছাদিত। এইরূপে তিনি বিশ্ব-সংসারে
পুনঃ পুনঃ প্রকটাপ্রকটলীলা নিস্তার করিতেছেন।

নিত্য ও নৈমিত্তিকভেদে দ্বিবিধ কৃষ্ণ-চরিত্র

শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র দুই প্রকার—নিত্য ও নৈমিত্তিক। গোলোকে সর্বকালে
নিত্যচরিত্র ও অষ্টকালীয় লীলা বর্তমান। ভৌমরূপে সেই অষ্টকালীয়
লীলার নৈমিত্তিক লীলা সংযুক্ত আছে। ব্রজ হইতে গতায়াত ও অজ্ঞ-
মারণাদি—নৈমিত্তিক-লীলা। নৈমিত্তিক-লীলা ব্যততিরেক-ভাবে
গোলোকে আছে ; কেবল প্রপঞ্চে সেই লীলা বস্তুতঃ প্রকাশিত।

প্রতিকূল ও অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন

সাধকগণের পক্ষে নিত্যানীলার প্রতিকূল হইয়া ঐ নৈমিত্তিক লীলা প্রতিভাত হইতেছে। অব-বকাদির প্রতিকূলানুশীলন—কৃষ্ণপ্রেমের পরিপন্থী ; এইজগৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব একমাত্র অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনকেই উত্তমা ভক্তি বলিয়াছেন,—

উত্তমা ভক্তি

অষ্টাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্য্যাদ্ভিনায়তম্ ।

আনুকূল্যেণ কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥

(ভ: র: সি: পৃ: বি: ১৯২)

মূল আশ্রয়াভিমাণে অহংগ্রহোপাসনাও

জীবন অপরাধ

জীবনরূপ অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনের আদর্শ দেখাইতে গিয়াও কখনই আপনাকে মূল আশ্রয় অর্থাৎ শ্রীমতী, নন্দ-যশোদা, সুদাম-শ্রীদাম, রক্তক-পত্রকাদিক্রমে বিচার করিবেন না। তাহা হইলে অহংগ্রহোপাসনার আবাহনরূপ অনর্থ বা প্রচ্ছন্ন প্রতিকূলানুশীলন জীবনরূপকে শ্রীকৃষ্ণভজন হইতে চিরতরে পাতিত করিবে। জীবনরূপের আশ্রয়-ভেদাংশ-বিচার অর্থাৎ নিত্য-সিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণোপাসকগণের অনুগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণোপাসনাই শ্রীকৃষ্ণানুশীলন।

শ্রীকৃষ্ণানুগবর শ্রীগুরুদেবের চরণাশ্রয়েই -

কৃষ্ণানুশীলন সম্ভব

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের দাসানুদাসগণের পাদাশ্রয় অর্থাৎ একমাত্র রূপানুগ-গণের পাদপদ্মাশ্রয়েই শ্রীকৃষ্ণানুশীলন হইতে পারে। অনর্থনির্মুক্তাবস্থায় জীবের উদ্ধৃক নির্মল সহজ স্বরূপে স্ব-সহজ সেবা-ভাব শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-বর গুরুদেবের রূপায় উদিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণের দেহ-দেহীতে ভেদ নাই

শ্রীকৃষ্ণের দেহ-দেহীতে ভেদ নাই, গুণ-গুণীতে ভেদ নাই, রূপ-রূপীতে ভেদ নাই, নাম-নামীতে ভেদ নাই, লীলা ও লীলাপুরুষোত্তমে কোন ভেদ নাই।

শ্রীকৃষ্ণের যে কোন একটি ইন্দ্রিয়—পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীকৃষ্ণের যে-কোন একটি অঙ্গ—পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের পাদনখাঞ্চল—পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম কর্ণের ছায়াই শ্রবণ করিতে পারেন, কর্ণও পাদেয় ন্যায়ই গমন করিতে পারেন, হস্ত দর্শন করিতে পারেন, চক্ষু স্পর্শ করিতে পারেন, কোন ইন্দ্রিয়ে কোনপ্রকার অভাব নাই। শ্রীকৃষ্ণের গুণ abstract মাত্র নহে, ইহা পূর্ণ Concrete absolute.

শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ-মাধুরী

শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ-মাধুরী, লীলা-মাধুরী, অতুল্য সেবকমণ্ডল-মাধুরী—অসমোক্ষ, নিত্য-প্রগতিশীল, নবনবায়মান সৌন্দর্য্যময়। শ্রীকৃষ্ণের রূপ-মাধুরী তাঁহার নিজেরও চমৎকারিতা আনয়ন করে এবং নিজেকেও আকর্ষণ করিয়া থাকে। তাঁহার সেই শ্রীবিগ্রহমাধুর্য্য অবলোকন করিয়া গো, পক্ষী, ক্রম, লতা ও বৃক্সকল পুলকাক্ষত এবং অষ্টসাত্ত্বিকভাবে পরিপ্লুত হয়। কোন পুরুষই পরম কুলজ্যোত্স্বরূপ গোপীবৃন্দের চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ নহেন; এমন কি, তাঁহারা সৌন্দর্য্য, স্বভাব, ধৈর্য্য, লজ্জাদিরূপ গুণ, বিচার-ব্যবসায়, বৈদগ্ধ্যাদি কৰ্ম্ম—এইসকল দ্বারা মহালক্ষ্মীকেও ততিক্রম করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের রূপ দর্শন করিয়া তাঁহারা সেই রূপ-দর্শনের প্রতিবন্ধক পক্ষসকলের রচনাকারী বিধাতার নিন্দা করিয়াছিলেন এবং বিবিধ অপরাধকারী ইন্দ্রকে পর্য্যন্ত ‘সহস্রাক্ষ’ বলিয়া শুব করিয়াছিলেন। এমন কি, তাঁহারা খেদ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, আমাদের যাবতীয় ইন্দ্রিয়গুলি কেন কেবল নয়নরূপে পরিণত হয় নাই? শ্রীকৃষ্ণ গোপ-ললনাগণের রূপ দর্শন করিয়া প্রীত হন, সেই রূপ-প্রদর্শনের পরস্পর প্রতিযোগিতায় অপ্রাকৃত রূপ-প্রদর্শনীর নবনবায়মান রূপ-মাধুর্য্য-ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হইতে থাকে এবং তদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রীতি হয় বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণের রূপ-মাধুরী গোপীকাগণের আকর্ষণের বিষয়। গোপীকা-শিরোমণি বৃষভানুন্দিনীর সৎপ্রেম-দর্পণে নিরন্তর প্রবৃদ্ধমান রূপ-মাধুরী দর্শন করিয়াই শ্রীকৃষ্ণের নিজ মাধুর্য্যের আত্মদানের নিমিত্ত তদাঙ্গাদনকারিণী বৃষভানুন্দিনীর রূপ-গ্রহণে অত্যন্ত লোভ, তাহা হইতেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের দাসানুদাস-গণের বা শ্রীকৃষ্ণানুগ-গণের শ্রীচরণাশ্রয়েই শ্রীকৃষ্ণবস্তু-তত্ত্ব উপলব্ধির বিষয় হয়—শ্রীকৃষ্ণে সুজ্ঞান-ভ প্রেম সজ্জাত হয়। (ব্রহ্মশঃ)

পরমাধ্যম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম
৮-১তম বর্ষপুত্তি শুভাবিভাব-তিথি-পূজায়
ভক্তিপ্রদানঞ্জলি

গোবিন্দ-কৃষ্ণ তৃতীয়া তিথি আজ আসিয়াছে নবরূপে,
দেবানন্দ মঠে মিলেছি আমরা গুরু-পূজা উৎসবে ।
মলয় বাতাসে গোলাপাদি ফুল ফুটে মঠ-প্রাঙ্গণে,
তৃণ-ভরলতা দোলে আনন্দে, শুক-সারী মাতে গানে ।
জয় গুরু জয় বলি' আজি সবে ব্রাহ্মযুহুর্ভে উঠি',
খোল-করতাল-শঙ্খ-বাজে শ্রীহরি-সঙ্কীর্তনে মাতি ।
আদিগুরু 'ব্রহ্মার' শিষ্য 'নারদ', তদনুকম্পিত 'ব্যাস',
তৎপরম্পরায় 'শ্রীসরস্বতী', তদনুগ 'শ্রীকেশব' ।
ব্রহ্মা হইতে শ্রী-ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের হইয়াছে উদ্ভব,
শ্রীগৌরাজের সেবকবৃন্দ সেই সম্প্রদায়-অনুগত ।
জগদগুরু শ্রীকেশব গোস্বামী একদা উদি' এ'দিনে,
আচারে-প্রচারে শ্রীগৌর-সিদ্ধান্ত জানাইলা ধরাধামে ।
শ্রীগুরু-সমীপে শ্রৌত-বাণীর ক্রমশঃ শ্রবণ-ফলে,
ইন্দ্রিয়-তর্পণাশা টুটে সত্বর শ্রীগুরু-করণা-বলে ।
চিহ্নাম-নিবাসী শ্রীল গুরুদেব, সেখাকার পথ চিনে,
গুরুই মোদেরে লয়ে যেতে পারে সেই জুজের স্থানে ।
শাস্ত্র-বাণী এবং শ্রীগুরু-বচন কভুও ভিন্ন নয়,
শ্রীগুরুদেবের কৃপায় হৃদয়ে প্রেমের সুরণ হয় !
আমাদের গুরু 'বদান্ত সমিতি' স্থাপি' নানা দেশে দেশে,
পতিতে তাপিতে ভক্তি প্রদানি' কোল দিলা স্নেহবশে ।
তাঁহার গুরৈকনিষ্ঠা নেহারি' বিস্মিত জগল্লোকে,
তিনি নিজপ্রাণ তুচ্ছ করি' একদা রক্ষিলা প্রভুপাদে ।

মুঢ় মানুষেরে জ্ঞান দিলা তিনি চৈতন্য-দর্শনালোকে,
 ব্রজ-রস-তত্ত্ব কহিত নিভূতে মরমী ভকত-সাথে ।
 শ্রীবিগ্রহ-সেবা-প্রকাশ, ভক্তিগ্রন্থ লিখনাদি কার্য্য-দ্বারে,
 জগন্দের মাঝে অক্ষয় সুকীর্তি রেখে গেলা চিরতরে ।
 আখ্যা ঋষিগণের প্রবর্তিত দৈব-বর্ণাশ্রম-বিধি,—
 প্রচারিলা তিনি জগৎমাঝারে আমাদের হিত লাগি' ।
 তাঁর অহৈতুকী করুণার কভু অন্ত খুঁজে না পাই,
 তাঁর পদাশ্রয় ব্যতীত মোদের কোনকালে গতি নাই ।
 প্রার্থনা করি তাঁর আনুগত্যে শ্রীনাম-ভজনে মাতি',
 তাঁর গুণ-লীলা গাহিতে গাহিতে এই দেহ যেন ত্যজি' ।
 ভকতি-কুসুমে অঞ্জলি আজি দিয়া তাঁর পূত পদে,
 প্রণমি' জানাই—'জন্মে জন্মে যেন থাকি তাঁর দাস-রূপে' ।

শ্রীগুরু-দাসাভাস—

শ্রীচিত্তরঞ্জন কবিভূষণ

ছয় গোস্বামী

"শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ ।

শ্রীজীব গোপাল-ভট্ট দাস-রঘুনাথ ॥

এই ছয় গোস্বামির করি চরণ বন্দন ।

যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ, অশীষ্ট-পূরণ ॥

এই ছয় গোস্বামির যার মুণ্ডি তাঁর দাস ।

তা' সবার পদরেণু মোর পঞ্চ-গ্রাস ॥

* * * * *

এই ছয় গোস্বামির যবে ব্রজে কৈলা বাস ।

রাধাকৃষ্ণ-নিত্যলীলা করিলা প্রকাশ ॥"—ঠাকুর নরোত্তম

ছয় গোস্বামীর অনুগত শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় তিন শ্রেণীর ব্যক্তিকে ষড়্-গোস্বামী-বিরোধী বা ষড়্-গোস্বামীর প্রতিকূলাচরণকারী বলিয়া কীৰ্ত্তন করিয়াছেন ।

“কন্মী, জ্ঞানী, মিছাভক্ত, না হ'বে তায় অনুরক্ত,
 শুদ্ধভজনেতে কর গম।

ব্রজজনের যেই মত, তা'তে হ'বে অনুরক্ত,
 সেই মে পরমতত্ত্ব ধন :—প্রেমভক্তিচক্রিকা।

ছয় গোস্থামীর সকলেই ব্রজজন; কন্মী, জ্ঞানী ও মিছা ভক্ত—এই সকল ব্রজজনের প্রদর্শিত পথ হইতে ভ্রষ্ট। কন্মীর চিন্তাশ্রোত এই বিহর্জগতে এতদূর আবদ্ধ যে, তাহার কর্মজড়ীয়-কৃতমতি ব্রজজনের অপ্রাকৃত কথা গ্রহণ করিবার কিছুমাত্র যোগ্যতা সঞ্চয় করে নাই। ইহারা অভূতদাবাদী (Elevationist) হইয়া অনেক সময় ষড়্গোস্থামীর চরিত্র ও মতা-লোচনা করিতে প্রয়াসযুক্ত হইলেও—

“অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।”—চৈঃ চৈঃ মধ্য ৯ম

শ্রীমদ্ব্যাকরণপ্রভৃতি এই বাক্যমুদারে ‘ষড়্গোস্থামীর অপ্রাকৃত’ অধোজ্ঞ-চরিত্র তাঁহাদের প্রাকৃত বুদ্ধির গোচরীভূত হয় না। মায়াদেবী ষড়্গোস্থামীর প্রাকৃত স্বরূপের পরিবর্তে তাঁহাদের নিকট উহার বাকৃত প্রতিফলন স্বরূপ স্থায়ীময় অদান্তব বস্তু প্রকাশ করিয়া থাকেন। ঐ সকল প্রাকৃত ব্যক্তি উহাকেই অপ্রাকৃত হরিজনের স্বরূপ বলিয়া ভ্রমে পাতিত হন ও সমশীল অন্যান্য ব্যক্তিগণকে ভ্রমে পাতিত করেন। বর্তমানে অনেক সাহিত্যিক, প্রত্নতত্ত্ববিৎ, ঐতিহাসিক প্রভৃতি কর্মজড় ব্যক্তিগণ “ছয় গোস্থামী”-কে কবিকঙ্কন, কীর্তিবাস প্রভৃতির অন্যতম-মনে করিয়া তাঁহাদের প্রাকৃত চেষ্টামূল্য গবেষণার দ্বারা “ছয় গোস্থামী” সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিতেছেন। ঐরূপ আরোহী-চেষ্টা নাস্তিক-সমাজের নিকট আদরণীয় হইলেও, বৈকুণ্ঠবস্তু ‘ছয় গোস্থামী’ ঐ সকল সাহিত্যিকগণের দ্বারা পরিচ্ছন্ন হইবার যোগ্য নহেন। ভীষ ভগবৎস্মৃতি-ক্রমে স্বরূপবিভাস্ত হইয়া গুণাধর্মরহিত বস্তুকে ‘মাপিয়া লওয়ার’ বা ভোগ করিবার প্রয়াস দেখাইতে পারেন। রাবণ ভগবচ্ছক্তি সীতা দেবীকে ‘মাপিয়া লওয়ার’ প্রয়াস দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু—

ঈশ্বর-প্রেমসী সীতা চিদানন্দমূর্তি।

প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের তাঁরে দেখিতে নাহি শক্তি ॥

রাবণ আসিতে সীতা অন্তর্দান কৈল।

রাবণের আগে মায়াসীতা পাঠাইল ॥—চৈঃ চৈঃ মধ্য ৯ম

কর্মজড্ব্যক্তিগণের যে অধোক্ষজ কৃষ্ণশক্তি ও গৌরশক্তিগণকে মাণিয়া লইবার প্রয়াস তাহাও এইরূপই। তাহারা বহিরঙ্গা শক্তির স্বরূপ বলিয়া ভ্রান্ত হন। এইরূপ বিবর্তজ্ঞান তাহাদের দুষ্করিকলেই উদিত হইয়া থাকে—

“ন মাং দৃষ্টিভিনে মূঢ়াঃ প্রপত্তস্তে নরাধমাঃ।

মায়ায়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ।”—গীতা ৭।১৫

অসুরান্বাশিত অর্থাৎ বাহারা ভগবান্ ও ভক্তের নিত্য চিহ্নলাস ও তাঁহাদের নিত্য স্বরূপকে অসুর প্রবৃত্তি যুক্ত হইয়া আক্রমণ করিবার চক্রবৃদ্ধি পোষণ করেন (শ্রীবলদেব টীকা)। তাহারা ব্রহ্মজন ‘ষড়্-গোস্বামীর স্বরূপ উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। যাহাদের নিকট স্ব-স্ব গুরুগণেরই নিত্য সত্তা নাই, তাহারা কি করিয়া জগদাকুরবর্গের অধোক্ষজচরিত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন? সুতরাং ‘ছয় গোস্বামী’র মত তাহাদিগের ধারণার বিষয়ীভূত হইতে পারে না। তাহারা ‘ছয় গোস্বামীর’ পদাঙ্কিত পথকে সাম্প্রদায়িকতা; ‘ছয় গোস্বামীর’ নামোচ্চারণকে কোন সম্প্রদায়বিশেষের অন্ধবিশ্বাসজনিত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস, ছয় ‘গোস্বামীর’ মাহাত্ম্য-কীর্তনকে সাম্প্রদায়িক-গৌড়ামি বা অর্থবাদ প্রভৃতি কল্পনা করিয়া গীতোক্ত ভগবদ্বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া থাকেন।

আর এক শ্রেণীর লোক “মিছাভক্ত” নামে খাত। তাহারা ভক্তের ‘মুখোম’ পরিধান করেন, যাত্রার দলের রাসা বাগ্দির ন্যায় নারদ ঋষির অভিনয় করেন, পরমহংসবৈষ্ণবের বেশ লইয়া নানা প্রকার পাষণ্ডতা করেন, লোকদেখান মাজাতিলক, ঝোলা ধারণ, দণ্ডবতের-ছড়াছড়ি, তুণাদপি ভাণে চল কবিতা কপট অকুণ্ডলভাব প্রদর্শন, ঠাকুর মহাশয়ের কীর্তিত ‘ছয় গোস্বামীর ভজনগান প্রভৃতি’কে ভোগোন্মুখ-ইন্দ্রিয়দ্বারা অনুকরণ, কার্যতঃ ‘ছয় গোস্বামীর’ বিরোধ করিয়া, মিছা রূপানুগত প্রচার করিয়া গোমতে নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণ-বিধানের জন্য ‘ছয় গোস্বামীর’ নাম বলিতে বলিতে সততঃ দণ্ডব্রজ (৫) প্রদর্শন, কপটাক্রম বিসর্জন করিয়া থাকেন। কখনও বা ‘ছয় গোস্বামীর’ বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠাতে ভোগবুদ্ধি পরবশ হইয়া রাবণের ছায় ‘জড়-প্রতিষ্ঠার’ লোভে বেযোপজীবী হইয়া থাকেন, রূপানুগ-ধর্মকে গোকেব নিকট বিপন্ন করিবার জন্ত একরূপ জড়-লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা ও “লোক-দেখান-গোরাভজা” এবং প্রাকৃত বুদ্ধি পূর্ণমাত্রায় থাকা সত্ত্বেও অপ্রাকৃত রাধাগোবিন্দভক্তনের চল প্রদর্শন করাকেই ‘ষড়্-গোস্বামী’র মতানুসরণ বলিয়া গ্রাহ্যবধন করিয়া থাকেন। আর বাহারা রূপানুগ

আচার্য্য শ্রীল জীব গোস্বামী, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীল ঠাকুর মহাশয় প্রভৃতির আচার ও প্রচার প্রদর্শন করিয়া বলেন,—

“অসংলগ্ন ত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার।

শ্রীমদ্ভী এক অসাধু কৃষ্ণভক্ত আর” ॥

* * * *

না করিও অসং চেষ্টা, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা,

সদা চিন্ত গোবিন্দ-চরণ।

* * * *

কর্মী জ্ঞানী মিছাভক্ত না হবে তার অহরক্ত

গুরুভজনেতে কর মন ॥”

তঁাহাদিগকে ঐ সকল মিছাভক্তসম্প্রদায় ‘ষড়্-গোস্বামীর’ আনুগত্য-রহিত বলিবার ঝুঁট। পর্য্যাপ্ত দেখাইয়া তঁাহাদের কপট নাট্য করিতে করিতে অপরাধসাগরে পতিত হন।

মিছাভক্তসম্প্রদায় বেষোপজীবিকা, কপট অশ্রমোচন, নিসর্গপিচ্ছিল ভাবপ্রবণতা, ব্যভিচার, লাম্পট্য প্রভৃতিকে রূপানুগত; গৃহব্রত ধর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া শোণিতশুক্লজাত দেহকেই ‘ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব’ (?) এবং ভক্তির সহিত বিরোধ করিয়া কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্তের পদাবলেহনকে “হয় গোস্বামীর” প্রদর্শিত পথ বলিয়া মনে করেন! ইহাই কি রূপানুগত বা ‘ষড়্-গোস্বামীর’ মতানু-বর্ত্তন? শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু উপদেশায়ুতের—

“বাচো বেগং ননসঃ ক্রোধবেগং

জিহ্বাবেগং উদরোপস্থবেগম্।

এতান্ বেগান্ যো বিবহেত ধীরঃ

সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাত্ ॥”

এই শ্লোকে ষড়্বেগ বা ইন্দ্রিয়ের দাসত্বকেই কি গোস্বামিত্ব বলিয়াছেন? শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু ভক্তিরসায়ুতসিদ্ধ গ্রন্থে—

“নিসর্গপিচ্ছলস্বাস্ত্বে তদভ্যাসপরেছপি চ।

সত্বাভ্যাসং বিনাপি স্যঃ কাপ্যশ্রপুলকাদয়ঃ ॥”

এই শ্লোকে কপট লোকের জলকেট কি তদীয় আনুগত্য বলিয়া প্রচার করিয়াছেন? রূপানুগ শ্রীপাদ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধের “যদশাসারম্” শ্লোকে শ্রীরূপপাদের ঐ শ্লোক উদ্ধার করিয়া ঐরূপ কপটতাকেই কি ‘রূপানুগত’ বলিয়া শিক্ষা দিয়াছেন? শ্রীল রূপপাদ—

“অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিচ্ছিয়ৈঃ ।

সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্মরত্যাদঃ ॥”

এই শ্লোকে অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণের নামরূপগুণলীলাকে কি প্রাকৃত ভোগোন্মুখ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিয়াছেন এবং নামাপরাধের প্রশয় প্রদানকেই কি রূপানুগত বলিয়াছেন? অথবা শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু—

‘যদবধি যম চেতঃ কৃষ্ণপাদারবিন্দে নবনবরসধামনুদতং বজ্রমাসীৎ ।

তদবধি রক্ত নারীসঙ্গমে স্মর্যামানে ভবতি মুখবিকারঃ সূচুনিষ্ঠীবনঞ্চ ॥

(ভঃ বঃ দক্ষিণ ৫।৩২)

—এই শ্লোকে কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠাসক্তিকেই কি ভজনাহরক্তি বলিয়া কীৰ্ত্তন করিয়াছেন? শ্রীরূপসনাতন কি শুক্রেশোণিতজাত দেহকেই গোষামিত্ত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন? ষড়্ গোস্বামীর মধ্যে একজনও কি চ্যুতবংশ-পরম্পরায় গোষামিত্ত স্বীকার করিয়াছেন? ছয় ‘গোস্বামীর’ একজনও কি গৃহব্রতধর্ম, মন্ত্রব্যবসায়, শিষ্যব্যবসায়, গৃহব্রত ধর্মযাজন করিয়া, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করিয়াছেন? জীপুলে, সংসারে অভিনিবিষ্ট থাকিয়া পরমহংস-বেষণারী ব্যক্তিগণের দ্বারা পাচকের কার্য্য, তামাক, গাঁজা সাজাইবার ভূতোর কার্য্য, পাদসংবাহন প্রভৃতি কার্য্য করাইয়া পরমহংস-বেষ বা গোষামী-বেষের অবমাননা করিয়াছেন? ছয় গোস্বামীর একজনও কি কর্ম্মজন্মস্মার্ত্তহুগ্ণা প্রভৃতি ভক্তিপরিপুষ্টী আচার বা প্রচার করিয়াছেন?

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু দিগদর্শিনী টীকায় পঞ্চরাত্নোক্ত—
“অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন যন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ ।

পুনশ্চ বিধিনা সম্যক্ গ্রাহ্যেদ্ বৈষ্ণবাদ্ভরোঃ ॥” (১।৭১)

—অবৈষ্ণবের উপদিষ্ট যন্ত্রের দ্বারা পুরুষ নিশ্চয়ই নরকগামী হয়, অতএব পুনরায় তাহাকে যথাবিধি কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদ্গুরুর নিকট সম্যক্ প্রকারে দীক্ষা গ্রহণ করাইবে ।”

“বিষয়শূন্যাসক্তানাং তাদৃশ জ্ঞানং দুর্ঘটমেবেতি * * দুঃখসাগর তরণেচ্ছয়াপি ভক্তিং বাঞ্ছনু সদ্গুরুমপেক্ষত ।” (১।২৪)

অর্থাৎ “বিষয়শূন্যসক্ত ব্যক্তিগণের হৃৎপ্রভ মনুষ্যজন্মে যে একমাত্র ভগবত্ত্বক্তি অর্জন ব্যতীত অপর কোনও কর্তব্য নাই এইরূপ জ্ঞান অতীব দুর্ঘট। সুতরাং তাহাদের দুঃখসাগর উত্তীর্ণ হইবার ইচ্ছা ভক্তিপূহা থাকিলে সদ্গুরু ব্যতীত অন্য কোন প্রকারেই সুবিধা হইতে পারে না ।” (ক্রেমশঃ)

সংস্কার

(পূর্বপ্রকাশিত ৩২শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৬৬ পৃষ্ঠার পর)

প্রাক্তন সংস্কার হইতে কর্মসঙ্গ ও জ্ঞানসঙ্গ হয় ; এই সংস্কারসঙ্গ অত্যন্ত অপরিহার্য। বহুচেষ্ঠা, এমন কি, আত্মঘাত পর্যন্ত পরিহাও সংস্কার ত্যাগ করিতে পারা যায় না। এই জন্যে সঙ্গক্রমে যে সংস্কার বা গুণাসক্তি লাভ করা যায়, তাহাকে আধুনিক সংস্কার বলি। এই দুই প্রকার সংস্কারে জগজ্জীব বশীভূত। জীব মায়াতে যখন বদ্ধ থাকেন না, তখন তাঁহার যে স্বভাব, তাহা নির্মল কৃষ্ণ-বাস্য। মায়াতে বদ্ধ হইয়া প্রাক্তন ও আধুনিক কুসংস্কারকে ত্যাগ করিতে পারেন না, তখন প্রাক্তন-জনিত কুসংস্কার তাঁহার দ্বিতীয়-স্বভাব বা নিসর্গ হইয়া উঠে। সাধুসঙ্গই এই সংস্কারাসক্তিকে শোধন করিতে পারেন। সাধুসঙ্গই এই রোগের একমাত্র ঔষধি। সংস্কারসঙ্গ শোধন করিতে না পারিলে কোনক্রমেই ভক্তিসিদ্ধি হইতে পারে না। যথা তৃতীয় স্তোকে,—

সঙ্গো যঃ সংসৃতের্হেতুরসংস্র বিহিতোহবিয়া ।

স এব সাধু কৃতো নিঃসঙ্গস্য কল্পতে ।

অসদব্যক্তিতে যে সঙ্গ করা হয়, তাহাতেই জীবের সংসৃতি ঘটে। অসংকে অজ্ঞানে সঙ্গ করিলেও সেই ফল অবশ্য হইবে। সেই সঙ্গ যদি প্রকৃত সাধুতে অজ্ঞানেও করা হয়, তদ্বারা নিঃসঙ্গত্বের উদয় হয়। পুনশ্চ একাদশ স্তোকে শ্রীভগবদুক্তি,—

ন রোধয়তি মাং যোগো সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব ।

ন দ্বাধ্যায়ন্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্তং ন দক্ষিণা ॥

ব্রতানি যজ্ঞচন্দ্রাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ ।

যথাহবরুদ্ধে সংস্রঃ সর্বমঙ্গাপহো হি মাম্ ॥

সংস্কারসঙ্গ অতিশয় দুষ্ট। অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্যবিজ্ঞা, বর্ণাশ্রমধর্ম, বেদাধ্যয়ন, তপস্বা, সন্ন্যাস, ইষ্টাপূর্ত, দান, দক্ষিণা, ব্রতসমূহ, যজ্ঞ, তীর্থপর্যটন, যম, নিয়ম—এই সকল সংকর্ম বহুকাল অচলিত হইলেও সঙ্গ-দোষশূন্য হইয়া জীব আমাদের পায় না। কিন্তু কেবল সংসঙ্গক্রমে ঐ দোষ দূর হইলে ঘনি ভক্ত-হৃদয়ে শীঘ্র আবদ্ধ হই। শুদ্ধ ভগবন্তরূপিণকে আদর করিয়া তাহাদের সঙ্গ করিলে কর্মসঙ্গ ও জ্ঞানসঙ্গরূপ সংস্কার-

সঙ্গদোষ দূর হয়। এষ্ট সংস্কার-সঙ্গদোষেই রাজস ও তামস-প্রবৃত্তি জীবে প্রবলা হয়। শয়ন, ভোজন, ইন্দ্রিয়ক্রিয়া-সম্বন্ধে মহত্বাদিদের যে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক প্রবৃত্তি দেখা যায়, সে-সমস্তই সংস্কারগত। এই সংস্কার-আসক্তি হইতেই বশ্মী ও জ্ঞানীদিগের বৈষ্ণবাবজ্ঞার উদয় হয়। যতদিন এই সংস্কারাসক্তি দূর না হয়, ততদিন দশটী নামাপরাধ নির্মূল হয় না। কর্ম্ম-ভিমান ও জ্ঞানভিমান হইতেই সাধুদিগের চরণে অপরাধ হয়। স্তব্রাং সাধু-নিষ্কারুণ নামাপরাধ আসিয়া অভ্যেকের হৃদয়ে বাস করে। ক্রোধ একেশ্বর-বুদ্ধির বিরোধী হইয়া সংস্কারাসক্তিই দুর্ভাগা জীবেক অনগ্রসর হইতে দেয় না। গুরুবজ্ঞা, শ্রুতিনিদা, নামে অর্থবাদ, ভগবন্মায়ের সহিত অন্য শুভকর্ম্মের সাম্য-বুদ্ধি, নামবলে পাপাচরণ, অহংতা-মহতাজনিত বৈমুখ্য, নাম অপাত্রে বক্রধ—এই সকল নামাপরাধ হইতে থাকে। সেই স্থলে আর জীৱের মঙ্গল-কিরণে হইতে পারে? অতএব বলিয়াছেন,—

অসত্তিঃ সহ সঙ্গস্ত ন কর্তব্যঃ কদাচন।

যন্মাংস সর্কার্থহানিঃ স্যাদধঃপাতশচ জায়তে ॥

কিছুদিন বিশুদ্ধ বৈষ্ণবঙ্গ করিতে করিতে সংস্কারাসক্তি দূর হয়, তাহা অনেক ভাগ্যবান ব্যক্তিকে দেখা গিয়াছে। নারদ-মঙ্গে ব্যাধ ও রক্তাকবের মঙ্গল হইয়াছিল, ইহা শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে। শ্রীরামাহুজাচার্য্যের চরম উপদেশ এই,—যদি তুমি আপনাকে কোন চেষ্টায় শুদ্ধ করিতে পার না, তবে বৈষ্ণবদিগের নিকটে গিয়া বসিয়া থাক, তাহা হইলে তোমার সকল মঙ্গল হইবে। বৈষ্ণবদিগের সংস্কৃত ভক্তচরিত্র দেখিতে দেখিতে অল্পদিনের মধ্যেই মন ফিরিয়া যায়, বিষয়াসক্তি খর্ব্ব হয়, ভক্তির অঙ্গুর হৃদয়ে উদয় হয়; এমন কি, আহার-বিহার-সম্বন্ধেও ক্রমে ক্রমে বৈষ্ণব-রুচি হইয়া পড়ে। বৈষ্ণবসঙ্গে থাকিতে থাকিতে অনেক লোকের স্ত্রীসঙ্গ-রুচি, অর্থ-পিপাসা, ভুক্তি-খুক্তি-বাহু, কর্ম্ম-জ্ঞানের প্রতি আদর, মংস্য-মাংস-মত্ত-তামাক-ধূতপান ও তাবুলসেবন-স্পৃহা ইত্যাদি অনর্থ দূর হইয়াছে, ইহা আমরা দেখিয়াছি। বৈষ্ণবের অব্যর্থকালত্ব-ধর্ম্ম দেখিয়া অনেকে আলস্য, নিদ্রা ধিক্য, বৃথা জল্পনা, বাক্যাদির বেগ প্রভৃতি অনর্থ-সকল অনায়াসে দূর করিয়াছেন। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, বৈষ্ণব-সংসর্গে কিছুদিন থাকিতে থাকিতে কাহারও কাহারও শাঠ্য ও প্রতিষ্ঠাশাও দূর হইয়াছে। একটু আদরের সহিত বৈষ্ণবসঙ্গ করিলে সংস্কার, আসক্তি প্রভৃতি সকল

সঙ্গই দূর হয়, ইহাও আমরা সচক্ষে দেখিয়াছি। যুদ্ধে জয়-পিপাসায় আসক্ত, রাজ্যলাভের জন্য বিশেষ কুশল, প্রচুর ধন-সঞ্চয়ের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল ব্যক্তিগণের চিত্ত শুদ্ধ হইয়া বৈষ্ণবসঙ্গে কক্ষভক্তি লাভ হইয়াছে। এমন কি, বিতর্কে জগৎকে পরাস্ত করিয়া দিগ্বিজয়ী হইব, এক্রপ তুরভি-সন্ধিযুক্ত ব্যক্তিদিগের চিত্ত স্থির হইয়াছে। বৈষ্ণবসঙ্গ ব্যতীত সংস্কারাসক্তি শোধনের উপায়ান্তর দেখি না।

দ্রব্যাসক্তিগুলি পরিত্যাগ করিবার বিশেষ যত্ন করা উচিত। গৃহদ্বারে, ব্যবহার্য্য দ্রব্যে, অলঙ্কার-বস্ত্রে, অর্থে, স্ত্রী-পুত্রাদির শরীরে, নিজ শরীরে, ভোজ্যবস্তুতে, বৃক্ষ, পশু প্রভৃতিতে গৃহী লোকের নিমগ্নমিচ্ছ আসক্তি আছে। কোন কোন লোকের ধূম্রপানে, তাব্দুল ভোজনে, মৎস্ত মাংসাদিতে এবং মাদক-বস্তুতে এতদূর আসক্তি হয় যে, পরমার্থ-সাধনে তাহা প্রতিবন্ধক হইয়া পড়ে। অনেক লোক মৎস্যাদির লোভে ভগবৎপ্রসাদাদিতে আদর করেন না। ধূম্রপানে মুহুমূহু স্পৃহা দ্বারা অনেকের ভক্তিগ্রন্থ পাঠ, শ্রবণ, কীর্তনাদি আবাদন, দেবমন্দিরে বহুক্ষণ-অবস্থিতি নিবারিত হয়। মিরস্তুর কৃষ্ণানুশীলনে ঐ সকল দ্রব্যাসক্তি বড়ই বিরোধী। বহু যত্নপূর্ব্বক সে-সকল সাধুসঙ্গে ঐ সকল দ্রব্যাসক্তি অনায়াসে দূর হয়। তথাপি ভক্তিপূর্ণ-চেষ্টা দ্বারা ঐ সকল ক্ষুদ্রাসক্তিকে দূর করিতে চেষ্টা করা চাই। ভগবন্ত-সম্মত ব্রতচরণ দ্বারা ঐ সকল দূরীভূত হইয়া থাকে।

হরিবাসরত্ন ও জমুস্ত্রীত্ন স্তম্বরূপে পালন করিলে ঐ সকল আসক্তি যায়। ব্রত-নিয়ম-পালনেই আসক্তিস্বয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। ঐ সকল ব্রতদিবসে সর্ব্বভোগ-বিবজ্জিত হইয়া ভজন করিবার বিধি আছে। ভক্ষ্য-দ্রব্য হই প্রকার অর্থাৎ প্রাণরক্ষক ও ইন্দ্রিয়তোষক। অন্ন-পানাদি দ্রব্য—প্রাণরক্ষক। মৎস্ত, মাংস, তাব্দুল, মাদকদ্রব্য, তাম্রকুটাди ধূম্রপান—এই সমস্ত ইন্দ্রিয়তোষক। ব্রতদিনে ইন্দ্রিয়তোষক দ্রব্য একেবারে পরিত্যাগ না করিলে ব্রত হয় না। যতদূর সাধ্য, প্রাণরক্ষক দ্রব্যসমূহও পরিত্যাগ করা উচিত। শরীরের অবস্থানুসারে যে অন্নকল্পের বিধান, তাহাতে প্রাণরক্ষক দ্রব্যসকলের ব্যবহারে যতদূর সঙ্কোচ হইতে পারে, তাহা করা চাই। ইন্দ্রিয়তোষক দ্রব্যের অগ্নিকল্পাদি নাই, পরিত্যাগই বিধি। ভক্ষ্য-জীবের ভোগপ্রবৃত্তি-খর্ব্বাভ্যাসই ব্রতের একান্ত। যদি এইরূপ মনে হয় যে, কষ্টেসৃষ্টে ক্ষুদ্র ত্যাগ করি, আবার কল্য সেই দ্রব্য যথেষ্ট ভোগ

কাঁৰিব, তবে ত্রুতের তাৎপর্য্য সিদ্ধি হইবে না। কেননা, ক্রম-অভ্যাসের দ্বারা ঐ সকল দ্রব্যসঙ্গ পরিভ্যাগ কঠিবার জন্ত ত্রুতসকল নির্ণীত হইয়াছে। ত্রুতগুলি প্রায় দিবসত্রয়ব্যাপী। এইরূপ দিবসত্রয় সঙ্গরোধ কাঁৰিতে করিতে একমাসব্যাপী ও চাতুৰ্ম্মাস্ত্রব্যাপী ত্রুতের দ্বারা ক্রমশঃ সঙ্কে নিৰ্ম্মূল করিয়া সেই সেই দ্রব্য বা ব্যবহার হইতে চিরকালের জন্য বিদায় লইতে হইবে। ত্রুতপালনে যাহারা “ক্ষিপ্রং ভবতি ধৰ্ম্মাত্মা”—এই গীতা-বচনের তাৎপর্য্য মনে থাকে না, তাঁহাদের বৈরাগ্য কেবল কুঞ্জর-জ্ঞানবৎ ক্ষণস্থায়ী।

যাহারা শুদ্ধভক্তি পাইবার আশা করেন, তাঁহাদের পক্ষে অভক্তসঙ্গ ও যৌষিৎসঙ্গরূপ সংসর্গদ্বয় একেবারে বর্জনীয়। তাঁহাদের পক্ষে সংস্কার-ভাসক্তি পরিভ্যাগ কঠিবার জন্ত সাধুসঙ্গের নিত্যান্ত প্রয়োজন। দ্রব্যাসক্তি দূরীকরণের জন্য তাঁহাদের পক্ষে বৈষ্ণব-ত্রুতসমুদয় পালন করা আবশ্যিক। এই সকল কার্য্য হেলা-ফেলা করিয়া করা কর্তব্য নয়। বিশেষ যত্নাগ্রহের সহিত আদরপূর্ব্বক করা আবশ্যিক। আদরপূর্ব্বক না করিলে কুটিনাটিক্রূপ কপটতা আসিয়া কার্য্যসমুদয় নিৰ্ম্মূল করিয়া দেয়। এই বিষয়ে যাহাদের আদর নাই, তাহাদের পক্ষে অনেক জন্ম শ্রবণ করিয়াও হরিভক্তি অদূৰ্দ্ধতা হইয়া পড়েন।

কি করিলে সঙ্গত্যাগ ও সঙ্গ হয়, এই বিষয়ে অনেকের সংশয় হয়। সংশয় হইতে পারে; কেননা, কেবল অসদ্ব্যক্তির বা বস্তুর নিকটস্থ হইলেই যদি সঙ্গ হয়, তবে সঙ্গত্যাগের উপায় থাকে না। যে পর্য্যন্ত জড়ধরীর আছে, ততদিন অসন্নৈকট্য কিরূপে ত্যাগ হইতে পারে? পারিবারিক ব্যক্তিগণকে গৃহস্থধৈর্য্য কিরূপে ত্যাগ করিবেন? কপটবৈশাখী ব্যক্তিকে গৃহত্যাগী হইলেও ত্যাগ করা যায় না। গৃহে থাকুন বা বনে থাকুন, জীবন-নির্ব্বাহের জন্য অবশ্যই অসদ্ব্যক্তির নিকট আসিতে হইবে। অতএব অসদ্ব্যক্তির সঙ্গত্যাগের সীমা-স্বল্পে উপদেশামূলে এইরূপ বিধি হইয়াছে,—

দদাতি প্রতিগৃহাতি গৃহমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।

ভুক্তে ভোজ্যতে চৈব ষড়বিধং প্রীতিসঙ্গমঃ ॥

হে সাধকগণ! দেশযাত্রা-নির্ব্বাহে সং ও অসদ্ব্যক্তি উভয়ের নৈকট্য অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। ইহাতে গৃহী ও গৃহত্যাগী উভয়েরই সমানতা। নৈকট্য অবশ্যই ঘটবে, তথাপি অসতের সঙ্গ করা হইবে না। দান,

প্রতিগ্রহ, পরস্পর গুঢ় জল্পনা ও পরস্পর ভোজনাদি-স্বীকার-কার্যে যদি প্রীতি করা হয়, তবে সঙ্গ হয়। ক্ষুধিতাতুর ব্যক্তিকে যাহা দেওয়া যায় এবং ধার্মিক দাতার নিকট হইতে যাহা কিছু লওয়া যায়, সে-সকল কর্তব্য-বোধে করা মাত্র, প্রীতির সহিত করা যায় না। তাহারা অসৎ হইলেও তৎকার্যে তাহাদের সঙ্গ হয় না। তাহারা শুদ্ধবৈষ্ণব হইলে সেই কার্যে প্রীতি হয়, প্রীতি করিলে সঙ্গ হয়; সুতরাং শুদ্ধবৈষ্ণবের প্রতি দান ও তাঁহাদের নিকট হইতে দ্রব্য বা অর্থগ্রহণে সংসঙ্গ হয়; অসতের প্রতি দান ও অসতের নিকট হইতে গ্রহণ যদি প্রীতিসহকারে হয়, তবে অসংসঙ্গ হইয়া পড়ে। অসদ্ব্যক্তি নিকটে আসিয়াছে, তাহার সহিত যে কর্তব্যকর্ম আবশ্যক হয়, তাহা কেবল কর্তব্য-বোধে করিবে। পরস্পরের গুঢ় কথার জল্পনা করিবে না। গুঢ় জল্পনায় প্রায়ই প্রীতি থাকে। তাহাতে সঙ্গ হয়। নিতান্ত সংসারী বান্ধবদিগের মিলনে আবশ্যক বার্তামাত্র করিবে, হৃদয়ের প্রীতি তখন না করাই ভাল। তবে যদি সেই বান্ধব সাধু-বৈষ্ণব হন, তবে সেই বার্তা প্রীতিসহকারে করিয়া তাঁহার সঙ্গ স্বীকার করিবে। কুটুম্ব-বান্ধবের সহিত এইরূপ ব্যবহার করিলে কোন বিরোধ হইবে না। ব্যবহারিক বার্তায় সঙ্গ হয়। বান্ধবে দ্রব্য ক্রয়-সময়ে যেকোন নূতন ব্যক্তির সহিত কেবল বাহ্য-ব্যবহার করিতে হয়, সেইরূপ ব্যবহার সাধারণের সঙ্গে করিবে। শুদ্ধভক্তের সহিত সেই সেই ব্যবহারেও প্রীতি-প্রদর্শনপূর্বক সঙ্গ করিবে। ক্ষুধিত, আতুর, বিছা ব্যবসায়ীদিগকে আবশ্যক ভোজন করাইতে হইলে অতিথি-ব্যবহারে তাহা সম্পন্ন করিবে। বিশেষ প্রীতি করিবার প্রয়োজন নাই। যত্ন কর, কিন্তু প্রীতি করিও না। শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণকে প্রীতিসহকারে ভোজন করাইবে এবং আবশ্যক হইলে প্রীতি-সহকারে তাঁহাদের প্রদত্ত প্রসাদ-ভোজন গ্রহণ করিবে। স্ত্রী, পুত্র, দাস, দাসী, আগন্তুক ব্যক্তি এবং যাহার নিকট বাইতে হয়, সকলের সহিত দান, গ্রহণ, জল্পন ও ভোজনাদি এইরূপ ব্যবহার বিচার করিতে পারিলে অসং-সঙ্গ হইবে না, বরং সংসঙ্গ হইবে। এইরূপ অসংসঙ্গ ত্যাগ না করিলে কৃষ্ণভক্তিলভের কোন আশা নাই। গৃহত্যাগী বৈষ্ণব সদৃশ্বের গৃহে মাধুকরী যাহা পান, এই বিচারের সহিত তাহাই গ্রহণ করিবেন। মাধুকরী ও স্থলভিক্ষায় যে ভেদ আছে, তাহা সর্বদা মনে রাখিবেন। গৃহস্থবৈষ্ণব সচ্চরিত্র গৃহস্থের বাটীতে প্রসাদ-অন্ন-পান গ্রহণ করিবেন। অশুভ ও

অসচ্চরিত্র ব্যক্তির বাটীতে সর্বদা সাবধানে প্রসাদ পাইবেন। এই বিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাট। ষাঁহাদের স্বকৃতি অনুসারে ভক্তিতে শ্রদ্ধা হইয়াছে; কৃষ্ণকৃপায় তাঁহাদের কিয়ৎপরিমাণে বুদ্ধিযোগ উদয় হয়। সেই বুদ্ধিক্রমে অচার্য্যাদিগের উপদেশের মর্ম্ম অনায়াসে বুঝিতে পারেন। সুতরাং স্বলক্ষণে তাঁহাদের প্রতি উপদেশ দেওয়ার প্রয়োজন। ষাঁহাদের স্বকৃতি নাট, তাঁহাদের শ্রদ্ধা নাই। অধিক করিয়া বলিলেও তাঁহারা কোনপ্রকারে বুঝিবেন না। অতএব শ্রীউপদেশামৃতে শ্রীকৃষ্ণ গোষামৌ প্রভু স্বলক্ষণে ভক্তনের উপদেশ দিয়াছেন।

প্রাপ্ত-পত্র

শ্রীল গোড়ীয়-সম্পাদক মহোদয় শ্রীশ্রীচরণকমলেশু—অশেষ-দণ্ডবদন্তি
পুরঃসরঃ-বেদনম্—

নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রশ্নের নানাপ্রকার কাল্পনিক মীমাংসা করিয়া কেবল মনোবশ্মের প্রসার বৃদ্ধি করিতেছি, সুসিদ্ধান্তের অভাবে হৃদয়ে বিন্দুমাত্র শাস্তি অনুভব করিতে পারিতেছি না। ইহার নির্মূল্যস্বরূপ কৈতবশূন্য উত্তরের স্বাক্ষর্য্যে শ্রীগোড়ীয় মঠের বৈষ্ণববৃন্দের চরণে শরণাগত হইলাম। আশা করি তাঁহাদের কৃপাকণালাভে বঞ্চিত হইব না।

১। চারিসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্য্যগণের দার্শনিক মত কি? 'দ্বৈত'-
'অদ্বৈত'-বিশিষ্টাদ্বৈত' প্রভৃতি দার্শনিক পরিভাষার সম্যক্ অর্থ কি? পরস্পরের মধ্যে এবং শ্রীমগ্নহাপ্রভুর প্রচারিত অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের সহিত কোন্ অংশে পার্থক্য ও কোন্ অংশে ঐক্য?

২। দীক্ষাগ্রহণের পর হইতে কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণসেবায় প্রবৃত্ত হওয়া কর্তব্য। ভগবদুচ্ছিষ্ট বাতীত জড়রসে উদরভরণের চেষ্টা সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করা কর্তব্য। সুতরাং জিজ্ঞাস্য এই—গৃহস্থের পক্ষে যে সমস্ত অশৌচ প্রতিপালনের ব্যবস্থা আছে, ঐ সমস্ত অশৌচ উপস্থিত হইলে দীক্ষিত-গৃহস্থগণ বিয়ু-নৈবেদ্যপাকের কিরূপ ব্যবস্থা করিবেন? বৈষ্ণব অবশ্য অমেধ্যতুল্য অনিবেদিত বস্তু গ্রহণ করিতে পারেন না। অশৌচ-কালে দীক্ষিত স্ত্রীলোকগণই বা কি করিবেন?

৩। শ্রীপ ঠাকুর মহাশয়ের নিম্নলিখিত বাক্যের অর্থ কি ?

“ধন মোর নিত্যানন্দ, পতি মোর গৌরচন্দ্র,

প্রাণ মোর যুগল-বিশোর।

অদ্বৈত আচার্য্য বল, গদাধর মোর কুল,

নরহরি বিলসই মোর ॥”

বৈষ্ণবদাসানুদাস—

শ্রীফণিভূষণ বসু

উত্তর

১। চারি-দম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্য্যগণের দার্শনিক মত একটী ক্ষুদ্র-প্রবন্ধে ব্যক্ত করা সম্ভব নহে। প্রবন্ধান্তরে চারি বৈষ্ণবাচার্য্যের দার্শনিক মত ও শ্রীমন্নুহাপ্রভুর অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্বের সহিত তুলনা বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীল ভক্তবিনোদ ঠাকুর “শ্রীশ্রীমন্নুহাপ্রভুর শিক্ষা” নামক গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন—

“বেদ ও বেদান্ত আলোচনা-পূর্ব্বক আচার্য্যগণ দুই প্রকার সিদ্ধান্ত করেন। দত্তাক্ষেয়, অষ্টাবক্র, দুর্লাসা প্রভৃতি ঋষিগণের অনুগত সিদ্ধান্ত লইয়া শ্রীমচ্ছঙ্খরাচার্য্য কেবলাদ্বৈত মত প্রচার করেন। তাহাই এক প্রকার সিদ্ধান্ত। নারদ, প্রহ্লাদ, ঋব, মহু প্রভৃতি মহাত্মাদিগের অনুগত সিদ্ধান্ত অনুসারে বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব প্রচার করেন। তাহাই দ্বিতীয় প্রকার সিদ্ধান্ত। ভক্তিসিদ্ধান্ত চারিপ্রকার, তাহার বিবরণ এই,—

(১) শ্রীরামানুজাচার্য্য বিশিষ্টাদ্বৈত-মতে ভক্তি প্রচার করেন (২) শ্রীমধ্বাচার্য্য শুদ্ধদ্বৈত-মতে ভক্তি প্রচার করেন। (৩) শ্রীনিম্বাদিত্যাচার্য্য দ্বৈতাদ্বৈত-মতে ভক্তি প্রচার করেন। (৪) শ্রীবিশ্বনামী শুদ্ধাদ্বৈত-মতে ভক্তি প্রচার করেন। চারিজনেই শুদ্ধভক্তির প্রচারক।

(১) শ্রীরামানুজ-মতে ‘চিং’ ও ‘অচিং’ এই দুই বিশেষণে বিশিষ্ট হইয়া একমাত্র ঈশ্বরই বস্তু। (২) শ্রীমধ্ব-মতে ‘জীব’ ‘ঈশ্বর’ হইতে পৃথক্ তত্ত্ব কিঙ্ক ঈশ-ভক্তিই তাহার স্বভাব। (৩) শ্রীনিম্বাদিত্য-মতে ‘জীব’ ‘ঈশ্বর’ হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ। অতএব ভেদেরও নিত্যতা স্বীকৃত। (৪) শ্রীবিশ্বনামী-মতে বস্তু এক হইলেও বস্তুতঃ ব্রহ্মতা ও জীবতা নিত্য-পৃথক্। এরূপ

পরস্পরের ভেদ থাকিলেও তাঁহারা সকলেই ভক্তির নিত্যত্ব, জীবের নিত্য-
দাস্য ও চরমে প্রেমগতি স্বীকার করিয়াছেন। অতএব সকলের মূলতত্ত্বে
'বৈষ্ণব'। মূলতত্ত্বে বৈষ্ণব হইলেও তাঁহাদের বিজ্ঞান একটু একটু পৃথক্
থাকায় অসম্পূর্ণ ছিদ্র। সাফাৎ ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইয়া সেই
বৈজ্ঞানিক-অসম্পূর্ণতা দূর করত বিজ্ঞান-গুহ্যভক্তিতত্ত্ব জগতে শিক্ষা
দিয়াছেন।

শ্রীজীবগোষ্ঠায়ী সর্বদাস্যাদিনী গ্রন্থ এই মতকে 'অচিন্ত্য-ভেদা-
ভেদাত্মক' বলিয়া লিখিয়াছেন। নিম্নাৰ্কমতে যে ভেদাভেদ অর্থাৎ দ্বৈতাদ্বৈত
মত—তাহা পূর্ণতা লাভ করে নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা লাভ করিয়া বৈষ্ণব-
জগৎ সেই মতে পূর্ণতাকে পাইয়াছেন। শ্রীমদ্ব্যমতে যে সচ্চিদানন্দ-
নিত্যাত্মক স্বীকার আছে, তাহাই এই 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদ'ের মূল বলিয়া
শ্রীমন্মহাপ্রভু মঙ্গলমঙ্গলায় স্বীকার করিয়াছেন। পূর্ণ-বৈষ্ণবাচার্যগণের
সিদ্ধান্তিত মতসকলে একটু একটু বৈজ্ঞানিক অভাব থাকায় তাঁহাদের পরস্পর
বৈজ্ঞানিক-ভেদে সম্প্রদায় ভেদ হইয়াছে। সাফাৎপরতত্ত্ব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু
দ্বীয় সর্বজ্ঞতা-বলে সেই সমস্ত মতের অভাব পূরণ করিয়া শ্রীমদ্ব্যের
সচ্চিদানন্দ-নিত্য বিগ্রহ, শ্রীরামানুজের শক্তিসিদ্ধান্ত, শ্রীবিষ্ণুস্বামীৰ গুহ্য-
দ্বৈত-সিদ্ধান্ত—তদীয়সর্বস্বত্ব এবং নিম্বাৰ্কের নিত্য-দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্তকে
নির্দোষ ও সম্পূর্ণ করিয়া স্বীয় অচিন্ত্য-ভেদাভেদাত্মক অতি বিস্তৃষ্টমত
জগৎকে কৃপা করিয়া অর্পণ করিয়াছেন।

কেবল 'ভেদ' বা 'অভেদ'-বাদ তথা 'গুহ্যাদ্বৈত' বা 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ'—
এ সকলই শ্রুতি-শাস্ত্রের একদেশসম্মত কিন্তু অন্য দেশবিরুদ্ধ। অথচ
"অচিন্ত্য-ভেদাভেদ"-তত্ত্ব বেদের সর্বদেশ-সম্মত-সিদ্ধান্ত, জীবের স্বতঃসিদ্ধ
শ্রদ্ধার আশ্রয় এবং সাধুযুক্তি-সম্মত।"

—শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা, ২ম পরিচ্ছেদ।

শ্রীল প্রভুপাদ "বৈষ্ণবদর্শন" শীর্ষকগ্রন্থ লিখিয়াছেন—"বিশিষ্টাদ্বৈত-
দর্শনে, ঈশ্বর 'চিৎ' ও 'অচিৎ' ত্রিবিধ বিভাগে দ্বীয় শক্তিদ্বারা নিত্যপ্রকাশ-
মান বলিয়া প্রচারিত হইয়াছেন। বস্তুর অদ্বয়তার ব্যাঘাত না করিয়া
বস্তুরাশ্রিত বৈচিত্র্যে ভগবান্ তিন প্রকারে লীলাবিশিষ্ট। চিৎ ও অচিৎ
উভয়ের ঈশ্বর ভগবান্। তিনি অনন্ত নিত্যশক্তিমান্ বিশেষ-বস্তু। স্বগত,
সজ্জাতীয়, বিজ্জাতীয়, বিশেষত্বের নিত্য বিরাজমান।

শুদ্ধদৈত-দর্শনে সর্বশক্তিমান্ রসময় ভগবান্ ও আশ্রয়রূপ ভক্তে নিত্য-সেবা-সেবক সক্ষম-বিশিষ্ট। আশ্রয়রূপ জড়বস্তু সেবাসেবক-সম্বন্ধ-রহিত হইয়া তৃতীয়। বিষয় এক হইলেও আশ্রয়ের বহুত্ব নিবন্ধন ভক্ত অসংখ্য এবং জড়বস্তুও অসংখ্য। এইরূপে পাঁচ প্রকার নিত্যভেদসত্তা সর্বদা ভগবানে নিত্যবৈচিত্র্য প্রদর্শন করে।

বৈতাইদৈত-দর্শনে চিন্ময়রসবিগ্রহ ভগবান্ বিষয় ও আশ্রয়গত সাগরী-রূপে নিতাপ্রতিষ্ঠিত। যেখানে নির্মল আশ্রয়গত চিৎসত্তা, সেখানে নিতাসত্তায় ঘনানন্দের স্বেচ্ছরূপে ভগবান্ লীলাময়। যেখানে নম্বর সমল আশ্রয়রূপ জড়সত্তা, সেখানে ভগবানের লীলা কুণ্ডদর্শনে সঙ্কুচিত। বৈকুণ্ঠ হইলেও প্রাণজিক বুদ্ধিতে মায়িক অনিত্য মাত্র দৃষ্ট হয়।

শুদ্ধদৈত-দর্শনে ভগবত্তায় ভড়ের চেয়তা ও ভেদ আরোপিত হয় না। ভগবদ্ব্যুৎ হইলেই চিদর্শনে ভড়ের ওদগত-সত্তা দর্শনের সত্যদর্শনে বাধা দেয় না। আবার চৈতৈচিত্র্যের নিত্য অস্তিত্বের হস্তারকও হয় না। বিভূ-চৈত্যানুর সচ অণুচৈত্যানুর সেবা-সেবকভাবে লীলা অদ্বয়জ্ঞানের বাঘাত-কারক নহে। ভগবদ্ব্যুৎ অংশ—‘জীব’, বস্তুর শক্তি—‘মায়ী’, তজ্জন্ম জীব, মায়ী ও মায়িক জগৎ সকলই “বস্তু” শব্দবাচ্য, উহার বস্তু হইতে স্বতন্ত্র নহে।—এই বিশ্বাস “শুদ্ধদৈত” নামে প্রসিদ্ধ।

শ্রীমদ্ব্যুৎপ্রভুর প্রচারিত অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তে—শ্রীজীব গোহামীও তদীয় ভগবৎসম্পর্ক ১৭শ সংখ্যায় ভগবদ্ব্যুৎবিচারে বলিচাছেন যে,—

“একমেব পরমং তদ্বৎ স্বাভাবিকচিন্তাসংক্ৰা সর্বদৈব-স্বরূপ-তজ্জন্ম-বৈভব-জীব-প্রদানরূপেণ চতুর্দ্ধাবতিষ্ঠতে সূর্য্য-জ্বর-মণ্ডলস্থিত তেজ ইব মণ্ডলতর্জ্বাহ-গত-তজ্জন্ম-তৎ-প্রতিচ্ছবি-রূপেণ।

পরমতত্ত্ব এক। তিনি স্বাভাবিকী অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন। সেই শক্তিক্রমে সর্বদাই তিনি (১) স্বরূপ, (২) তজ্জন্মবৈভব, (৩) জীব ও (৪) প্রদানরূপে চতুর্দ্ধা অবস্থান করেন। সূর্য্যমণ্ডলস্থ তেজঃ, মণ্ডল, তাহার বাহিরে স্থিত সূর্য্যরশ্মি ও তাহার প্রতিচ্ছবি অর্থাৎ দূরগত প্রতিফলন এই অবস্থায় কথঞ্চিং উদাহরণস্থল। সচ্চিদানন্দ-মাত্র বিগ্রহ-ই তাহার স্বরূপ। চিন্ময় ধাম, নাম, সঙ্গী ও সমস্ত ব্যবহার্য উপকরণই স্বরূপ-বৈভব। ‘নিত্যমুদ্র’, ‘নিত্যবন্ধ’ অনন্ত জীৱগণও শক্তিবিশেষ। ‘মায়ী’ ‘প্রধান’ ও তৎকৃত সমস্ত জড়ীয় স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎই ‘প্রধান’ শব্দ-বাচ্য। এই চতুর্দ্ধা প্রকাশ যেক্রপ

নিত্য পরম তত্ত্বেব এতৎ সৌকর্যম্ নিত্য । বিরুদ্ধ ব্যাপার ক্রিয়ণে যুগপৎ থাকিতে পারে ? উত্তর এই যে, জীব-বুদ্ধিতে ইহা অসম্ভব । কেন না, জীব-বুদ্ধি সীমাবিশিষ্ট । পরমেশ্বরের অচিন্ত্য-শক্তিতে ইহা অসম্ভব নয় ।

বস্তু-শক্তি-বিচারে ভেদ ও অভেদ ধারণা । বস্তু-শক্তির বিবিধত্ব ও শক্তিমন্ বস্তু একত্ব । একবস্তু-জ্ঞান বস্তুস্বরাভাবে সিদ্ধ নহে । শক্তির বৈচিত্র্য দ্বারাই দৈখ্য ও জীবের ভেদাভেদ ধারণা । জীব ও দৈখ্য পরস্পর Co-relative terms. বস্তুর বিচিত্রতার পরিচয়ে বিষয় ও আশ্রয়-বিচারে ভেদ আবার আলম্বন বিচারে অভেদ । কিন্তু নির্বিশিষ্ট বস্তুর “ভেদ” ও “অভেদ” সম্ভবপর নহে । যেহেতু জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার অভাবে ভেদাভেদ বিশেষ লক্ষিতব্য নহে । ‘অচিন্ত্য-ভেদাভেদ’—শব্দে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ । তাহা মনের দ্বারা চিন্তা করা যায় না । মনোধর্ম্মে এককালে বিপরীত ধর্ম্মের ধারণা সম্ভবপর নহে । অদ্বয়-জ্ঞান-বস্তুই ‘সৎ’ ও ‘অসৎ’ হইতে পৃথক্ । উহা সংখ্যা ও কালাতীত । অণুচিৎ মহ বিভূচিৎ চিৎ-বিচারে অভেদ, বিভূ ও অণুত্বের পরিমিতিতে ভেদ-ধর্ম্মবিশিষ্ট । অচিৎ পরমাণুগুলি পরস্পর সীমাবিশিষ্ট, চিৎসমান-ধর্ম্ম-হেতু খণ্ডিত হইবার অযোগ্য । অচিৎ-এর ধারণা লইয়া চিদ্বস্তু মাপিয়া লইবার প্রয়াসে সংখ্যা-ভেদ, কালভেদ প্রভৃতি গোপভাবে সমধর্ম্ম বিপন্ন করাই চিদ্বস্তু হইতে বিদায় গ্রহণ ।

নির্বিশেষবাদী ‘অচিন্ত্য’-শব্দের তাৎপর্য বুঝিতে পারেন না । তাঁহার মনোধর্ম্মের ধারণায় যাহা ‘অচিন্ত্য’ বা চিন্ত্য’ বলিয়া মনে হয়, তাহাও তাঁহার মনোধর্ম্মের ‘চিন্ত্য’ বলিয়া ‘অচিন্ত্য’ শব্দবাচ্য নহে ।

কেবলাদ্বৈতী নির্বিশেষবাদীর সহিত বৈষ্ণবাচার্য্যগণের

মতের পার্থক্য কি ?

কেবলাদ্বৈতবাদী, শুদ্ধাদ্বৈতবাদীর শুদ্ধবিচারের সহিত ভিন্ন । কেবলাদ্বৈতবাদী ‘মায়াকে’ ‘অবস্তু’, ‘বস্তু’কে ‘নির্বিশেষ’, ‘জীব’ ও ‘ব্রহ্মে’ ত্রিবিধ ভেদহীন ‘অভেদ’, জগৎ ‘অমতা-জৈবজ্ঞানের বিবর্ত জগৎ তাৎকালিক অহুভূতিময়, জ্ঞানপ্রাকটো অনুভবকারী, অনুভবনীয়, অনুভবাস্তাব প্রভৃতি শুদ্ধাদ্বৈতবিরোধি-বিচারবিশিষ্ট । কেবলাদ্বৈতবাদী—বিশিষ্টাদ্বৈতদর্শন-রহিত, তিনি শুদ্ধাদ্বৈত-দর্শন-রহিত, তিনি শুদ্ধভেদদর্শন-রহিত, তিনি দ্বৈতা-দ্বৈত-দর্শন-রহিত । বিশিষ্টাদ্বৈতী ‘শক্তিপরিণামবাদ’-কেই তত্ত্ব বলিয়া

গ্রহণ করেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বিবর্তবাদী নহেন। বিশিষ্টাদ্বৈতীর সহিত শুদ্ধাদ্বৈতীর পার্থক্য বস্তুশক্তির পরিণাম বিচার মধ্যে আবদ্ধ। কেবলাদ্বৈতীর অংশাংশি-বিচারাব্যাব, বস্তু ও মায়াবিচার, চিন্মাত্রবিচার, জগন্নিখ্যাত প্রভৃতির অকর্ণ্যতা, শুদ্ধাদ্বৈতী ও বিশিষ্টাদ্বৈতী বুঝাইয়া দিয়া থাকেন। শুদ্ধাদ্বৈতবাদী শ্রীধরস্বামিপাদের ভাবার্থদীপিকা (ভাঃ ১।১।১, ১০।৮৭।২ প্রভৃতি) এবং শ্রীরামানুজাচার্য্যের শ্রীভাষ্য, বেদার্থগংগ্রহ, বেদান্ততত্ত্বসার ও লোকাচার্য্যের তত্ত্বত্রয়, অর্থপঞ্চক প্রভৃতি গ্রন্থ এ বিষয়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণ। শ্রীমন্মধ্যাচার্য্যের “তত্ত্ববিবেক”, “তত্ত্বতোত”, “তত্ত্বসংখ্যা” প্রপঞ্চমথ্যাত্মনু-মানখণ্ডন, মায়াবাদ-খণ্ডন, তত্ত্বমুক্তাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ এবং শ্রীমার্কীয় বেদান্ত-কামধেনু, দশশ্লোকী পারিজাতভাষ্য প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

২। শুদ্ধবৈষ্ণব সঙ্গুতর নিকট যথাবিধি দীক্ষিত বৈষ্ণব—“গৃহস্থই”, হউন বা “ত্যাগীই” হউন, তাঁহার “অশৌচ” নাই। তথাপি গৃহস্থ-বৈষ্ণব লোক-ব্যবহার-রক্ষার্থে যে কোনও দিবস বিষ্ণু-প্রসাদ-নির্মাল্যাদির দ্বারা শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন করিতে পারেন। শুদ্ধ-বৈষ্ণব সঙ্গুতর কৃপাপাত্র ‘গৃহস্থবৈষ্ণবের’ও কর্মজড়াত্তিনিবেশ বা কর্মজড়গণের অদৈববিধি অপালনজনিত-প্রত্যায় বুদ্ধিও নাই। সুতরাং তিনি ভক্তির অনুকূল বিচারেই যাবতীয় বিধি গ্রহণ ও পরিত্যাগ করেন।

৩। এই কয়েকটি পদ ও তৎপরবর্ত্তী কয়েকটি পদে শ্রীল ঠাকুর মহাশয় নিজ নৈষ্ঠিক ভজনের কথা বলিয়াছেন। শ্রীরাধাগোবিন্দ এবং শ্রীগৌর-লীলার পঞ্চতত্ত্বের সহিত নিজের অবিচ্ছেদ্যসাম্যতা (নৈরন্তর্য্য) বলিতে গিয়া নিত্যানন্দকে তাঁহার ‘ভজন-বল-সম্পত্তি’, শ্রীগৌরমুন্দরকে স্বীয় ‘প্রভু’, শ্রীঅদ্বৈতকে তাঁহার ‘সম্বল’, গদাধরকে স্বীয় ‘বংশ’ এবং শ্রীগদাধরানুগত নরহরিকে ‘বিলাস-সত্তার’ ও ভক্তগোষ্ঠীর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বর্ণন করিয়াছেন। প্রভু গোবিন্দ সাক্ষাৎ ব্রজরাজনন্দন ও বার্ষভানবীর লীলা-বিলাসপর জীবনধন।

শ্রীনিত্যানন্দ-সম্বন্ধ বাস্তবিত্ত অর্থাৎ শ্রীজগদগুরুর পাদপদ্ম ব্যতীত বন্ধ-জীবের অন্য কোনও সম্পত্তি নাই। তাঁহার পদাশ্রয় করিলেই সকল সম্পত্তি লব্ধ হয়। ‘অধন’ বা অনর্থের নিবৃত্তিই শ্রীনিত্যানন্দকৃপা। বন্ধ-জীবগণ অনর্থরূপ অধনকে বহুমানন করিয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণ-দাস্যে নিযুক্ত হন।

তাহারা প্রাকৃত বস্তুর প্রভুত্ব, জল-দান্তিকতা পরিহার করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরকে 'নিতাপ্রভু' জ্ঞানিলেই তাহাদের স্বরূপগত সম্বন্ধ প্রকাশমান হয়।

শ্রীগৌরসুন্দরই অগ্নি-যুগল-কিশোর। তদ্ব্যতীত প্রাণহীন দেহ-ধারণ। শ্রীরাধাগোবিন্দই প্রাণিগণের প্রাণস্বরূপ। সেই যুগল-সেবাকে আশ্রয় করিয়া জীবগণের প্রাণ প্রতিষ্ঠিত থাকে। সেবাহীন অস্তিত্ব প্রাণহীন-চেষ্ঠা-বিশিষ্ট।

শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর আচরণই জীবের হরিতজন্যের বল। ভগবৎ-সেবাই আচার্যের শক্তিসত্তা। দুর্বল জড়াভিমানী বদ্ধজীব শ্রীগৌরসুন্দরের অভিন্ন-কলেবর কারণার্ণবশায়ী উপাদান-কারণ শ্রীঅদ্বৈতই শ্রীগৌরসেবা করিবার জীবগণের আদর্শ। তাহার জলতুলসী-হৃদয়ে শ্রীগৌরসুন্দর জীবগণকে দ্বীয় দাস্তের স্বযোগ প্রদান করেন।

শ্রীগদাধরাদি শক্তি অন্তরঙ্গ-সেবার অধিকারী। শ্রীকৃপানুগগণ মধুরসে ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন। মধুরসের সেবকগণের প্রদান শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী শ্রীগৌরসুন্দরের নয়নাভিরাম হইয়া শ্রীনীলাচলে ক্ষেত্র-সন্মাস প্রদর্শন করিয়াছেন।

তাহার অনুগত নরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয় ব্রজরসের আনুগত্যে শ্রীগৌরসুন্দরের বিলাস-বিগ্রহরূপে গোড়মণ্ডলে সাহচর্য্য করিয়াছিলেন। শ্রীগদাধর সেইকালে নবদ্বীপ নগরে ব্রজলীলার মধুরসের শ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্কীর্ণ-যজ্ঞের হৃদয়ভাবের পোষণ করেন। চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্য অন্তরঙ্গ-মধুর-রসের ভক্তসমাজে নবদ্বীপ-লীলায় শ্রীনরহরি ঠাকুর মহাশয় নরোত্তমের ভক্তনাদর্শ। তিনি ব্রজের মধুমতিসখী। শ্রীগদাধরের কুলেই ব্রজের মাধুর্য্য-গত সেবাধিকার সহ শ্রীগৌরসুন্দরের উপাসনা বিহিত হয়। বিশ্রলস্ত-রসান্তিব্যক্তিকে ব্রজলীলার সন্তোগরসের আদর্শ ভ্রম জীবের অনর্থোপদনের হেতু। বিশ্রলস্ত ও সন্তোগের পরস্পর যোগাতা-বিচারে সন্তোগের পুষ্টিই বিয়োগ রস। প্রাকৃত-সহজিয়া ও ভজনরহিত কল্লিত রস-শ্রুতিদিগের রসবোধের অভাবে যে অবৈধ-সম্মিলন-প্রয়াস বাচাল দলে দেখিতে পাওয়া যায়, উহা অজ্ঞতাবিজ্ঞাপী। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয় শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে একুণ অবৈধ উৎকট প্রয়াস গর্হণ করিয়া বদ্ধজীবকূলকে সতর্ক করিয়াছেন।

'নদীয়া নাগরী'-বাদ বা 'গৌরনাগরী'-বাদ-গর্হণ-মূলে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের এই সকল বাক্য নিদর্শন-রূপে কার্য্য করে। শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-সম্প্রদায় শ্রীধুনাথ দাস গোস্বামী বা শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়-প্রমুখ কেহই শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ব-লীলাকে বসাতাস-দোষে দৃষ্ট করিবার প্রয়াস-এর প্রশংসা করেন নাই। পক্ষতত্ত্বে ঔদার্য্যলীলা প্রকাশিত। সেই ঔদার্য্যের অভ্যন্তরে কৃষ্ণলীলা-মাধুর্য্য প্রকটিত। ঔদার্য্যলীলায় মাধুর্য্যের বিকৃত প্রতিফলন রস-বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি করে ও ঐংকে মুক্তভূমি হইতে প্রাকৃত ভোগময় রাজ্যে পাতিত করে। শ্রীগদাধর ও নরহরির অন্তরঙ্গ ভক্তোচিত ব্রজলীলার আনুগত্য শ্রীকৃষ্ণগোস্বামী কথিত—

“সবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্ত্ব হি।

তত্ত্বাবলিপ্সুনা কার্য্যে ব্রজলোকাহুসারতঃ।”

(ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব-বিঃ সাধনভক্তি লঃ ১১৮ শ্লোক)

—শ্লোকের সমপর্য্যায়ে অবস্থিত। ঐহারা বৈষম্য দর্শন করেন, *ঐহার্য্যবৈষম্যেই যামদেবী হৌম বিক্রয়পালিকা ও দ্বাপরপালিকা সৃষ্টি*—দ্বারা আচ্ছন্ন করেন।

শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা-দিবসে মহোৎসব

বৈশাখের অক্ষয়-তৃতীয়ায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূলকেন্দ্র নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রতি বৎসরই উক্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে স্মৃতি-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সেই স্মৃতি স্মরণ করিয়া এই বৎসরেও উক্ত উৎসবের অনুষ্ঠান হয়।

অক্ষয়-তৃতীয়া তিথিতেই সত্যযুগের উৎপত্তি। সত্যযুগে ধর্ম্ম চতুষ্পাদ পূর্ণরূপে বিদ্যাজিত ছিল। পরে ত্রেতা, দ্বাপরে ক্রমশঃ উক্ত ধর্ম্মের এক-এক পাদ লুপ্ত হইয়া বর্ত্তমান কালিতে মাত্র একপাদ অবশিষ্ট আছে। আসুরিক চিন্তাস্রোত বা অধর্ম্ম যখন অত্যন্ত প্রবল হয়, তখন ভগবান্ স্বয়ং-ই আবির্ভাব হন বা নিজজনকে প্রেরণ করিয়া অসুরগণের বিনাশ-সাধন এবং উক্ত সজ্জনগণকে রক্ষা করেন।

আমরা শ্রীগীতার পাই,—“হৌ ভূতসর্গেণ লোকেহস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।……” অর্থাৎ এই জগতে দুই প্রকার ভূত (যানুষ) সৃষ্টি হইয়াছে

—যথা দৈব ও আসুর-স্বভাবযুক্ত। যাহারা ঈশ্বরের সেবা করে তাহাদিকেই এখানে দৈব সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়াছে এবং যাহারা ঈশ্বরের সেবা করে না বা ঈশ্বরে বিশ্বাসী নহে তাহাদিগকেই আসুর বলা হয়। অর্থাৎ আসুর মানে শুধু ইহাই নহে যে তাহাকে কিছুতাকার দেখাইতে হইবেই। সুক্লী ও সুন্দর শাক্ত-পরিচ্ছদে সজ্জিত হইলেও নাস্তিকগণ আসুর পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া শাস্ত্রে বিভিন্নস্থানে বর্ণিত করিয়াছেন। সম্বৎসরিত ঈশ্বর-বিশ্বাসী বা দৈব-স্বভাব সম্পন্নগণই দৈব বা দেবতাতুল্য। আত্মরিক চিন্তাশ্রোতকে প্রতিহত করিয়া লনাতন-ভক্তের অনুসন্ধানই মানবগণের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। নশ্বর বস্তুর অনুসন্ধানে মানুষ কখনই নিত্যশাস্তি লাভ করিতে পারে না। নিত্য-শাস্তির অনুসন্ধান ও মানব জাতিকে সেই উদ্দেশ্যে ব্রতী করণ, ভগবদ্ভক্ত-গণের এক আকাঙ্ক্ষা-বিশেষ তাই মরণের বিধিকায় আত্মজাগরণের বাণী যুগ যুগ ধরিয়া ভক্ত সজ্জনগণ বিধে বিধোদিত করিয়া থাকেন।

সেই প্রয়াস নিয়াই প্রায় অর্ধশতাব্দি পূর্বে পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। হরিকথার জুড়িফ দিনে মানুষ যাহাতে ইতর প্রাণীর জায় আচরণ করিতে আগ্রহী না হন তজ্জন্ত দার্শনিক তত্ত্ব-পূর্ণ তথ্য বিতরণ করিয়া প্রেমধর্মের উদ্বুদ্ধ করার জন্যই এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাই ইহার সদস্যবর্গ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমময় বাণী বিতরণে ব্রতী আছেন।

এতদ্ব্যতীত সামাজিক জীবনের সঙ্গেও সমিতির সদস্যবর্গ যুক্ত থাকিয়া সমাজের জগৎসাধারণের ইহ এবং পারলৌকিক কল্যাণের জন্য নিদর্শন স্থাপনা করিয়া চলিতেছেন। এ-সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য এই যে, কোন দলমত বা জাতি-ধর্ম-নির্কিশেষে নিরপেক্ষ নীতিই সমিতির বৈশিষ্ট্য।

অক্ষয়-তৃতীয়া দিবসে প্রাতঃ হইতেই বিশেষ পাঠ-কীর্তনের ব্যবস্থা ছিল। মধ্যাহ্নে আমন্ত্রিত, আহত, রবাহত প্রায় সহস্রাবিধ নরনারীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করেন। স্থানীয় সরকারী হাসপাতালের সুপারিন্টেন্ডেন্ট শ্রী এ. বানাজ্জী মহাশয়ও স্বস্ত্রীক আমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হন। তিনি আশ্রমের পরিবেশ দর্শনে বিশেষভাবে মুগ্ধ হইয়া ভূয়সী প্রশংসা করেন ও লিখিতভাবে তাঁহার বক্তব্যও রাখেন। উহার অবিকল প্রতিলিপি এতদসহ লিপিবদ্ধ করা হইল।

— শ্রীগুণেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

THE GOVERNMENT OF WEST BENGAL

NABADWIP GENERAL HOSPITAL

I had the pleasure of visiting Shri Devananda Goudiya Math, Nabadwip this morning. This philanthropic organisation is linked with various Social Works in addition to its religious activities. It has taken up service to humanity as a part & parcel of worship of God.

The proposed constructions of new wing of the Math consists of Educational, Social and Medical Unit giving service to ailing humanities.

Shri Kamales Roychowdhury, Social Education Extn. Officer, Nabadwip was present and Shri Nilmani Mukherjee of Charicharapara, Nabadwip explained me the development works of different wings specially of Medical wings of Shri Devananda Gondia Math.

Shrimad B. V. Narayan Maharaj, Vice-President & Shri Nabajogendra Brahmachari, Constituted Attorney are taking keen interest in the all round development of the said Math.

I wish their enterprise be crowned with success.

Sd./— A. Banerjee

17. 4. 80

Superintendent,

Nabadwip General Hospital.

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা ও

শ্রীশ্রীগঙ্গাথদেবের রথযাত্রা

মহোৎসবের আহ্বান

[পুরীধামের প্রথানুসারে]

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

(গভঃ রেজিষ্টার্ড)

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,

তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ,

জেলা—নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ) ।

সাদর সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন—

অত্যাশ্চর্য বৎসরের ত্রায় এই বৎসরেও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের উদ্যোগে উক্ত মঠে শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা-পালন ও শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছে । এই উপলক্ষে আগামী ২৮শে আষাঢ়, '৮৭ (ইং ১২৭৭৮০) শনিবার হইতে ৫ই আষাঢ় (ইং ১২৭৭৮০) মঙ্গলবার পর্য্যন্ত একাদশ দিবসব্যাপী পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, নগর-সঙ্কীৰ্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহের সেবা-পূজা, ভোগরাগ, আরাট্রিক প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজনমুখে বিরাট মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে।

ধর্ম্য প্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ-ভক্তানুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও পরমোৎসাহিত হইবেন। এই মহদানুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য-দ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী স্মৃতি অর্জিত হইবে। পরপৃষ্ঠায় দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা প্রদত্ত হইল। ইতি—১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৭ ; ইং ১৮৮০

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সত্যব্রন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য :—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে পরিব্রাজকচাৰ্য্য ত্রিদিগ্বামী শ্রীশ্রীমন্ত্রিবেদান্ত বামন মহারাজের নিকট উল্লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

—ঃ সেবাপঞ্জী :—

- ১। ২৮শে আষাঢ় (ইং ১২।৭।৮০), শনিবার—অপরাহ্ন ৫টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত শুঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব উপলক্ষে পাঠ, বক্তৃতা ও কীর্তন।
- ২। ২৯শে আষাঢ় (ইং ১৩।৭।৮০), ববিবার—পূর্বাহ্ন ৭ ঘটিকায় নগর-সঙ্কীৰ্ত্তন-মুখে গুণ্ডিচাবাড়ী গমন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও গুণ্ডিচা-মন্দির-অর্জ্জুন, গঙ্গা-স্নানস্বে মঠে প্রত্যাবর্তন।
- ৩। ৩০শে আষাঢ় (ইং ১৪।৭।৮০), সোমবার—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা; অপরাহ্ন ৩টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত সঙ্কীৰ্ত্তনমুখে শোভা-যাত্রাসহ রথাকূট শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচাবাড়ী গমন। পরে শ্রীমঠে সন্ধ্যা ৮টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত সঙ্কীৰ্ত্তন, সন্ধ্যারাত্রিক ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ।
- ৪। ৩১শে আষাঢ়, ১৫ জুলাই মঙ্গলবার হইতে ১লা শ্রাবণ, ১৭ জুলাই বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় প্রত্যহ অপরাহ্ন ৫টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত সঙ্কীৰ্ত্তন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ ও সন্ধ্যারাত্রিকান্তে রাত্রি ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগোরাঙ্গ-শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীরামলীলা-সম্বন্ধে বক্তৃতা।
- ৫। ২রা শ্রাবণ (ইং ১৮।৭।৮০) শুক্রবার—ছেরাপঞ্চমী-দ্বিসে শ্রীলক্ষ্মী-বিজয়-উৎসব। পূর্বাহ্ন ৭টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত গুণ্ডিচাবাড়ীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও নগর-সঙ্কীৰ্ত্তন। অপরাহ্ন ৫টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত শ্রীমঠে সঙ্কীৰ্ত্তন, সন্ধ্যারাত্রিক ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ।
- ৬। ৩রা শ্রাবণ, ১৯ জুলাই, শনিবার হইতে ৫ই শ্রাবণ, ২১ জুলাই, সোমবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় প্রত্যহ অপরাহ্ন ৫টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত শ্রীমঠে সঙ্কীৰ্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও আবারাত্রিকান্তে রাত্রি ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা, শ্রীরাম-লীলা ও শ্রীমদ্বাহ্মভূর বিবিধ শিক্ষা-সম্বন্ধে বক্তৃতা।
- ৭। ৬ই শ্রাবণ (ইং ২২।৭।৮০) মঙ্গলবার—অপরাহ্ন ৪টা হইতে রাত্রি ৭টা পর্য্যন্ত সঙ্কীৰ্ত্তন ও শোভাযাত্রাযোগে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা। পরে শ্রীমঠে সঙ্কীৰ্ত্তন, শ্রীভাগবত পাঠ, আরতি ও সাধারণ-সহোৎসব।

বিঃ দ্রঃ—দৈব ও বিশেষ কার্যানুরোধে উৎসব-তালিকা পরিবর্তনযোগ্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাজ্যে জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরবোধজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যুগান্ধা সুপ্রদীপতি ।

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরদয় ।
অবোধজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ।

অল্প ধর্ম সূচকপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈনে পণ্ড সেই শ্রম ।

৩২শ বর্ষ

১৮ বামন, অনিরুদ্ধ, ৪২৪ গৌরান্দ
৩২ আষাঢ়, বুধবার, ১৩৮৭ : ইং ১৯৭১/১২৮০

৫ম সংখ্যা

সান্ন্যাসাদঃ

শ্রীগোবর্দ্ধনবাস-প্রার্থনাদশকম্

[শ্রীল-রঘুনাথদাস-গোস্বামি-খিরচিতম্]

নিজপতিভুজদণ্ডচ্ছত্রভাবং প্রপত্ত

প্রতিহতমদধুষ্টোদ্দণ্ড-দেবেন্দ্রগবর্ব ।

অতুল-প্রথুল-শৈলশ্রেণিভূপ প্রিয়াং মে

নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥১॥

হে গোবর্দ্ধন! আপনি অতুলনীয় অত্যন্ত শৈলরাজ্যের অধীশ্বর এবং আপনিই নিজপতি শ্রীকৃষ্ণের ভুজরূপ-দণ্ডের উপরে চত্রভাব ধারণ করিয়া গর্বিত, ধুষ্ট ও উদ্ধত দেবরাজ ইন্দ্রের অহঙ্কার বিনাশ করিয়াছেন। আপনি আমাকে অভীষ্ট আপনার নিজ-নিকটে (শ্রীরাধাকৃষ্ণ-তটে) বাসস্থান প্রদান করুন ॥১॥

প্রমদ-মদন-লীলাঃ কন্দরে-কন্দরে তে
 রচয়তি নবযুগযুগল আপনার এই প্রতিকন্দরে কন্দর্পোন্মাদ-
 জনিত ক্রীড়াসমূহ প্রচুরভাবে অনুষ্ঠান করিতেছেন, এইহেতু তাঁহাদের
 উত্তরের সেই লীলাসমূহ প্রদর্শনের মধ্যস্থ হইয়া আপনি আমাকে আপনার
 নিজনিকটে বাসস্থান প্রদান করুন ॥২॥

হে গোবর্দ্ধন ! ব্রহ্ম-নবযুগযুগল আপনার এই প্রতিকন্দরে কন্দর্পোন্মাদ-
 জনিত ক্রীড়াসমূহ প্রচুরভাবে অনুষ্ঠান করিতেছেন, এইহেতু তাঁহাদের
 উত্তরের সেই লীলাসমূহ প্রদর্শনের মধ্যস্থ হইয়া আপনি আমাকে আপনার
 নিজনিকটে বাসস্থান প্রদান করুন ॥২॥

অনুপম-মণিবেদীরত্ন-সিংহাসনোর্বী-
 রুহরদরসানুদ্রোণিসঙ্কেষু রঞ্জেঃ ।
 সহ বলসখিভিঃ সংখেলয়ন্ স্বপ্রিয়ং মে
 নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥৩॥

হে গোবর্দ্ধন ! আপনি অনুপম মণিবেদীরূপ রত্নসিংহাসন, তরু, বর
 অর্থাৎ ক্ষুদ্র তরু-সমাজের নিবিড় বনভাগ, গর্ভ, সমদেশ দ্রোণি অর্থাৎ
 অস্তর্য্যল-প্রদেশসমূহে বলদেব ও সহচরগণের সহিত নিম্নপ্রিয় স্ত্রীকৃষ্ণকে
 রত্ন-সহকারে ক্রীড়া করাইয়া আমাকে আপনার নিজ-নিকটে বাসস্থান
 প্রদান করুন ॥৩॥

রসনিধি-নবযুগোঃ সাক্ষিগীং দানকেলে-
 ছ্যুতিপরিমলবিদ্যাং শ্যামবেদীং প্রকাশ্য ।
 রসিকবরকুলানাং মোছ্যমান্ফলয়ন্মে
 নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥৪॥

হে গোবর্দ্ধন ! আপনি পরম-রসময় নবযুগযুগলের দান-লীলার
 প্রকাশিকা। আপনি কান্তি-সৌরভ-সমস্থিতা শ্যামবেদীর প্রকটনপূর্বক
 নিজ ভক্তবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া আমাকে আপনার নিজ-নিকটে
 বাসস্থান প্রদান করুন ॥৪॥

হরিদয়িতমপূর্বং রাধিকাকুণ্ডমাত্ম-
 প্রিয়সখমিহ কণ্ঠে নন্দ্যগালিঙ্গ্য গুপ্তঃ ।

নবযুবযুগখেলাস্তত্র পশ্যন্ রহো মে
নিজ্নিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥৫॥

হে গোবর্দ্ধন ! আপনি যে-স্থানে নিজ প্রিয় সখা ও শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় পরম বিচিত্র শ্রীরাধাকণ্ঠকে কৌতুকভরে কণ্ঠদেশে আশিষ্যন-পূর্বক এস্থলে গুপ্ত হইয়া নবযুব-যুগলের ক্রীড়াসমূহ অবলোকন করিতে করিতে অবস্থান করিতেছেন, সেই নির্জন প্রদেশে আমাকে আপনার নিজ্নিকটে বাসস্থান প্রদান করুন ॥৫॥

স্থল-জল-তল-শম্পৈভূরুহচ্ছায়ায়া চ
প্রতিপদমমুকালং হস্ত সঞ্চর্দয়ন্ গাঃ ।
ত্রিজগতি নিজ্জগোত্রং সার্থকং খ্যাপয়ন্মে
নিজ্নিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥৬॥

হে গোবর্দ্ধন ! আপনি সর্বদা নানাস্থানে স্থল, জল, তল, নূতন তৃণ এবং তরুছায়া-দ্বারা গো-সমূহকে সঞ্চর্দিত করিয়া ত্রিলোকে নিজ নাম অর্থাৎ ‘গোবর্দ্ধন’ এই নাম যথাযথরূপে প্রকাশ করিতেছেন ; আপনি আমাকে নিজসমীপ-বাস প্রদান করুন ॥৬॥

শুরপতিকৃতদীর্ঘদ্রোহতো গোষ্ঠরক্ষাং
তথ নবগৃহরূপস্ত্রাস্তুরে কুবর্বতৈব ।
অধবকরিপুণোচ্চৈর্দত্তমান ভ্রতং মে
নিজ্নিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥৭॥

হে গোবর্দ্ধন ! অধ-বক-শত্রু শ্রীকৃষ্ণ নূতন গৃহরূপী আপনার মধ্যভাগেই ইন্দ্রকূত দীর্ঘকালব্যাপী দ্রোহ অর্থাৎ বজ্র-বারি-বর্ষণরূপ উৎপীড়ন হইতে নিজ গোষ্ঠের রক্ষা করিয়া অধিকরূপে আপনাকে মান দান করিয়াছেন ; আপনি আমাকে সহস্র নিজসমীপে-বাস প্রদান করুন ॥৭॥

গিরিনৃপ ! হরিদাস-শ্রেণীবর্ষোত্তি নামা-
মৃতামদমুদিভং শ্রীরাধিকাবক্তৃচন্দ্রাৎ ।
ব্রজনবভিলক্বে ক্লিপ্তো বেদৈঃ স্মৃটং মে
নিজ্নিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥৮॥

হে গিরিরাজ ! গোবর্দ্ধন ! শ্রীরাধিকার মুখচন্দ্রে হইতে আপনার ‘হরিদাস-বর্ষা’ এই প্রসিক নামরূপ অমৃত প্রকাশিত হইয়াছে. আর আপনি বেদগণ-কর্তৃক ত্রৈলোক্যের নুতন তিলক-চিহ্নরূপে স্পষ্টরূপেই কল্পিত হইয়াছেন। আপনি আমাকে নিজসমীপ-বাস প্রদান করুন ॥৮॥

নিজজনমুত্ত-রাধাকৃষ্ণমৈত্রীরসাত্ত্ব-

ব্রজনর-পশু-পক্ষিব্রাত-সৌখ্যৈকদাতঃ ।

অগণিতকরণতান্নামুরীকৃত্য তাস্ত্বং

নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম ॥৯॥

হে গোবর্দ্ধন ! আপনি নিজগণের সহিত শ্রীরাধাকৃষ্ণের মৈত্রীরসে আল্লাত ত্রৈলোক্যের মানব, পশু ও বিহঙ্গমসমূহের একমাত্র সুখদায়ক ; আপনি অপর করুণাবশে আমাকে নিতান্তভাবে অঙ্গীকারপূর্ব্বক নিজসমীপ-বাস প্রদান করুন ॥৯॥

নিরুপধিকরণেন শ্রীশচীনন্দনেন

ত্বয়ি কপটি-শাঠ্যেহপি ত্বংপ্রিয়েণাপিতোহস্মি ।

ইতি খলু মম যোগাযোগ্যতাং ত্রায়ণংহুন্

নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম ॥ ১০ ॥

হে গোবর্দ্ধন ! আমি কপটি এবং শাঠ্য হইলেও আপনার প্রিয় অষ্টৌতুক কৃপাময় শ্রীশচীনন্দন-কর্তৃক আপনার নিকটে অর্পিত হইয়াছি ; কেবল এইহেতুই আমার সেই প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট যোগাত্ম বা অযোগ্যত্ব গ্রহণ না করিয়া আপনি নিজসমীপ-বাস প্রদান করুন ॥১০॥

রসদ-দশকমস্ত্রা শ্রীল-গোবর্দ্ধনস্ত্রা

ক্ষিত্তিধরকুলভর্তৃর্যঃ প্রযত্নাদধীতে ।

স সপদি সুখদেহস্মিন্ বাসমাসাচ্ছ-সাক্ষা-

চ্ছুভদ-সুগলসেবারত্নমাপ্নোতি তুর্গস্ ॥১১॥

যিনি পরিতুল্যপতি শ্রীমদ্ গোবর্দ্ধনের রসপ্রদ দশক্লোক প্রযত্ন-সহকারে পাঠ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ সুখপ্রদ গোবর্দ্ধনে বসতি লাভ করিয়া সাক্ষাৎভাবে পরমমঙ্গল শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা-বত্ন সত্ত্বর প্রাপ্ত হ'ন ॥১১॥

বৈষ্ণব-মতঃ

কনিষ্ঠাধিকারী বৈষ্ণব প্রাকৃত

এই প্রাকৃত জগতে আমরা বৈষ্ণবগণকে ত্রি বধ অধিকারে দেখিতে পাই। এতদ্ব্যতীত চেতনময় বস্তুসমূহ সকলেই কৃষ্ণদাস। যাহারা কৃষ্ণানুশ্চারণ কোন পরিচয় দেয় না সাধারণ লোক, কনিষ্ঠাধিকারী ও মধ্যমাধিকারী বৈষ্ণবগণ তাহাদিগকে হরিবিমুখ বলিয়া জানেন, কিন্তু তাহারা অবৈষ্ণব হইলেও বিষ্ণুদাস। বাসুদেব সর্বভূতে অধিষ্ঠিত। প্রাকৃত রাজ্যে উচ্চাচ সৰ্বল-বস্তুতেই বিষ্ণুর অধিষ্ঠান না থাকিলে কোন বস্তুই অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না।

কনিষ্ঠাধিকারগত বিষ্ণুদাস্যে আমরা দেখিতে পাই যে, বৈষ্ণব-মহাশয়ের বিষ্ণুবিগ্রহে বিশ্বাসের সহিত সেবা আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু বৈষ্ণবের স্বরূপোপলব্ধির অভাব আছে। সেজন্মই কনিষ্ঠাধিকারে বৈষ্ণবকে 'অপ্রাকৃত' আখ্যা দিবার পরিবর্তে 'প্রাকৃত' বলিয়া শ্রীমত্তাগবত কীর্তন করিয়াছেন।

কনিষ্ঠাধিকারীর ক্রমোন্নতি

পরম শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রীভগবানের সেবা করিতে করিতে তাঁহার কৃপা লাভ করিয়া কোমল-শ্রদ্ধ-বৈষ্ণব নিজ প্রাকৃত বুদ্ধি ক্রমশঃ ত্যাগ করিবার অবসর লাভ করেন। অন্যাভিলাষ, সংকীর্ণাহুশীলন এবং এমন কি নির্বিশেষ ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ প্রাকৃত জ্ঞানীর অতিমানকেও তুচ্ছ দর্শন করিয়া প্রাকৃত বিষয়ে বিরাগ লাভ করেন। তখন তাঁহার বর্ণমদ, প্রাকৃত ধনমদ, প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-চেষ্টা প্রভৃতি খর্ব হইতে আরম্ভ করে। তৃণজলোকার ন্যায় প্রাকৃত বৈষ্ণব অপ্রাকৃত রাজ্যের অহসন্ধান করিতে গিয়া স্বীয় অধিকার পরিবর্তন করেন।

বৈষ্ণবের মধ্যম অধিকার

পরিবর্তিত মধ্যমাধিকারে আমরা দেখিতে পাই যে, অপ্রাকৃত অনুসন্ধান-ফলে কনিষ্ঠ-ভাগবৎ-দর্শনের শ্রীমুক্তি তাঁহার অপেক্ষাকৃত উন্নত-দর্শনের বিষয় হয়। তিনি সেই কালে শ্রীমুক্তিকে কেবল প্রাকৃত বস্তু জ্ঞান করেন

॥ তাঁহার নিজ অস্তিত্বে সেই কালে অপ্রাকৃতের তরঙ্গ অবস্থান লক্ষ্য করেন এবং অধিকারভেদে ভাগবতগণের তারতম্য পরিদর্শন করিবার চক্ষু

লাভ করেন। তাদৃশ দৃষ্টি লাভ করিয়া তিনি ভগবদধিষ্ঠানসমূহে প্রেম, কৃষ্ণানুগ-জনে মিত্রতা, কৃষ্ণভক্তির (প্রচার) দ্বারা পরোপকার এক অপ্রাকৃত-বস্তু-বিরোধিবর্গের সম-ত্যাগরূপ অনুষ্ঠানসমূহে ব্যস্ত হন। এই কালে তাঁহার নানাপ্রকার বিদ্র উদয় হয়। কখনও বা মায়াবাদী অহং-গ্রহোপাসক-কর্তৃক মদ্বিত, কখনও বা সংকল্পকারী মূর্খ-জন-কল্পক নিম্নিত এবং কখনও বা আহার-পানাদি-মাত্র যথেষ্টাচারী ব্যক্তির আক্রমণের বস্তু হন।

মধ্যমাধিকারীর ক্রমোন্নতি

এই সকল উপদ্রব অগ্নানবদনে সহ্য করিতে করিতে তিনি হরিসেবা হইতে কৃষ্ণ-কৃপাক্রমে বিপথগামী হন না। কোমল-শ্রকের যে প্রকারে পতন সম্ভাবনা, মধ্যমাধিকারীর জ্ঞান তাহা অপেক্ষা দৃঢ় হওয়ার তাঁহাকে হরি-বিমুখ-জনগণ দিগ্ন করিতে পারে না। মধ্যমাধিকারীর বুদ্ধিশে ভগবান্ অনেক সময় অধিষ্ঠিত জাহেন, তিনি তাহা বুদ্ধিতে পারেন। কৃষ্ণচন্দ্র চৈত্যানুরূপে ভক্তের হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিজ-জন বলিয়া আকর্ষণ করেন। মধ্যমভাগবত হরি-গুরু-বৈষ্ণব-কৃপাক্রমে সম্পূর্ণ অপ্রাকৃত জন্মভূতি লাভ করেন। সাধারণ ভাষায় ইহাকেই স্বরূপ-সিদ্ধি বলে।

বৈষ্ণবের উন্নত অধিকার

জ্ঞানিগণ যাহাকে জীবনুজ-সংজ্ঞা দেন, তাদৃশ শুদ্ধাধিকার বৈষ্ণবের ভাষায় স্বরূপ-সিদ্ধি অর্থাৎ অনিমিশ্র অপ্রাকৃতে অবস্থিতি। এইকালে তাঁহার কৃষ্ণসেবা বাতীত অন্য কোন চেষ্টা থাকে না। সেবার উপকরণ লইয়া যাহারা বিবাদ করেন, তাহারা উন্নতাদিকারের ধারণা করিতে পারেন না। শ্রীশ্রীমদ্ বিষ্ণুপাদ গৌরকিশোরের মৃত্যুও, অপক বস্তুর গ্রহণ, স্ত্রীত্ব বৈরাগ্য, সহজিয়াগণকে উৎসাহ প্রদান প্রভৃতি হরিসেবার উপকরণ জ্ঞানিয়া তাহাতে প্রমত্ত হইলে, মূল-বস্তু ত্যাগ করিয়া খোশা লইয়া টানাটানি হইয়া যাইবে। যাহারা অপ্রাকৃত ছাড়িয়া প্রাকৃতে মত্ত, তাহারা কোনদিনই মহাভাগবতের চেষ্টা বুদ্ধিতে সমর্থ হইবেন না। সেবার উপকরণগুলিকে নিজ নিজ প্রাকৃত ভোগ-যোগ্য উপকরণের সহ সমান জ্ঞান করিলে কখনই অপ্রাকৃত উপলব্ধি হইবে না।

বৈষ্ণবের বংশ ও তাহার বিপর্যয়

উপরিউক্ত তিনপ্রকার বৈষ্ণবের বংশ এই জগতে দেখিতে পাওয়া যায়। বংশ বলিলেই যে কেবল শৌক্ৰ অধস্তনগণকে বুঝায় একরূপ নয়। বর্ণাশ্রমধর্মের আদরক্রমে বৈধ-যোষিংসঙ্গ-প্রভাবে পৃথিবীতে বংশের উৎপত্তি হয়। কিন্তু তাহাই যে কেবল সেই বস্তুর ধারাবাহিক অবিমিশ্র অধিষ্ঠান তাহা বলা যায় না। পিতামাতা উভয় বস্তুর সম্মেলনে সন্তানের উদ্ভব, প্রতি পুরুষেই ভিন্ন ভিন্ন স্ত্রীর সহযোগে সেই বস্তু হইতে অপর বস্তুর সমাবেশ লক্ষিত হয়; সুতরাং অবিমিশ্র পিতৃসত্তা পুত্রে বা স্তূল শৌক্ৰ-বংশে আরোপণ স্থল বিচার-পুষ্ট নহে।

শৌক্ৰ-জন্ম ও পিতামাতার প্রতি কর্তব্য

পিতামাতা পুত্রের সর্বপ্রধান সেবক। তাহারা পুত্রের জন্য নানাবিধ অনুষ্ঠান দ্বারা কায়মনোবাক্যে অপত্যের জন্মাবধি মৃত্যু পর্যন্ত সেবা করিয়া থাকেন। সেই ঋণ পরিশোধের জন্য কৃতজ্ঞ পুত্রের পিতৃ-মাতৃ-সেবা কর্তব্যের প্রধানতম অনুষ্ঠান। পুত্র, জন্মের অব্যবহিত পর হইতে পিতা-মাতার সেবা করিতে যোগ্য হন না। অনেক দিন পরে পুত্রের নিজস্ব উপলব্ধি হইলে সেবাধর্ম প্রকাশমান হয়। তখন তিনি পিতামাতার উত্তরাধিকারী-স্বরূপে পিতৃ-মাতৃ-সেবায় নিজ প্রধান কর্তব্যতা উপলব্ধি করেন। এই প্রকার (শৌক্ৰ) বংশ—ইহাতে পিতৃ-মাতৃ-প্রদর্শিত চিত্তের ধারণাসমূহ প্রবল হয়।

সাবিত্র্য-জন্ম ও আচার্য্যের প্রতি কর্তব্য

আমরা জানি যে, শৌক্ৰ-জন্ম বাতীত আচার্য্য-কূলে জীবের দ্বিতীয় জন্ম হয়। দ্বিতীয় জন্ম হইলে জীব “এক জন্ম-অপবাদের” হস্ত হইতে মুক্ত হন। আচার্য্য ও ‘গায়ত্রী’ তাহাকে সাবিত্র্য-জন্ম প্রদান করেন। এইকালে আচার্য্য-কূলে জীবের দ্বিতীয় জন্ম লাভ হওয়ায় তিনি অপেক্ষাকৃত সেবাধর্ম্য বৃদ্ধিতে পারেন। পিতা-মাতা সন্তানের জন্মাবধি তাহার গৃহে বাস-কাল পর্যন্ত সেবা করিয়া থাকেন। পুত্রের জ্ঞান বিকাশের প্রথমেই তিনি আচার্য্য-কূলে প্রেরিত হন। সুতরাং পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য-জ্ঞান আচার্য্য-কূলে অবস্থান কালে তিনি বৃদ্ধিতে পারেন। পিতা-মাতার ন্যায় সন্তানের সেবক আচার্য্য হন না। দ্বিজ, আচার্য্যের অনেকটা অধিক

সেবা করিবার সুযোগ পান। আচার্য্যাদাস বিজ্ঞ, আচার্য্যের গৃহকে নিজ গৃহ জানিতে পারেন এবং আচার্য্যের যাবতীয় দ্রব্যের সেবা-ভার গ্রহণ করেন।

বেদের দুই প্রকার উপদেশ

বিজ্ঞ আচার্য্যের নিকট হইতে বেদান্তের সহিত সমস্ত বেদশাস্ত্রে অধিকার লাভ করেন। বেদশাস্ত্র দুইপ্রকার অনুষ্ঠানের উপদেশ করেন। প্রাকৃত জগতে সুশৃঙ্খলভাবে প্রাকৃত-ধর্মের সহিত অবস্থান এক প্রকার ফল। অপর প্রকার নিত্য পরমার্থ-বিদ্যায় অধিকার।

আচার্য্য অনিত্য ধর্মের যাজক হইলে অস্ত্রোবাসিকে অনিত্য উপাসনা কর্ম বা জ্ঞান উপদেশ করেন। আবার আচার্য্য স্মার্ত না হইয়া পরমার্থী হইলে বেদ-কথিত পরম গোপনীয় পরমার্থ শিক্ষা দেন। যে অস্ত্রোবাসী প্রাকৃত কুচিবিশিষ্ট—জড়-ধর্ম অভিনিবিষ্ট, তিনি আচার্য্যের নিকট হইতে বৈদিক অধিকার-ক্রমে গৃহত্বত ধর্মই মানব-জীবনের ফল মনে করেন। আবার পরমার্থ-ধর্মজ্ঞ বেদের প্রপঞ্চ ফল ভাগবত সদ্ধর্ম বেদশাস্ত্র হইতে শিক্ষা দিয়া জীবকে অনন্ত জীবনের পথে অগ্রসর করান। নিত্য জীবন হইতে নৈমিত্তিক জীবনের পার্থক্য বুঝাইয়া দেন। অস্ত্রোবাসী ক্ষুদ্রার্থ লোভের বা ভোগের বশবর্তী হইয়া আচার্য্যের নিকট হইতে সমাবর্তন অনুষ্ঠান সমাপন করিয়া গৃহে প্রবেশপূর্বক কর্মকাণ্ডীয় অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। যিনি প্রাকৃত-অর্থ পরমার্থের নিকট নিতান্ত ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিংকর জানিয়া পরমার্থে আকৃষ্ট হন, তিনি সমাবর্তনের পরিবর্তে বৃহৎ-ব্রত অথবা মতি-ধর্ম বা গৃহ স্বীকার করিয়া পারমার্থিক দীক্ষা লাভ করেন।

দৈক্ষ্য-জন্ম ও শ্রীগুরুর প্রতি কর্তব্য

পারমার্থিক আচার্য্যের নাম গুরু, তিনি অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞান প্রদানরূপ দীক্ষালুষ্ঠান দ্বারা জীবের তৃতীয় জন্ম প্রদান করেন। এই তৃতীয় জন্মে তিনি অপ্রাকৃত উপাসনায় প্রবৃত্ত হন এবং প্রাকৃত দর্শন হইতে বিমুক্তি লাভ করেন। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, শৌক্রেজন্মের বিস্তৃতি কেবল বংশাখ্যা লাভ করিতে পারে না, পরন্তু সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্য জন্মের বিস্তারকেও বংশাখ্যা দেওয়া হয়।

শৌক্রে জন্মের সহিত সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্য জন্মের পার্থক্য

আচার্য্যকূলে অবস্থান বা অপ্রাকৃত গুরু-গৃহে জন্ম, শৌক্রে-জন্ম বিস্তৃতির সহিত পার্থক্য থাকিলেও পারম্পর্য্যক্রমে 'বংশ' বলিয়া দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে।

শৌক্রেবশ্মে সন্তানের পিতার ভৃত্যত্ব অল্প, কিন্তু মাষিত্য ও দৈক্ষ্যজন্মে আচার্য্যের ও গুরুর দাস্ত উত্তরোত্তর অধিক। ভক্তিমার্গে সেবনের ভারতম্যই উত্তরাধিকারের ভারতম্য নির্ণয় করে। যেকোন চিকিৎসকের পুত্রের চিকিৎসা-শাস্ত্রে অধিকার পুত্রত্বে আবদ্ধ নহে, পরন্তু তদ্বিত্তাধিকারে ব্যক্তিগত পারদর্শিতাই একমাত্র কারণ, তদ্রূপ বৈষ্ণব-গুরুর (শৌক্রে) পুত্রত্বই কেবল আচার্য্যত্ব বা গুরুত্বের কারণ নহে। শৌক্রে-বংশে কেবল যে পারমার্থিক অধিকার লাভ হইবে এরূপ কথা কোন শাস্ত্র বা সদাচারে দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র গৃহস্থ অবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কতিপয় স্বার্থক লেখকের কপটতার ফল মাত্র।

সংসম্প্রদায়ের মধ্যে তুর্য্যাশ্রমী গুরুগণের বংশাবলী শিষ্য-পরম্পরায় আবদ্ধ। সংসম্প্রদায়-জ্ঞাত অর্থাৎ সংসাম্প্রদায়িক গুরুপরম্পরা ব্যতীত মন্ত্রের নিষ্ফলতা পদ্যপুরাণে লিখিত আছে।

বঞ্চক সম্প্রদায়ের অপচেষ্টা

মুঢ় ব্যক্তিগণকে প্রভাবিত করিবার মানসে কতই নূতন মত উদ্ভূত হইয়াছে এবং সেই মতবাদগুলি নিরাস করিয়া প্রাকৃত স্বার্থ-বিজড়িত সাধারণ লোকে প্রাকৃত মতে মত্ত হইয়া সত্যের জহ্ননদান করিতে পারে না। সুতরাং সত্য আচ্ছাদন করিয়া বঞ্চক-সম্প্রদায় জাল বিস্তার করে। অনেক দুর্ভাগা লোক তাহাদের কুহকে পড়িয়া পরম সত্য হইতে বিচ্যূত হয় এবং পরমার্থ-দূরে থাকে কেবলমাত্র অনর্থ-জালে আবদ্ধ হয়। যদি ডাক্তারের পুত্র ডাক্তারী না শিখিয়া লোকের চিকিৎসা করে, রেলওয়ের ড্রাইভারের পুত্র ইঞ্জিনের যন্ত্রসমূহে জ্ঞান লাভ না করিয়াই ট্রেন চালাইতে আরম্ভ করে, সন্তরণ কুশল পিতার সন্তরণে অসমর্থ পুত্র যদি অপরকে অগার জলে সাঁতার শিখাইতে শইয়া যায়, তাহা হইলে যে কি বিষময় ফল উৎপন্ন করে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

উপসংহার

বৈষ্ণবের শৌক্রেবংশে জাত বলিয়া আমরা যতই কেননা আশ্বালন করি, আমাদের হরি-সেবায় মুঢ়-শ্রদ্ধা না থাকিলে নিজীব ভক্তাজসমূহ প্রদর্শন করিলে আত্ম-বঞ্চনা এবং সমাজের শত্রুতা ব্যতীত আর কিছু করা হইবে না। অচ্যুতগোত্র-কখনই শৌক্রে-গোত্র নহে; সুতরাং

বৈষ্ণব-বংশ বলিলে কেবল বৈষ্ণবের শৌক-বংশ বুঝায় না। অচ্যুত-গোত্র প্রবর্তিত পরমার্থী বৈষ্ণব স্ব-স্ব অধিক 'রসমুহ' তাদৃশ নিত্য অনুরক্ত সেবকেই গ্রহণ করেন। কুল-প্রসূত বলিয়া অযোগ্য অধস্তনগণ কখনই পূর্ব-পুরুষের উত্তরাধিকার লাভ করিতে পারে না; লাভ করিলে তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ হন না। এই সকল কথা বৈষ্ণব-বংশের ন্যায় বিষ্ণুবংশেরও সমধিক কার্য্যকারী। বিশেষতঃ ভগবান্ ও ভক্তগণ কালে কালে ভিন্ন ভিন্ন বংশে জন্মগ্রহণ করেন, আবার তত্তৎবংশে অভক্ত বা অসুরগণের জন্ম লাভ করিবার বাধা নাই। বিষ্ণুর সম্ভ্রান বিষ্ণু নহেন, কিন্তু বৈষ্ণব, জুতরাং বিষ্ণু-বংশে ও বৈষ্ণব-বংশে তৃতীয় পুরুষ হইতে ভেদ নাই।

—শ্রীল. প্রভুপাদ—

বাউল-মতের বিচার

বাউলদের সম্বন্ধে পাঁচটি প্রশ্ন

কাকিনীয়া নিবাসী শ্রীযুত রাধিকানাথ রায় মহাশয় আমাদেরকে নিম্নলিখিত পাঁচটি প্রশ্ন লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। আমরা যথাসাধ্য নিম্নে প্রত্যুত্তর সহ লিখিতেছি,—

১) বর্তমান বাউল-ধর্ম্ম শাস্ত্রানুমোদিত কিনা ও ইহার প্রবর্তক কে ?
 ২) স্বকীয়া ও পরকীয়া সাধনপ্রণালী কিরূপ ? রসাত্মক ও ভাবাত্মক কাহাকে বলে ?

৩) রায় রামানন্দ, স্বরূপ দামোদর, শ্রীরূপ গোস্বামী, জগদেব, বিভূতাপতি, বিল্বমঙ্গল, মিরাবাই, পদ্মাদেবী, লক্ষ্মীবাই, চিন্তামণি প্রভৃতি মহাজ্ঞানগণ এইরূপ আশ্রয় অবলম্বন ও লীলাত্বকরণ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন কি না ?

৪) শাস্ত্রের কোন কোন অংশ বুঝিবার দোষে যদি এইরূপ ধর্ম্ম প্রবর্তিত হইয়া থাকে, তবে সেই সেই অংশের প্রকৃত অর্থ কি ?

৫) স্বরূপ দামোদর ও মিরাবাইয়ের এই পন্থা বিষয়ক কড়চার সত্যতা সম্বন্ধে আপনাদের কি মত ?

বাউল-মত সর্বশাস্ত্র-বিরুদ্ধ

বাউল-ধর্ম যে আকারে বর্তমান সময়ে দৃষ্ট হয়, তাহা সর্বশাস্ত্র-বিরুদ্ধ। শাস্ত্রে বৈধী ও রাগামুগা দুই প্রকার ভক্তির উপদেশ দেখা যায়। বাউলের কোন প্রকার বৈধী ভক্তি আচরণ করেন না। রাগামুগা ভক্তির চলে নানাবিধ অসদাচরণ করিয়া থাকে। বদ্ধত রাগামুগা ভক্তি অতিশয় পবিত্র। তাহাতে লেশমাত্র জড়ীয় বাপার নাই। আত্মার অপাকৃত রস ও ভাব অবলম্বনপূর্বক এই ভক্তি অনুষ্ঠিত হয়। এই ভক্তের বিবরণ এই পত্রিকার সময়ে সময়ে প্রদত্ত হইবে। বাউলদিগের অসং প্রথা অনেকদিন হইতে প্রচলিত। এই প্রথার প্রবর্তক যে কে,—তাহা বলা যায় না। বাউলেরা কখন শ্রীমদাতন গোস্থামী ও কখন শ্রীবীরভদ্র গোস্থামী প্রভুকে তাহাদের প্রবর্তক বলিয়া প্রচার করে। বদ্ধত তাহারা কখনই বাউল-দিগের কুপ্রথা শিক্ষা দেন নাই।

বাউলেরা রায় রামানন্দ প্রভৃতির ত্রীচরণে অপরাধী

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর আশাতত্ত্ব লিখিত হইল না; কেন না, অতি শীঘ্রই থকীয়া পারকীয়া তত্ত্ববিচার অবলম্বনপূর্বক একটা স্মরণ প্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে,—রায় রামানন্দ প্রভৃতি মহাজনগণ বিগুহ রাগমার্গে ভজন করিয়াছেন। কখনই বাউল মতের রসপ্রিয়, ভাবপ্রিয়াদি করেন নাই। বাউলেরা নানা ছলে তাহাদের সম্বন্ধে কতকগুলি মিথ্যা আখ্যায়িকা রচনা করত তাহাদের নিকট অপরাধী হইয়া থাকে।

বাউলেরা কু-প্রবৃত্তি-শালী ও ইন্দ্রিয়-পরায়ণ

চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরে এই মাত্র বলিতে পারি যে, বাউল মত শাস্ত্র-সিদ্ধ নয়। কতকগুলি কু-প্রবৃত্তিশালী ইন্দ্রিয়-পরায়ণ লোক শাস্ত্রের কোন কোন স্থলের কদর্থ করিয়া তাহাদের সুখজনক একটা কল্পিত মত সৃষ্টি করিয়াছে। বাউলেরা শাস্ত্রের কোন বিশেষ বাক্যের উপর নির্ভর করেন না, কিন্তু আবশ্যক হইলে চরিতামৃতের কোন কোন পদ্যাংশ ধরিয়া নিজ-মতের প্রতিষ্ঠা করে। সেই সেই অংশ যদি আমাদের নিকট দেখান হয়, তবে আমরা বিগুহার্থ প্রচার করিতে পারি।

বাউলের কড়চাছয় ঘৃণিত ও শ্রীলোকদিগকে কুপথে আনার জন্য কল্পিত

পঞ্চম প্রস্তাবে উত্তর এই যে, যে-ছইটী কড়চা রায় মহাশয় পাঠাইয়াছেন তাহা নিতান্ত ঘৃণিত। বাউলেরা ঐ সকল কড়চা রচনা করিয়া দুর্বল হৃদয় মূৰ্খ প্রকৃষ ও শ্রীলোকদিগকে কুপথে লইয়া যায়। আমরা স্বরূপ-দামোদরের কড়চা অনুসন্ধান করিতে করিতে ঐ প্রকার অনেক কৃত্রিম পুস্তক পাইয়াছি। সে সমস্তই হেয়। বস্তুত স্বরূপ-দামোদরের কড়চা পাওয়া যায় না।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীকৃষ্ণ কি বস্তু ?

(পূর্বপ্রকাশিত ৩২শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১২৭ পৃষ্ঠার পর)

আধ্যাত্মিকগণের মনঃকল্পিত কৃষ্ণ (?)—শ্রীকৃষ্ণ

নহে, উহা মায়াময় পুস্তল

শ্রীকৃষ্ণ-গণের চরণাশ্রয় না করার জন্যে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে অসংখ্য আধ্যাত্মিক মনঃকল্পনা-সমূহ উদ্ভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণালোচনার নামে অত্যন্ত কৃষ্ণবহিষ্মুখতার ভাব বুদ্ধি পাঠিতেছে। এইজন্য শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন,—“যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয়।” শ্রীল রায় রামানন্দ, শ্রীল স্বরূপদামোদর, শ্রীল রূপ-সনাতন, শ্রীবিশুনাথ, শ্রীজীবাদি গোস্বামিবৃন্দের উপদিষ্ট শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব আলোচনা করিলে আধ্যাত্মিক মতবাদিগণের মনঃকল্পনার কারখানায় প্রস্তুত শ্রীকৃষ্ণের নামে শ্রীকৃষ্ণ-গুণমায়ার পুস্তলিকা-সমূহের কৃষ্ণ-বহিষ্মুখ-মনোহারী চাকচিক্যের মূল্য অন্ধকণ্ঠিক হইলেও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতিভাত হয়।

গ্রাম্য সাহিত্যিক ও কবিগণের কল্পিত শ্রীকৃষ্ণ—

বাস্তব শ্রীকৃষ্ণ নহে

কোন কোন গ্রাম্য ঔপন্যাসিক, কোন কোন গ্রাম্য যন্ত্রা-তত্ত্বা কবি শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র, শ্রীকৃষ্ণ-লীলা প্রভৃতি লিখিতে গিয়া শ্রীকৃষ্ণের পদনথ হইতে কোটি যোজন দূরে শ্রীকৃষ্ণ-মহামায়ার রচিত অন্ধকূপে গিলিষ্ট হইয়াছেন।

ইহারা বুদ্ধিতে পারেন নাই যে, যেমন রাবণ চিহ্নঙ্কিত সীতাকে হরণ করিতে পারে না, মায়াসীতাকে হরণ করিয়াই সীতা হরণ করিয়াছি মনে করে, মক্ষিকা যেক্রপ স্বচ্ছ কাচখণ্ডস্থিত মধু স্পর্শ করিতে না পারিয়া কাচভাঙের বহির্ভাগে অবস্থান করিয়াই মধু পাইয়াছি মনে করে, তদ্রূপ যাহারা শ্রীকৃপানুগগণের চরণাশ্রয় করেন নাই, একান্তভাবে সর্বস্ব সমর্পণ করিয়া সর্বাত্মায় শ্রীকৃপানুগ-গণের পাদপঙ্কজ-পরাগ ভজন করেন নাই, সেই সকল গ্রাম্য কবি, গ্রাম্য সাহিত্যিক, গ্রাম্য ঔপন্যাসিক, দেশ-নেতা, সমাজ-নেতা, অনুচানমানী, জাগতিক ধন-গুণ-কুলে-শীলে-পাণ্ডিত্যে শ্রেষ্ঠা-ভিমানী ব্যক্তি ছনিয়ার সকল লোকের নিকটও যদি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তথাপি তাঁহারা অপ্রাকৃত কৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। তাঁহাদের কৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা—আংশিক বা অসম্যক মাত্র নহে, পরস্তু সম্পূর্ণ বিকৃত ও বিপরীত।

প্রাকৃত ব্যক্তিগণের শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে নানাপ্রকার

অনোদর্শনপর যতবাদ

এইরূপ শ্রেণীর ব্যক্তিগণ শ্রীকৃষ্ণকে কখনও রাজনৈতিক নায়ক, কুট-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিবিশেষ, কখনও জাগতিক সম্পটগণের আদর্শ, কখনও বা শ্রীকৃষ্ণের লাম্পট্য-কালিমার (৭) অপনোদনের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে রূপক তত্ত্ব-বিশেষ, কখনও শ্রীকৃষ্ণকে জাগতিক অভ্যুদয় ও উন্নতির উপদেশক প্রভৃতি-রূপে কত কি বিচার করেন। অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণ এইসমস্ত প্রাকৃত বিচারের সম্পূর্ণ অতীত। শ্রীকৃষ্ণ কেন, শ্রীকৃষ্ণের পদমখ হইতে প্রকাশিত অসংখ্য অবতার এবং তাঁহাদের সেবকানুসেকমণ্ডলীতেও ঐ সকল লৌকিকতা আরোপিত হইতে পারে না।

জীবে কৃষ্ণ-বুদ্ধি বা আরোপ—কৃষ্ণচরণে

অমার্জ্জুনীয় অপরাধ

আধুনিক কেহ কেহ কোন কোন লৌকিক দেশ-নেতা প্রভৃতিকে শ্রীকৃষ্ণ সাজাইবার চেষ্টা-মূলে জীবে পরমেশ্বর-বুদ্ধি করার দরুণ ভীষণ মায়াবাদ-হুগাচল জগতে বিস্তার করিতেছে। এইরূপ অপবাদের দ্বারা অগজজাল প্রবন্ধ ও দেশ উচ্ছন্নের পথে উপনীত হইয়াছে। জীবে কৃষ্ণ-বুদ্ধির জ্ঞান অপরাধ আর নাই। জীবে কৃষ্ণের অধিষ্ঠান আছে, কিন্তু

জীব কৃষ্ণ নহে। যাহারা বিকিশেষবাদকে চরমে লক্ষ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-পূজার সাময়িক ছলনা প্রদর্শন করেন, তাহারা তা' শ্রীকৃষ্ণ-পূজক নহেনই, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণে সম্পূর্ণ বিমুখ ও অপরাধী। অগ্নি-শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবের পদবর্ণনগুণের শাদপদ্মপ্রায় করিলে এইসকল কথার উপলব্ধি হয়।

‘শ্রীকৃষ্ণ’ শব্দ স্বয়ং পূর্ণ ও নিরপেক্ষ সত্ত্বাক

‘শ্রীকৃষ্ণ’ শব্দ—পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্য, মুক্ত, চিন্তামণিস্বরূপ। ‘শ্রীকৃষ্ণ’ শব্দ স্বয়ংদিক ও স্বয়ং পূর্ণ বলিয়া তাহাকে পরিপূরণ করিতে অন্য কোন শব্দ বা নামাস্তরের প্রয়োজন হয় না। ‘ব্রহ্ম’, ‘পরমাত্মা’, ‘অন্তর্যামী’, ‘জগৎপ্রভা’, ‘বিশ্ববিধাতা’ প্রভৃতি শব্দকে পূর্ণ করিতে হইলে ‘কৃষ্ণ’ শব্দের প্রয়োজন হয়, কারণ, তত্ত্ব শব্দে পূর্ণ পরাংপর বস্তুর সকল ভাব প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু ‘কৃষ্ণ’ শব্দ কুঞ্জেই ছায় অথগু স্থান, অথগু কাল, অথগু পাত্র এবং বাবতীয় অথগু তাবরাশির সমগ্রতা সাধন করিয়াছেন। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণের পরমশুদ্ধ শব্দ বলিয়াছেন,—

মহাদেবের উক্তি

তারকাজ্জারেতে মুক্তিঃ প্রেমভক্তিস্ত পারকাদিতি। পূর্বমজ মোচকত্ব-প্রেমদত্তাত্ম্যং তারকপারকসংজ্ঞে রামকৃষ্ণনাম্নোহি বিহিতে। তত্র চ রাম-নাম্নি মোচকত্বশক্তিরেবাধিকা। শ্রীকৃষ্ণনাম্নি তু মোক্ষঅর্থতিরস্কারিপ্রেমানন্দ-দাতৃত্বশক্তিঃ সমধিবেতি ভাবঃ। ইৎসমেবোক্তং-বিযুধ্যম্বোত্তরে—যচ্ছক্তি নাম যৎ তস্ম তস্মিন্বেব চ বস্তনি সাধকং পুরুষব্যাপ্ত শৌম্যকুরেবু বস্তদ্বিতি। কিঞ্চ শ্রীকৃষ্ণনাম্নো মাহাত্ম্যং নিগদেদৈব ক্ষয়তে প্রভাসপুরাণে স্রীনারদ-কুশধ্বজ-সংবাদে শ্রীভগবদুক্তৌ—নাম্নাং মুখ্যতমং নাম কৃষ্ণাখ্যং মে পরস্তপেতি। তদেবং গতিসামান্যেন নামমহিমদ্বারা তস্মহিমাতিশয়ঃ সাধিতঃ। (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ)।

‘রাম’নাম—তারক, ‘কৃষ্ণ’নাম—পারক

মুক্তিদাতৃত্ব-হেতু রাম-নামের ‘তারক’ সংজ্ঞা এবং প্রেমদাতৃত্ব-হেতু কৃষ্ণ-নামের ‘পারক’ সংজ্ঞা। ‘তারক’ হইতে মুক্তি এবং ‘পারক’ হইতে প্রেমভক্তি-লাভ হয়। রাম-নামে মোচকতা-শক্তি অধিক, আর কৃষ্ণনামে মোক্ষঅর্থ-তিরস্কারি-প্রেমানন্দ-দাতৃত্ব-শক্তি সমধিক। বিযুধ্যম্বোত্তরে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—যে পুরুষব্যাপ্ত, কেহ শাস্ত হউন, আর বলই হউন,

শ্রীভগবানের নামের শক্তি নিঃশঙ্কানুরূপ ফলদান করিয়া থাকেন। যে নামে প্রেমদানশক্তি প্রচুর, সেই নাম আশ্রিত ব্যক্তির অপরাধ বিদূরিত করিয়া প্রেম দান করিয়া থাকেন; আর যে নামে মোচকতা-শক্তি প্রচুর, সেই নাম মুক্তিলাভ প্রদান করেন। কিন্তু মোক্ষ-প্রেমের ছায় সাধা ফল নহে, আরোগ্য বা রোগরূপ দুঃখের অভাব-মাত্রই সূখ নহে। রোগ-নির্মুক্তির পর স্বাস্থ্যবানের ন্যায় আহার-বিহারাদি ক্রিয়াই সূখ-সাধক। আর শ্রীকৃষ্ণের নামান্ত্রাসেই অনায়াসে মুক্তি হয়। এইজগৎ শ্রীকৃষ্ণনামের মহিমাধিকার কথা সুস্পষ্ট উক্তিতে শুনা যায়। প্রভাসপুরাণে শ্রীনারদ-কুশধ্বজ-সংবাদে শ্রীভগবানের উক্তি,—‘হে পরব্রত, নামসকলের মধ্যে ‘কৃষ্ণ’ নামটি আমার সর্বশ্রেষ্ঠ নাম।’

গতিসামান্যে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের সর্ববিশ্রেষ্ঠতা

অতএব শ্রীকৃষ্ণনামের মাহাত্ম্যাধিক্য হইতে গতিসামান্যে অর্থাৎ নামের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপত্তির ন্যায় স্বরূপের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপত্তি—এই সমানগতির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ মহিমা সাধিত হইল। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকরবৈশিষ্ট্য প্রভৃতিতে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে হইলে সঙ্গুরুপদাশ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রদর্শিত ভজন-পথ শ্রীকৃষ্ণনামসঙ্কীৰ্ত্তন গ্রহণ করাই জীবমাত্রের কর্তব্য।

চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবায়িঃ নির্দীপনং

শ্রেয়ঃকৈরবচ্ছিন্না-বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্ ।

আনন্দানুধিবর্জনং প্রতিপদং পূর্ণায়ুতাম্বাদনং

সর্বান্নম্পনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীৰ্ত্তনম্ ॥

[শ্রীকৃষ্ণের নামসঙ্কীৰ্ত্তন-দ্বারা মারুঘের অনর্থরূপ ময়লাযুক্ত চিত্তরূপ আগ্ননাথানির মলিনতা পবিত্র হইয়; নামসঙ্কীৰ্ত্তন সংসারের আগুনের জ্বালা নিভিয়ে দেন; শ্রীনাম-প্রভু ভাবরূপী জ্যোৎস্না বিতরণ ক’রে যাবতীর কল্যাণ-রূপ কুমুদসকলকে প্রফুল্লিত করেন; বিদ্যাবধূরূপ ভক্তিদেবীর প্রাণই—**শ্রীকৃষ্ণনাম-সঙ্কীৰ্ত্তন**; শ্রীকৃষ্ণের নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনে আনন্দরূপসাগর বৃদ্ধি পেতে থাকে; শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীৰ্ত্তনে প্রতি পদে পদে প্রেমের আশাদ পাওয়া যায়; শ্রীকৃষ্ণ-নাম-সঙ্কীৰ্ত্তন সমস্ত জীবের নিঃসংশয় ও স্নিগ্ধতা দান ক’রে সেবায়ুতমাগরে জীবকে ডুবিয়ে রাখেন, এই শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীৰ্ত্তন বিশেষভাবে জয়যুক্ত হউন।]

আশা

মিথ্যা আশায় গেল কাল ফুরাইয়া !

মায়া-অন্ধ অবিরাম অলিক স্বপন-সম,

হিসাবের দিন গেল লুকাইয়া ॥

বাণেশ্বর ক্রীড়া-কৌতুক উঠে নবীন আলোক,

মুছে যাব আশার প্রভাবে ।

কত যে যতন করি— এড়াইল কত অরি,

মায়া-পিশাচীর ছুদান্ত স্বভাবে ॥

কৌমার যৌবন এল, কত আশা মনে হল,

কিন্তু ক্রমে পত্রবৎ বরি যায় ।

জড়বিভা অর্থ আসে মহা দুঃখ মাঝে ভাসে,

তবু রতি নাহি গোবিন্দ-সেবায় ॥

মিথ্যা মোহে আশা করি, অন্তঃকালে গেল রবি,

জীবন-প্রদীপ হ'ল অবসান ।

মাহুষ অনিত্য-আশে, নিত্যধন সদা নাশে,

না হইল শ্রীগোবিন্দ-সেবন ॥

আশা-বশে বীর জোয়ান, হল যুদ্ধে আগুয়ান,

হারায় অকালে অমূল্য প্রাণ ।

অনিত্য মোহ-বশে জীব বন্ধ কর্ম-পাশে,

দৈব-মায়ার অটুট বন্ধন ॥

মৃত্যু-শয্যায় শায়িত জন, ভাবে অলিক স্বপন,

পড়িয়া মায়ার ফাঁপরে ।

কাতর হইয়া তায়, করে কত ধন ব্যয়,

বাঁচিতে এ অবনী মাঝারে ॥

আশার যে শেষ নাই, সদা দুঃখ দেয় তাই,

জীবের কর্মবন্ধ জীবনে ।

আশার সম্পূর্ণ শান্তি— কর কৃষ্ণে দৃঢ়ভক্তি,

হইবে লভ্য নিত্য পরম সুখ ॥

—শ্রীনরহরিদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্য-লীলার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

(পূর্বপ্রকাশিত ৩২শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১০৯ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে রামানুজীয় বৈষ্ণব শ্রীবৈষ্ণব ভট্টকে

কৃষ্ণের অসমোদ্ধ পরতমত্ব সম্পর্কে শুদ্ধ-

সিদ্ধান্ত জানাইয়া স্বমতে আনয়ন।

মহাপ্রভু শ্রীরঙ্গক্ষেত্র দর্শনে অসিয়া লক্ষ্মীনারায়ণ-জীউর উপাসক রামানুজীয় বৈষ্ণব শ্রীবৈষ্ণব ভট্টের অনুরোধ-ক্রেমে তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া চাতুর্ঘ্যাস্ত্র এত উদ্‌যাপন করেন। এই সময় বৈষ্ণব ভট্টের পুত্র তথা ষড়্‌গোষামীর অন্যতম শ্রীমদ্ গোপাল ভট্ট গোষামিপাদ বালা বয়সে শ্রীমদ্ব্যাসভট্টের শ্রীপাদপদ্ম সেবা করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন। বৈষ্ণব ভট্ট তাঁহার উক্ত বালক পুত্রকে মহাপ্রভুর চরণে সমর্পণ করিলেন। কিন্তু মহাপ্রভুর ইচ্ছাক্রমে শ্রীল গোপালভট্ট গোষামী প্রভু বৈষ্ণব-পিতামাতার আমরণ পর্য্যন্ত সেবা করিতে থাকেন। কালক্রমে গোপাল ভট্টের পিতামাতা পরলোক গমন করিলে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে গমন করেন।

মহাপ্রভু বৈষ্ণব ভট্টের আলয়ে থাকাকালে কৃষ্ণ-কথা প্রসঙ্গে ভট্টের উপাস্তদেব শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণজীউ অপেক্ষা কৃষ্ণের পরতমত্ব স্থাপন করেন। মহাপ্রভু শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত উল্লেখপূর্বক ভট্টকে জানাইলেন যে, নারায়ণ ও কৃষ্ণের স্বরূপদ্বয়ের মধ্যে তত্ত্বতঃ ভেদ না থাকিলেও রসের উৎকর্ষ-নিবন্ধন কৃষ্ণ-রূপেই রসতত্ত্বের বৈশিষ্ট্যপূর্ণতা বিद्यমান। ক্রটিগণ গোপীর আরাধনা করিয়া কৃষ্ণের রাসে সঙ্গী হইয়াছেন, কিন্তু লক্ষ্মীদেবী কৃষ্ণের অসমোদ্ধ-মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া রাস-লীলার সঙ্গিনী হইবার ইচ্ছা থাকিলেও গোপীকা-অনুগা হইয়া শুজন না করায় কৃষ্ণের রাসে স্থানলাভে ব্যথিত হইয়াছেন। - এইভাবে মহাপ্রভু উপদেশদ্বারা রাগমার্গ-ভক্তির মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব ব্যক্ত করিলেন।

“গোপী-আহুগতা বিনা ক্রৈশ্বর্য্যজ্ঞানে।

ভজিলে নাহি পায় ব্রহ্মলু-নন্দনে।”—(১৫: ৫:)

মহাপ্রভুর উক্ত শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত শ্রবণে বৈষ্ণব ভট্ট আশ্চর্য্যাবিত হইলেন এবং ভট্ট এতকাল ধরিয়া শ্রীনারায়ণ-ভজন শ্রেষ্ঠ জানিয়া শ্রীনারায়ণকে স্বয়ং ভগবান্ জ্ঞান করিয়া আসিলেও এক্ষণে তদপেক্ষা কৃষ্ণ-ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিলেন। মহাপ্রভু ভট্টের গর্ব্ব খণ্ডন করিবার জন্য আরও কহিলেন,—‘ভগবান্ কৃষ্ণের বিলাসমুর্ত্তি শ্রীনারায়ণ হওয়ায় কৃষ্ণচন্দ্র লক্ষ্মী-আদিরও মন হরণ করিয়া থাকেন। তদুপরি নারায়ণ অপেক্ষা কৃষ্ণের

অসাধারণ গুণ থাকায় লক্ষ্মীদেবীর কৃষ্ণের প্রতি অনুক্ষণ আকাঙ্ক্ষা বর্তমান। কিন্তু গোপীগণ কৃষ্ণ-প্রেমসী বিধায় নারায়ণের চতুর্ভুজরূপ-গোপীদের মন হরণ করিতে সমর্থ নহেন।' মহাপ্রভু অবস্থিধ শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত বলিবার পর ভট্টের মনে সন্তোষ বিধানার্থ পুনরায় জানাইলেন,—‘ভগবান্ অচ্যুত ধ্যান-ভেদে রূপভেদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ কৃষ্ণ ও নারায়ণ যেকোন একই স্বরূপ, তদ্রূপ গোপী ও লক্ষ্মীদেবীর মধ্যে কোন ভেদ নাই। লক্ষ্মীদেবীই গোপীদ্বারে কৃষ্ণ-সঙ্গাদ্দ করিয়া থাকেন। ঈশ্বরত্বে ভেদ মানিলে অপরাধ হয়।’ তখন ভট্ট সাহসনয়ে কৃতাজলিপুটে কহিলেন,—

‘ভট্ট কহে, কাঁহা মুঞি জীব পামর।

কাঁহা তুমি সেই কৃষ্ণ,—সাক্ষাৎ ঈশ্বর ॥

অগাধ ঈশ্বর-লীলা কিছু নাহি জানি।

তুমি যেই কহ, সেই সত্য করি’ মানি ॥

মোরে পূর্ণ রূপা ঠেল লক্ষ্মীনারায়ণ।

তাঁর রূপায় পাইছু তোমার চরণ-দর্শন ॥

রূপা করি’ কহিলে মোরে কৃষ্ণের মহিমা।

যাঁর রূপ-গুণৈশ্বর্যের কেহ না পায় সীমা ॥

এবে সে জানিহু কৃষ্ণ-ভক্তি সর্বোপরি।

কৃতার্থ করিলে প্রভু মোরে রূপা করি’ ॥”—(চৈঃ চঃ)

অনন্তর-ভট্ট অশ্রুপূর্ণ নয়নে মহাপ্রভুর চরণে পতিত হইলে মহাপ্রভু ভট্টকে আশিষদ্বারা আশীর্বাদ করিয়া দক্ষিণদিকে রওনা হইলেন।

মাদুরায় রামদাসবিপ্র সীতাহরণ-প্রসঙ্গ শুনিয়া ব্যথিত

হইলে ভগবানের স্বরূপশক্তি সীতাদেবীর

মহিমা বর্ণনাপূর্বক সাস্তুনা প্রদান

মহাপ্রভু ক্রমে ঋষভ পর্বতে আসিয়া পরমানন্দপুরী গোস্বামীর নিকট তিন দিবস কৃষ্ণ-কথা-প্রসঙ্গে অতিবাহিত করিয়া পুরী গোস্বামীর সহিত নীলাচলে একত্রে থাকিবাব অভিপ্রায় জানাইলেন। পুরী গোস্বামী নীলাচল অভিযুখে গমন করিলে মহাপ্রভু সেতুবন্ধ হইয়া শ্রীশৈল পর্বতে উপস্থিত হইলেন। তথায় শিব-দুর্গা আসিয়া ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর বেশে মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করেন। অনন্তর কামকোষ্ঠী হইয়া দক্ষিণ মধুগায় বা মাদুরায় পৌছিলে রামভক্ত এক ব্রাহ্মণের সহিত মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ হয়। সেই রামভক্ত ব্রাহ্মণ দুঃখিত অন্তঃকরণে মহাপ্রভুকে জানাইলেন,—‘জগন্নাথ

মহালক্ষ্মী সীতাদেবীকে রাক্ষসরাজ রাবণ স্পর্শ করিয়াছে শুনিয়া দুঃখে এই দেহ-প্রাণ অলিয়া যাইতেছে, মনে বড় অশান্তি পাইতেছি।’ মহাপ্রভু তৎক্ষণে সেই বিপ্রকে কহিলেন,—

“ঈশ্বর-প্রেমসী সীতা চিদানন্দমূর্ত্তি।

প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে তাঁরে দেখিতে নাহি শক্তি ॥

স্পর্শিবার কার্য্য আছুক, না পায় দর্শন।

সীতার আকৃতি-মায়া হরিল রাবণ ॥

রাবণ আসিতেই সীতা অন্তর্দান কৈল।

রাবণের আগে মায়া-সীতা পাঠাইল ॥

অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর।

বেদ-পুণ্যেতে এই কহে নিরন্তর ॥

বিশ্বাস করহ তুমি আমার বচনে।

পুনরপি কুভাবনা না করিহ মনে ॥”—(চৈঃ চঃ)

মহাপ্রভুর উল্লিখিত বচনে সেই বিপ্র আশ্বস্ত হইলেন। মহাপ্রভু তথা হইতে কামেশ্বর আসিয়া এক ব্রাহ্মণ-সভায় কুর্মপুরাণে মায়া-সীতার উক্ত-রূপ উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া তাহা সংগ্রহপূর্ব্বক মাদুরার রামদাস বিপ্রকে আনিয়া দেন এবং নিজ পূর্ব্ব-সিদ্ধান্তের যথার্থ্যতা প্রতিপাদন করেন। কুর্মপুরাণান্তর্গত মায়া-সীতা হরণ সম্পর্কীয় শ্লোকের বর্ণনার জ্ঞানী যায়,—

“সীতয়ারাধিতো বহিঃছায়া সীতামজীজনৎ।

তাং জহার দশগ্রীবঃ সীতা বহিঃপুং গতা ॥

পরীক্ষা-সময়ে বহিঃ ছায়াসীতা বিবেশ সা।

বহিঃ সীতাং সমানীয় তৎপুংস্তাদনীনয়ৎ ॥”

অর্থাৎ, “সীতা কর্তৃক আরাধিত হইয়া বহিঃ একটি ছায়া-সীতা উৎপাদন করেন। দশস্কন্ধ রাবণ তাহাকেই হরণ করিয়াছিল। মূল-সীতা অগ্নিপু্রে প্রস্থান করিলেন। পরীক্ষা-সময়ে (রামচন্দ্র যখন পরীক্ষা করেন) ছায়া-সীতা অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন, অগ্নিদেব মূল-সীতাকে আনিয়া শ্রীরামের নিকট দিলেন।”

এমতাবস্থায় মায়াবদ্ধ রাক্ষসরাজ রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ সম্ভব হইতে পারে না। ভগবানের স্বরূপশক্তি সীতাদেবীর ছায়া মায়া-সীতা মাত্র রাবণ কর্তৃক অগ্রহৃত হইয়াছিল। ঈশ্বর রামচন্দ্রের প্রেমসী সীতাদেবী

যদিও রাবণ কর্তৃক অপহৃত হইল নাই, তথাপি গীতার প্রতি ভোগবুদ্ধি-জনিত মহা-অপরাধ হেতু রাবণ শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা নিহত হইয়াছিল।

অনন্তর মহাপ্রভুর কৃপায় রামদাস বিপ্লবের হৃদয় আনন্দে ভরপুর হইল এবং বিপ্র তখন মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ রঘুনন্দন জানিয়া প্রভুর পাদপদ্মে প্রণত হইলে মহাপ্রভু সেই বিপ্রকে কৃপাশীর্ষাদ প্রদান করিলেন।

মল্লারদেশে ভট্টথারিদের কবল হইতে পর্যটন-লীলার

লজ্জা বিপ্র কালা কৃষ্ণদাসকে উদ্ধার

অনন্তর মহাপ্রভু চিড়মতাপা-তীর্থ, তিলকাধী, গজেন্দ্র-মোক্ষণ-তীর্থ, কথ্য-কুমারী প্রভৃতি স্থান দর্শনপূর্বক ক্রমে মল্লারদেশে উপস্থিত হইলেন। এই মল্লারদেশে 'ভট্টথারি' নামে এক সম্প্রদায় মারণ, বশীকরণ প্রভৃতি যাগ-যজ্ঞ ক্রিয়া-কলাপের মাধ্যমে উক্ত স্থানীয় নথুদ্রি ব্রাহ্মণদের পুরোহিত-রূপে সন্ন্যাসীর বেশে বসবাস করিয়া থাকে। এই ভট্টথারিগণ প্রভাবনা ও বশীকরণ প্রভাবে জীলোক সংগ্রহ করিয়া সেই জীলোক দ্বারা অপর পুরুষকে আকৃষ্ট করাইয়া নিজেদের দলে আনয়ন করে। নীলাচল হইতে সরল ব্রাহ্মণ কালা কৃষ্ণদাস বরাবর মহাপ্রভুর পরমোদার্যাময়ী লীলা-সকল দেখিতে দেখিতে সজী-সেবকরূপে তাহার জলপাত্র-বহির্কাস বহনপূর্বক এই মল্লারদেশে আসিলেন। ভট্টথারিগণ এই কালা কৃষ্ণদাসকে নবাগত সরল ব্রাহ্মণ দেখিয়া জী-ধন দেখাইয়া তাহাকে প্রলুব্ধ করিল। 'কৃষ্ণদাস তুর্কবুদ্ধিবশে জীধন প্রাপ্তির লোভে মহাপ্রভুর সেবা ভুলিয়া গিয়া ভট্টথারি-দের গৃহে তথা শিবিরে প্রবেশ করিল। জীলোকের প্রলোভনে আর্ষা সরল ব্রাহ্মণ কৃষ্ণদাসের বুদ্ধি নাশ হইল। মহাপ্রভু সত্বর কৃষ্ণদাসকে ভট্টথারিদের কবল হইতে উদ্ধারের জন্ত ভট্টথারিদের গৃহে গমন করিয়া কহিলেন,—‘তোমরা আমার ব্রাহ্মণকে কিছন্ম জটক রাখিবাছ ? তোমরাও সন্ন্যাসী, আমিও সন্ন্যাসী ; অতএব আমাকে হুঃখ দেওয়া তোমাদের অন্যায় হইতেছে।’ মহাপ্রভুর ঐক্লপ বাক্য শ্রবণে ভট্টথারিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া চতুর্দিক হইতে অস্ত্র লইয়া মহাপ্রভুকে আক্রমণ করিল। কিন্তু প্রভুর অচিন্ত্য-শক্তিতে ভট্টথারিগণ নিজেদের অস্ত্রে নিজেরাই আঘাত পাইয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে পলায়ন করিল। মহাপ্রভু তখন নিজ সেবক কৃষ্ণদাস বিপ্লবের কেশ ধরিয়া টানিতে টানিতে সে-স্থান হইতে বাহির করিয়া নিজ স্থানে আনয়ন করিলেন।

হৃদৈববশে বিকিণ্ড-চিত্ত কৃষ্ণদাসকে ভট্টথারিদের কবল হইতে কেশাকর্ষণ-পূর্বক মহাপ্রভু উদ্ধার করিলেন বটে, কিন্তু কৃষ্ণদাসের ঐরূপ যোষিং-দর্শন বা যোষিং-দঙ্গ-স্পৃহা মহাপ্রভু বিন্দুমান্ন অনুমোদন করেন নাই। পরে মহাপ্রভু দক্ষিণদেশ হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিয়া সার্বভৌমের নিকট কৃষ্ণদাসের স্ত্রী সঙ্গে প্রলোভিত হইবার ঘটনা বিবৃত করিয়া কহিয়াছিলেন,—

ভট্টথারি-কাছে গেলা আমারে ছাড়িঞা।

ভট্টথারি হৈতে ইঁহা আনিবু উদ্ধারিয়া ॥

এবে আমি ইঁহা আনি' করিলাঙ বিদায়।

য'হা ইচ্ছা যাহ, আমা-মনে নাহি আর দায় ॥—(চৈঃ চঃ)

প্রভুর মুখে অরূপ কথা শ্রবণে কৃষ্ণদাস ক্রন্দন বহিতে থাকিলেন। ইহাতে কৃষ্ণদাসের প্রতি মহাপ্রভুর বর্জ্জন-লীলাই প্রদর্শিত হইয়াছে। অবশ্য নিত্যানন্দপ্রভুর নিবেদনে মহাপ্রভু উক্ত কৃষ্ণদাসকে সাক্ষাৎ সেবা হইতে বঞ্চিত করিয়া গোড়দেশে প্রেরণের অনুমতি দেন। তটস্থাসক্তি জীব স্বরূপগঠনে অহুচেতন হইলেও স্বতন্ত্র স্বভাববশতঃ স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-ক্রমে-মায়াবশ্যযোগ্য হওয়ায় এস্থলে কৃষ্ণদাস ভগবৎসেবা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া ভট্টথারিদের স্ত্রীর প্রলোভনে প্রলুপ্ত হইয়াছিল। কাল কৃষ্ণদাসের এইরূপ ভগবৎ-সেবার অভিনয় মহাপ্রভু জানিতে পারিয়া কৃষ্ণদাসকে সাক্ষাৎ সেবাধিকার হইতে দূরে রাখিবার লীলা প্রকাশ করিয়া এসদ্ অভিসন্ধি-পরায়ণ বৈষ্ণবদিগকে সাবধান করিয়াছেন।

উড়ুণীতে তত্ত্ববাদিগণের কর্কটকাণ্ডীয় বিচারখণ্ডন

ক্রমে মহাপ্রভু পয়স্বিনী-তীরে আদিকেশব মন্দির দর্শনাঙ্কে ব্রহ্মসংহিতা সংগ্রহপূর্বক সিংহারিমঠ, মংস্ততীর্থ প্রভৃতি স্থান হইয়া উড়ুণীতে মধ্বাচার্য্য-স্থাপিত 'গোপালকৃষ্ণ' দেখিয়া প্রেমোন্মাদে নৃত্য-কীর্্তন করিলেন। তথাকার তত্ত্ববাদিগণ প্রথমে মহাপ্রভুকে মায়াবাদী-জ্ঞানে সম্ভাষণ না করিলেও পরে মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া বৈষ্ণব-জ্ঞানে যথোচিত ব্যবহার করিলেন। কিন্তু সেই তত্ত্ববাদিগণের মনে মনে বৈষ্ণবতার গর্ব ছিল। সর্বভূতান্তর্যামী মহাপ্রভু তাহা জানিতে পারিয়া তত্ত্ববাদিগণের গর্ব খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্যে তত্ত্ববাদী-আচার্য্যের সহিত শাস্ত্র-সংলাপ আরম্ভ করিলেন। সাধ্য-সাধন সম্পর্কে তত্ত্ববাদী-আচার্য্য মহাপ্রভুকে জানাইলেন যে, 'কৃষ্ণে বর্ণাশ্রমধর্ম সমর্পণই কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ সাধন এবং পঞ্চবিধ মুক্তি পাইয়া বৈকুণ্ঠে গমনই সাধ্য শ্রেষ্ঠ।' মহাপ্রভু তত্ত্বতরে কহিলেন,—

“প্রভু কহে,—শাঙ্গে কহে শ্রবণ-কীর্তন ।

কৃষ্ণ-প্রেম-সেবা ফলের পরম সাধন ॥

শ্রবণ-কীর্তন হৈতে কৃষ্ণে হয় ‘প্রেম’ ।

সেই পরম পুরুষার্থ—পুরুষার্থের সীমা ॥

পঞ্চবিধ মুক্তি ত্যাগ করে ভক্তগণ ।

ফল্য করি ‘মুক্তি’ দেখে নরকের সম ॥

মুক্তি কর্ম—তুই বস্ত তাজে ভক্তগণ ।

সেই তুই স্থাপ’ তুমি ‘সাধ্য’, ‘সাধন’ ॥

সন্ন্যাসী দেখিয়া মোরে করহ বঞ্চন ।

না কহিলা তেঁঞে সাধ্য-সাধন-লক্ষণ ॥—(চৈঃ চঃ)

তখন তত্ত্ববাদী-আচার্য্য অন্তরে লজ্জিত হইলেন এবং মহাপ্রভুর বৈষ্ণবতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া কহিলেন,—‘প্রভু, আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সর্বশাঙ্গে স্বীকৃত ও সত্য। তথাপি আমরা মধবাচার্য্য-সম্প্রদায় সম্বন্ধে আচরণ করি।’ প্রভু পুনরায় জানাইলেন,—“কর্ম্মী ও জ্ঞানী—তুই ভক্তহীন। তথাপি আপনার সম্প্রদায়ে সেই তুই ভক্তহীনের চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইতেছে। তবে একমাত্র ঈশ্বরে সত্য বিগ্রহ করিয়া নিশ্চয়রূপে আপনার সম্প্রদায় মান্য করিয়া থাকে।”

প্রভুর উপরোক্ত বাণী শ্রবণে সেই তত্ত্ববাদী আচার্য্য বুঝিলেন যে, ‘তত্ত্ববাদীগণের বিচার ভক্তজন-গ্রাহ্য নহে। কৃষ্ণভক্তগণের নিকট নিকষণ মুক্তিও তুচ্ছ।’ শ্রীকৃষ্ণ-কথা-শ্রবণ-কীর্তনাদি নবলক্ষণাভক্তিই অতিথৈয় বা পরম সাধন, এবং কৃষ্ণ-প্রেমই প্রয়োজন বা পরমসাধ্য।’ এইভাবে তত্ত্ববাদী-আচার্য্যের গর্ভ চূর্ণ হইল।

এই প্রসঙ্গে অগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের উক্তি স্মরণীয়;—“তত্ত্ববাদী ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্র ভক্তসম্প্রদায় মনে করেন, বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ মূলবস্ত; কৃষ্ণ সেই বস্তুর অবতার, নিমিত্ত উপলক্ষ্য করিয়া প্রপঞ্চে অবতরণ করেন; প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে। বৈকুণ্ঠনাথ অপেক্ষা কৃষ্ণলীলা-মাধুর্য্যের উৎকর্ষ আছে; তাহা তত্ত্ববাদীগণেরও ধারণাতীত রাজ্যে অবস্থিত। (ত্রয়মণঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন কবিভূষণ

ছন্ন গোস্থানী

(পূর্ব প্রকাশিত ৩২শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৭ পৃষ্ঠার পর)

“তত্ত্বজ্ঞম্ অন্যাথা সংশয়নিরাসকত্বাবোগাত্বাং, অপরোক্ষাভূতবেন নিষ্কাতম্
অন্যথা বোধ-সঙ্কারাবোগাং, পরমশাস্ত্রম্, ভক্তিযোগাশ্রয়ম্, সদা শ্রবণ-
কীৰ্ত্তনাদিপরম্ শ্রীবৈষ্ণববরং,—(১২৭) অর্থাৎ “সদৃশ্য তত্ত্ববিৎ হইবেন,
নতুবা তিনি শিষ্যের নিবসন করিতে সমর্থ হইতে পারেন না; সদৃশ্য
অধোক্ষজ ভগবদ্ভূপলকিতে নিষ্কাত হইবেন, নতুবা তিনি শিষ্যের হৃদয়ে
ভগবদ্ভাব সঞ্চার করিতে অসুপযুক্ত; সদৃশ্য নিষ্কাম, শাস্ত্র অর্থাৎ মোক্ষাতীত
ভক্তিযোগ-আশ্রয়কারী এবং নিরন্তর শ্রবণ-কীৰ্ত্তনাদিপর মহাভাগবত
হইবেন;” “শিষ্যতঃ সকাশাং পরিচর্যা দিলিপ্যুর্ধ্বঃ স গুরুর্ন ভবতি, তহি
কিমর্থং গুরুঃ? পরমদয়ালুতয়া লোকহিতার্থমেব (১৩৫)”—অর্থাৎ “যিনি
শিষ্যের নিকট হইতে কোনও প্রকার সেবা বা অর্থাৎ ইচ্ছা করেন, তিনি
কখনও ‘গুরু’-পদবাচ্য নহেন; তবে প্রপন্ন হইতে পারে, গুরুর আবশ্যিকতা
কি? শ্রীগুরুদেব পরমদয়ালু, রূপাসিদ্ধ, তিনি পরভূত-হৃদয়ী, তাই, জীবের
আত্মার মঙ্গলের জন্যই ‘গুরু’পদ স্বীকার করিয়া থাকেন, অন্য কোন উদ্দেশ্য
নহে;” “(দীক্ষাবিধানেন) নৃণাং সর্বেষামেব বিপ্রতা (জায়তে)—(২১৭)”
অর্থাৎ “সদৃশ্যের নিকট বৈষ্ণবী-দীক্ষাপ্রভাবে মহাত্মনাত্মেরই বিপ্রত্ব সাধিত
হয়”—এই সকল বাক্যদ্বারা ব্যবসায়ী, কোলিক, লৌকিক, বিষয়ামগ্ন,
অর্থলোলুপ, নিরন্তর ভগবৎ-সেবা-ব্যতীত ইতর কার্যে ব্যস্ত গুরুভূবগণকে
‘গুরু’ বলিয়া গ্রহণ করাই কি গোস্থাম-মত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন?
শ্রীল সনাতন গোস্থানী প্রভু—“শূদ্রেষন্ত্যজেষপি যে বৈষ্ণবাস্তে শূদ্রাদয়ো ন
কিলোচ্যন্তে, শূদ্রং বা ভগবন্তুক্তং নিষাদং খপচং তথা। বীক্ষতে জাতি-
সামান্যং স যতি নরকং ক্রমমিতি ॥ * * * ন শূদ্রা ভগবদন্তুক্তান্তে তু
ভাগবতা নরাঃ। সর্গবর্ণেষু তে শূদ্রা যেন ভক্তা জনাৰ্দ্দনে ॥—* *
বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণেভ্যো নীচজাতিজাতানামপি বৈষ্ণবানাং শ্রেষ্টম্। (৫১২৫)”
—অর্থাৎ “শূদ্র এমন কি অন্ত্যজকুলেও যদি কোনও বৈষ্ণব আবির্ভূত হন,
তাহা হইলে তাঁহাদিগকে কখনই শূদ্রাদি বা তত্ত্বজ্ঞাতিত্বে আরোপিত করা
হইবে না; শূদ্র, ব্যাধ অথবা কুকুরভোজী চণ্ডালকুলেও যদি ভগবন্তুক্ত হন,
তাঁহাদিগকে যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞাতিসামান্যে অর্থাৎ তাঁহাদিগকে শূদ্র, নিষাদ

অথবা চণ্ডাল বলিয়া মনে করেন, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই নরকে গমন করিয়া থাকেন। ভগবদ্ভক্তগণ কখনও শূদ্র নহেন, তাঁহারা ভগবানের দাস—ভাগবত, আর যাহারা ভগবানের ভক্তিহীন, তাঁহারা যে কোন কুলে জন্মগ্রহণ করেন না কেন, তাঁহারাশুদ্র। বৈষ্ণব এবং ব্রাহ্মণ এই উভয়ের মধ্যে নীচ জাত্যাংশ হইলেও বৈষ্ণবই শ্রেষ্ঠ”—এই সকল বাক্য দ্বারা কর্মজড় স্মার্তের পদাবলোহিতপূর্বক বৈষ্ণবের অবমাননাকেই কি গোষামি-মত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন? কোন কোন কপট ব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে, “আমরা হরিদাস ঠাকুরের ন্যায় বৈষ্ণবকে ব্রাহ্মণ হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানি, কিন্তু যাহারা সবে মাত্র (?) ভগবদ্ভক্তনে প্রবর্তিত হইয়াছেন, সেই সকল কনিষ্ঠাধিকারি-ব্যক্তিগণের প্রতি জাতিবুদ্ধি করিতে কোন আপত্তি নাই”! শ্রীল সনাতন গোষামী প্রভু কি এই স্থানে মহাভাগবতের বিচার-প্রসঙ্গে এই সকল কথার উল্লেখ করিয়াছেন, অথবা কনিষ্ঠাধিকারী ভ্রষ্ট-মার্গীয় ব্যক্তিগণের কথা বলিতে গিয়া এই সকল কথার অবতারণা করিয়াছেন? কর্মজড়স্মার্তদাস মিছা ভক্ত-সম্ভবায় আচার্য্য শ্রীসনাতন গোষামীর সিদ্ধান্ত ভাল করিয়া বিচার করুন।

শ্রীল গোপাল ভট্ট গোষামী প্রভু কি সমগ্র হরিভক্তি-বিলাসের কোনও স্থলে বা অন্য কোনও স্থানে মন্তব্যবসায়, শিষ্টব্যবসায়, অযোগ্য কৌলিক ও মৌলিক অসৎগুরু গ্রহণ, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, মহাপ্রসাদে ভাতডালবুদ্ধি, প্রেতশ্রাদ্ধ প্রভৃতিকে গোষামি-মত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন? শ্রীল গোপাল ভট্ট গোষামী প্রভু—

“নৈবেদ্যং অগ্নীশস্ত অন্নপানাদিকঞ্চ যৎ।

ভক্ষ্যভক্ষ্যবিচারশ্চ নাস্তি তত্ত্বক্ষেণে দ্বিজাঃ॥” (৯।১৩৪.)

—অর্থাৎ, “হে বিশ্রাম, শ্রীহরির নৈবেদ্য অন্নপানাদি যে কোন বস্তুই হউক না কেন, তাহা গ্রহণ করিতে কোনওরূপ স্পর্শদোষগত বিচার করিবে না। শ্রীহরির নৈবেদ্য বিষ্ণু হইতে অভিন্ন, তাহা নির্ভীকার বস্তু, যাহারা তাহাতে স্পর্শগত দোষবিচার আরোপ করেন, তাঁহারা অনন্তকালের জন্য নরকপথের পথিক হন।”—এই বাক্যদ্বারা বহিন্মুখ-সমাজের ভয়ে বিষ্ণু, বৈষ্ণব ও মহাপ্রসাদে প্রাকৃত বুদ্ধি করাকেই কি ‘গোষামি-মত’ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন? স্মৃতিপ্রবন্ধ-লিখিত এই সকল প্রয়োগ-বিধি কি কেবল গ্রন্থমধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিবার জন্যই গোষামিপাদগণ

লিখিয়া গিয়াছেন? তাঁহাদের কি প্রচার ও আচাৰের মধ্যে কিছু ব্যবধান ছিল? শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্থামী প্রভু কি শ্রীমমহাপ্রভুর বিরোধিতা প্রচার করিয়াছেন? শ্রীল গোপাল ভট্ট প্রভু যে হরিভক্তিবিলাসের নবমবিলাসে বৈষ্ণবশ্রাদ্ধবিধি এবং বর্নধুত-স্মার্তমতাবলম্বীর শ্রেতশ্রাদ্ধ প্রভৃতি পরিত্যাগের কথা বলিয়াছেন, সেই মতের বিরুদ্ধাচরণ করাই কি ‘ছয়-গোস্থামীর’ মত?

শ্রীজীব গোস্থামী প্রভু মন্দর্ভে—‘পরমার্থগুরুপ্রায়ো ব্যবহারিক-গুরুাদি পরিত্যাগেনাপি কর্তব্যঃ’—অর্থাৎ ব্যবহারিক, কৌলিক গুরু প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়াও পারমার্থিক সৎগুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে’; “প্রথমং নাম্নঃ শ্রবণমন্তঃকরণশুদ্ধাধর্মপেক্ষাং, শুদ্ধে চাস্তঃকরণে রূপশ্রবণেন তদুদয়যোগ্যতা ভবতি” অর্থাৎ “প্রথমে নামতত্ত্ববিৎ সৎগুরুর নিকট শুদ্ধনাম শ্রবণ করিতে করিতে অন্তঃকরণ শুদ্ধ অর্থাৎ অনর্থনির্মুক্ত হইলে, সেই নির্মূল অন্তঃকরণেই রূপশ্রবণদ্বারা শ্রীভগবানের অপ্ৰাকৃতরূপ প্রকাশিত হইবার যোগ্যতা লাভ হয়;—“নাম্নোপি সর্বস্বদো হপরাধাং পতত্যাঃ” (ক্রঃ সংঃ ৭।৫।১৮)—অর্থাৎ “শ্রীনাম সর্বপ্রকারে জীবের শুদ্ধ হইলেও শ্রীনামের চরণে অপরাধ থাকিলে নিশ্চয় জীব অধঃপতিত হয়, নামাপরাধযুক্ত নাম শ্রীনাম নহেন, “অথ কীর্তনাদিভিঃ শুদ্ধান্তঃকরণশেদেতন্নির্জিহমানানামিত্যাহ্যুক্ত তন্নাম-কীর্তনাপরিত্যাগেন স্মরণং কুর্যাৎ (ঐ)”—অর্থাৎ কীর্তনাদির দ্বারা যদি তোমার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে সাধক ও সিদ্ধ উভয়েরই পক্ষে হরিনাম কর্তব্য—এই ভাগবতীয় বাক্যানুসারে নাম গ্রহণ পরিত্যাগ না করিয়া শুদ্ধহৃদয়ে অর্থাৎ আত্মার যে নিত্য ভগবলীলা স্মৃতি হইবে, তাহাই স্মরণীয়; শ্রীভগবতা সহ সম্বন্ধবিশেষঃ দীক্ষাবিধানেন শ্রীগুরুচরণ-সম্পাদিতং চিকীর্ষতিঃ কৃত্য্যাং দীক্ষায়াং অর্চনমবশ্যং ক্রিয়েতৈব, পরদ্বারা অর্চনসম্পাদনং ব্যবহারনিষ্ঠত্বস্যালসত্বস্য বা প্রতিপাদকন্, * * দীক্ষিতানাঞ্চ সর্বেষাং তদকরণে নরকপাতঃ শ্রযতে।”—(ঐ) শ্রীগুরুদেব দীক্ষাবিধানের দ্বারা শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধবিশেষ স্থাপন করিয়া দেন; পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষালব্ধব্যক্তিগণের দীক্ষায় অর্চন অবশ্য কর্তব্য; তন্মধ্যে গৃহস্থের অর্চন একান্ত আবশ্যক; কিন্তু বাহ্যার নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবত বৈষ্ণবগণের অনু-করণে অর্চনাদি পরিত্যাগ করিয়া কেবল স্মরণাদি করেন, অথবা দেবল ব্রাহ্মণাদি দ্বারা অর্চন করাইয়া থাকেন, তাঁহাদিগের অজসতা ও কর্তব্য-বিমুখতারূপ প্রত্যয় হইয়া থাকে। যে কোন কুলোদ্ভূত ব্যক্তিই হউন

না কেন, দীক্ষিত হইয়া তিনি যদি অর্চন না করেন, তাহা হইলে শাস্ত্রে তাহার নরকপাতের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় ; “অর্চনাদিকার নির্ণয়—এতদৈ সর্ব-বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ সম্বতম্ । শ্রেয়সানুত্তমং যন্তে শ্রীশৃঙ্গাণাঞ্চ মানদ ॥ দীক্ষা-তত্ত্বসাগরে—যথা কাঞ্চনতাং যান্তি কাংশ্চং রসবিধানতঃ । তথা দীক্ষা-বিধানেন বিজত্বং জাহতে নৃণাম্ ।” (ভক্তিসম্ভর্ভ ২৯৮ সংখ্যা) —অর্থাৎ “অর্চনাদিকারনির্ণয়ে সর্ববর্ণ ও আশ্রমস্থ শ্রী বা শূদ্রকুলোদ্ভূত যে কেহই হউন না কেন, মদগুরুর নিকট বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তির ভগবদর্চন কর্তব্য ; কেন না যেদ্রুপ কোনও বিশেষ রসসংযোগে কাঁসাও স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ দীক্ষাবিধানদ্বারা, যমুদ্রমাত্রেয়ই বিপ্রত্ব লাভ ঘটে ।”—এই সকল বাক্যদ্বারা কি বর্তমান মিছাভক্ত সম্প্রদায়ের প্রচলিত মূর্খলোক ঠকান ব্যাপারকেই গোস্বামী-মত বলিয়া প্রচলন করিয়াছেন? ভক্তিসম্ভর্ভ ২৮৫ সংখ্যায় শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু শ্রীমহাপ্রসাদদ্বারা পিত্রাদির আত্মার তর্পণ-ক্রিয়া এবং পঞ্চোপাসনা ত্যাগপূর্বক মিতাবৈকুণ্ঠসেবক দেবতাবৃন্দকে বিষ্ণুর অবশেষ মহাপ্রসাদাদি দ্বারা অর্চনবিধির যে-সকল কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার সহিত বিরোধ করিয়া পঞ্চোপাসক কস্মৈজড়মার্জ ও নির্বিশেষবাদীর মতামুসরণপূর্বক সমাজের আভিজাত্যশালী (১) বা ধনবান ব্যক্তিগণের সহিত কুটুম্বিতা করা ও অর্থপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতির সুগম করিয়া লওয়াই কি ‘ছয়-গোস্বামী’ মত? শিষ্যগণকে পতিতগণকে, চিরকাল পতিত রাখিয়া নিজেরা পতিতপাবনের যুগ্মস পরিয়া মৃগচন্দ্রাবৃত হিংস্রজন্তুর ন্যায় পরবন্ধনা করাই কি ছয়গোস্বামীর মত?

ষড়্গোস্বামীর অন্ততম শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভুকে শ্রীমহাপ্রভু আদেশ করিয়াছিলেন—

‘বৈষ্ণবপাল ভাগবত কর অধ্যয়ন ।’—(চৈঃ চঃ অন্ত্য, ১৩৯) রঘুনাথ শ্রীমহাপ্রভুর আদেশ পালন করিলেন । তিনি বৈষ্ণবের নিকট ভাগবত অধ্যয়ন করিয়া যখন শ্রীমহাপ্রভুর নিকট আগমন করিলেন, তখন মহাপ্রভু পুনরায় ভট্ট গোস্বামী প্রভুকে বলিলেন—

“আমার আজ্ঞায় রঘুনাথ যাহ বৃন্দাবনে ।

তাহাঁ যাঞা রহ রূপ-সনাতন-স্থানে ॥

ভাগবত পড় সদা লহ কৃষ্ণনাম ।

অচিরে করিবেন রূপা কৃষ্ণ ভগবান্ ॥”

শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট —

“প্রভুর ঠাই আজ্ঞা লঞা গেলা বৃন্দাবনে ।

আশ্রয় করিল আসি’ রূপ সনাতনে ॥

রূপ গোস্থামীর সভায় করে ভাগবত পঠন ।

ভাগবত পাড়িতে প্রেমে আউলায় তা’র মন ॥

* * *

গোবিন্দ চরণে কৈল আত্ম-সমর্পণ ।

গোবিন্দ চরণারবিন্দ যা’র প্রাণধন ॥

* * *

গ্রাম্যবার্তা না শুনে না কহে জিহ্বায় ।

কৃষ্ণকথা পূজাদিতে অষ্টপ্রহর যায় ॥”

শ্রীমদ্রামপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্থামী প্রভুর আচরণ দ্বারা কি ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, গৃহব্রতধর্ম স্বচ্ছন্দে চালাইবার জন্য ভাগবত ব্যবসায় করিয়া কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করাই ‘ছয় গোস্থামী’র মত? যিনি ভগবদ্ভক্তিসাভের জ্ঞাত ভগবত পাঠ করেন, যিনি ভাগবতের আচার্য্য ও উপদেষ্টা, তিনি নিশ্চয়ই শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্থামীর দ্বারা গোবিন্দচরণে শরণাগত হইবেন। শ্রীগোবিন্দচরণারবিন্দই তাঁহার একমাত্র প্রাণধন। স্বর্গবিধা শরণাগতির স্বরূপলক্ষণ “রক্ষিগুণীতি বিশ্বাসঃ”—অর্থাৎ ভগবান্ নিশ্চয়ই আমাকে রক্ষা করিবেন। ইহার গোবিন্দ-চরণে শরণাগতি উদ্ভূত হইয়াছে, তাঁহার গোবিন্দচরণারবিন্দই একমাত্র যথাসর্ব্বস্ব; সুতরাং তিনি আর গৃহব্রত-ধর্ম-যাজনের জন্য অথবা দেবসেবার জন্য করিয়া ভাগবতজীবী হইতে পারেন না। শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্থামী প্রভু ভাগবতে মহাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি ত’ ভাগবতজীবী হইয়া দেবসেবার ছলনাপূর্ব্বক অর্থ-সংগ্রহ করিতে পারিতেন? কিন্তু তিনি ঐরূপ নামবিক্রয়কার্য্য না করিয়া—

“নিজ শিষ্যে কহি’ গোবিন্দের মন্দির করাইল ।

বংশী-মকর-কুণ্ডলাদি ভূষণ করি’ দিল ॥”

তিনি নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য ভাগবতজীবী হইয়া শ্রোতৃবর্গের নিকট হইতে বা শিষ্যবর্গের নিকট হইতে ‘কর’ আদায় করিলেন না। তাঁহার নিজ শিষ্যকে গোবিন্দের সেবায় নিযুক্ত করাইলেন, শিষ্যের “কনকের

দ্বারে মাধবের সেবা" করাইলেন। শ্রীল ভট্টগোস্বামীর এই আচরণ দেখিয়া কোনও স্বধীপুরুষ কি বর্তমানে ভাগবত-ব্যবসায়ী জাতিগোস্বামিগণের আচরণকে 'ষড়্-গোস্বামী' বা রূপাঙ্গ-মত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন ?

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যপার্যদ ও ব্রহ্ম-পরিকর হইয়াও আমাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য যে অভিনয় করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখ হইতে জগজ্জীবের জন্য—

“বৈরাগী হইয়া যেবা করে পরাণেক্ষা।

কার্য্য-সিদ্ধি নহে কৃষ্ণ করেন উণেক্ষা ॥”

* * *

জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি যায়।

শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায় ॥

* * *

গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্য বার্তা না কঠিবে।

ভাল না খাষ্টবে আর ভাল না পরিবে ॥

* * *

বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।

মলিন মন হইলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ।

বিষয়ীর অন্ন হয় রাজস নিম্নল্লণ।

দাস ভোজ্য দৌহার মলিন হয় মন ॥

* * *

সিংহ-দ্বারে ভিক্ষাহুতি বেষ্টার আচার।”

—চৈঃ চঃ অন্তঃ, ৬ষ্ঠ।

এই সকল উপদেশ জগতে প্রচার করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিয়াও কি কেহ মকট-বৈরাগীকূপ ও বিষয়ীর অন্ন-পরিপুষ্ট ধর্মব্যবসায়ীকুলের দন্ধোদর বা স্ত্রীপুত্র ভরণ-পোষণের জন্য করিনাম, (১) ভাগবত-ব্যবসায় প্রভৃতির ছলনা, অর্থের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইয়া “বেষ্টার আচার” গ্রহণ করাকেই ‘ছন্ন গোস্বামী’র মত বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইতে পারেন ?

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর উপদিষ্ট—

“অসদ্ব্যস্তাবেষ্টা বিসৃজ্যতিসর্ব্বস্বহরণীঃ”

হে মন, তুমি অসজ্জনের সহিত ষ্ঠিতিকূপ বেষ্টাকে পরিত্যাগ কর, উহা বুদ্ধিকূপ সর্ব্বস্বধনকে হরণ করিয়া থাকে।”

“অরে চেতঃ প্রোচ্যৎ কপটকুটিনাটীভরথর

ক্ষরম্মূত্রে স্নাত্বা দহসি কথমাঙ্গানমপি যাম্।”

—কৃষ্ণপাদপদ্মে অভিনিবেশ ব্যতীত যে নিবেশাতিশয়া—তাহা গর্দভের
প্রাবিত মূত্রস্বরূপ, কপটতা ও কুটিনাটী আশ্রয়পূর্বক ভূমি কেন সেই গর্দভ-
মূত্রে নিজকে স্নান করাইয়া দধীভূত হইতেছে ?

“প্রতিষ্ঠাশা ষষ্ঠাংশচরমণী মে হৃদি নটেৎ

কথং দাধু প্রেমা স্পৃশতি শুচিষেতন্নহু মনঃ।”

—প্রতিষ্ঠাশা কুলটা-চণ্ডালরমণীসদৃশ, যাহার হৃদয়ে অড়প্রতিষ্ঠা নৃত্য
করিতেছে, কিরূপে নির্মল প্রেম তাহার হৃদয়কে স্পর্শ করিবে ? শ্রীল
দাসগোস্বামী প্রভুর এই সকল প্রচারিত বাক্য শ্রবণ করিয়াও কি লাভ,
পূজা, প্রতিষ্ঠার আশায় কপটতাকুটিনাটীর আশ্রয়পূর্বক বেষোপজীবী
মর্কটবৈরাগী হওরাকেই মিছাস্তরঙ্গসম্প্রদায় ষড়্গোস্বামীর মত বলিয়া স্থির
করিয়াছেন ? কলিযুগের ভাগবতোক্ত (১১৭৩৮-৪১) দ্রুত (তান, পাশা,
দাবা, মত্ত-বাবসায়, ভাগবতপাঠ বাবসায়), পান (তামাক, গাঁজা, অহিফেন,
ভাঙ, চরস, মদ্যপান প্রভৃতি), স্ত্রী (অবৈধ স্ত্রী যথা :—সেবাদাসী গ্রহণ
প্রভৃতির ছল করিয়া পরস্ত্রীলাম্পট্য, বৈধ স্ত্রীতে অত্যাশক্তি), সূনা (পত্ন-
বধ, কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিদিগকে বিপথ প্রদর্শন, লোকবঞ্চনা, আত্মবঞ্চনা),
জাতরূপ (ভাগবত-বাবসায় ও মত্তবাবসায় প্রভৃতি দ্বারা কিম্বা দেবতা-
সেবার ছল করিয়া নিজেহিঁদ্র-তর্পণোদ্দেশে অর্থগ্রহণ)—এই কলির স্থান-
পঞ্চককে বিস্তার করিবার জন্য গৃহতন্ত্র ধর্মযাজন বা কপট পরমহংস বৈষ্ণব-
বেষ ও কোপীনাদি গ্রহণই কি ষড়্গোস্বামীর মত ?

‘ষড়্গোস্বামীর’ সকলেই ব্রহ্মপরিকর। তাঁহারা রাধাতাব্যতীতি-
স্ববলিততমু শ্রীগৌরসুন্দরের মনোভীষ্ট প্রচারের জন্য এবং তাহার অন্তরঙ্গ
সেবা করিবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত এই প্রপঞ্চে উদিত হইয়াছিলেন।
শ্রীরাধাগোবিন্দ-পাদপদ্মে এবং শ্রীগৌরসুন্দরের চরণাবিন্দে যাহাদের যামস-
ভৃঙ্গ নিত্যকাল সংযুক্ত রহিয়াছে, সেই সকল নিদ্বিঞ্চন গুহরূপাহুগ-দাধুজন
ব্যতীত ‘ষড়্গোস্বামীর’ মহত্ব বা প্রচারিত মত প্রাকৃত-অভিনিবিষ্ট ব্যক্তি-
গণ কখনই বুঝিতে পারিবেন না। অপ্রাকৃত তত্ত্ব কখনও প্রাকৃতচিন্তার
ভোগ্যবস্তুর হয় না। ‘ষড়্গোস্বামীর’ এক-একজন “সর্বগুণধনি” শ্রীমতী-
বৃষভানন্দিনীর এক একটা মুষ্টিমান অপ্রাকৃত গুণ-স্বরূপ। বৃষভানন্দ-
রাজ-

কুমারীই তাঁহাদের দৈবরী, তাই, তাঁহারা মদনমোহন হইতেও নিজদৈবরী মদনমোহনমোহিনীর প্রতি অধিকতর নিষ্ঠাযুক্ত। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুই এই ষড়্গোস্বামীর অগ্রণী; তিনি ব্রজলীলায় “শ্রীকৃষ্ণ-মঞ্জরী”। এই শ্রীকৃষ্ণই সর্বশোভার আকরস্বরূপ। “পরমাসুন্দরী” শ্রীমতী রাধিকার মুক্তিমতী শোভারূপিনী। কৃষ্ণই চিহ্নিলাসের মূল, রসোৎপাদনের মূল। সর্ববিধ গুণের মধ্যে প্রথমে আত্মা অপ্রাকৃত-রূপের দ্বারাই আকৃষ্ট হয়। চিহ্নিলাস-রাজ্যের হেয় ও বিকৃত প্রতিফলনস্বরূপ এই জগতেও আমরা তাহার দাক্ষ্য পাইয়া থাকি। চিহ্নিলাসধামে আত্মাকে সর্বপ্রথমে কৃষ্ণই সেবায় আকর্ষণ করেন। তাই, সেবারাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে সর্বপ্রথমে আমাদের শ্রীকৃষ্ণের আনুগত্য আবশ্যক। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু ব্রজলীলায় “লবঙ্গ-মঞ্জরী”। ‘লবঙ্গ’ দেবকুম্ববিশেষ; শ্রীল সনাতনপ্রভু শ্রীমতী বৃষভানুন্দিনীর সৌরভ ও হৃদয়ের কোমলতাস্বরূপ। তিনি সস্বকজ্ঞানের কথা প্রচার করিয়া সর্বজীবেকে শ্রীমতীর পাদপদ্ম-সৌরভে আকৃষ্ট করিয়াছেন। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু তাঁহাকে ‘পরহংসদুঃখী’ বলিয়াছেন। জীবাত্মাকে রাধা-গোবিন্দের-পাদপদ্মে আকর্ষণ করিবার জন্য তাঁহার হৃদয় বড়ই দয়াদ্রু। শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভু শ্রীমতী বৃষভানুন্দিনীর মুক্তিমান ‘গুণ’-স্বরূপ। শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভু শ্রীমতী বৃষভানুন্দিনীর মুক্তিমান ‘অনুরাগ’-স্বরূপ। শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভু শ্রীমতী বৃষভানুন্দিনীর মুক্তিমতী ‘রতি’-স্বরূপ আর শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু শ্রীমতী বৃষভানুন্দিনীর মুক্তিমান ‘বিলাস’-স্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণই জগতে চিন্তাত্র-বাদের সন্ধীর্ণতা প্রদর্শন করিয়া চিহ্নিলাসের সৌন্দর্য্য জগতে প্রচার করিয়াছেন। জীব, শ্রীজীবের অনুগত হইলেই চিহ্নিলাস রাজ্যে প্রবেশিত হইতে পারেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু এই ‘ষড়্গোস্বামী’র অনুগত। তিনি ব্রজ-লীলায় ‘কম্বুরী-মঞ্জরী’। তিনি রাধাগোবিন্দের সেবার্শোগক্ষে মুগ্ধ হইবার লীলা প্রদর্শন করিয়া জগৎকে মুগ্ধ করিয়াছেন। এই কবিরাজ গোস্বামীর অনুগত ঠাকুর নরোত্তম। শ্রীনরোত্তমের অনুগত রসিক-চূড়ামণি শ্রীল বিশ্বনাথ। বিশ্বনাথের অনুগত শ্রীবলদেব ও শ্রীজগন্নাথ। জগন্নাথের অনুগত ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও মহাভাগবতবর পরমহংস শ্রীগৌরকিশোর। গৌর-কিশোরের অনুগত শ্রীবার্ঘভানবীদয়িত গুরুগোস্বামী। শ্রীবার্ঘভানবীদয়িতদাস বা শ্রীল প্রভুপাদের অনুগত আচার্য্যগিৎহকুলতিলক শ্রীমন্তুক্তিপ্ৰজ্ঞান কেশব

গোস্বামী মহারাজ । — এইরূপ ভাবে রূপানুগ বা ‘বড়্-গোস্বামী’র মত নির্মল সেবাপর আত্মায় সঞ্চারিত হইয়া শ্রোত-পারম্পর্য্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন । যেখানে অপ্রাকৃত ও অধোদৃষ্টি ভগবদ্ভক্তি-শ্রোতকে আত্মার নির্মলবৃত্তির মধ্য দিয়া সঞ্চারিত করিবার পরিবর্তে শুক্লশোণিতের মধ্যে সঞ্চারিত হয় বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে, সেই স্থানে বড়্-গোস্বামী মতের ব্যাভিচার হইবেই হইবে । কারণ অপ্রাকৃত বস্তু কখনও প্রাকৃত রক্তমাংস-শোণিতের ভিতরে সঞ্চারিত হইতে পারে না । একটী সেবাপর নির্মলাত্মা, যখন অপর একটী সেবোন্মুখী নির্মলাত্মায় সেই অপ্রতিহতা অহৈতুকী সহজনির্মল সেবাবৃত্তিটি সঞ্চারিত করিয়া দেন, তখনই শ্রোত-ধারার বাস্তবসত্যটি জগতে প্রকাশিত হইতে পারে । আর যখন কোনও শৌক্লবংশ-ধারায় কোনও শুদ্ধমত প্রবাহিত হইয়াছে বলিয়া মনে করা হয়, তাহা শুদ্ধ মত নহে । তাহা মনোবর্ষ । কারণ আত্মার চেতনের বৃত্তি অর্থাৎ শুদ্ধসেবাশ্রুতি অত্যাভিলাষ জ্ঞানকর্মাতির দ্বারা অনাবৃত আত্মব্যতীত অন্য জড় বস্তুতে বা চিদাভাসে সঞ্চারিত হইতে পারে না । চিদাভাসে যাহা আত্মার বৃত্তি বলিয়া ভ্রম হয়, তাহা বিবর্ত মাত্র, অসত্য বস্তুতে সত্য ভ্রম । উহা মনোবর্ষ । সুতরাং এইরূপ শ্রোতপারম্পর্য্যে আত্মবৃত্তির মধ্য দিয়াই জগতে রূপানুগধারা প্রবাহিত হইয়াছে ।

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

পরম পূজাপাদ শ্রীল ‘শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা’-সম্পাদক মহাশয় কৃপাপূর্বক নিম্নলিখিত প্রশ্ন কয়েকটির শাস্ত্র-সম্মত উত্তর-দানে উপকৃত করিতে প্রার্থনা ।

বৈষ্ণবদাসানুদাস—

শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র সোম

প্রশ্ন

১। অনেক বৈষ্ণব-নামধারী ব্যক্তি, এমন কি, তথাকথিত গোস্বামি-সন্তানগণও শ্রীগৌরানন্দদেবের জন্মতিথিতে উপবাস করেন না, অথচ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীতে উপবাসাদি করিয়া থাকেন । তাঁহারা বলেন, শ্রীগৌরান্দ-জন্ম-তিথি ফাল্গুনীপূর্ণিমায়ে উপবাসের বিধি শ্রীহরিতত্ত্ববিলাসাদি গোস্বামি-গ্রন্থে বিহিত নহে । প্রকৃত বিষয়টি কৃপাপূর্বক লিখিয়া জানাইবেন ।

২। বৈষ্ণবগণ শিবপূজা করিবেন কি না? মহাদেব যদি বৈষ্ণব হন, আর বৈষ্ণব-পূজা যদি শিবপূজা অপেক্ষাও বড় হয়, তবে কেবল শিবো-
পাসকগণের অধিক মাহাত্ম্য স্বীকৃত হইবেন না কেন? কারণ,—

কৃষ্ণসেবা হৈতে বৈষ্ণবের সেবা বড়।

ভাগবত আদি সব শাস্ত্র কৈল দঢ়।

সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োহ্চ্যুতসেবিনাম্।

নিঃসংশয়োস্ত তদন্তপরিচর্য্যারতাত্মনাম্ ॥

উত্তর

১। এতৎ সম্বন্ধে মহানুভবগণের প্রাচীন উক্তি এইরূপ,—

ছদ্মাবতারস্য তন্মৈব জন্মদিনে হুণবাসাদিকানাং তত্রৈব চম্নতয়া বিহি-
তত্বাং। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে শ্রীভগবদ্জন্মদিনমা্ত্রে হুণবাসাদিকং বিহিতং
তত্রৈবোপবাসদিননির্ণয়-প্রকরণে তু—“একাদশা তথা ষষ্ঠী পৌর্ণমাসী
তথাষ্টমী। তৃতীয়া চ চতুর্থী চ অমাবস্যা চতুর্দশী। উপোষ্যা পরসংযুক্তা
নোপোষ্যা পূর্বসংযুক্তা ॥” ইতিশারদাতিলকবচনেন তদ্দিনে উপবাসো
নির্ণীতঃ। সদাচারসিদ্ধত্বদস্য ব্রতস্য প্রামাণ্যে ন সন্দেহঃ। অত্র যে কেচিৎ
প্রতিকূলতামাচরন্তি তেষাং প্রকারান্তরতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনা-
ভিন্নত্বাবোপাদ-বৈষ্ণবশাস্ত্র-হুদারোণাশ্রয়ত্বমলমিতি।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে স্পষ্টভাবে আদেশ রহিয়াছে যে, শ্রীভগবদ্জন্ম-
দিনে বা জন্মতীমা্ত্রেই অবশ্য উপবাস করিবে। শ্রীগোষামিগণ শ্রীগৌর-
সুন্দরকে স্বয়ংরূপ ভগবান্ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-
জন্মোক্তমীতে যেরূপ উপবাসাদি ব্রত পালন করিতে হইবে, শ্রীগৌরসুন্দরের
আবির্ভাবতিথি ফাল্গুনী পূর্ণিমাযও সেইরূপই উপবাসাদি নিয়ম পরিপালিত
হইবে। তবে শ্রীহরিভক্তিবিলাসকার যে স্পষ্টভাবে তাহা উল্লেখ করেন
নাই, তাহার কারণ, শ্রীগৌরাবতার—‘চম্নঃ কলৌ’। কিন্তু শ্রীচৈতন্যলীলার
ব্যাস তাহা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন,—

চৈতন্যের জন্মযাত্রা ফাল্গুনীপূর্ণিমা।

ব্রহ্মা-আদি এ তিথির করে আরাধনা ॥ (চৈঃ ভাঃ)

ব্রহ্মাদি দেবতাগণও শ্রীচৈতন্যের জন্মতিথি-উপবাসাদি ব্রত-বিধির দ্বারা আরাধনা করিয়া থাকেন। যাহারা ইহার প্রতিকূলাচরণ করে, তাহার বৈষ্ণবশাস্ত্রানুসারে অদৈবগণে গণিত হয়।

শ্রীগৌরাবতার 'ছন্ন' বলিয়া তাঁহার জন্মতিথি-পালনাদিব্রত যে ছন্ন-ভাবে গোপনে করিতে হইবে, তাহা নহে।

স্বয়ং শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু একদিন নীলাচলে সকলকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন,—(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ২ম অঃ)

শুন তাই সব এক কর সমবায়।

মুখ ভরি' গাই আজি শ্রীচৈতন্যরায় ॥

আজ আর কোন অবতার গাওয়া নাই।

সকল অবতারময় চৈতন্য গোসাঞি ॥

যে প্রভু করিল সর্ব জগত উদ্ধার।

আমা সবা লাগি' যে গৌরাজ অবতার ॥

সর্বত্র আনরা যা'র প্রসাদে পূজিত।

সকীর্্তন হেন ধন যে কৈল বিদিত ॥

নাচি আমি তোমরা চৈতন্য-বশ গাও।

'সিংহ হই' গাহি, পাছে মনে ভয় পাও ॥

প্রভু সে আপনা লুকায়েন নিরস্তর।

ভ্রুঙ্গ পাছে হয়েন সবার এই ভয় ॥

তথাপি অদ্বৈত-বাক্য অলভ্যা সবার।

গাইতে লাগিল শ্রীচৈতন্য-অবতার ॥

নাচেন অদ্বৈত-সিংহ পরম বিহ্বল।

চতুর্দিকে গায় সবে চৈতন্যমঙ্গল ॥

নব অবতারের শুনিয়া নাম-বশ।

সকল বৈষ্ণব হৈল আনন্দে বিবশ ॥

আপনে অদ্বৈত চৈতন্যের গীত করি'।

বলিয়া নাচেন প্রভু জগত নিস্তারি ॥

শ্রীচৈতন্য-নারায়ণ করুণালাগর।

দুঃখিতের বন্ধু প্রভু মোরে দয়া কর ॥

অদ্বৈতসিংহের শ্রীমুখের এই পদ ।

ইহার কীৰ্ত্তনে বাড়ে সকল সম্পদ ॥

যখন লোকশিক্ষক মহাপ্রভু প্রেম-চিরস্কার-পূরক বলিলেন,—

ছাড়িয়া কৃষ্ণের নাম কৃষ্ণের কীৰ্ত্তন ।

কি গাইলা আমারে তা' বুঝাহ এখন ॥

তখন মহাবক্ষা শ্রীনিবাস বলিতে লাগিলেন,—

হস্তে কি কখন পারি সূর্য্য আচ্ছাদিতে ?

সেই মত অসম্ভব তোমা লুকাইতে ॥

সূর্য্য যদি হস্তে বা হযেন আচ্ছাদিত ।

তবু তুমি-লুকাইতে নার কদাচিত ॥

যে নাগিল লুকাইতে কীরোদমাগরে ।

লোকালয়ে আচ্ছাদন কিসে করি তাঁরে ?

হেমগিরি সেতুবন্ধ পৃথিবী পর্য্যন্ত ।

তোমার নির্মল যশে-পূরিল দিগন্ত ॥

আ-ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ হইল তোমার কীৰ্ত্তনে ।

কত জন দণ্ড তুমি করিবা কেমনে ॥

এমন সময়,—

সহস্র সহস্র জন না জানি কোথার ।

জগন্নাথ দেখি' আইল প্রভু দেখিবার ॥

কেহ বা ত্রিপুরা, কেহ চট্টগ্রামবাসী ।

শ্রীকৃষ্ণা লোক কেহ কেহ বঙ্গদেশী ॥

সহস্র সহস্র লোক করেন কীৰ্ত্তন ।

শ্রীচৈতন্য-অবতার করিয়া বর্ণন ॥

* * *

লুকাও আপনে তুমি, প্রকাশ আপনে ।

যা'রে অহুগ্রহ কর, জানে সেই জনে ॥

* * *

নিত্যানন্দ অদ্বৈতাদি যতেক প্রধান ।

সবে বলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবান্ ॥

এ সকল ঈশ্বরের বচন লজিয়া ।

অন্যেরে বলয়ে কৃষ্ণ সে অভাগিয়া ॥

শেষশাখী লক্ষীকান্ত শ্রীবৎসলাঞ্জন।

কৌস্তভভূষণ আর গরুড়বাহন ॥

এ সব কৃষ্ণের চিহ্ন জানিহ নিশ্চয়।

গঙ্গা আর কারো পাদপদ্মে না জন্ময় ॥

শ্রীচৈতন্য বিনা ইহা তত্ত্ব না সম্ভবে।

এই কহে বেদে, শাস্ত্রে, সকল বৈষ্ণবে ॥

সর্ব বৈষ্ণবের শাক্য যে আদরে লয়।

সেই সব জন পায় সর্বত্র বিজয় ॥

কেহ কেহ পূর্বপক্ষ করেন,—শ্রীকৃষ্ণই যখন শ্রীচৈতন্য, তখন শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী পালন করিলেই ত' শ্রীচৈতন্য-জন্মতিথি পালিত হয়, পৃথকৃত্তাবে শ্রীচৈতন্য-জন্মদিবসে উপবাসাদির আবশ্যকতা কি? একপ বিচার শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরসুন্দরের ভেদবাদী হুঁষ্টবুদ্ধিগণের ভুল্ট হৃদয়ের অভিব্যক্তি। ইহারা কপটতা-পূর্বক 'শ্রীকৃষ্ণই শ্রীগৌরসুন্দর'—এইরূপ উক্তি করিলেও ইহাদের কার্য ইহাদের হৃদয়ের কপটতার সাক্ষ্য দেয়। শ্রীকৃষ্ণই ঔদার্য্যাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর, অথবা শ্রীগৌরসুন্দরই মাধুর্য্যাবতারী শ্রীকৃষ্ণ হইলেও যাহারা লীলাবৈশিষ্ট্য স্বীকার করেন, তাহারা শ্রীকৃষ্ণ-জন্মলীলা ও শ্রীগৌর-জন্মলীলা-বৈশিষ্ট্যের নিশ্চয়ই আরাধনা করিবেন। কপটতা-পূর্বক এক লীলা-বৈশিষ্ট্য লোক-দেবান-মুখে স্বীকার করিয়া অপর অবতারের লীলাকে কার্য্যক্ষেত্রে অস্বীকার করিলে তাহাতে মায়াবাদ, পাম্পুতা প্রভৃতি দোষ উপস্থিত হয়। শ্রীগৌরসুন্দরের মাধুর্য্যময়স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-লীলা-পরিষ্কর-বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিয়া কেহ যদি শ্রীকৃষ্ণের ঔদার্য্যস্বরূপ শ্রীগৌরসুন্দরের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিষ্কর-বৈশিষ্ট্যের অস্বীকার করেন, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরসুন্দর—উভয়ের বিরোধী অদৈব ব্যক্তি মাত্র। শ্রীকৃষ্ণের অর্চনার পূজা যেরূপ জগতে প্রচারিত, শ্রীগৌরার্চনার আরাধনাও তেমনি জগতে প্রচারিত। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের পূজা ব্যতীত কেহই শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় অনর্থ-নিম্মুক্ত-যোগ্যতা লাভ করিতে পারেন না। শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব-তিথি আরাধনায় শ্রীকৃষ্ণ-জন্মতিথি আরাধনার প্রকৃত যোগ্যতা লাভ হয়। শ্রীগৌরজন্মতিথিতে ভোগবিলাস বা হোলি খেলায় প্রযুক্ত থাকিয়া উপবাসাদি পরিত্যাগে যে বাউল প্রাকৃতসহজিয়া বা স্মার্তগিরির আবাহন করা হয়, তাহা সম্পূর্ণ ভক্তিপ্রতিকূলচরণ বা কৃষ্ণবিদ্বেষ মাত্র।

প্রত্যেকেরই উপাসাদি ব্রতের দ্বারা শ্রীগৌরজন্ম-তিথির আরাধনা করা একান্ত কর্তব্য। গোস্বামিগণের পূর্বাচরিত—যাচা সিদ্ধ মহাজন ও আচার্যগণের মধ্যে প্রচারিত রহিয়াছে, তাহাতে নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণিত হয় যে, গোস্বামিগণ, আচার্যগণ, শুদ্ধভক্তগণ—সকলেই শ্রীমুহাপ্রভুর জন্ম-তিথিতে উপাসাদিতে ব্রত পালন করিয়াছেন। ভোগবিলাসী স্মার্তপদা-বলেহী, প্রাকৃতসহজিয়া, উৎপথগামী আচার্যসন্তানত্রয় গোস্বামিত্রয় প্রভৃতি কোন কোন ব্যক্তিকে যদি বিরুদ্ধ আচরণ প্রচলিত থাকে, তাহা হইলে উহা শ্রীগোস্বামিবর্গের মত-বিরোধী ভোগময় আচার বলিয়া পরিভ্রাজ্য হইবে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

২। শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণপ্রিয়তম-বিচারে কৃষ্ণপ্রসাদ-নির্মাল্যে শিব-পূজা করিয়া থাকেন এবং শিবের নিকট গোত্রাঙ্গণ-যজ্ঞঘাতী অশ্বর—দৈত্যাদির প্রাণ্য মোক্ষাদি কামনা না করিয়া একমাত্র নিকৃপাধিকা কৃষ্ণপ্রীতিতে প্রার্থনা করেন। কারণ শ্রীমুহাদেব স্বয়ং নিকৃপাধিক কৃষ্ণপ্রেমের অবধূত। শ্রীশিব-প্রসাদে দশ-প্রচেতা প্রভৃতি বহু বহু ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমাঙ্গদতা লাভ করিয়াছেন। দশ প্রচেতা যেক্রপভাবে মহাদেবের পূজা করেন, সেক্রপ শিব-পূজাই বিধি-সম্মত ও আদর্শ অন্য প্রকার শিব-পূজার ছলনা গীতা-ভাগবতাদি শাস্ত্রে অবৈধ ও পাষণ্ডতা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তাহাতে ভীষণ নামাপরাধই উপস্থিত হয়; সুতরাং ঐক্রপ নামাপরাধীর কোনও কালেই মঙ্গল হয় না।

শিবো ভবতু বৈষ্ণবঃ কিমজিতোহপি শৈবঃ স্বয়ম্।

তথা সমতরাথ বা বিধিহরাদিনুত্তিরয়ম্ ॥

বিলোকা ভব-বেধসোঃ কিমপি ভক্তবর্গক্রমম্।

প্রণম্য শিরসা হি তৌ বসমুপেন্দ্রদাস্যং শ্রিতাঃ ॥

প্রহ্লাদ-ক্রব-রাবণানুজ-বলি-ব্যাসাখরিয়াদয়ো-

স্তে বিষ্ণুপরাযণা বিধিভব-প্রের্তা জগন্মুদ্রলাঃ।

যেহন্তে রাবণ-বাণ-গৌণ্ডক-ক্রোধ * অহো

যন্তুজা ন চ তৎপ্রিয়াঃ ন চ হরেস্তম্বাজ্জগদ্বৈরিণঃ ॥

(ক্রমঃ)

স বৈ পুংসাং পরো ধাত্মা যাতী ভক্তিরধোক্ষজে।

৫ নং পত্ৰ উক্ত পুস্তক বিক্রেতার কক্ষস্থ যঃ।

৫ নং পত্ৰ উক্ত পুস্তক বিক্রেতার কক্ষস্থ যঃ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াস্মা হুপ্রদীদতি।

সেই ধন্য শ্রেষ্ঠ যাতে আনন্দ-পরসর।

আধোদ্যঃ জ অহৈতুকী ভক্তি নিব্রূত।

অল্প ধর্ম হুত্বরূপে পালে সেই জন।

হরি-কথায় রতি নৈলে গণ্ড সেই জন।

৩২শ বর্ষ } ২১ শ্রীধর, বাসুদেব, ৪৯৪ গৌরাক্ষ
৩২ জ্যৈষ্ঠ, রবিবার, ১৩৮৭ : ইং ১৭/৮/১৯৮০ } ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সান্নিধ্য

শ্রীশ্রী বলদেব-স্তোত্রম্

[শ্রীমদ্বৈকর্ণকসংহিতানুসারে বলদেব-স্তোত্রম্ একাদশোহধ্যায়ে]

দেবাদিদেব ভগবন কামপাল নমোহিস্ত তে।

নমোহিনস্তায় শেষায় সাক্ষাৎসাক্ষায় তে নমঃ ॥১॥

হে দেবাদিদেব ! হে ভগবন কামপাল ! আপনাকে নমস্কার। হে বলরাম ! আপনি সাক্ষাৎ দেব চন্দন, আপনাকে নমস্কার ॥১॥

ধরাধরায় পূর্ণায় স্বধায়ে সৌরপাণয়ে।

সহস্রশিরসে নিত্যং নমঃ সঙ্কর্যণায় তে ॥২॥

হে ধরাধর হলধর ! আপনি দ্বীপ তেজে পূর্ণ ! হে সহস্র-শীর্ষ সঙ্করণ ! আপনাকে নিত্য নমস্কার ॥২॥

রেবতীরমণ হং বৈ বলদেবাচ্যুতাগ্রজ।

হলায়ুধ প্রলম্বস্ত্র পাহি মাং পুরুষোত্তম ॥৩॥

হে বলদেব ! আপনি অচ্যুতের অগ্রজ, রেবতীর পতি, হলায়ুধ ও প্রলম্বয় ; হে পুরুষোত্তম ! আপনাকে নমস্কার ॥৩॥

বলায় বলভদ্রায় তালান্ধায় নমো নমঃ ।

নীলাম্বরায় গৌরায় রৌহিণেয়ায় তে নমঃ ॥৪॥

হে বল, বলভদ্র ও তালধ্বজ ! আপনাকে নমস্কার, নমস্কার । হে নীলাম্বর গৌরবর্ণ রৌহিণী-ভ্রমর ! আপনাকে নমস্কার ॥৪॥

ধেহুকারণমুষ্টিকারিঃ কুটারিবল্লভলান্তকঃ ।

রুক্মারিঃ কূপকর্ণারিঃ কুস্তাগ্ধাতিভ্রমেব হি ॥৫॥

আপনি ধেহুকারণ, মুষ্টিকারণ, কুটারি, বল্লভলান্তক, রুক্মী, কূপকর্ণ ও কুস্তাগ্ধেরও অগ্নি আপনিই ॥৫॥

কালিন্দীভেদনোহসি ত্বং হস্তিনাপুরকর্ষকঃ ।

দ্বিবিদারিষাদবেন্দ্রো ব্রজমণ্ডলমণ্ডনঃ ॥৬॥

আপনি কালিন্দীকে ভেদ ও হস্তিনাপুরকে আকর্ষণ ও দ্বিবিদ-বানরকে বধ করিয়াছিলেন ; আপনি যাদবগণের শ্রেষ্ঠ, ব্রজমণ্ডলের মণ্ডন ॥৬॥

কংসভ্রাতৃপ্রহস্তাসি তীর্থযাত্রাকর প্রভুঃ ।

দুর্ঘ্যোধনগুরুঃ নান্ধাৎ পাহি পাহি প্রভো ততঃ ॥৭॥

আপনি কংস-ভ্রাতাদিগের নিহন্তা, তীর্থযাত্রাকর, প্রভু ও সান্ধাৎ দুর্ঘ্যোধন-গুরু ; অতএব হে প্রভো ! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন ॥৭॥

জয় জয়াচ্যুত দেব পরাংপর স্বয়মনন্ত দিগন্তুগতশ্রুত ।

সুরমুনীন্দ্র-ফণীন্দ্রবরায় তে মুসলিনে বলিনে হাণিনে নমঃ ॥৮॥

হে অচ্যুত ! আপনার জয় হউক, জয় হউক ; হে পরাংপর দেব ! আপনি স্বয়ং অনন্ত ও দিগন্তবিস্তৃত এবং আপনি সুরেন্দ্র, মুনীন্দ্র, ফণীন্দ্র, হলী, বলী ও মুঘলী ; আপনাকে নমস্কার ॥৮॥

যঃ পঠেৎ সততং স্তবনং নরঃ স তু হরেঃ পরমং পদমাত্রজেৎ ।

জগতি সর্ববলং ত্বরিসর্দনং ভবতি তস্য ধনং স্বজনো ঘনম্ ॥৯॥

যে মানব সতত এই স্তব পাঠ করে, সে হরির পরমপদ প্রাপ্ত হয় ; জগতে তাহার সর্ববল-সম্পন্ন শত্রু-সংহারে সমর্থ ধন ও স্বজন লাভ হইয়া থাকে ॥৯॥

আচার্য্য-সন্তান

আচার্য্য ও আচার্য্য-সন্তানের প্রতি সম্মান

বাহারা অলৌকিক ভগবচ্ছক্তিসম্পন্ন হইয়া ধর্ম্মের স্রষ্টা আচরণ করেন, তাহারা আচার্য্য আখ্যায় অভিহিত হন। ইহাদের আচরণ অনুগমন করিয়া বাহারা হরিসেবা করেন, তাহারা আচার্য্য-পদাশ্রিত শুদ্ধ ভক্ত। ভগবান্ বলিয়াছেন,—“আমাকে আচার্য্য বলিয়া জানিবে, কোন প্রকারে আচার্য্যের অংমাননা করিবে না।” আচার্য্যকে আশ্রিতজনের যেরূপ ভক্তি করা কর্তব্য, আচার্য্যের সন্তান, বন্ধু ও আত্মীয়বর্গকে যথাস্বরূপ সম্মান করা কর্তব্য। সামাজিক ধর্ম্মশাস্ত্রনামুহে গুরুপুত্রের প্রতি কিরূপ সৌজন্য ও সম্মান করা কর্তব্য, তাহা অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। শুদ্ধ ভক্তগণ আচার্য্যতনয়কে আচার্য্যের সদৃশ নিজ্ঞাপেছা শ্রেষ্ঠ জানিয়া সম্মান করিয়া থাকেন। আচার্য্যের বংশে সম্মান প্রদর্শন করাও সকল সদাচার ও শাস্ত্রসম্মত।

আচার্য্যের পরিবার ও সন্তানে পার্থক্য

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রধান দাসদ্বয় শ্রীপ্রভু নিত্যানন্দ ও শ্রীপ্রভু অষ্টৈত। শ্রীনিহ্যানন্দ প্রভু ও শ্রীঅষ্টৈত প্রভু গৃহস্থাস্রম স্বীকার করায় তাঁহাদের শৌক্রে অধস্তনগণ আচার্য্যসন্তান। আবার তাঁহাদের সেবক-পরম্পরায় তদাশ্রিত ভক্তগণও তাঁহাদের সন্তান। বঙ্গদেশে সেবক-পরম্পরা পরিবার নামে বিদিত এবং শৌক্রে অধস্তনগণট সন্তান নামে পরিচিত। পূর্ব পূর্ব আচার্য্যবর্গের বংশ বসিতে গেলে শৌক্রে সন্তান শিষ্যবর্গকে বুঝাইত।

উদাসীন বিরক্ত শিষ্যের অভাবহেতু শৌক্রে-সন্তানগণ

অযথা সম্মানিত

বঙ্গদেশে স্মার্তের আগমনে গৃহস্থাশ্রমের প্রচুরতায় উদাসীন বিরক্ত শিষ্যধারার বিশেষ অভাব। তজ্জন্ত শৌক্রে অধস্তনগণ অশিক্ষিত ও গৃহস্থ-ধর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তিগণের উপর স্ব-স্ব প্রভুত্ব প্রকাশ করিতে গিয়া সন্ত্য-ধর্ম্মের প্রভূত হানি করিয়াছেন। এমন কি সাধারণ শিষ্য-শ্রেণীস্থ অভক্ত গৃহস্থগণ আচার্য্যসন্তান বলিয়াই ব্যাকুল এবং তাঁহাদের সামাজিক প্রাকৃত সম্মানাদি প্রদানকেই হরিসেবা জ্ঞান করিয়া অনেক স্থলে হরি-বিমুখ হইয়া পড়িতেছেন। কোন স্থলে আচার্য্য-শৌক্রেসন্তানগণ অশিক্ষিত সম্প্রদায়কে যোগা ভক্ত প্রভৃতি আখ্যা দিয়া ভক্তি-বিমুখ করাইতেছেন।

আচার্য্য-সন্তানগণের ভক্তিবিরোধিনী ক্রিয়ানমূহ ও

ষড়্‌রিপুর দাসত্ব

আচার্য্য-শৌক্যসন্তানগণ কোথাও মূর্খতা, হরিষিমূখতা, কনক-কামিনী সংগ্রহাতিশয়া অর্থ-লোভে শ্রীমন্তাগবতাদি পাঠ-পরায়ণতা, কথকতা, অষ্ট-প্রহরোত্তে নর্তনভোজনচাতুরী, অর্থ ও বস্ত্রগ্রহণে মত্তদানশীলতা প্রভৃতি ভক্তিবিরোধিনী ক্রিয়ানমূহের আবাহন করিয়াছেন।

শ্রীমহাপ্রভুর অপ্রকট কালের পরেই এই সকল হৃদৈব আসিয়া জীব-জগতে বৈষ্ণব-সংসার উৎসাদিত করিয়া অধঃপাতিত করিয়াছিল। সেই সময় মহাপ্রভুর শক্তি লাভ করিয়া শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, ঠাকুর মহাশয় ও শ্যামানন্দ প্রমুখ আচার্য্যগণ, ব্রজবাসী ৮ জন গোস্বামীর চরণানুগত্যে ভক্তিবর্ষের প্রচার অক্ষুণ্ণ রাখিতে যত্ন করেন।

কালক্রমে তাঁহাদিগের অধস্তনগণের সময়ে—শুদ্ধ ভক্তিবর্ষ পুনরায় আচ্ছাদিত হয়। আবার আচার্য্য-সন্তানগণের মধ্যে হরিবৈষ্ণবা আসিয়া সত্যবর্ষ আচ্ছাদন করে এবং আচার্য্য-সন্তানদিগকে তাহাদের মূল পুরুষ হইতে নানা প্রকারে বিক্ষিপ্ত করে। আচার্য্য-সন্তানগণ যদি শুদ্ধপথে থাকিয়া ভক্তিবর্ষ যাজন করেন, তাহা হইলে তাহাদের আচরণ হইতেই জগতের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে। অনেক স্থলে আচার্য্য-সন্তানে রিপুবটক আসিয়া কি বিষয় উৎপাত উপস্থিত করে, তাহা শুদ্ধ ভক্তের অবিদিত নহে।

ব্রহ্মার সন্তানহেতু প্রাণীমাত্রই আচার্য্যসন্তান

আদি গুরু ব্রহ্মা সর্বপ্রথম আচার্য্য। তাঁহা হইতেই চাতুর্য্য ও অন্যান্য সকল জীব জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কেবল অধস্তনগণের মধ্যে বৃত্তি-ভেদে নানা প্রকার বর্ণ ও জাতির উদ্ভব হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাণীমাত্রই আদি-আচার্য্য ব্রহ্মার সন্তান। এই আচার্য্যসন্তানগণের মধ্যে যাহাতে আচার্য্যের হরিসেবা প্রবৃত্তি প্রবল হয়, তাহিষয়ে শ্রীগৌরসুন্দর ও তদীয় পার্শ্বদগণ অশেষ বিশেষে চোঁকা করিয়াছেন।

কর্ম্মফলে আচার্য্য-সন্তানগণের দুর্গতি

প্রাক্তন কর্ম্মফলে অনেক স্থলে আচার্য্য-সন্তানগণের মধ্যে প্রকৃত আচার্য্য উদয় হয় নাট। কোন কোন স্থলে অজ্ঞানতা, মূর্খতা ও ভক্তিবিরোধী ভাবসমূহ আসিয়া আচার্য্যসন্তানকে ও সন্তানান্তিত জনকে হরিষিমুখ

করিয়েছে। আমরা কোথাও বা আচার্য্য-সম্মানে কপটতা আসিয়া ভক্তির নামে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলতা ও তদাপ্রিতঙ্গনে উচ্ছৃঙ্খলতা সাধন করিয়াছে। ভুক্তিমত্তা ও কপটতার ফলে কোন কোন আচার্য্য-সম্মান প্রাপ্তক বিষয়-সমূহে মুগ্ধ হইয়া অর্থাদি সংগ্রহপূর্ব্বক বিষয়ে অতিনিবিষ্ট হইয়াছেন। কোথাও বা মূর্খতা ভক্তির ভূষণ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। ইহাতে ফল হইয়াছে এই যে, অন্তরুগ্ধ অনেকে হরিভক্তকে তত্ত্বতার অঙ্গবিবেচ্য বলিয়া মনে করিতেছেন, তাহাতে শুদ্ধভক্তির প্রচার বন্ধ আছে।

আচার্য্য-সম্মানগণের প্রতি নির্দেশ

ভগবানের স্তোত্র জীবনসমুহ সকলেই আচার্য্য-সম্মান। তাহাতে সীতরণকরণে বিনীত প্রার্থনা এই যে তাঁহারা সকলেই শ্রীগৌরসুন্দরের একমাত্র শিক্ষা—“তৎপাদপি হৃদাচ নিকৃপট ভাবনাম্পন্ন হইয়া তরুর ছায় সন্নিবিষ্ট। জগৎস্বপ্নপূর্ব্বক সকলকে সম্মানে দিয়া এবং আপনাকে সর্ব্বাধম জানিয়া সর্ব্বক্ষণ কৃপণনাগ করুন।” তাহা হইলেই আমাদের ছায় মুঢ় আপ্রিতঙ্গন জীব-রূপ আচার্য্য-সম্মানের আচার্য্যত্ব উপলব্ধি করিয়া এই সুহৃস্তর সংসার-সমুদ্রে অতিক্রম করিয়া নিরন্তর হরিসেবায় নিযুক্ত হইবে।

—শ্রীল প্রভুপাদ

মনুষ্য-সমাজ ও বৈষ্ণব-ধর্ম (১)

স্ব-নিষ্ঠিত ও পরনিষ্ঠিত বৈষ্ণবের পার্থক্য

এই বিষয়ে আমাদের অনেক বক্তব্য আছে, তাহা ক্রমশঃ বলিব। সম্প্রতি কতকগুলি ‘সংযোগী বৈষ্ণব’ আমাদের ব্যবস্থার সঙ্কট নন। তৎসম্বন্ধে দুই-একটা কথা বলা আবশ্যিক। আমরা ‘সংযোগী বৈষ্ণব’-রূপ প্রথার বিরোধী নই; কেবল তাঁহাদের ধর্ম্ম-ব্যতিক্রম সম্বন্ধে আমাদের যত কথা। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে উক্ত আছে যে,—পরমার্থের জন্য ভগবানকে ভজ্ঞন করিবে; কিন্তু অন্যান্য প্রাকৃত ফলের জন্য অন্যান্য দেবতার উপাসনা পদ্ধতি। যাহারা এইরূপ কার্য্য করেন, তাঁহারা স্বনিষ্ঠ বর্ণাশ্রমী এবং বহু দেবতা ও কর্ম্মাশ্রমী। যদি সংসারে বর্ত্তমান হইয়া অন্য দেবতা পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল একমাত্র অচ্যুতাপ্রিত হইতে পারা যায়, তাহা

হইলে 'পরিণিষ্ঠিত' নাম লাভ করা যায়। তাহাদের লক্ষণ ভাগবতে ঐহলেই কৃত হইয়াছে; যথা:—

অকামঃ সর্বকামো বা যোক্ষকাম উদারধীঃ।

তীত্রেণ ভক্তিয়োগেন যজ্ঞেত পুরুষঃ পরম্। (ভাঃ ২।৩।১০)

[পূর্বে অকামই থাকুক, সর্বকামই থাকুক বা যোক্ষকামই থাকুক, উদারবুদ্ধি হইবামাত্র মনুষ্য তীত্র শুদ্ধভক্তিয়োগে পরম পুরুষ কৃষ্ণের যজ্ঞ করিবেন।]

তীত্র ভক্তিয়োগ-অভাবে সংযোগী বৈষ্ণব নহেন

সংসারী লোক মাতেই সর্বকাম। সর্বকাম সত্ত্বেও যদি সেই সেই কামের জ্ঞান কর্তৃ-কান্ডাশ্রুত বহু দেবতা-ভজনে পরিত্যাগপূর্বক একমাত্র পরম পুরুষকেই যজ্ঞনা করা যায়, তবে স্বনিষ্ঠগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা লাভ হয়—ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ শ্রেণীর পক্ষে একটী কঠিন ব্যবস্থা লক্ষিত হয়। 'তীত্রেণ ভক্তিয়োগেন' এই শব্দ দ্বারা ঠিক বুঝিতে হইবে যে, তীত্র ভক্তিয়োগ অভাবে অচ্যুত-গোত্রত্ব সম্ভব হয় না। অন্যান্য বেদসম্মত যে বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা তাহাতে নিষ্ঠাপূর্বক বর্তমান হইলে মানব-সমাজ নির্দোষী। কিন্তু অচ্যুত-গোত্র লাভ করত তীত্র ভক্তির অভাব হইলে উত্তর পদচ্যুত হয়। 'তীত্র-ভক্তিই' একমাত্র অচ্যুতকুলের জীবন। আমাদের বক্তব্য এই যে, গৃহস্থ-বৈষ্ণব বলিলে 'বর্ণাশ্রমী' ও 'সংযোগী' উভয় বৈষ্ণবই গৃহীত হইবেন; কিন্তু সংযোগীর পক্ষে কঠিন এটি যে, যে সংযোগীর তীত্র ভক্তি দেখা যায় না, তিনি উভয় কুলচ্যুত। কৃষ্ণ-ভক্তির জন্য বর্ণাশ্রম পরিত্যাগে কিছুমাত্র দোষ নাই। কিন্তু বর্ণাশ্রম ত্যাগীর যদি কৃষ্ণভক্তি দূর হয়, তবে তাহাকে কি বলা যাইবে? সে অবশ্য বর্ণাশ্রম-ত্যাগের জন্য দোষী এবং অপকৃষ্ট ফলভোগী হইবে। তাহাকে বৈষ্ণব বলিয়া আদর করা যাইবে না।

তিন প্রকার বৈষ্ণব; তন্মধ্যে 'নিরপেক্ষ'—ত্যাগী ও শ্রেষ্ঠ

সমাজ সম্বন্ধে বৈষ্ণব তিন প্রকার—(১) স্বনিষ্ঠ অর্থাৎ বর্ণাশ্রমে অবস্থিত অথচ কৃষ্ণভক্ত, (২) পরিণিষ্ঠিত অর্থাৎ কর্তৃকান্ডত্যাগী অচ্যুতাত্মাশ্রিত ব্যক্তি-বিশেষ; ইহারা উভয়েই গৃহস্থ। (৩) নিরপেক্ষ অর্থাৎ স্বরূপতঃ কণ্ঠ-ত্যাগী। নিরপেক্ষ ব্যক্তিই অগৃহস্থ। ইহারা উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ লক্ষণবিশিষ্ট বৈষ্ণব। কিন্তু কৃষ্ণভক্তি তিনজনেরই জীবন। উত্তরোত্তর কৃষ্ণ-ভক্তির

উন্নতিই প্রয়োজন। যে-স্থলে পরিমিষ্ঠিত বা নিরপেক্ষের কৃষ্ণভক্তি লঘু হয়, সেস্থলে তদনুসারে তাহাদের পতন স্বীকার করা যায়।

কৃষ্ণ-ভক্তিই বৈষ্ণবতার লক্ষণ

বর্ণাশ্রম স্বীকার, বর্ণাশ্রমত্যাগ বা ভেদাদি গ্রহণই যে বৈষ্ণবতা, তাহা নয়। একমাত্র কৃষ্ণভক্তিই বৈষ্ণবতার লক্ষণ। বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিতে গেলে যে-পরিমাণ কৃষ্ণভক্তি থাকে, তাহার প্রতি লক্ষ্য করা চাই।

গৃহস্থ বা স্ত্রীসঙ্গীর কোপীন গ্রহণে অধিকার নাই

ইহাতে আর একটি নিগূঢ় কথা এই যে, স্থনিষ্ঠ ও পরিমিষ্ঠিত উভয়ই গৃহস্থ, অতএব কোপীন গ্রহণে অনধিকারী। অধিকার না থাকিলে যাহা করা যায়, তাহা দোষ বহি গুণ নয়। স্থনিষ্ঠ বৈষ্ণবদিগের পক্ষে কৃষ্ণ-মন্ত্র গ্রহণ পর্য্যন্তই বৈষ্ণবতার পরিচয়। পরিমিষ্ঠিত ব্যক্তির পক্ষ সংস্কারস্থলে বর্ণাশ্রমাস্তর্গত নামান্তর গ্রহণ দ্বারা পরিচয় সিদ্ধ হয়। তাহাদের কোপীন গ্রহণ হইতে পারে না। নিরপেক্ষ ব্যক্তির পক্ষে কোপীন গ্রহণই বৈষ্ণবতার বাহ্য পরিচয়। ইহাই সর্ব্বশাস্ত্র সিদ্ধ। পরিমিষ্ঠিত ব্যক্তির কোপীন গ্রহণে অপরাধ হয়। কোপীন গ্রহীতা আর কখনই স্ত্রীসঙ্গ করিতে পারিবে না—ইহার ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে। অতএব সংযোগী বৈষ্ণবদিগের যে ধর্ম্ম-ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়, তাহার সংস্কার নিতান্ত আবশ্যক। একথা অতু আমরা সংক্ষেপে বলিলাম।

ত্যাগী ব্যতীত গৃহস্থের ভিক্ষা নিষিদ্ধ

পরিমিষ্ঠিত ব্যক্তিদিগের পরিবার-পোষণের জন্য অর্থ সংগ্রহ আবশ্যক। সেই অর্থ সংগ্রহ সম্বন্ধেও বিচার আছে। এইস্থলে (ভাগবত) সপ্তম স্কন্ধোক্ত বর্ণাশ্রম-লক্ষণ-স্বীকার না করিলে তাহাদের ভিক্ষা-দ্বারা সংসার-নির্ব্বাহ করার যত্ন সুতরাং সঙ্কটনীয়। তদ্বারা তাহারা পতিত হইবেন। যেহেতু নিরপেক্ষ ব্যতীত কাহারও ভিক্ষাধিকার নাই। অতএব পরিমিষ্ঠিত ব্যক্তিদিগের স্বভাবানুসারে একটি একটি বর্ণ নিক্রপণপূর্ব্বক তচ্ছক্তি দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন।

এই সমস্ত বিষয়ের ক্রমশঃ বিশেষ আলোচনা করিব।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-মহিমা

অনন্ত বৈষ্ণব-গুণ, কহনে না যায় ।
বেদ-পুরাণেতিহাস, অস্ত নাহি পায় ॥
যে-জন শরণ লয়, বৈষ্ণব-চরণে ।
সে-জন জানয়ে কিছু কৃষ্ণকৃপাওনে ॥
কৃষ্ণ-কাষ্ণ ভেদ নাহি শাস্ত্র-পরমাণ ।
যেবা করে ভেদ-বুদ্ধি সেই অগেযান ॥
সোথলে বৈষ্ণবগণে, কৃষ্ণ-সেবা হয় ।
বৈষ্ণব-সেবা দিহনে (কৃষ্ণ)-সেবা কভু নয় ॥
(শুদ্ধ) বৈষ্ণবের আলুগতো কৃষ্ণসেবা পাই ।
বৈষ্ণব-বিনা সেবক ত্রিভুনে নাই ॥
কৃষ্ণের যাতোক লীলা বৈষ্ণব লইয়া ।
বাড়ায় বৈষ্ণব-গুণ নিজে লঘু হঞা ॥
এ হেন করুণ প্রভু, সেবক তাঁহার ।
ভজিলে মঙ্গল হয় ঘুচয়ে আঁধার ॥
তীর্থও মলিন হয় পান্ধীর পরশে ।
বৈষ্ণব-বিজয়ে তীর্থ—সব পাপ নাশে ॥
ধরণী সহিতে নারে যে পাপের ভার ।
বৈষ্ণব-উদয়ে পাপ নাহি থাকে আর ॥
ধরার সম্পৎ শুধু বৈষ্ণব-চরণ ।
আর যত সব হয় মায়া-আবরণ ॥
না জে'নে বৈষ্ণব-ভক্ত মর্ত্যবুদ্ধি করে ।
জাতিবুদ্ধি হয় যার অভিমান-ভরে ॥
নিজ কার্য্যাকার্য্য বোধ কভু নাহি যার ।
সেই অভাগিয়া করে বৈষ্ণব-বিচার ॥
বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা বুঝে শক্তি কার ।
না বুঝিয়া চর্চা করে সেই ছুরাচার ॥

কুষ্ঠীপাকে পড়ি রবে নাহিক সংশয় ।
 বৈষ্ণব নিন্দিলে ত্রাণ কোনকালে নয় ॥
 এমন নির্বোধ কেবা জগত ভিতরে ।
 কুষ্ঠার আঘাত করে নিজে নিজ-শিরে ॥
 সংসারে সকল পাপী হইবে উদ্ধার ।
 চর্চিলে বৈষ্ণবগণে, নাহিক নিস্তার ॥
 অতএব নিন্দা ছাড়ি বুদ্ধিমান জন ।
 আপন-মঙ্গল-লাগি (করে) বৈষ্ণব-ভজন ॥
 এহি নিবেদন মম বৈষ্ণব-চরণে ।
 কভু নাহি শুনি যেন ভক্ত-নিন্দা কানে ॥
 বৈষ্ণব-গহিমা যেন গাহিবে সতত ।
 এ অধমদাস তাঁর চরণে প্রণত ॥

গাইহস্ত্য-ধর্ম

(মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে লিখিত)

ভীষ্ম যুদ্ধটির মহারাক্ষকে বলিলেন,—পুত্রকালে ভার্গব মুনি মুচকুন্দ রাজার নিকট যে ব্যাধ-কপোত-সংবাদ কীর্তন করিয়াছিলেন, আমি তাহাই আবৃত্তি করিতেছি, মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর ।

কোন মহারণ্যে এক ঘোরদর্শন পক্ষীহস্তা ব্যাধ বিচরণ করিতেছিল । তাহার কাকোল অর্থাৎ কাকবিশেষের মত কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গ ও চক্ষু দুইটি রক্তাভ, দীর্ঘ উরুদেশ, ক্ষুদ্র পাদ, মহাহনু ও বৃহৎ মুখ ছিল । জগতে তাহার কোন বন্ধু-বান্ধব ছিল না । নির্জুর কর্মের জন্য সে মহাব্যসমাজে পরিত্যক্ত । শাস্ত্র বলেন,—পাপীকে দেখিলেই পঙ্কিতগণ তাহাকে দূরতঃ পরিত্যাগ করিবেন । যে নিজেকে বিষ বা উল্কানে বধ করিতে চায়, সে অস্ত্রের হিতকারী কি করিয়া হইতে পারে ? যে নৃশংস, ছুরাঙ্গা প্রাণী-মাত্রেরই প্রাণহরণকারী, সে হিংস্র সর্পের মত ভয়ঙ্কর ।

সেই ব্যাধ বনে ঘুরিয়া বেড়াইত ও জ্ঞানের সাহায্যে বিহঙ্গ ও পতঙ্গাদি শিকার করিত। উহাদের মাংস-বিক্রয়দ্বারা তাহার জীবিকা নির্বাহ হইত।

একদা বনগধ্যে অকস্মাৎ ঈশ্বরের প্রবেশ করিলেন। তিনি শুধু একা নন, তাঁহার সঙ্গে সংবর্দ্ধক-মেঘাদি চেল্য-চামুণ্ডাও ছিল। আকাশ মেঘে আচ্ছাদিত হইল, মুঘলধারে বারিপাত হইতে লাগিল; মুহূর্ত্তঃ বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল। প্রবলবেগে ঝড় বহিতে শুরু হইল। বনভূমি জলে জলময় হইয়া ভীষণ আকার ধারণ করিল। যুগ-সিংহ-বাঘাদি দূরে কোন স্থলভূমি আশ্রয় করিয়া বসিল। পক্ষিগণ বহু হতাহত হইল। বনবাসিগণ ক্ষুধায় কাতর ও ভীত হইয়া বনপথে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছিল। সে ব্যাধও নীতান্ত হইয়া 'ন যযৌ ন তস্মৌ' অবস্থায় সেখানে দাঁড়াইয়া গেল। এমন সময় দৈবক্রমে ভূমিতে এক বর্ষ্যাদ্রিভিত ও নীতকাতর-কপোতীকে সে দেখিতে পাইল। তাহাকে নীতে জর্জরিত দেখিয়াও তাহার কঠিন হৃদয়ে হৃৎথের উদ্বেক হইল না। সে বড় শিকার মিলিয়াছে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ নিঃশব্দে পিঞ্জরমধ্যে তাহাকে নিক্ষেপ করিল। যে পাপী, সে নিজে হৃৎথে অভিভূত হইয়াও অপরের হৃৎথ উৎপাদন করে। পাপাত্মা পাপকার্য্যের ফলে পাপ করিয়াই চলিতে থাকে।

কিয়ংকাল ভ্রমণের পর বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে মেঘের ছায় নীলবর্ণ এক বনস্পতিকে দেখিতে পাইল। বহু বিহঙ্গমের নীড়ের চিহ্ন রহিয়াছে।

আহা বিধাতা কি করুণাময়! পরভূৎ-ভৃগু সাধুদের মতই উহাকে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। পক্ষিগণকে স্থান, ছায়া ও ফলাদি-দানে উহার জীবন সার্থক করার জন্যই পরমেশ্বরের কি অপূর্ব সৃষ্টিকৌশল।

অনন্তর ক্ষণকালপরে আকাশ মেঘমুক্ত হইল; সূর্য্যদেব অন্তাচলে লুপ্তায়িত হইলেন; অসংখ্য নক্ষত্রের উদয় হইল বটে, কিন্তু সন্ধ্যারানী শীতবিহ্বলা ধরণীর শীত দমনের জন্য একখানি তিমির বস্ত্র পরিধান করাইয়া দিলেন। আকাশ নির্মল হইলেও তন্দ্রাকারে ও ঐত-বর্ষার শীতে কাতর হইয়া ব্যাধ চিন্তা করিতে লাগিল,—এই গাঢ় অন্ধকার, তাহাতে আবার বন-পথ দুর্গম ও বাসস্থান বহুদূরে। এইরূপ চিন্তার পর একটি স্থির-সিদ্ধান্তে পৌছিল। এই যে সম্মুখে বনস্পতি, ইহার আশ্রয়ে আজ রাত্রি যাপন করিব। এই সম্বল করিয়া বনস্পতিকে কৃতজ্ঞলি-গহকরে প্রণামপূর্ব্বক শরণ প্রার্থনা করিল। শিলার উপর বৃক্ষপত্র শয্যাক্রমে স্থাপন করিয়া তাহাতে

শয়ন করিল। সেই পক্ষীহস্তা মহাত্মাঃখে আবিষ্ট হইয়া নিম্নাদেবীর ক্রোড়ে শান্তি লাভ করিল।

সেই বনস্পতির শাখাশ্রয় করিয়া এক কপোত বহুকালযাবৎ বাস করিতেছিল। তাহার ভাৰ্য্যা গতকণ্য খাত্তানুসন্ধানে নীড় হইতে বনের মধ্যে চরিতে গিয়াছিল। সে অত্যাধি ফিরিল না দেখিয়া বৃক্ষোপরি বিলাপ করিতেছিল—হায়! একদিন গত হইল, অল্প রাজি উপস্থিত, তাহাতে আবার দিবসে বাড়-জল। আমার প্রিয়র গৃহে না আসিবার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। বনের ভিতর দয়িতার কোন অমঙ্গল ঘটিল নাকি? তাহার বিরক্তে অল্প আমার গৃহশূন্য বোধ হইতেছে। শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়—‘ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহম্ভাতে।’ অর্থাৎ যে গৃহস্থের গৃহিণী (স্ত্রী) নাই, সে গৃহ গৃহই নহে। পুত্র-পৌত্র-ভৃত্যাদিদ্বারা গৃহ পরিবেষ্টিত থাকিলেও ভাৰ্য্যাহীন গৃহস্থের গৃহ শূন্য বলিয়া গণ্য হয়। গৃহিণী-হীন গৃহ অবশ্যাসদৃশ। কারণ যাহার গৃহে প্রিয়বাদিনী শাক্ষী স্ত্রী নাই, তাহার বনগমন কর্তব্য।

সেই কপোত আরও অধিক দুঃখের সহিত খেদ করিতে লাগিল—আমার প্রাণাধিকা প্রিয়া যদি না আসে, তবে আমার এ জীবনে কি প্রয়োজন? আমি স্নানাহার না করিলে, সে কোনদিন উঠা করে নাই; আমাকে শান্তিতে শয়ন করাইয়া সে বিশ্রাম করিত; আমার দুঃখে সে দুঃখ অনুভব করিত ও আমি কষ্ট হইলে, সে তুষ্ট হইত। পতিব্রতা স্ত্রীর পতিই প্রম দেবতা ও একমাত্র গতি। স্ত্রী ধর্ম্মার্থকাম—এই ত্রিবর্গের সহায়িনী।

ভীষ্মদেব বলিতে লাগিলেন,—বৃক্ষ কপোতের এই ককুণ বিলাপবাক্য শ্রবণ করিয়া ব্যাধের পিঞ্জরাকব কপোতী উত্তর করিল,—অহো, আমার কি সৌভাগ্য! আমি যে স্বামীকে কিঞ্চপ প্রিয় ছিলাম, তাহা আমার গুণ-বর্ণনের মধ্যেই লক্ষ্যভূত হইয়াছে। যে নারী পতিকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না, সে তাহার পত্নী বলিয়া পরিগণিত হইবে না। নারীর স্বামী তুষ্ট হইলেই সর্বদেবতা তুষ্ট হন। যেমন দাবাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া লতাপুষ্প-স্তবকসহ ভস্মীভূত হয়, তদ্রূপ পতি অসন্তুষ্ট হইলে পত্নীও ভস্মাকারে বিনষ্ট হয়।

ব্যাধ কর্তৃক গৃহীত হইলেও স্বামীর হৃৎখে বাধিত হইয়া স্বামীকে এইরূপ উপদেশ করিল,—ওহে স্বামিন্! আমি তোমায় কিছু হিতবাক্য বলিব, তুমি তদনুসারে কার্য্য কর। হে কান্ত! শরণাগতের ত্রাণকর্তা হও। এই পক্ষীহন্তা তোমার গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। সে তোমার শরণাগত, সে শীতার্ভ ও হৃদার্ভ; অতএব তাহার পরিচর্য্যার ব্যবস্থা কর। যে মাতৃরূপা গাভী ও ব্রাহ্মণকে হত্যা করে, তাহার মহাপাতক—নরকগতি হয়, তদ্রূপ যে শরণাগতকে হত্যা করে, সে তত্তুল্য পাতকী হয়। ব্যাধ তোমার সমাশ্রিত, উহার জীবন যাহাতে দিনষ্ট না হয়, তাহার যথাচিত সংকার কর। গৃহস্থের গৃহে অতিথি আগত হইলে তাহার যথাযোগ্য সমাদর করিলে পরকালে অক্ষয় লোক লাভ হয়। হে পতে! তুমি সম্ভ্রানবান্, নিজ দেহের দয়া-মায়া পরিত্যাগ করিয়া গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম-রক্ষার্থে আশ্রিতের সেবা কর এবং তাহার শ্রীতিবিধান কর। হে বিহঙ্গম! মনে কোন সন্তাপ করিও না। শরীর-যাত্রানির্ব্বাহের জন্য অন্য ভাষ্যা গ্রহণ করিও। আমি ত যমসদৃশ ব্যাধেব কবলে কবলিত। আমার জীবনের আশা করিও না। অতএব ইচ্ছানুসারে শত্রু-শরণাগতের আতিথ্য-বিধান কর। সে অতি হৃৎখের সহিত স্বামীকে উপদেশ করিয়া নিঃসৃত হইল।

সেই কপোত স্বীয় পত্নীর ধর্ম্মযুক্তিদম্বিত বচন শ্রবণ করিয়া মহাতর্বে বাঙ্গালুললোচন হইল এবং মনে বিচার করিতে লাগিল যে, বহুভাগ্যের ফলে অল্প এই পক্ষীজীবির সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল।

যাহাউক জ্ঞীর উপদেশানুসারে ব্যাধকে কপোত জিজ্ঞাসা করিল,—“আপনি আমার গৃহে অতিথি, বলুন, আমি আপনার কি সেবা করিতে পারি? আপনি মনে কোন হৃৎখ করিবেন না। আপনি নিজের গৃহে বর্ত্তমান আছেন—ইহাই বোধ করিবেন। আপনার কি ইচ্ছা, সত্বরই প্রকাশ করুন। আমি প্রণয়ভরেই বলিতেছি যে, আপনি আমাদের শরণাগত। শত্রুগৃহে উপস্থিত হইলেও আতিথ্যের যোগ্য। বৃক্ষের ছেদনকারী যদি বৃক্ষতলে উপনীত হয়, তবু বন্যম্পতি তাহাকে ছায়া ও ফলদান করিতে কুণ্ঠিত হয় না। পঞ্চস্থনা-পাপ হইতে নিষ্কৃতির জন্য যে পঞ্চযজ্ঞের বিধি-শাস্ত্রে বিহিত আছে, তাহা যদি গৃহস্থ পালন না করে, তবে তাহার ইহলোক ও পরলোক দুইই দিনষ্ট। অতএব আপনার

মনের ইচ্ছা নির্ভয়ে প্রকাশ করুন। আমি যথাসাধ্য আপনার প্রীতি-বিধানের ব্যবস্থা করিব।

ব্যাধ কপোতের আশ্বাসবাক্যে বিশ্বাসযুক্ত হইয়া আগ্রহভরে দারুণ শীতের হস্ত হইতে ত্রাণের উপায় প্রার্থনা করিল। তাহার শীতনিবারণের জন্য দ্রুত শুকপত্রসমূহ ও গৃহস্থের ঘর হইতে জ্বলন্ত অঙ্গার সংগ্রহ করিয়া অগ্নি প্রজ্জ্বালিত করিল এবং তাহার গাত্র অগ্নিতাপে উত্তপ্ত করিবার অনুরোধ জানাইল। উহাতে পক্ষীহস্তার দেহের শীতলতা দূর হইল বটে, কিন্তু উদবের জ্বালা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন সে বিহঙ্গমকে বলিল,—“হে সদাশয় অতিথি-সংকারক! আমি শীতের কবল হইতে মুক্ত, কিন্তু ক্ষুধার জ্বালা আমাকে বিশেষ পীড়া দিতেছে। শীঘ্র কিঞ্চিৎ আহার দ্বারা আমার ক্ষুধিবৃত্তি কর।” ইহার উত্তরে কপোত বলিল,—“আমরা বনবাসী। বনের উৎপন্ন শস্যাদি দ্বারা জীবন-ধারণ করি। আমাদের কোন বিত্তব নাই, যাহা দ্বারা আপনার ক্ষুধার জ্বালা শান্ত করিতে পারি। মুনিগণের মত আমাদের গৃহে কোন সঞ্চয় থাকে না। আমরা দৈনন্দিন আহাৰ্য্য সংগ্রহ করি। আচ্ছা দেখি কোন উপায় করা যায় কিনা।” এই কথা বলিবার পর সে ক্ষণকাল চিন্তা করিল এবং শুকবৃক্ষপত্রের সাহায্যে অগ্নি প্রজ্জ্বালিত করিয়া বারম্বার পরিক্রমাপূর্বক তাহাতে স্বীয় দেহ নিষ্ক্ষেপ করিল।

পক্ষীজীবি ব্যাধ ক্ষুদ্র পক্ষীর স্বদেহ-মাংসে অতিথি-সংকারের দৃষ্টান্তে হতবুদ্ধি হইল এবং স্বীয় পাপাত্মক কর্মের জন্য শত শত ধিক্কার-সহকারে বিলাপ করিতে লাগিল,—হায়! আমি কি নৃশংস! সামান্য কপোত আত্ম-ত্যাগদ্বারা অতিথিপূজনই গৃহস্থের পরম ধর্ম—এই শিক্ষা দান করিল।

অতঃপর পক্ষীহস্তা লুক্কাক সর্বভোগবিবজ্জিত হইয়া ধর্মযাজনে কৃত-সম্বল করিল। যষ্টি, শঙ্খাকা, জাল, পিঞ্জর প্রভৃতি পক্ষীশিকারের দ্রব্যাদি পরিত্যাগ করিয়া এবং পিঞ্জরাবদ্ধ কপোতীকে মুক্তিদানের পর মহাপ্রস্থানের উদ্দেশ্যে বহির্গত হইল।

—ত্রিদণ্ডিধামী শ্রীমন্ত্ৰিবেদান্ত উর্দ্ধমহী মহারাজ

প্রমোত্তর-স্তম্ভ

(পূর্বপ্রকাশিত ৩২শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৮৬ পৃষ্ঠার পর)

শিব বিষ্ণুর উপাসক-নিবন্ধন বিষ্ণু জগদ্বাস্তা হউন, কিংবা বিষ্ণু শিবের উপাসক-নিবন্ধন শিবই জগদ্বাস্তা হউন, অথবা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—তিনজনই সমভাবে জগদ্বাস্তা হউন, আমরা মহাদেব এবং ব্রহ্মার ভক্তগণের অন্তঃপাত শাস্ত্রে অবলোকন-পূর্বক তাঁহাদের উভয়কে মন্তকের দ্বারা দণ্ডবৎ বিধান করিয়া উপেক্ষার অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর দাসত্ব অবলম্বন করিয়াছি। কারণ, প্রহ্লাদ, ধ্রুব, বিভীষণ, বলি, ব্যাস ও অঙ্গরীষ প্রভৃতি মহাজনগণ বিষ্ণুপরায়ণ; একজ্ঞ তাঁহার শ্রীশঙ্কু ও ব্রহ্মার পরম-শ্রীতিভাজন ও জগদ্বাস্তা-বিধায়ক। আর রাবণ, বাণ, গৌণ্ডক, বৃক প্রভৃতি অনুরাগ ব্রহ্মা এবং মহাদেবের ভক্তাভিমান করিয়াও তাঁহাদের প্রিয় হইতে পারে নাই, একজ্ঞ তাহারা জগত্তের পরম শত্রু হইয়াছিল।

রাবণ ব্রহ্মার ভক্ত ছিল; কিন্তু ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের লক্ষ্মী দীতাদেশীকে হরণ করিবার জন্ত তাহার দুর্ভুজি হইয়াছিল। রাবণ ব্রহ্মার প্রদত্ত মৃত্যুশরেই নিহত হয়, ব্রহ্মা রাবণ-হননের জন্ত ঐ মৃত্যুশরের কথা ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকে বলিয়া দেন। সুতরাং বিষ্ণু-বিদেষীকে ব্রহ্মা কখনও 'ভক্ত' বলিয়া স্বীকার করেন না, পরন্তু তাহার বিনাশই আকাঙ্ক্ষা করেন।

বাণ-নৃপতি মহাদেবের পরম ভক্ত বলিয়া আপনাকে অভিমান করিতেন। তিনি মহাদেবের নিকট হইতে সহস্র বাহু প্রাপ্ত হইয়া সেই মহাদেবের সহিতই যুদ্ধ করেন। মহাদেব বাণ-নৃপতিকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন। ক্রোধের সহিত যুদ্ধে বাণ-নৃপতির সহস্র বাহুর মধ্যে কেবলমাত্র চারিটি বাহু থাকে। বাণ-নৃপতি জগত্তের ভীষণ শত্রুতা সাধন করিয়া বিনষ্ট হন। মায়াবাদী বা গাণ্ড শৈবগণের শিব-ভক্তিও এইরূপ। তাঁহারা নিজের আরোহ-চেষ্টায় শিবের নিকট হইতে জোর করিয়া কিছু প্রাকৃত বল-লাভ-পূর্বক সেই বলের দ্বারা শিবকে হনন ও বিষ্ণু-বিদেষ করিবার জন্ত্য ধাবিত হন। অর্থাৎ তাঁহারা নিজেরাই ভবানীভর্তা বা সোহংবাদী হইয়া পড়েন! তাঁহারা শিবের প্রিয় নহেন; এইজন্য তাঁহাদের উপর শিবের চির-অভিসম্পাত রহিয়াছে।

পৌণ্ড্রকও আপনাকে একজন শিবভক্ত বলিয়া অস্মিয়মান করিত। সে শিবের নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় এবং তাহাতে বিনষ্ট হয়।

রুক শিবের ভক্তাভিমাত্রী ছিল। অনেক তপস্যা করিয়া এই রুক শিবের নিকট হইতে বর প্রাপ্ত হয় যে, যাহার মস্তকে সে হস্ত স্থাপন করিবে, সেই ব্যক্তি তমুহুর্ভেই মৃত্যুগ্রস্থ হইবে। রুক এইরূপ বর প্রাপ্ত হইয়া ঐ বরের ফলাফল পরীক্ষা করিবার জন্য সর্বপ্রথমে বর-প্রদাতা শিবকেই নির্দোষ-পূর্বক শিবের মস্তকে হস্ত প্রদান করিতে উদ্যত হইল। শৈব মায়াবাদিগণের বিচারও এইরূপ। শিব উপায়ান্তর না দেখিয়া বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীবিষ্ণুর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বিষ্ণু ব্রাহ্মণবিশেষ ধারণ-পূর্বক রুককে বলিলেন,—“শিবের কথায় বিশ্বাস করিও না। তুমি আপনার মস্তকে হস্ত দিয়া দেখ, কিছুই হইবে না।” রুক বিষ্ণুর আদেশানুসারে নিজ-মস্তকে হস্ত দেওয়া মাত্রই বিনষ্ট হইল। এইরূপ শিব-ভক্তের বিনাশ অবশ্যজ্ঞাবী।

ক্রৌঞ্চ ব্রহ্মার ভক্ত ছিল। ব্রহ্মার নিকট হইতে ক্রৌঞ্চ মহাবল লাভ করে এবং দেবতাগণকে বিতাড়িত করিয়া দেয়। দেবতাগণ ব্রহ্মার শরণাগত হইলে ব্রহ্মা কার্ত্তিককে সেনাপতি করিয়া পাঠান। কার্ত্তিক ক্রৌঞ্চকে বিনাশ করেন।

যাহারা ব্রহ্মা-রুদ্রাদির নিত্য আরাধা শ্রীকৃষ্ণের সর্বৈশ্বরেশ্বরত্ব, সর্ব- কারণ-কারণহ অধীকার করিয়া ব্রহ্মা-শিবাदि দেবতার পূজক হন, কিম্বা শিবের পূজা বা ব্রহ্মার পূজা করিলেই সর্বার্থসিদ্ধ হইবে মনে করেন, তাহাদের বিনাশ অবশ্যজ্ঞাবী। একমাত্র ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর পূজকের বিনাশ নাই, আর সকলেরই বিনাশ আছে। একমাত্র সর্বৈশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের পূজকই বিধি-পূর্বক পূজ্যকালী, আর সকল পূজকই অবৈধ; এইজন্য তাহাদের কর্ম্মমার্গে বিচরণ, তাহাদের আত্মবিনাশ অবশ্যজ্ঞাবী।

কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥

যেহপ্যান্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ ।

তেহপি নামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্ ॥ (গীতা)

কৃষ্ণসেবা অপেক্ষা কৃষ্ণভক্ত শিবের পূজা বড়, সন্দেহ নাই। কিন্তু কৃষ্ণসেবায় উদাসীন বা কৃষ্ণসেবা-বিদেষী হইয়া শিবের পূজার চলনা—

পাষণ্ডতা। এইরূপ পাষণ্ডতা কপটতা পূর্বক হৃদয়ে পোষণ করিয়া যাহারা শিব-পূজার ছলনা করে, তাহারাই প্রকৃতপক্ষে শিব-বিদ্বেষী। কৃষ্ণপ্রিয়তম শিবের পূজা-প্রভাবে হৃদয়ে নিকৃপাধিক কৃষ্ণপ্রীতিই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইবে — ভোগ-মোক্ষ-পিপাসা সম্পূর্ণভাবে বিদূষিত হইবে। এইজন্য শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

প্রথমং কেশবং পূজাং কৃত্বা দেবমহেশ্বরম্ ।

পূজনীয়াঃ মহাত্মন্য। যে চান্যে সন্তি দেবতাঃ ॥ (স্কন্দপুরাণ)

অতএব সর্বাত্তে শ্রীকৃষ্ণে পূজি, তবে ।

শ্রীতে শিব-পূজি, পূজিবেক সর্ব দেবে ॥ (চৈঃ ভাঃ অঙ্ক ৪।৪৮২)

অপিচ—

যথা তরোমূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভূজোপশাখাঃ ।

প্রাণোপহারাজ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্কার্হণমচ্যুতেজ্য। ॥

(ভাঃ ৪।৩১।১৪)

— যেখানে শিব-পূজার ফলে কৃষ্ণপ্রীতিতে সিদ্ধি লাভ না হয়, সেখানে সেইরূপ কল্লিত শিবের বৈষ্ণবত্ব নাই, সেইরূপ কল্লিত শিব-পূজা—বৈষ্ণব-পূজা নহে, তাহা অবৈষ্ণব-পূজা—অবৈধ পূজা—অশাস্ত্রীয় পূজা। কৃষ্ণ-প্রিয়তম বাস্তব শিব-পূজা-ফলে প্রচেতাগণের ল্যাহ নিকৃপাধিক কৃষ্ণপ্রেমে সিদ্ধি অবশ্যস্বাভাবী।

শ্রীচৈতন্য-লীলার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

(পূর্বপ্রকাশিত ৩২শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৭২ পৃষ্ঠার পর)

দণ্ডকারণ্যে সপ্ততাল বৃক্ষকে আলিঙ্গনমাত্রেই উদ্ধার করিয়া

ক্রমে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন

মহাপ্রভু এইবার উড়ুপী হইতে পঞ্চাপুরা তীর্থ, কোলাপুর হইয়া পাণ্ডুপুরে পৌঁছিলে তথায় মাধবপুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। শ্রীরঙ্গপুরীর সহিত আলোচনারূপে মহাপ্রভু জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার পূর্বাশ্রমের জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণান্তে শঙ্করারণ্য নামে প্রসিদ্ধ হইয়া এই তীর্থে নিত্যধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীরঙ্গপুরীর সহিত ইষ্টগোষ্ঠী

করিয়া বিদায় লইয়া ক্রমে কৃষ্ণ-বেধা-তীরে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে “কৃষ্ণ-কর্ণামৃত” গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া মাহিম্বতীপুর, ধনুতীর্থ হইয়া দণ্ডকারণ্যে আসিলেন। তথায় ত্রেতাযুগ হইতে বালিবাজ কর্তৃক এক সর্প অভিযন্ত হইয়া সপ্ততাল বৃক্ষরূপে আচ্ছাদিত-চেতন জন্ম পাইয়া অবস্থান করিতেছিল। ভগবান্ মহাপ্রভু সেই সপ্ততাল বৃক্ষকে উদ্ধার করিবার মানসে সেই-স্থানে গিয়া সপ্ততালকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহার আলিঙ্গনমাত্রেই সেই সপ্ততালবৃক্ষ সশরীরে অন্তর্ধান হইলেন। লক্ষ লক্ষ লোক তাহা দেখিয়া বিস্মিত ও চমকিত হইয়া মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ রাম-অবতার বলিয়া জ্ঞান করিলেন।

ক্রমে মহাপ্রভু দণ্ডকারণ্য হইতে নাসিকত্ৰাসক হইয়া বিজ্ঞানগরে আসিলে তথায় পশ্চিম গোদাবরী প্রদেশের রাজ্যপাল রায় রামানন্দের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইল এবং ছুটজনে ইকগোষ্ঠী করিয়া দাক্ষিণাত্যে সংগৃহীত “কর্ণামৃত” ও “ব্রহ্মসংহিতা” রামানন্দকে দিয়া কহিলেন,—

“প্রভু কহে তুমি যেই সিদ্ধান্ত কহিলে।

এই ছুট পুঁথি সেই সব সাক্ষী দিলে।” (১৫: ৫ঃ)

ঐহিক পাইয়া রায় রামানন্দ বড়ই আনন্দিত হইলেন। অনন্তর প্রভু সেথায় রামানন্দের সহিত পাঁচ-সাত দিন অতিবাহিত করিয়া নীলাচলের দিকে অগ্রসর হইলেন। আলালনাথে পৌঁছিয়া মহাপ্রভু সঙ্গী কৃষ্ণদাস যারফৎ নীলাচলে ভক্তবৃন্দের নিকট আগমন-সংবাদ পাঠাইলে তৎক্ষণাৎ নিত্যানন্দাদি ভক্তবৃন্দ প্রেমাগ্নিতে হইয়া নাচিতে নাচিতে মহাপ্রভুর সমীপে আসিয়া সাক্ষাৎ ভুলুটি হইলেন ও হরি-সঙ্কীৰ্ত্তন সহযোগে মহাপ্রভু সহ সকলে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

নীলাচলে কানীমিশ্রের আশ্রয়ে অবস্থানপূর্বক কানীমিশ্রকে

চতুর্ভূজরূপ প্রদর্শন : স্বরূপ-দামোদরের সহিত মিলন ;

ভক্ত গোবিন্দকে নিজ অঙ্গ-সেবার অধিকার প্রদান ;

উড়িয়া-সত্ৰাট প্রতাপরুদ্রকে উদ্ধার, অঘোষ-

বিপ্র উদ্ধার প্রভৃতি বিবিধ লীলার অবতারণা

মহাপ্রভু দুইবৎসর দক্ষিণদেশ তীর্থাদি ভ্রমণ করিয়া নীলাচলে পৌঁছিলে সমস্ত ভক্তবৃন্দ আসিয়া তাঁহার চরণে পতিত হইয়া প্রেমানন্দে বিভোর

হইলেন। এই সময় কলিঙ্গদেশের (উৎকলদেশের) স্বাধীন সম্রাট গঙ্গাবংশীয় গঙ্গপতি প্রতাপরুদ্রের গুরু ও পুরোহিত কাশীমিশ্রের গৃহে মহাপ্রভু অবস্থান করিলেন। কাশীমিশ্র মহাপ্রভুর চরণে পতিত হইয়া লক্ষ্যান্তঃকরণে আত্মনিবেদনপূর্বক শরণ গ্রহণ করিলে মহাপ্রভু কৃপাপূর্বক মিশ্রকে চতুর্ভুজ মূর্তি দেখাইয়া কৃতার্থ করিলেন।

অনন্তর প্রহ্মমিশ্র, মুরারি মাহিতি, শিখি মাহিতি, পরমানন্দ মহাপাত্র কানাই খুঁটিয়া প্রমুখ ভক্তবৃন্দ মহাপ্রভুর চরণে পতিত হইলেন। তৎপরে পাঁচ-সাতদিন গত হইলে রামানন্দ রায় আসিয়া তথায় মিলিত হইলেন। রামানন্দ রায়ের অন্য চারি ভ্রাতা ও পিতৃদেব ভবানন্দ রায়ও এই সময় মহাপ্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ করেন।

নবদ্বীপ নিবাসী পুরুষোত্তম আচার্য্য পূর্বে মহাপ্রভুর নবদ্বীপ-লীলার সঙ্গী থাকাকালে সঙ্গীত বিজ্ঞায় পারদর্শিতা হেতু মহাপ্রভু-কর্তৃক দামোদর নাম প্রাপ্ত হন। মহাপ্রভুর সন্মাস আশ্রম গ্রহণে পুরুষোত্তম আচার্য্য বিরহোন্মত্ত অবস্থায় কাশীধামে গিয়া শ্রীচৈতন্যানন্দ নামক আচার্য্যের নিকটে যোগপট সন্মাস নাম গ্রহণ না করিয়া কেবলমাত্র শিখাসূত্র তাগরূপ সন্মাস গ্রহণপূর্বক দশনামৌ-দণ্ডীগণের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম স্বীকার হেতু “স্বরূপ” নাম প্রাপ্ত হন এবং গুরু শ্রীচৈতন্যানন্দের আজ্ঞা লইয়া নীলাচলে আসিয়া এই সময় মহাপ্রভুর পদপ্রান্তে মিলিত হইলেন। স্বরূপ-দামোদরই সূত্রাকারে কড়চা রচনা করিয়া মহাপ্রভুকে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলতরু বসিয়া সর্বপ্রথম সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন। ইনিই পঞ্চতত্ত্বের স্বরূপ কীর্ত্তন করেন। স্বরূপ-দামোদর গোস্বামীকে সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ বলা হয়। ইনি ব্রহ্মলীলায় শ্রীমতী রাধাগণীর দ্বিতীয় স্বরূপিনী বলিতা দয়ী। ভক্তি-সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ ও রসাতাসত্বই কোন লেখনী বা কাব্য মহাপ্রভু গুণিতে না পাবার জন্য স্বরূপ-দামোদর গোস্বামী কর্তৃক সেই লেখনী পরীক্ষিত ও সংশোধিত হইলে মহাপ্রভুকে ভুনানো হইত। স্বরূপ দামোদরের পাণ্ডিত্য প্রতিভা সম্পর্কে মহাভাগবত শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহোদয় লিখিয়াছেন,— “সঙ্গীতে গন্ধর্ব্বসম, শাস্ত্রে বৃহস্পতি।

দামোদর সম আর নাহি মহামতি।”

কৃষ্ণরসতত্ত্ববেত্তা ও শ্রীচৈতন্যতত্ত্বের ভাণ্ডারী স্বরূপ দামোদরকে মহাপ্রভু আলিঙ্গন করিয়া প্রেমাবিষ্ট হইলেন।

এই সময় একদিন সার্কভৌম প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের সাথে মহাপ্রভু কৃষ্ণ-কথারঙ্গে ব্যাপ্ত থাকাকালে ঈশ্বরপুরীপাদের প্রিয়ভৃত্য শূদ্রকুলোদ্ভূত আদর্শ সেবানিষ্ঠ গোবিন্দ আসিয়া মহাপ্রভুর পদতলে প্রণত হইয়া জানাইলেন,— ‘প্রভু, পুরী গোসাঞি সিদ্ধিপ্রাপ্তিকালে আপনার সেবা করিবার জন্য আমাকে আদেশ করিয়াছেন। তাই আপনার পাদ-পদ্মপাশে উপস্থিত হইয়াছি।’ সার্কভৌম তাহা শুনিয়া পুরী গোসাঞির এইরূপ শূদ্র সেবক রাখার কারণ সম্পর্কে জানিতে চাহিলেন। তখন প্রভু কহিলেন,—

‘ঈশ্বরের কৃপা জাতি-কলাদি না মানেন।

বিহরের ঘরে কৃষ্ণ করিলা ভোজনে ॥

স্নেহলেশ/পেঙ্কা-মাত্র ঈশ্বর-কুপার।

স্নেহবশঃ এরা করে স্বতন্ত্র আচার ॥

মর্যাদা হৈতে কোটি স্বর্থ স্নেহ-আচরণে।

পরম আনন্দ হয় যাহার শ্রবণে ॥’—(চৈঃ চঃ)

“ন শূদ্রা ভগবন্তকান্তে তু ভাগবতা মতাঃ”—এই শ্রীহরিভক্তিবিলাস-বচনানুসারে ভগবন্তকৃপারায়ণ ব্যক্তি শূদ্রকুলে জন্মিলেও তিনি ভাগবত। মহাপ্রভু অতঃপর গোবিন্দকে আলিঙ্গন করিলেন ও মহাপণ্ডিত সার্কভৌমকে সম্মান প্রদান জলে এত বিষয়ে তাহার কর্তব্য সম্পর্কে বিচার চাহিয়া জানাইলেন,—‘গোবিন্দ আমার গুরুর পিত্রর হওয়ায় তাহার দ্বারা আমার সেবা করানো শোভা পায় না; কিন্তু গুরুর সেবক হুত্রে গোবিন্দ আমার মান্য হইলেও তাহাকে সেবকরূপে রাখিবার জন্য গুরুর আদেশ থাকায় এখন কি উপায় করা যাইবে?’ সার্কভৌম তখন মহাপ্রভুর ইচ্ছা ও ইচ্ছিত বৃদ্ধিয়া কহিলেন,—‘গুরু আজ্ঞাই বলবান্। শাস্ত্র প্রমাণানুসারে গুরুদেবের আজ্ঞা লঙ্ঘন করা কর্তব্য নহে’ তখন মহাপ্রভু হৃষ্টচিত্তে গোবিন্দকে নিজ অঙ্গ সেবার অধিকার প্রদান করিলেন। নীলাচলে প্রত্যাবর্তনপূর্বক মহাপ্রভু সেবক কালীকৃষ্ণদাসকে সাক্ষাৎ সেবা হইতে দূদূবে রাখিয়া তৎস্থলে গোবিন্দকে সেবকরূপে নিয়োগ করিলেন।

মহাপ্রভু প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা সমুদ্রে স্নান করিয়া শ্রীলীলগঙ্গাধেবকে দর্শন করিতেন। এই সময় উভিয়া গম্বাট গজপতি প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর দর্শনে ব্যগ্র হইলে সার্কভৌম, নিত্যানন্দ, রামানন্দ রায় প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের অনুরোধ সত্ত্বেও মহাপ্রভু রাজাকে প্রথমতঃ দর্শন দেন নাই। পরে একদিন রাজার

পুত্রের কৃষ্ণপ্রেমোদ্দীপক আভরণ ও সজ্জা দেওয়া মহাপ্রভু প্রেমাবেশে তাহাকে স্পর্শ করায় রাজপুত্র প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়ে। রাজাও নিজ পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া প্রেমারত হন। ইহার কিছুদিন পরে মহাপ্রভু বলগুণী উদ্ভানে প্রেমাবেশে থাকাকালে রাজা প্রতাপরুদ্র মহাপণ্ডিত সার্বভৌমের পরামর্শানুসারে বৈষ্ণব-বেশ পরিধান করিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতের “তব কথাযুতং তপ্ত জীবনং... ..” শ্লোকটি আবৃত্তি করিলে মহাপ্রভু ‘ভূরিদা-ভূরিদা’ বলিয়া প্রেমাবেশে রাজাকে আলিঙ্গন দানপূর্বক ঐশ্বর্য দেখাইয়া রূপা করিলেন এবং প্রতাপরুদ্র-সংক্রান্তা নামে খ্যাত হইলেন।

“তবে মহাপ্রভু তারে ঐশ্বর্য দেখাইল।

কাঁহা না কহিও এই নিষেধ করিল।”—(চৈঃ চঃ।)

এই সময় মহাপ্রভু ভক্তগণসহ নীলাচলে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার নূতন দিগ্‌দর্শন প্রকাশ করেন। স্বরূপ দামোদর-মুখে মহাপ্রভু এই রথ-যাত্রার রসতথ্য প্রস্তোত্তর ছলে জ্ঞানাইয়াছেন, যথা—

“রস বিশেষ প্রভুর স্তনিতে মন হৈল।

ঈষৎ হাসিয়া তবে স্বরূপ পুছিল ॥

যত্নপি ভগ্নপাথ করে দ্বারকা-বিহার।

সহজ প্রকট করে পবন উদার ॥

তথাপি বৎসর মধ্যে হয় একবার।

বৃন্দাবন দেখিবারে উৎকর্ষা অপার ॥

বৃন্দাবন সগ এই উপবনগণ।

তাহা দেখি’ দেখিবারে উৎকর্ষিত হয় মন ॥

বাতির হৈতে করে রথযাত্রা চল।

সুন্দরাচল যায় প্রভু ছাড়ি নীলাচল ॥

নানা পুষ্পোদ্ভানে তাঁহা খেলে রাজি-দিনে।

লক্ষ্মীদেবী সঙ্গে নাহি লয় কি কারণে ॥

স্বরূপ কহে স্তন প্রভু কারণ ইহার।

বৃন্দাবন-ক্রীড়ায় লক্ষ্মী নাহি অধিকার ॥

বৃন্দাবন-ক্রীড়ার সহায় গোপীগণ।

গোপী বিনা অগ্র কক্ষের হরিতে নাহে মন ॥

প্রভু কহে,—যাত্রা-ছলে কৃষ্ণের গমন।

সুভদ্রা আর বলদেব সঙ্গে ছুইজন।

গোপী-সঙ্গে লীলা যত করে উপবনে।

নিগূঢ় কৃষ্ণের ভাব কেহ নাহি জানে।”—(চৈঃ চঃ)

গৌড়দেশীয় বহু ভক্ত এই সময় রথ-যাত্রা-উৎসবে মহাপ্রভুর চরণতলে কৃষ্ণ-কথা শ্রবণ করিয়া চরিতার্থ হন।

একদিন মহাপ্রভু সার্বভৌম ভট্টাচার্যের গৃহে ভোজন-বিলাস ছলে অনিন্দক ভট্টের জামাতা অমোঘ বিখ্যে সার্বভৌম সম্বন্ধে কৃপাপূর্বক রিসূচিকা ব্যাধি হইতে মুক্ত করিয়া কৃষ্ণ-প্রেম সঞ্চার করত একান্ত ভক্তে ক্লান্তকরিত করেন।

ক্রমে গৌড়দেশ হইতে অদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীবাস, রামাই, বাসুদেব, মুরারি প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ ও কুলীন গ্রাম-নিবাসী গুণরাজ, সত্যরাজ প্রভৃতি ভক্তগণ এবং খণ্ডবাসী নরহরিদাস-আদি বৈষ্ণববৃন্দ আসিয়া শ্রীশ্রীগননাথদেবের স্নানযাত্রার সময় মহাপ্রভুর সমীপে উপস্থিত হইলেন। মহাপ্রভু গৌড়-দেশের ভক্তগণের সহিত নীলাচলে রথযাত্রা-উৎসব পালন ও বিবিধ লীলা করিয়া নিত্যানন্দ-অবৈতপ্রভু প্রভৃতি ভক্তবৃন্দকে গৌড়দেশে পাঠাইলেন এবং নিত্যানন্দকে প্রতিবৎসর নীলাচলে না আসিয়া গোড়ে থাকিয়া প্রেমভক্তি বিলাইবার নির্দেশ দিলেন। নীলাচল হইতে গৌড়দেশের কুলীনগ্রামী ভক্তবৃন্দকে বিদায় দিবার সময় প্রভু তাঁহাদের কর্তব্য নির্ধারণপূর্বক করিলেন।—

“প্রভু কহে, বৈষ্ণব-সবা, নাম সঙ্কীর্ণন।

ছুই কর শীঘ্র পাপে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ।”—(চৈঃ চঃ)

ভক্ত পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি এই সময় দরঙ্গের সহিত কৃষ্ণ-কথা প্রসঙ্গে আলোচনাদি-ক্রমে নীলাচলে অবস্থান করেন এবং অন্তান্ত বহু গৌড়দেশীয় বৈষ্ণব নীলাচল ভাগ করেন। উক্ত পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ১৪০৭ শকাব্দের মাঘী শ্রীপঞ্চমী তিথিতে শ্রীচৈতন্যদেবের পার্বদরূপে পিতা বাণেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় ও মাতা গঙ্গাদেবীকে আশ্রয় করিয়া চট্টগ্রামের হাটহাজারী ধানার অন্তর্গত মেঘলা গ্রামে পঞ্চ ‘ম’-কারের সাধনে নিরত ঘোর শাক্ত-সমাজে আবির্ভূত হন। বাল্যকাল হইতে পুণ্ডরীক প্রভু কৃষ্ণ-ভজনের প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থাকিয়া ক্রমে বিদ্যাজ্ঞানের ছলে শ্রীধাম মাধ্যপুরে

জামিয়ার নিজ বাসাবাটী স্থাপন করেন এবং শ্রীমৎ মাধবেন্দ্রপুরীপাদেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। কোমলপ্রকৃতি সাধকের মনে ভজনে উৎসাহ বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত ভগবৎপার্বদগণ ঐক্লপ তামলিক আচার সমুদ্বকুলে সময় সময়ে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। মহাপ্রভু পুণ্ডরীককে 'হে পিতঃ' বন্দিয়া আহ্বান করিয়া কৃষ্ণ-লীলার বহুভাৱরূপে প্রকাশ করেন এবং পুণ্ডরীকের ভগবৎপ্রেমের নিগূঢ়তা গম্য করিয়া 'প্রেমনিধি' উপাধি প্রদান করেন। মায়াপুরধামের মাধবমিশ্রের পুত্র শ্রীল গদাধর পণ্ডিত প্রভু পূর্বের নবদ্বীপে পুণ্ডরীক বিজ্ঞানিধির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং ক্ষেত্র-সন্ন্যাস করিয়া নীলাচলে মহাপ্রভুর সমীপে অবস্থানকালে এই সময় দীক্ষা-মন্ত্র বিস্মৃত হইয়া মহাপ্রভুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে চাহিলে মহাপ্রভু শ্রীগদাধরকে পুণ্ডরীক বিজ্ঞানিধির নিকটই পুনরায় মন্ত্র লইবার জন্ত উপদেশ দিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্য আনুগত্য স্বীকারের আদর্শে অনুপ্রাণিত করেন। বিজ্ঞানিধিও গদাধরকে পুনরায় ইন্টমন্ত্র প্রদান করেন।

মহাপ্রভু দক্ষিণভারত হইতে ফিরিবার পর এইভাবে নীলাচলে ভক্ত-বৃন্দসহ বিবিধ লীলার মধ্যে দুই বৎসর অতিবাহিত করিলেন এবং তৃতীয় বৎসর বিজয়া-দশমী দিনে গোড়দেশ হইয়া বৃন্দাবন বাইবার ইচ্ছায় যাত্রা করিলেন।

বৃন্দাবন গমনচ্ছলে গোড়দেশে গমনপূর্বক শ্রীক্লপ-সনাতন,

রঘুনাথ দাস প্রভৃতি ভক্তগণের সাথে মিলনান্তে স্বজন-

উদ্ধার-কার্য্য করত নীলাচলে প্রত্যাবর্তন

মহাপ্রভু গোড়ের পথে রওনা হইবার বাসে স্বরূপ দামোদর, মুকুন্দ, জগদানন্দ প্রভৃতি বহু ভক্ত তাঁহার সঙ্গী হইলেন এবং ক্ষেত্রসন্ন্যাস অবলম্বন-কারী গদাধরও মহাপ্রভুর সঙ্গে যাইতে চাহিলেন। মহাপ্রভু তখন গদাধরকে ক্ষেত্র-সন্ন্যাস ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে নিবেদন করিলে প্রভুর বিচ্ছেদ-শঙ্কাতুর গদাধর পণ্ডিত কহিলেন,—‘আপনি যেখানেই অবস্থান করুন, তাহাই নীলাচল। আমার ক্ষেত্র-সন্ন্যাস রসাতলে যাউক, তথাপি আপনার সঙ্গে ছাড়িতে পারিব না। মহাপ্রভু তখন পণ্ডিত গদাধরকে টোটার গোপীনাথ-সেবা করিবার জন্য অনেক বুঝাইয়াও কিছুতেই ক্ষান্ত করিতে পারিলেন না। ঘোরশক্তি গদাধর ভালভাবেই জানেন যে, ভগবানের বা ভগবানের নিজ-জন শ্রীগুরুপাদপদ্মের সাক্ষাৎ সেবা ব্যতীত

ক্ষেত্র-সন্ন্যাস দ্বারা মঙ্গল হয় না। তাই তিনি মহাপ্রভুর সাথে সাথে কটক পর্য্যন্ত আসিলেন। অনন্তর মহাপ্রভু প্রিয়তম গদাধরকে আবার নীলাচলে ফিরিতে নির্দেশ দিলেন এবং মহাপ্রভুর ইচ্ছিত ও আদেশ পাইয়া সার্বভৌম গদাধরকে নীলাচলে ফিরাইয়া আনেন।

প্রভু এইবার নৌকায় চড়িয়া ওড়দেশ সীমা পার হইয়া পিছলদায় উপস্থিত হইলেন ও পিছলদায় যবন-রাজকে উদ্ধার করিলেন। তৎপরে শান্তিপু্রে অদ্বৈত আচার্য্যের আশ্রয়ে কিছুদিন অবস্থান করেন এবং শচী-মাতাও তখন মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করেন। কিন্তু আদর্শ বৈষ্ণব-গৃহিণী পতি-হিতাকাঙ্ক্ষী বিফুপ্রিয়া দেবী মহাপ্রভুর সন্ন্যাস ধর্ম্ম রক্ষার কারণে তাঁহার নিকটে গমন করেন নাই। এই সময় ভজের রসজঙ্গরী বলিয়া খ্যাত প্রয়োজনতত্ত্বের আচার্য্য শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীপ্রভু শান্তিপু্রে মহাপ্রভুর পদপ্রান্তে মিলিত হইয়া প্রেমাদ্বিষ্ট হইলেন। সপ্তগ্রাম তালুকের বিশ লক্ষ টাকা আয়ের ক্ষমিদার গোবর্দ্ধনদাস মজুমদারের পুত্ররূপে শ্রীরঘুনাথদাস আনুমানিক ১৪১৬ শকাব্দে জগলী জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণপুং গ্রামে আবির্ভূত হন। শৈশব হইতেই উদাসী রঘুনাথ এইবার মহাপ্রভুর কৃপা-প্রাপ্ত হইয়া ঘরে ফিরিলেন।

অতঃপর শান্তিপু্রে অস্টান্য ভক্তগণকে কৃপা করিয়া মহাপ্রভু রামকেলী গ্রামে উপস্থিত হইলেন এবং পূর্বে নীলাচলে থাকাকালে গোড়ের বাদশাহ হোসেন শাহের প্রধান মহী সনাতন ও রাজঘ-সচিব শ্রীকৃপের দৈন্ত্যপূর্ণ পত্র পুনঃ পুনঃ পাইয়া তাঁহাদিগকে এক্ষণে উক্ত গ্রামে দর্শন দান করিলেন। কর্ণাটদেশীয় ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ কুমারদেবের পুত্ররূপে যশোহরজেলায় ফতেঘাবাদ-নামক স্থানে শ্রীসনাতন ও শ্রীকৃপ আবির্ভূত হন। শ্রীসনাতন ও শ্রীকৃপ পূর্বে পিতৃ-প্রদত্ত নাম যথাক্রমে অমর ও সন্তোষ নামে পরিচিত ছিলেন। মহাপ্রভুই তাঁহাদের সনাতন ও শ্রীকৃপ নাম রাখেন। কুমারদেবের সন্তানগণের মধ্যে শ্রীসনাতন, শ্রীকৃপ ও শ্রীঅনুপম (শ্রীবল্লভ) সাকুর্মা মহাপ্রভুর আশ্রিত হন। কুমারদেবের পরলোক গমনের পর শ্রীসনাতন, শ্রীকৃপ ও অনুপম (শ্রীবল্লভ) সাকুর্মা-নামক এক শ্লোতে মাতুলালয়ে থাকিয়া বিচারজ্ঞান করেন এবং শ্রীসনাতন ও শ্রীকৃপ তৎকালে বাদশাহের অধীনে চাকুরী করায় বাদশাহ কর্তৃক যথাক্রমে সাকর মলিক ও দবিরখাস উপাধি প্রাপ্ত হন। মহাপ্রভু রামকেলি গ্রামে শ্রীসনাতন ও শ্রীকৃপকে অঙ্গীকার

করিবার সময় বল্লভের একমাত্র পুত্র শ্রীজীব গোস্বামী শৈশবকালে আড়ালে থাকিয়া মহাপ্রভুর পাদপদ্ম দর্শন করেন। মহাপ্রভু, শ্রীকৃষ্ণ ও সনাতনকে রাজকার্য্য পরিচাল্যপূর্ব্বক শীঘ্র তাঁহার প্রচার কার্য্যে সহায়তা করিয়া ব্রজের ভক্তিসিকাগু ও ব্রজপ্রেমলীলা প্রকাশ করিতে আদেশ করিলেন। এক্ষণে মহাপ্রভু রামকেলি হইতে বৃন্দাবন না যাইয়া কানাইয়ের নাটশালা পর্য্যন্ত যাইয়া পুনরায় শান্তিপুরে ফিরিয়া আসিলেন।

মহাপ্রভু শান্তিপুরে আসিলে রঘুনাথ দাসের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইল। রঘুনাথদাসকে সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ করিবার জন্য তাঁহার পিতৃদেব জটনিকা সুন্দরী বালিকার সহিত বিবাহ দিলেও রঘুনাথদাস তাহাতে আদৌ আসক্ত হইলেন না। মহাপ্রভুকে পাইয়া সাতদিবস ধরিয়া রঘুনাথ দাস কৃষ্ণ-কথায় অতিবাহিত করিলেন এবং মহাপ্রভু রঘুনাথের হৃদয়ে তীব্র মর্কট বৈরাগ্যের উদয় দেখিয়া তাহা পরিচাল্যপূর্ব্বক যুক্ত-বৈরাগ্য শিক্ষা দিয়া কহিলেন :—

“স্থির হইয়া ঘরে যাহ না হও বাতুল।

ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবশিদ্ধকুল।

মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।

যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা ॥

অন্তরু মিঠা কর, বাহ্যে লোক-ব্যবহার।

অচিরান্তে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার ॥

বৃন্দাবন দেখি’ যবে আসিব নীলাচলে।

তবে তুমি আমি পাশে আসিহ কোন ছলে ॥

সে-কালে সে-ছল রক্ত স্ফুরাবে তোমাতে।

কৃষ্ণরূপা যাবে, তাহে কে রাখিতে পারে ॥”—(চৈঃ চঃ)

শ্রীমদ্রম্যপ্রভুর উক্ত শিক্ষার ব্যাখ্যায় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার প্রণীত “শ্রীশ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত” গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—‘যথাযোগ্য বিষয় স্বীকার কর’ এই আজ্ঞার তাৎপর্য্য এই যে, ইন্দ্রিয়-প্ৰীতির জন্ত বিষয় গ্রহণ করা উচিত নয়, কেবল আত্মার কৃষ্ণসম্বন্ধ স্থাপনের জন্য যতটা বিষয় স্বীকার করিতে হয়, তাহা কর। আত্মখসাদ ফল দিয়া বিষয় স্বয়ং প্রপঞ্চাতীত আত্মাকে জড়িয়া দিবে। দেহ, গেহ, কৃষ্ণার্চনার উপকরণ সমাজ সকলই যুক্ত-বৈরাগ্যের উপকরণ হইতে পারে। কেবল সাধকের অন্তরনিষ্ঠা হইলে

সব ভাল হয়। বাহ্যনিষ্ঠা কেবল লোক ব্যবহার মাত্র। অন্তঃনিষ্ঠা নিকপট-ভাবে হইলে ভাববদ্ধ ও শ্রবণকমলস্বক্ক সহস্রই তিরোহিত হয়। ভক্তি যে পরিমাণে শুদ্ধোদয় প্রাপ্ত হয়, সেই পরিমাণে শুদ্ধজ্ঞান ও শুদ্ধবৈরাগ্য অবশ্যই বাড়িতে থাকিবে। উক্ত আশ্বাস-বচনের দ্বারা মহাপ্রভু হনুনাথকে ভগবৎপ্রেম-প্রাপ্তিব পতিকুল শুদ্ধ বৈরাগ্য ভাগ্যপূর্বক যুক্তবৈরাগ্য গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়া শাস্ত করিয়া গৃহে পাঠাইলেন।

অতঃপর নিত্যানন্দ, অবৈত আচার্য্য প্রভৃতি ভক্তবৃন্দকে আলিঙ্গনপূর্বক মহাপ্রভু নবদ্বীপ হইয়া আরও নানাবিধ লীলা প্রকাশপূর্বক নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিলেন। নীলাচলে পৌঁছিতেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষারত কামীমিশ্র, রামানন্দ, প্রভাম্ব, সার্বভৌম, বাণীনাথ প্রভৃতি ভক্তগণ মহাপ্রভুর পদান্তিকে মিলিত হইলেন। পণ্ডিত গদাধর আসিয়া মহাপ্রভুকে প্রণাম করিলে মহাপ্রভু জানাইলেন,—

“গদাধরে ছাড়ি’ গেলু ইঁহো দুঃখ পাইল।

সেই হেতু বৃন্দাবনে যাঠিতে নারিল ॥”—(চৈঃ চঃ)

গদাধর প্রেমাবিষ্ট হইয়া কহিলেন,—“প্রভো! আপনি যেই স্থানে অবস্থান করেন তাহাই বৃন্দাবন এবং গঙ্গা-যমুনা সহ সর্বভীর্থ সম্বিত হয়। তথাপি আপনি যেচ্ছায় লোক-শিকার জন্ত বৃন্দাবন গমনের অভিনয় করেন। আমার প্রার্থনা—আগামী বর্ষাকালে চারিমাস নীলাচলে অবস্থান করিয়া আমাদিগকে কৃপা করুন।” হনুনাথ ভক্তগণ ও গদাধরের প্রার্থনামুক্রম মহাপ্রভুকে সেই বৎসর নীলাচলে থাকিতে অনুরোধ করিলে মহাপ্রভু ভক্তগণের ইচ্ছাপূরণার্থে সন্মত হইলেন। এইরূপে সেই বৎসর মহাপ্রভুর বৃন্দাবনে যাওয়া স্থগিত থাকায় পরবৎসর বৃন্দাবনের পথে রওনা হইলেন। (ক্রমশঃ)

—ঐচিন্তরঞ্জন কবিভূষণ

এ কোন্ রোগের হাঁসপাতাল ?

সম্প্রতি অনেক রোগী আসায় রোগীরা চিকিৎসা গোড়ীয়-হাঁসপাতালে ভালরূপ হইতেছে না বলিয়া বাজারে গুজব। চিকিৎসকগণের সে-বিষয়ে মনোযোগ আকৃষ্ট হইলে, আশা করা যায়। যে রিপোর্ট প্রথমে আগত হইয়াছে, তাহার বিবরণ কতকটা প্রকাশিত হইতেছে,—

১। একটি রোগীর বর্ণনে পাওয়া যায় যে, কপটতা-সমর্থন-কল্পে তিনি ব্যয় করিতে প্রস্তুত। হাঁসপাতাল-সংরক্ষণের জন্ত তাঁহার কোন স্পৃহা নাই। হাঁসপাতাল ভাঙ্গিবার জন্ত তাঁহার চেষ্টা-রোগ তাঁহাকে দরিদ্র করাইয়া ইকনমিক্ করাইতেছে। বাস্তিচার পোষণ করিতে পারিলে তাঁহার ইকনমিক্ প্রব্রুমেয় মৌমাংসা হয়, তিনি একরূপ বিকারগ্রস্থ। সুতরাং তিনি পয়সা খরচ করিয়া বিরোধ করিবার রোগে পীড়িত।

২। অপর একটি রোগী প্রাজ্ঞাপত্য অপেক্ষা পরদার-পোষণের রোগে পীড়িত। টনটনে জ্ঞান আছে,—ওটা অন্যায়, তবে সামাজিক বিপ্লবকারীর দল ভারি করা দরকার বলিয়া মনে করেন। নাস্তাবাদ পোষণ করিতে পারিলে তাঁহার ব্যবস্যাটা ভাল চলে। “সাধারণ স্বাস্থ্য বেশী ভাল আছে” বলিয়া তিনি দুর্বলতা ছাড়িতে পারেন না। এই রোগীর প্রতি ঔষধ প্রয়োগ-ব্যবস্থায় তাঁহার মতভেদের কারণ এই যে, হাঁসপাতালে ভাল চিকিৎসা হয় না, ঔষধাদি ভাল নাই, আর তিনি নিজেই বড় চিকিৎসক, একরূপ অভিমান করেন—এই রোগ।

৩। অন্য একটি রোগীর রোগে জানা গিয়াছে যে, তাঁহার মতে জৈগ হওয়াটাই পরম ধর্ম। ‘আমার আমার’ করিয়া ব্যস্ত থাকিয়া সর্বক্ষণ জীবন,—ভোগে কোন প্রকার বাধা না আসে; মামুলী রোগ পোষণ করাই ভাল। গোড়ের-মতে চিকিৎসা করাইয়া ব্যাধি ভাল হইয়া গেলে পাছে জড়েন্দ্রিয় তৃপ্তির ব্যাঘাত ঘটে, এই ভয়। হাঁসপাতালে যখনই সেবা-সুশ্রুতি যথেষ্ট পাওয়া যায়, তখনই হাঁসপাতাল ভাল; কিন্তু যখনই চিকিৎসা আরম্ভ হয়, তখনই ভোগের ব্যাঘাত হওয়ায় হাঁসপাতাল আর ভাল নহে,—এই রোগ। যদি হাঁসপাতাল না থাকে, তাহা হইলেই রোগ অধিক বৃদ্ধি করান যাইতে পারে।

৪। চতুর্থ রোগীর অবস্থা এই যে, হাঁসপাতালবাড়ী বড় হওয়ার আবশ্যকতা নাই। দেশে রোগ বৃদ্ধি হউক, রোগিগণ বেশী ছুগুৎ,—ইহাই অন্তরের অভিলাষ। যখন গৌড়ীয় হাঁসপাতাল বড় হইয়াছে সেখানে ঔষধ-পথ্যাদির ব্যবস্থা ভাল, সুতরাং তাই দেখিয়া গায়ের আলা। হিংসা-রোগ প্রবল হওয়ায়, যাহাতে হাঁসপাতাল ঔষধ পথ্য যোগাড় না করিতে পারে, তাবিষয়ে উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে—এই রোগ।

৫। পঞ্চম রোগীর অবস্থা,—‘আমার মনিবের ঘরে আমারই অধিকার ; সুতরাং হাঁসপাতালের জন্ত সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইলে, আমরা যে-সব চাকর-বাকর আছি, আমাদের পাওনাটা দিতে হইবে, তাহা না দিয়া ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাওয়া কোন প্রকারেই টলারেট করা যাইতে পারে না।’ সুতরাং ছিদ্রান্বেষণ বা ছিদ্র না থাকিলেও পাংচার করিয়া ছিদ্রীকরণ-রোগে ইনি প্রীড়িত, আর এঁর নিচ্ছে কথা বলা, জোলাপ খাওয়াও রোগ।

৬। ষষ্ঠ রোগীর অবস্থা,—‘বেশ খাচ্ছি-দাচ্ছি, সম্মান-প্রতিষ্ঠা পাচ্ছি, আবার ভবরোগ হ’তে মুক্ত হ’বার চেষ্টা কেন ? পৃথিবীর সহিত পরিচয়ে কর্মের ফলে কত প্রকারে সৌভাগ্যবান হ’বার চুলকুনি ও আশা রোগে বৃষ্ট পাচ্ছি, উহা ছাড়বো কেন ? আমরা এখনও সুখ পাচ্ছি, মরণের পরেও সুখ পাবো। গোড়ীয়মঠের সেবকেরা পরোপকারব্রত নিয়েছেন, আমরা না হয় পরের অপকার-ব্রত নিলাম, তা’তে আর কি ?’—এই রোগ।

৭। সপ্তম রোগীর অবস্থা,—‘আমি আভিজাত্যে বড়, সুতরাং ভব-রোগের ডাক্তারীতেও বড়। গোড়ীয়-হাঁসপাতালের চিকিৎসা এক রকম, আমার অল্প রকম চিকিৎসা। মুরুষিয়ানা-চালে পীড়িত হ’য়ে কষ্ট পেলেও আমি গোড়ীয় হাঁসপাতালে চিকিৎসিত হবো না; আমি নিন্দে কোরে বেড়াবো’—এই রোগ।

৮। অষ্টম রোগীর অবস্থা,—গোড়ীয়-হাঁসপাতাল-বাড়ীটা আমাদের ঘরপাগুলো-সম্প্রদায়ের মতই একটা আড্ডা। সুতরাং ঐ স্থানেও আমাদের ঘরপাগুলো-গিরি চালাইতে পারিলে আমাদের রোগ ভাল করার বদলে বাড়াইয়া লইতে পারিব—এই রোগ।

৯। নবম রোগীর অবস্থাও ভাল নয়,—‘হাঁসপাতালে গেলে রোগ বেড়ে যাবে, সুতরাং কেউ যেন হাঁসপাতালে না যায়, ওখানে ভাল ডাক্তার নাই। আমরা যে রোগ পোষণ করিতে চাই, সেই রোগ গোড়ীয় হাঁসপাতালে আরোগ্য ক’রে দিতে চায়,—এই রোগ।

১০। ডাক্তারদেরও ঐ সব রোগ আছে, তাহারা আপনাদেরই ভাল কর্তে পারে নাই। ওদের কাছে চিকিৎসা হ’বে না বলে মোর্গোল করান-রোগে পীড়িত আরো সত্তেরটা লোক আছে।

মন্তব্য—প্রত্যহ বহু রোগী গোড়ীয় হাঁসপাতালে এডমিশন্ নিচ্ছে সুতরাং রোগীর বিবরণ পড়ে তাঁদের চিকিৎসার সময় লাগবে। ব্যস্ত হ’লে চলবে না।

“অন্ধস্ত দীপো বধিরস্ত গীতম্”

যাহার যে ইন্দ্রিয় বা যোগ্যতা নাই, তাহার পক্ষে সেই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষ লাভের চেষ্টা বৃথা। অন্ধের সম্মুখে উজ্জ্বল প্রদীপ ধরিলে বা বধিরের নিকট সুমধুর দিব্য সঙ্গীত কীর্ত্তিত হইলেও আর “দেহাত্তহংবুদ্ধি”-মূৰ্খের নিকট সচ্ছাত্তের সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যাত হইলেও তাহাদের যোগ্যতার অভাবে তাহারা তদন্ত-বিষয় গ্রহণ করিতে পারে না। যাহারা গোদাম, গৃহত্নত, অন্ধতুলা, গুরু-ব্রহ্মগণের দ্বারা পরিচালিত,—“অন্ধৈরুপনীযমানা যথাক্ষাঃ (ভাঃ ৭।৫।৩১)—এই ছায়াভূমারে যাহারা সুদর্শন-বিরহিত বিপণ্যমায়ী সত্যাক, আত্যন্তিক শ্রেয়ঃকথার যাহাদের কর্ণ বধির, যাহারা “দেহাত্তহং-বুদ্ধি মূৰ্খ (ভাঃ ১।১।১৯।৪২) বা “গোবর” (ভাঃ ১০।৮।৮।১৬) তাহারা কি করিয়াই বা ভাগবতাকের নির্মল প্রভা বা দিব্যজ্ঞান-প্রদীপ দর্শন, গুরু-ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ এবং শাস্ত্রের সুদার্শনিক সিদ্ধান্ত উপলব্ধি করিতে পারিবে?

শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভুর রচিত ভক্তি-সুসিদ্ধান্ত-পূর্ণ অকুণ্ঠিত “প্রাণ-বিবর্ত” নামক গ্রন্থখানিতে প্রাকৃত-সহজিয়া-সমাজের অনেকগুলি ব্যভিচারের কথা অতি সরল ভাষায় বিবৃত থাকায় তত্তদোষদৃষ্ট ব্যক্তিগণ উক্তগ্রন্থের বহুল প্রচারের পাছে তাহাদের ভণ্ডামিগুলি লোকে ধরিয়। ফেলে তজ্জন্ত ভীত হইয়াছেন। শ্রীগৌরপার্বদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামী শ্রীমদ্ব্যাসপ্রভুর অচার-প্রচার-লীলা স্বচক্ষে দর্শন ও প্রভুর মুখে সুসিদ্ধান্ত-বাক্যসমূহ শ্রবণ করিয়া যে একখানি অপূর্ব গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহাতে গৌরানুগত্যে কণ্ঠভঞ্জন, সধুসঙ্গের মাহাত্ম্য, ‘শ্রীনাথ’ ও ‘নামা-পরাদ’, ‘ফল’ ও ‘মুক্তবৈরাগোর’ পার্থক্য, গুরুব্রহ্মবিন্দ্য ও সৎগুরুচরণাশ্রয়-কর্তব্যতা, প্রাকৃত-সহজিয়া-মতখণ্ডন, সর্বট বৈরাগীর নিন্দা, শ্রীকৃষ্ণদশী-ব্রত-পালনের অবশ্যকর্তব্যতা প্রভৃতি অতি হৃদয়গ্রাসিনী ভাষায় গীত আছে। যে-সকল কারণে প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের জাঁতে বা লাগিয়াছে, নিম্নে শ্রীগ্রন্থ হইতে তাহার কয়েকটী উদাহরণ উদ্ধার করিতেছি,—

(১) “গৌরা ভজা, লোকরক্ষা একত্র নিষ্ফল ॥

হয় গৌরা ভজ, নয় লোক ভজ ভাই।

এক পাত্রে ছই কভু না রছে এক ঠাঞি ॥

লোকের মনোরক্ষাকারী বা লোকভজনাকারী ধর্ম-ব্যবসায়ী-সম্প্রদায়ের এই সত্য কথাই অস্বীকার করিতে হইয়াছে।

(২) “অসামু-সঙ্গে ভাই, কুক নাম নাহি হয়।

নামাকর বাহিরায় বটে, তবু নাম কভু নয় ॥”

নামাপরাধীর প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের নিকট এইরূপ শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত ‘অদ্ভুত’ বলিয়া মনে হইয়াছে। না হইবারও কোন কথা নাই, কারণ নামাপরাধ হাড়িলে, সাধুসঙ্গ বা বৈষ্ণব সঙ্গুরুচরণাশ্রয় করিলে ত’ তাহাদের ইচ্ছিত-তর্পণ ও ধর্ম্যব্যবসায় চলে না।

(৩) “গোরার আমি,” “গোরার আমি”

বলিলে নাহি চলে।

গোরার আচার গোরার বিচার

লইলে ফল ফলে ॥

লোক-দেখান-গোরা-ভজা তিলক মাত্র ধরি’।

গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি ॥

যদি প্রেমের রাখিতে চাহ গোরাঙ্গের সনে।

ছোট ছরিদাসের কথা থাকে যেন মনে ॥”

এই সকল শুদ্ধভক্তির ননাতনী কথায় ব্যভিচারি-প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায় ও মর্কট বৈরাগিগণের অস্থিবিধা হইয়াছে।

(৪) “জড়দেহে চিদারোপ, গড় তুচ্ছ অতি।

ভাষে কৃষ্ণভাব আশা সমূহ দুর্গতি ॥

চৈতন্য আজ্ঞায় আমি একথা না মানি।

জড়তে একরূপ বুদ্ধি ‘নরক’ বলি মানি ॥”

এই সকল কথা “জড়ে ছল-চিদারোপকারী” প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের অনর্থযুক্তাবস্থায় “অষ্টকালীয়-লীলা-স্বরণ”, “রাডায়”, ঘাটে, বেশ্যার মুখে, ভাড়াটিয়া-কীর্তনীয়ার মুখে, ব্যভিচার-ভৃতক-পাঠক-কথকের মুখে, রাইকানুর কীর্তন (৭) “দশভেকী”, “বাউল”, ‘সহজিয়া কালচাঁদী’, ‘কর্ত্তাভজা’ প্রভৃতি জড়ে চিদারোপকারী প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের নানাবিধ অসংমতের সমূহ কতি কহিয়াছে। তাই কতিপয় প্রাকৃত-সহজিয়া নাকি শ্রীল পণ্ডিত জগদানন্দ গোস্বামী প্রভুর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে উচ্চবাচ্য করিবার দৃষ্টতা করিতেছেন। আমরা নিজে যে-সকল বিচার ও সিদ্ধান্তের অবতারণা করিব, তাহা যে অন্ধগুরুব্রহ্মগণের দ্বারা উগ্রার্গেণীত সত্য্যাদি ও স্বার্থ্যাদি, প্রেমঃকথায় উৎকর্ণ ও প্রেমঃকথায় বধির, কুণপাল্লাবাদী-মূর্খ ও ‘গোখর’

ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারিবে না, ইহা বিলক্ষণ জানি; তথাপি সজ্জন ও মত্যাচরসন্ধিঃস্ব ব্যক্তিগণের জন্য নিম্নে বিবৃত হইতেছে—

কুমিল্লার সনিস্যামক-নাথমহাশয়—

“অসাধু সঙ্গে ভাই কৃষ্ণ নাম নাহি হয়।”

শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত-গোস্বামি-প্রভুর এই ভক্তিসিদ্ধান্তকে “অদ্বুত সিদ্ধান্ত” বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং সেই প্রমাণ-বলে ‘প্রেমবিবর্ত্তের’ অপ্রামাণিকত্ব প্রদর্শন করিতে দুঃসাহসী হইয়াছেন। নাথ মহাশয় বা তন্নিয়ামক যে রাজ্যের লোক, সেই রাজ্যে একথা ‘অদ্বুত’ বটে। শ্রীল জগদানন্দ-পণ্ডিত গোস্বামী যদি ইন্দ্রিগ্রাহ্য বা অক্ষজগতিতশাস্ত্রের কোন সিদ্ধান্ত লিখিতেন, তাহা হইলে শ্রীমান্ নাথ মহাশয়ের নিকট উহা ‘অদ্বুত’ বলিয়া মনে হইত না বা অশ্রদ্ধাধানে নামোপদেশ; নাম-বলে পাপাচরণ ও অহংমমাদি-বুদ্ধি-যুক্ত হইয়া নামমন্ত-বিক্রয় বা ভাগবত-ব্যবসায় দ্বারা অর্থপ্রতিষ্ঠাদি-সংগ্রহরূপ নামাপরাধগুলি যদি “প্রেমবিবর্ত্ত” গ্রন্থে সমর্থিত হইত, তাহা হইলেও সন্যাস-নিয়ামক মহাশয়ের নিকট ঐ সকল সিদ্ধান্ত “অদ্বুত” বলিয়া বিবেচিত হইত না। কিন্তু সাধুসঙ্গে সঙ্গুরুপদাশ্রমে সেবোন্মুখ হইলে-ই সেবোন্মুখ-ত্রিহ্বায় স্বয়ংপ্রকাশ শ্রীকৃষ্ণ-নাম উদ্ভিত হন।

বহির্নিষ্ঠ মন্ত-বিগ্রহ-পাঠ-ব্যবসায়ী অসাধুগণের সঙ্গে অনর্থ যুক্ত-বন্ধ-জীবের চিত্ত কখনই সেবোন্মুখ হইতে পারে না, স্তবরাং তাহার ইন্দ্রিয়-দ্বারে শুকনামও কীৰ্ত্তিত হন না—এইরূপ গোস্বামি-সিদ্ধান্ত শুনিয়া সনিস্যামক-নাথমহাশয় চমকিত হইয়াছেন। তাহার ইহাতে চমকিত বা ভীত হইলেও মিথিল বৈষ্ণবশাস্ত্র ও গোস্বামিপাদগণ তারফরে বলেন যে, অসাধুসঙ্গে কখনই ভজন হইতে পারে না। ‘প্রেম’ প্রভৃতি পণা লইয়া ভূতকপাঠক ফিরিওয়ালার সিদ্ধান্ত ও ভক্তিসিদ্ধান্ত পৃথক্।

নাম-সঙ্কীৰ্ত্তন-ই সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ-ভজন। শ্রবণ-কীৰ্ত্তন-ফলেই কৃষ্ণপ্রেমা উদ্ভিত হন; যথা—

“শ্রবণ কীৰ্ত্তন হৈতে কৃষ্ণে হয় ‘প্রেম’।”

—(চৈঃ চঃ যঃ ৯৬১)

কিন্তু আবার কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর বাক্যে-ই দেখিতে পাওয়া যায়—

“বহুজন্ম করে যদি শ্রবণ কীৰ্ত্তন।

ভবু ত’ না পার কৃষ্ণপদে প্রেমধন ॥” —চৈঃ চঃ আঃ ৮১৬

“ফলেন ফলকারণমস্মীহতে”—অর্থাৎ ফলের দ্বারাই ফলের কারণ বুঝা যায়। যদি “একবার মাত্র কৃষ্ণনাম শ্রবণ-কীর্তন হইতেই প্রেমা উদ্ভিত হন” বলিয়া একবার স্বীকৃত হইল, আবার “বহুজন শ্রবণ কীর্তন করিলেও ‘প্রেমা লাভ’ হয় না,—এইরূপ দুইবার দুইরকম কথার তাৎপর্য কি? ইহা দ্বারা কি বুঝিতে হইবে না যে, বহুজন “শুদ্ধ-কৃষ্ণনাম” শ্রবণ-কীর্তন হয় নাই; পরন্তু দেখিতে কৃষ্ণনামের মত ‘নামাপরাধ’ কীর্তন হইয়াছে। যদি ‘নাম-ই’ কীর্তিত হইত, তাহা হইলে তৎকলম্বরূপ ‘প্রেমা’ও অবশ্যই প্রকাশ পাইত। যথা,—

“এক কৃষ্ণনাম করে সর্ব পাপনাশ।

প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ ॥”

“অনায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন।

এক কৃষ্ণ-নামের ফলে পাই এত ধন ॥”—চৈঃ চঃ আঃ ৮।২৩।২৮

নামাপরাধ-হেতুই ‘প্রেম’ হয় নাই। যথা,—

“হেন কৃষ্ণ নাম যদি লয় বহুবার।

তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রদ্ধার ॥

তবে জন্মি তাহাতে অপরাধ প্রচুর।

কৃষ্ণনাম-বীজ তাহে না করে অঙ্গুর ॥”—চৈঃ চঃ মঃ ৮।২৯।৩০

“কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার।

‘কৃষ্ণ’ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার ॥”—চৈঃ চঃ আঃ ৮।২৪

ত’র মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম-সঙ্কীৰ্তন।

নিরপরাধে নাম কৈলে পায় প্রেমধন ॥—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।১৭

যদি কোনও নামাপরাধী কণ্ঠব্যক্তি প্রতিষ্ঠাদি প্রাপ্তির জন্য কৃত্রিম-ভাবে প্রেম-বিকারের চিহ্ন স্বৈদ, কম্প, পুলক, গঙ্গন-শ্রদ্ধার প্রভৃতি প্রদর্শন করিয়া বলেন যে, দেখ, আমার জিহ্বায় নিশ্চয়ই ‘নাম’ উদ্ভিত হইয়াছে, নতুবা আমাতে এই প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-স্বরূপ কৃষ্ণ-প্রেমার লক্ষণসমূহ দেখা যাইতেছে কেন? “প্রত্যক্ষ কেন বাধ্যতে?” প্রতিষ্ঠাকামী ভাক্তদিগের ভক্তি-বিটলামী গর্ভণ এবং ঐরূপ কাণটা প্রতিবেধ-কল্পে শ্রীমদ্ভাগবত ‘তদশাসারং’ (ভাঃ ২।৩।২৪) শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন এবং বসিক-কুলচূড়ামণি রূপাঙ্গবর শ্রীল চক্রেবর্তী ঠাকুর “নারায়ণদর্শনীতে উক্ত শ্লোকের সারার্থ নির্দেশ করিয়া লিপিবদ্ধছেন:—

“অশ্রুপুলকাবাব চিত্তদ্রবলিমিত্যপি ন শক্যতে বজ্রদ্বন্দ্বঃ; যজ্ঞঃ শ্রীমজ্ঞপ-
গোশ্বামিতরনৈঃ—“নিসর্গপিচ্ছিল-স্বাস্তে তদভ্যাসপরেহপি চ। সত্ত্বাভাসং
বিনাপি স্মাঃ কাপ্যশ্রুপুলকাদয় ইতি ॥ (ভাঃ রঃ শিঃ দঃ লং ৫২ শ্লোক) * *
ততশ্চবহিঃশ্রু পুলকয়োঃ সত্তোরপি বজ্রদ্বন্দ্বং ন বিক্রিয়েত তদশাস্ত্রমিতি
বাক্যার্থঃ। ততশ্চ হৃদয়বিক্রিয়ালক্ষণানুসাধরণানি ক্ষান্তি নামগ্রহণাসম্বাদীশ্রোব
জ্ঞেয়ানি। * * কনিষ্ঠাধিকারিণাং সমৎসরাণ্যন্ত সাপরাধচিত্তহান্যামগ্রহণ-
বাহুল্যোহপি তন্মাধুর্য্যভূতবাতাবে চিত্তং নৈব বিক্রিয়েত, তদ্ব্যাজকাঃ কাস্ত্যা-
দযোহপি ন ভবন্তি, তেষামেব অশ্রুপুলকাদিমিত্তেহপ্য শ্রুনার হৃদয়ভয়া
নিবন্ধেয়া। কিঞ্চ! তেষামপি সাধুলক্ষণানর্থনিবৃত্তি-মিষ্টাক্রিয়াদি ভ্রামকা-
ক্রান্তানাং কালেন চিত্ত-দ্রবে সতি চিত্তশাস্ত্রানারম্ভমপচ্ছতোব। যেহন্ত চিত্ত-
দ্রবেহপি সতি চিত্তশাস্ত্রসরতা তিষ্ঠেদেব, তে তু হু’শ্চাকংস্তা এব জ্ঞেয়াঃ।”

—অর্থাৎ (যদিও হরিনামে চিত্তদ্রবতার বাহুলক্ষণ ‘অশ্রুপুলকাদি’,
তথাপি) ঐ ‘অশ্রু’ ও ‘পুলক’-ই (সকল ক্ষেত্রেই) যে চিত্ত ক্ষোভের
লক্ষণ, তাহাও ব্যপ্তিতে পাবা যায় না। যেহেতু, শ্রীল রূপগোস্ব মিপাদ
বলেন যে, যে-সকল লোকেও চিত্ত স্বভাবতঃই পিচ্ছিল অর্থাৎ উপরি স্থগ,
অন্তরে কঠিন (দুর্গমদৃঢ়মনী দ্রষ্টব্য) এবং যে সকল ব্যক্তি সাত্ত্বিকভাব
উদয়ার্থে ধারণা-বিশেষের দ্বারা অভ্যাসের—এইরূপ লোকের হৃদয়ে সত্ত্বাভাস
ব্যতীতও কোথাও কোথাও অশ্রু-পুলকাদি দেখা যায়। বাহিরে অশ্রু-
পুলকাদি সত্ত্বেও যে হৃদয় বিকৃত না হয়, তাহাই ‘পাষণ’ সদৃশ কঠিন।
হৃদয়বিকারের মুখ্য-লক্ষণ-সমূহ (শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু,
পূর্ববিভাগ, ৩য় লহরী, ১১শ সংখ্যায়) নিম্নলিখিত—(১) ক্ষান্তি অর্থাৎ
ভাগতিক কোন ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলেও অনুক-চিত্ততা, (২)
“অব্যর্থ-কালত্ব” অর্থাৎ প্রতিমুহূর্ত্তে—২৪ ঘণ্টার ভিতরে ২৪ ঘণ্টা ভগবৎ-
সেবাসুত্বতা, (৩) “বিরজ্জি” (অর্থাৎ হস্তাজ্য জী, পুত্র, স্বহৃৎ এবং
তাহাদের বা নিজের দেহ পোষণের জন্য নাম-মন্ত্র-বিক্রয় বা ভাগবৎ-
শব্দসাহিত্যাদির দ্বারা অর্থার্জ্জম—এক কথায় কৃষ্ণের বিষয়ে স্বাভাবিকী
অরোচকতা (ভাঃ ৫।১৪৪৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য), (৪) “শানশ্রুত্যা” অর্থাৎ
‘আমি ব্রাহ্মণ’, ‘আমি পণ্ডিত’, ‘আমি জাতি-গোশ্বামী’, ‘আমি ছোট-
খাট নিত্যানন্দ’, ‘আমি ইন্সপেক্টর/কন্স দিতে পারি’, ‘আমার শিক্ষা-সৈনিক
আছে’, ‘আমার সামাজিক বিধি ও সম্মানের অপেক্ষায় ভক্তি-প্রতিকূল

কার্য্য করিতে হয়'; 'আমি মহারাজ ভগীরথের আদর্শে ভিক্ষার জন্য শত্রু গৃহে যাইতে পারি না বা তাঁহার ন্যায় স্বরূপ দর্শন করিয়া চণ্ডালকেও প্রণাম করিতে পারি না'—এইরূপ বিরূপাভিনিবেশজ অভিমানকে 'মান' বলে, এই সকল বিরূপের মানের হস্ত হইতে নিমুক্ত হইয়া 'উত্তম' হইয়াও আপনাকে নিরূপট 'তৃণাধম-জ্ঞান'-ই মানশূন্যতা, (৫) 'আশাবদ্ধ' অর্থাৎ ভগবৎ-সেবাপ্রাপ্তি সম্বন্ধে দৃঢ়া সম্ভাবনা, (৬) "সমুৎকর্থা" অর্থাৎ নিজা-ভীষ্ট ক্রমপ্রীতিলাভের জন্য যে অত্যন্ত লুক্কিতা (কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অভিস্ফুটিকার জন্য লোভ নহে) (৭) "নামগানে সদাকুচি" (যখন অধিক অর্থ বা প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়, তখনই নামগানে কুচি দেখা যায়, অর্থের প্রাপ্তির হ্রাস বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কুচিরও তারতম্য অথবা অর্থের ফুরণ কিছু কম মাত্রায় হইলে তাহাতে অধিক সময় ব্যয় করিতে ইচ্ছা হয় না,—য'হা বর্তমান নামাশ্রয়ী ভাগবত-ব্যবসায়ী-দলে দৃষ্ট হয়, তাহা নামগানে সদাকুচির উদাহরণ নহে) (৮) "ভগবানের গুণ-কীর্তনে আসক্তি" অর্থাৎ অর্থ বা প্রতিষ্ঠাদি প্রাপ্তির লোভে ধর্ম্ম-ব্যবসায়িগণের মধ্যে যে 'আসক্তি' দেখা যায়, তাহা ভগবৎগুণাখ্যানে আসক্তি নহে, পরন্তু ভগবদিতর-কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা, ভোগ্য স্ত্রী-পুত্র-স্বজনাদির প্রতি আসক্তি মাত্র। (এতৎ প্রসঙ্গে ভক্তিরসায়তনসিদ্ধি পূর্ব্ব ২।১২৮ সংখ্যা দ্রুত শীল রূপগোষামিচরণ কৃত কারিকা আলোচ্য,— ধর্ম্মশিখাদিত্তিকারৈর্বা ভক্তিরূপণ্যতে। বিধরত্না-দুস্তমতাহাচ্ছা তস্যাস্য নাস্ততা ॥ অর্থাৎ ধর্ম্ম শিখাদিব দ্বারা যে ভক্তি উৎপন্ন হয়, সে ভক্তি কদাচ উত্তম ভক্তির অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইবে না; যেহেতু তথায় শৈথিল্য-নিবন্ধন উত্তমতার হানি হইয়া থাকে), (৯) "তদ্বসতিস্থলে প্রীতি" অর্থাৎ সাত্ত্বিক-বনবাস, রাজসিক গ্রামবাস বা স্ত্রী পুত্রাদির সহিত অবস্থান করিয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণের-পরগৃহব্রত ধর্ম্ম-যাজন, তামসিক-দ্যুতক্রীড়া দি স্থানে বাস কিম্বা ধামাপত্যবিগণের ন্যায় 'শ্রীধাম নবদ্বীপাদিতে বাস করিলে অর্থাৎ অর্জুনের সুবিধা হইবে'—এইরূপ 'তুর্কুচ্চি' পণিত্যাগ করিয়া চরিত্র-সেবায় নিমগ্ন-পরম ও কার্য্য-বসতিস্থলে সেবোন্মুখচিত্তে বাস-ই "ধর্ম্ম-বসতি-স্থলে প্রীতি।"

যে ভগবান্ পুরুষের সেবোন্মুখ-জিহ্বায় শুদ্ধ হরিনাম উদ্ভিত হওয়ায় স্বদয়বিক্রিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে উক্ত নববিধ লক্ষণ নিশ্চয়ই দেখা যাইবে, মৎসরতায়ুক্ত বৈষ্ণব-প্রায় প্রাকৃত ব্যক্তিগণের চিত্তে অপরাধ থাকায়

বহুবার ‘নাম’ (অর্থাৎ নামাপরাধ) গ্রহণেও নামমাধুর্যানুভবের অভাবে তাহাদের চিত্ত দ্রব হয় না; সুতরাং চিত্তবিক্রিচাপ্রকাশক ‘ক্ষান্তি’ প্রভৃতি নববিধ লক্ষণও তাহাদিগের মধ্যে দেখা যায় না। এইরূপ ব্যক্তিগণের অশ্রুপুলকাদি বাহ্যলক্ষণ থাকিলেও ইহাদিগের হৃদয় অপরাধহেতু পাষণ-তুল্য কঠিন, সুতরাং নিস্কার্য। কিন্তু সাধুসঙ্গের দ্বারা অনর্থ নিবৃত্ত হওয়ার পর ইহাদেরও চিত্ত নির্ভা; কৃতি প্রভৃতি ভূমিকায় আরুঢ় হইলে কালে চিত্তদ্রব হইতে পারে এবং তখনই চিত্তের কাঠিরূপ অপরাধ বিদূরিত হয়। কিন্তু তাহাদের চিত্তদ্রব হইলেও (অপরাধ-নিবন্ধন) চিত্তের কাঠিই থাকিয়া যায়, তাহাদিগকে দুরারোগ্য জানিতে হইবে। (ক্রমশঃ)

সনাতন ধর্ম

আমরা ভারতবাসী, সাধারণতঃ সনাতন ধর্মাবলম্বী বলিয়া জগতে পরিচয় দিয়া থাকি। কিন্তু হৃৎকের বিষয় এই যে আমাদের অধিকাংশই সনাতন ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ বিষয়ে অনভিজ্ঞ। সনাতন শব্দের প্রকৃত অর্থটাও আমরা অহুধাবন করি না। কেবলমাত্র গতানুতিকভাবে কতকগুলি বাহ্যিক অহুষ্ঠানের অনুবর্তন করিয়াই আমরা সনাতনী বলিয়া গর্ব অনুভব করি।

সনাতন শব্দের অভিজ্ঞান লাভ করিলে অসনাতন শব্দেরও অভিজ্ঞান লাভ করা যায়। যাহা সনাতন তাহা কছু অসনাতন নহে এবং অসনাতন যাহা তাহাও কছু সনাতন নহে। যাহা নিতাস্থিতিশীল, অপরিবর্তনীয় ও অবিনাশী তাহাকে সনাতন বলা হয়। ইহার বিপরীত যাহা তাহাই অসনাতন। সুতরাং কেবলমাত্র সনাতন বস্তুর ধর্ম বা স্বভাবকে সনাতন ধর্ম বলা হয়, অসনাতন বস্তুর ধর্ম কখনও সনাতন ধর্ম নহে।

আত্মা এবং আত্মার বাহ্যবরণ স্কুল শূন্য দেহদ্বয় এক জাতীয় বস্তু নহে। আত্মা চেতন ও সনাতন। স্কুল শূন্য দেহদ্বয় অচেতন ও অসনাতন। শরীর পরিবর্তিত হইলে আত্মা পরিবর্তিত হয় না। শরীর ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে আত্মা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আত্মাকেই সনাতন বলিয়াছেন। যথা—“ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নাশং ভুত ভবিতা বা ন ভুতঃ।

অজো নিত্যঃ শাস্বতোহয়ং পূবাণো ন ভুক্ততে হহমানো শরীরে ॥

নৈনং ছিন্দ্ৰতি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ ।

ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥

অচ্ছেদ্যোহমদাহোহমক্লেদ্যোহশোষ্য এব চ ।

নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাপুচলোহয়ং সনাতনঃ ॥" (গীতা ২'২০, ২২৩-২৪)

অর্থাৎ জীবাত্মা অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, নিত্য অর্থাৎ সকল কালেই বর্তমান; তাহার জন্ম-মৃত্যু নাই অথবা তাঁহার পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি কি বৃদ্ধি প্রভৃতি নাই। তিনি পুরাতন অথচ নিত্য নবীন; জন্মমরণশীল শরীরের বিয়োগে তিনি হত হন না। তিনি অস্ত্রশস্ত্রাদিতে ছিন্ন হন না, অগ্নিতে দহ্য হন না, জলে ক্লেদিত হন না এবং বায়ু-দ্বারাও শুষ্ক হন না। এই জীবাত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য ও অশোষ্য; ইনি নিত্য, সর্বগত অর্থাৎ সর্ববোনিভ্রমী, স্থাপু ও অচল, ইনি সনাতন অর্থাৎ সদা বিद्यমান।

স্থূল ও সূক্ষ্মদেহদ্বয়কে গীতা অপরা অর্থাৎ জড়শক্তি সম্বৃত বলিয়াছেন—

“ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ ।

অহঙ্কার ইতীযং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টবা ॥

অপরেয়মিতত্ত্বত্বাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।

জীবভূতাং মহাবাহো বরেদং ধার্যতে জগৎ ॥ (গীঃ ৭।৪-৫)

অর্থাৎ ক্রীড়গবানের যে নিত্য-স্বরূপ তাহাতে তাঁহার শক্তির দুই প্রকার পরিচয় আছে; শক্তির একটি পরিচয়ের নাম—বহিরঙ্গ বা যারাজক্তি তাঁহাকে ‘অপরা শক্তি’ও বলা যায়। ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই অপরা শক্তি-জাত। এতদ্ব্যতীত তাঁহার একটি ‘তটস্থ-প্রকৃতি’ আছে, যাহাকে ‘পরা-প্রকৃতি’ বলা যায়। সেই প্রকৃতি—চৈতন্যস্বরূপা ও জীবভূতা; সেই শক্তি হইতে সমস্ত জীব নিঃসৃত হইয়া এই জড়জগৎকে চৈতন্যবিশিষ্ট করিয়াছে।

সুতরাং স্থূলদেহ পঞ্চভূতনির্মিত এবং সূক্ষ্মদেহ মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার সম্বৃত হওয়ার ইহার পরিবর্তনশীল; নিত্য নহে। এই অনিত্য শরীরকে উদ্দেশ্য করিয়া যে ধর্ম বিহিত হয় তাহা অনিত্য বা অসনাতন। পিতা, মাতা, আত্মীয়-স্বজন, দেশবাসী প্রভৃতির প্রতি কর্তব্য এই শরীরকে উদ্দেশ্য করিয়াই জাত হয়। আমাদের শরীর ইহাদের সহায়তায় রক্ষিত এবং বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া আমরা কৃতজ্ঞতাপূর্বে ইহাদের প্রীতি বিধান করিয়া থাকি। দেবভাগ্য বায়ু, জল, বোদ্ধ; বুদ্ধি এবং নানাপ্রকার শরীর

রক্ষণীয় বস্তু প্রদান করেন বলিয়া আমরা তাঁহাদের পূজা করিয়া থাকি। তাঁহারা আশাধিককে জাগতিক বস্তু প্রদান করত আমাদের শারীরিক ও মানসিক সুখ বিধান করেন বলিয়া আমরা তাঁহাদের আরাধনা করি। সুতরাং এ সমস্ত দৈহিক অনিত্য ধর্ম। আমরা নানাপ্রকার দেবদেবী প্রভৃতির পূজা করিয়া সনাতন ধর্ম পালন করিতেছি মনে করিয়া থাকি; কিন্তু ইহা দ্বারা অসনাতন দেহেরই অংশীলন হওয়া হেতু ইহা প্রকৃত সনাতন ধর্ম নহে। “কামৈতৈত্তৈহুতজ্ঞানাঃ প্রপত্ত্বন্তেহন্যদেবতাঃ।

তং ভং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্য নিয়তাঃ স্বয়া ॥” (গী: ৭-২০)

হুতজ্ঞান অর্থাৎ যখন আমাদের চিত্তে ভোগবাসনা প্রাবল্য লাভ করে তখন আমরা আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া পড়ি। সুতরাং আত্মধর্ম যে নিকাম বিষ্ণুসেবা তাহাও সঙ্গে সঙ্গে বিস্মৃত হই। তখন হুল নৃসিংহের কামনামূলে সেই সেই কামনা পরিপূরণকারী আধিকারিক দেবতার উপাসনা করি। ইহা হুল ও নৃসিংহের পর আরাধনা হইয়া যাওয়ায় ইহা অসনাতন ধর্ম, প্রকৃত সনাতন ধর্ম বা আত্মধর্ম নহে।

কিন্তু কামনামূল্য বিষ্ণুসেবা অর্থাৎ একমাত্র বিষ্ণুর শ্রীতির ইন্দ্রেশেই বিষ্ণুসেবা সনাতন ধর্ম। বিষ্ণু পরিপূর্ণ চেতন বস্তু এবং ইহা তাঁহারই ক্ষুদ্র অংশ। যথা—“মমৈবংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।” (গী: ১৫-৭)

অর্থাৎ জীবসকল আমারই অংশ (নিমিত্তাংশ) ও নিত্য।

বিষ্ণু শক্তিমান, জীবাত্মা তাঁহারই শক্তি। “অপরেয়মিতত্ত্বাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্”—এই গীতাবাক্য হইতে তাহা আমরা পাইয়াছি। শক্তি সর্বদাই শক্তিমানের অধীন। শক্তিমান্ যাহা ইচ্ছা করেন শক্তি তাহা সম্পাদন করিয়া শক্তিমান্কেই আনন্দ দিয়া থাকেন। এই কার্য্য করিয়া শক্তি শক্তিমানের নিকট হইতে কোনপ্রকার বিনিময় প্রত্যাশা করেন না। সুতরাং এই শক্তিস্বলীঃ চেতন জীবাত্মার বা সনাতন জীবাত্মার যে বিষ্ণু-সেবা, তাহাতে বিষ্ণুসেবা ব্যতীত অন্য কোন প্রকার কামনা বা অন্যাভিলাষ থাকিতে পারে না। এইরূপ অন্যাভিলাষিতামূল্য ভগবত্তত্ত্বই সনাতন ধর্ম।

“স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে।

অহিতুকা প্রতিহতা যদায়া সুপ্রসীদতি ॥” (ভা: ১২।১)

অর্থাৎ যাহা হইতে ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত শ্রীকৃষ্ণে শ্রবণাদি-লক্ষণা ফলাভি-সন্ধানরহিত। ঐকান্তিকী স্বাভাবিকী নিরপেক্ষা ভক্তি হয়, তাহাই মানবগণের সর্গশ্রেষ্ঠ ধর্ম। সেই ভক্তিবলে অনর্থ উপশান্ত হইয়া আত্মা সম্যকরূপে প্রসন্নতা লাভ করে।

—সম্পাদক

শ্রীশ্রী গুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

ন বৈ পুংনাং পরো ধন্যো যতো ভাক্তরধোক্ষজে ।



অহৈতুকাপ্রতিহতা যয়াক্ষা হুপ্রসীদতি ।

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিষমশূন্য ।

অন্য ধর্ম হুত্বরূপে গালে বেই জন ।
হরি-কথায় রতিনৈলে পণ্ড সেই শ্রম ।

৩২শ বর্ষ

২২ চন্দ্রীকেশ, অনির্কল্প, ৪২৪ গোরাঙ্গ
৩১ ভাদ্র, বিবাব, ১৩৮৭ : ইং ১৭৮১ : ১৮০

৭ম সংখ্যা

সান্নিধ্য

শ্রীজগন্নাথ-ভোজন

[শ্রীকান্দে উৎকলখণ্ডে সপ্তবিংশ-অধ্যায়ে]

[চিত্রাক্ষা প্রযযৌ শীঘ্রং নারায়ণরথন্ততঃ ।

প্রবিপতা জগন্নাথঃ ত্রিঃ পরীতা পিতামহঃ ॥১৩॥

আনন্দদিক্কদময়ঃ শলোমাঞ্চবপুঃ ধরম্ ।

স্বমাত্মানং ননামাথ সপ্রত্যক্ষং সঙ্গদাদম্ ॥১৪॥]

[কমলহোনি পিতামহ ব্রহ্মা (রাজা ইন্দ্রজাম্ববন্ত) এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ ভগবান্ নারায়ণের রথ-সমীপে গমন করিলেন এবং সেই জগন্নাথ ভরিকে বারজয় প্রদক্ষিণ ও প্রণামপূর্বক আনন্দমাগরে ভাসমান ও রোমাঞ্চিত কলেবর হইয়া আত্মপুরুষ প্রত্যক্ষভূত সেই ভগবান্কে গদগদ-স্বরে এইরূপে স্তুতিবাদের সহিত প্রণাম করিতে লাগিলেন ॥১৩-১৪॥]

বিষয়ানন্দমখিলং সহজানন্দরূপিণঃ ।

অংশং তবোপজীবন্তি যেন জীবন্তি জন্তবঃ ॥১॥

(হে ভগবন্!) সমুদয় জন্তুগণই সহজ আনন্দরূপী আপনার অধি-
বিষয়ানন্দ-কণা আশ্রয় করিয়া জীবিত রহিয়াছে ॥১॥

গুণাতীত গুণাধার ত্রিণাত্মনমোহস্ত তে ।

তন্মায়য়া মোহিতোহুং সৃষ্টিমাত্রপরায়ণঃ ॥২॥

হে ত্রিগুণাত্মন! আপনি সজ্জাদি গুণত্রয়ের আধার হইয়াও ত্রিগুণাতীত ;
অতএব আপনাকে নমস্কার ॥২॥

নমো দেবাধিদেবায় দেবদেবায় তে নমঃ ।

দিব্যাদিব্যস্বরূপায় দিব্যরূপায় তে নমঃ ॥৩॥

প্রভো! আপনি অখিল দেবগণেরও আরাধ্য দেবতা ও অধিদেবতা,
আপনি দিব্যরূপী অথচ দিব্যা-দিব্য-স্বরূপ; অতএব আপনাকে বারম্বার
নমস্কার ॥৩॥

জরামৃত্যুবিহীনায় মৃত্যুরূপায় তে নমঃ ।

জলদগ্নিস্বরূপায় মৃত্যোরপি চ মৃত্যবে ॥৪॥

আপনি জরা-মৃত্যুবিহীন ও মৃত্যুরূপী; আপনাকে নমস্কার। মনীষিগণ
আপনাকে জলদগ্নি-স্বরূপ তেজোময়; মৃত্যুরও মৃত্যুস্বরূপ বলিয়া কীৰ্ত্তন
করেন ॥৪॥

প্রপন্ন-মৃত্যু-নাশায় সহজানন্দরূপিণে ।

ভক্তপ্রিয়ায় জগতাং মাত্রে পিত্রে নমো নমঃ ॥৫॥

হে দেব! আপনি সহজ আনন্দময়, শরণাগত ব্যক্তিগণের মৃত্যু-বিনাশন,
ভক্তগণের প্রিয় এবং নিখিল জগতের পিতা-মাতা; অতএব আপনাকে
পুনঃ পুনঃ প্রণিপাত করি ॥৫॥

নমো নমস্তে জগদেকবন্দ্য, সুরাসুরাভ্যাজিতপাদপদ্ম ।

নমো নমস্তাপহরৈকচন্দ্র, নমো নমঃ সান্দ্রসুধোষসান্দ্র ॥৬॥

দেব! আপনি অখিল জগতের একমাত্র আরাধ্য, এজন্য সুরাসুরগণ
সতত আপনার পাদপদ্মের অর্চনা করিয়া থাকে। নাথ! এই বিশ্বনাগরে
একমাত্র আপনিই সান্দ্রসুধাধার সন্তাপহর অদ্বিতীয় সুখাংগুস্বরূপ; অতএব
আপনাকে পুনঃ পুনঃ অসীম নমস্কার ॥৬॥

নমো নমঃ কম্পনদূরভূত, দুঃপ্রাপ-কামপ্রদ-কল্পবৃক্ষ ।

দীনশরণ্য প্রণতৈকহুঃখ-সংযোদ্ধতো নিত্যসুবদ্বপক্ষ ॥৭॥

হে দীনবন্ধো ! আপনি দীনগণের দুর্লভ কামপ্রদ অকম্পন কল্পবৃক্ষ-
স্বরূপ এবং দীন নিরাশ্রয় প্রণত ভক্তগণের অসীম ক্লেশরাশি নিবারণে
সতত সমুদ্রত ; অতএব আপনাকে বাবস্থার প্রণাম করি ॥৭॥

প্রসীদ জগতাং নাথ মগ্নানাং হুঃখসাগরে ।

কটাক্ষলীলাপাতেন ত্রায়স্ব করুণাকর ॥৮॥

নাথ ! দুঃখসাগরে নিমগ্ন জগৎসবী জীবগণের প্রতি আপনি প্রসন্ন
হউন । হে করুণাকর ! করুণা প্রকাশ করিয়া করুণা-কটাক্ষপাতে
জগৎসবীকে পরিত্রাণ করুন ॥৮॥

চাতুৰ্মাস্ত

সৰ্ব-শাস্ত্রেই চাতুৰ্মাস্তের উল্লেখ

বেদ-শাস্ত্রে অনেক স্থলে চাতুৰ্মাস্ত-যাজির কথা এবং চাতুৰ্মাস্তে
কৰ্ম্মাঙ্গত উল্লিখিত আছে । ধৰ্ম্ম-শাস্ত্রেও সংকৰ্ম্মীর চাতুৰ্মাস্ত-ব্যবস্থার
অভাব নাই । পুরাণের মধ্যেও নানা স্থলে চাতুৰ্মাস্ত ব্রতের কথা দেখিতে
পাওয়া যায় ।

আধুনিক স্মৃতি-নিবন্ধেও চাতুৰ্মাস্ত-বিধান, পরমার্থী ও স্মার্তগণের
অপরিচিত নহে । পরমার্থস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাস অথবা রঘুনন্দনের
কৃত্যতত্ত্বেও আমরা চাতুৰ্মাস্ত-ব্রতের কথা দেখিতে পাই ।

কন্মী, জ্ঞানী—একদণ্ডী ভক্ত—ত্রিদণ্ডী সকলের জগুই

চাতুৰ্মাস্ত ব্রত

কৰ্ম্মকাণ্ডীয় বিচারেই যে কেবল চাতুৰ্মাস্ত-যাজির ফল কথিত হইয়াছে,
একরূপ নহে । কাঠক গৃহসূত্রেও আমরা যতিধৰ্ম্ম নিক্রপণে পাঠ করি যে,—

“একরাত্রং বসেদ্ গ্রামে নগরে পঞ্চরাত্রকম্ ।

বর্ষাভ্যোহিন্যত্র বর্ষাস্ত্র মাসাংশচ চতুরো বসেৎ ॥”

একদণ্ডী জ্ঞানীগণ ও ত্রিদণ্ডী ভক্তগণ উভয়ই চাতুৰ্মাস্ত ব্রত
ধারণ করেন । শ্রীশঙ্কর-মতাবলম্বিগণের মধ্যে চাতুৰ্মাস্ত ব্রতের ব্যবস্থা
আছে ।

শ্রীগৌরসুন্দরের চাতুর্নাম্য

শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরও চাতুর্নাম্য উপস্থিত হইলে কাবেড়িতে শ্রীরঙ্গ-মন্দিরে চারিমাস-কাল বাস করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় ভক্ত-গণ চারিমাস-কাল ঐশীলাচলে শ্রীগৌরপাদপদ্মে প্রত্যেক বৎসরেই গমন করিতেন ও তথায় তাঁহাদের অবস্থানের কথা লীলা-লেখকগণের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

চারি আশ্রমের হিন্দুমাত্রেই চাতুর্নাম্য ব্রত

চারি প্রকার আশ্রমেই চাতুর্নাম্য ব্রত গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। কট্টসাধ্য বসিয়া ঐসকল প্রাচীন রীতি ক্রমশঃ সমাজ-বন্ধ হইতে সুদূরে চলিয়া যাইতেছে। ফলকাম্য কনিগণে অথবা নিষ্কাম ভক্ত-সম্প্রদায়ে ব্রত-পালনের অনুষ্ঠান কিছু কিছু ভিন্ন হইলেও ব্রতের সম্মান হিন্দুমাত্রেই সকলেই করিয়া থাকেন।

চাতুর্নাম্যে ভোগ-পরিভাগের আদর্শ

ইহাতে ভোগ-ত্যাগের বিধান পূর্ণমাত্রায় অভিব্যক্ত হইয়াছে। ভোগ-ত্যাগ-বিধান—কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত ত্রিবিধ সমাজেই সমধিক আদরের বস্তু। সুতরাং ত্রিবিধ পথাবলম্বী আর্ধ্যগণ সকলেই চারি আশ্রমে চাতুর্নাম্যের সম্মান করেন। বাহ্য বা নিত্যস্থ অসমর্থ, তাঁহারা সুদীর্ঘকাল নিঃসের অধীন হওয়া সুবিধাজনক মনে না করায় ক্রমশঃ ঐসকল ব্রতাদিতে শিথিলভাব প্রদর্শন করিয়াছেন।

গৃহস্থের ভোগ—ত্যাগেরই উদ্দেশ্যে

আশ্রম-চতুষ্টয়ের মধ্যে তিনটি আশ্রমে অর্থাৎ ব্রহ্মচরী, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুর আশ্রমে ভোগ-মাহাত্ম্য নাই। কেবল গৃহস্থের কর্তব্য-পালন-বিষয়ে যে নির্দিষ্ট ভোগের ভাব আদিষ্ট আছে, তাহাও ভোগ-ত্যাগের উদ্দেশ্যে। বাহ্য বা আটমাস কালের মধ্যে গৃহধর্ম্ম পালন করিবার মধ্যে অধিকার পান, তাঁহাও বৎসরের বর্ষাকাল বা চারিমাস ভোগ-ত্যাগ-বিধি পালন করিয়া অবশিষ্ট আশ্রমিগণের সহ তান্ত্রভোগ হইয়া বাস করেন।

অসমর্থ-পক্ষে কার্ত্তিক অর্থাৎ উর্জ্জা-বিধি পালন কর্তব্য

যিনি চারিমাস কাল নিয়মসেবা পালন করিতে অসমর্থ, তাঁহারাও কেবল উর্জ্জাবিধি বা কার্ত্তিক মংসে বিশেষভাবে নিয়ম-সেবা পালন করাই

বিধি। শুভ্রগণ কেহ কেহ চাতুৰ্মাস্ত্র-ব্রত গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া কেবল দামোদর-ব্রত গ্রহণ করেন, তাহা দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, শুভ্রগণের চাতুৰ্মাস্ত্র-বিধানের আবশ্যিকতা নাই। ইহা অসমর্থের অনুরক্ত বিধিভাঙ্গ। চারিমাস-কাল নিয়মাবলী হইয়া হরিসেবা করিলে নিদর্শনঃ মনের মধ্যে হরিসেবন-প্রবৃত্তি দেখা দিবে। জীব নৈসর্গিক হরি-স্মরণতা প্রদর্শন করিতে পারিবেন।

চাতুৰ্মাস্ত্রের কাল নিরূপণ

চাতুৰ্মাস্ত্রের কাল বরাহ-পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে,—

“আষাঢ়-শুক্রদ্বাদশ্যাং পৌৰ্ণমাস্ত্রামথাপি বা।

চাতুৰ্মাস্ত্র-ব্রতঃশুং কুর্য্যাৎ কর্কট-সংক্রমে ॥

অভাবে তু তুলার্কহপি যত্নেণ নিয়মং ব্রতী।

কার্ত্তিকে শুক্রদ্বাদশ্যাং বিধিবন্তং সমাপয়েৎ ॥”

আষাঢ় মাসে শুক্র দ্বাদশী তিথি হইতে কার্ত্তিকের শুক্রদ্বাদশী পর্যন্ত চারিটি চান্দ্রমাসে এই ব্রত-নিয়ম পালন করিবে। অথবা আষাঢ়-পূর্ণিমা হইতে কার্ত্তিক-পূর্ণিমা পর্যন্ত চারিটি চান্দ্রমাস-কাল এই ব্রতের সময়। অথবা কর্কট-সংক্রান্তি অর্থাৎ সৌর-শ্রাবণ হইতে সৌর-কার্ত্তিক শেষ পর্যন্ত চাতুৰ্মাস্ত্র ব্রতের কাল। , যাহারা চারিমাস কাল উপরি লিখিত তিন প্রকার বিচার অবলম্বনে চাতুৰ্মাস্ত্র-ব্রতে অসমর্থ তাহারা নিয়ম-সেবা-পালনপর হইয়া কার্ত্তিক মাসে স্বীয় মন্ত্র-জপাদি দ্বারা বিধিপূর্বক ব্রত গ্রহণ করিবেন। উক্তব্রত বিশেষতঃ কর্তব্য, ইহা চতুঃষষ্টি প্রকার শুভ্যজ্ঞের অত্যন্তম বলিয়াও উল্লিখিত আছে। কার্ত্তিক শুক্র দ্বাদশী হইতে ব্রত পরিহার করিতে আরম্ভ করিবেন অর্থাৎ পঞ্চবিংশ দিবস অবশুই ব্রত পালন করিবেন।

হরি-শয়নে চাতুৰ্মাস্ত্র ব্রতের অকরণে প্রত্যাবায়

শ্রীভগবান্ বর্ষার চারিমাস-কাল শয়ন করেন। সেই শয়নকালে কৃষ্ণ-সেবা-প্রবৃত্তি বৃদ্ধির জন্য চাতুৰ্মাস্ত্র-ব্রত গ্রহণ কর্তব্য। ইহা নিত্য ব্রত। ব্রতের অকরণে প্রত্যাবায় আছে। শাস্ত্র বলেন,—

গণ্ডে ভায় জগন্নাথ জগৎ সুপুং ভবেদিদম্।

বিবুদ্ধে তু বিবুদ্ধোত প্রসলোমে ভবাচ্যুত ॥

ইত্যাদ্যন্ত প্রভোবগ্নে গৃহীতান্নিয়মং ব্রতী।

চাতুর্মাস্যেব কৰ্ত্তব্যং কৃষ্ণভক্তিবিবৃদ্ধয়ে ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১৫।৫৯)

অর্থাৎ, ব্রতী ব্যক্তি “হে জগন্নাথ ! আপনি শমন করিলে এই জগৎ স্তম্ভ হয় এবং আপনার আগরণে জগৎ জাগরিত হয়। হে অচ্যুত ! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন” — এইরূপ আশ্বাস করিয়া প্রভুর অংশ কৃষ্ণভক্তি-বৃদ্ধির নিমিত্ত চারিমাসে কৰ্ত্তব্য-কার্যের নিয়ম গ্রহণ করিবেন।

যো বিনা নিয়মং মৰ্ত্তো ব্রতং বা জপ্যমেব বা।

চাতুর্মাস্যং নয়েন্মূৰ্খো জীবন্নপি মৃতো হি সঃ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১৫।৬০ সংখ্যা-স্বত স্কন্দপুরাণ-বচন)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিয়ম, ব্রত কিম্বা জপ ব্যক্তিরেকে চাতুর্মাস্যাদি যাগন করে, সে মূৰ্খ এবং জীবিত অবস্থায়ই মৃততুল্য।

ব্রতে গ্রহণীয় ও বর্জ্যনীয়

ব্রতের গ্রহণীয় বিধিতে—ভগবানের নিকট, সেবা ও জপ-সঙ্কীৰ্ত্তনাদি।
ক্ৰা পুরাণ ব্রহ্ম-নারদ সংবাদে,—

জপ-হোমাস্তমুষ্ঠানং নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনস্তথা।

খীকৃত্য প্রার্থয়েদেবং গৃহীতনিয়মো বুধঃ ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১৫।৬৫)

অর্থাৎ নিয়মধারী পণ্ডিত ব্যক্তি জপ, হোমাদির অনুষ্ঠান এবং সঙ্কীৰ্ত্তন স্বীকার করিয়া ভগবানের নিকট “হে দেব ! আপনার অগ্রে এই ব্রত গ্রহণ করিলাম। হে কেশব ! আপনার অনুগ্রহে ইহা নির্বিন্দে দিক্টি-প্রাপ্ত হউক” — এইরূপ প্রার্থনা করিবেন।

চাতুর্মাস্য-ব্রতের বর্জ্যনীয় বিচারে লিখিয়াছেন,—

প্রাৰ্ণে বর্জ্যেচ্ছাকং দধি ভাজপদে তথা।

দুগ্ধমাশ্ববুজে মাসি কার্ত্তিকে চামিষং ত্যজেৎ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১৫।৬১ সংখ্যা-স্বত স্কন্দপুরাণ-বচন)

চাতুর্মাস্যের প্রথম মাসে শাক, ভাদ্র মাসে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ এবং কার্ত্তিকে আমিষ বর্জন করিবে। শাক বলিতে কেহ কেহ পক্ষ বাজ্যনকে বুঝিয়া থাকেন। ভোগভাগ করিয়া হরি-সঙ্কীৰ্ত্তনই উদ্দিষ্ট।

“কুচং তত্ত্বকাল-লভাং ফণ-বুলাদি বর্জয়েৎ।”

কালোচিত ফলযূল বাহার আদানে জীবের লোভ হয় এবং হরি-বিস্মৃতি ঘটে তাহা প্রচুর পরিমাণে সেবা করিলে ক্ষুদ্রবস্তুতে অতিরিক্ত

অভিনিবেশ হয়; সুতরাং তাহা চাতুৰ্মাস্ত্রে বর্জন করিয়া সংযত হইয়া হরি-কীৰ্ত্তন করিবে।

হরি-শয়নে নিষ্পাব বা সীম, রাজমাষ বা বরবটী, কলিঙ্গ বা ইল্লম্ব, পটোল, বেগুন এবং পয়ূষিত বা বাসি দ্রব্য গ্রহণ করিবে না। সাদা বেগুন বা সাহেব-বেগুন অশুদ্ধ, তাহাই সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। সমর্থ-পক্ষে পটোল, বেগুন প্রভৃতি অখময় খাদ্যও ত্যাগ করিবে।

অসমর্থ-পক্ষে রুচির অনুকূল বিষয়-সঙ্কোচনই-

হরিসেবায় উৎসাহ-বর্দ্ধক

নানাপ্রকার ত্যাগ একাধারে সম্ভবপর নহে; শুদ্ধন্য সমর্থপক্ষে যতগুলি ত্যাগ করিতে পারা যায়, তাহাই ত্যাগ করিতে হইবে। কষ্টিগণ ভোগ-পর, তজ্জাত ত্যাগের ফল প্রভৃতি যোচনার্থ কথিত হইয়াছে। মোটের উপর, ত্যাগদ্বারা অভিনিবেশ স্তম্ভ হইলে ভগবৎসুখতার অযোগ উপস্থিত হয়। আনন্দধর্ম বা নিত্য হরিসেবন-ধর্ম প্রস্তুতি করিতে হইলে রুচির অনুকূল দেহ ও মনের ধর্ম যতটা সংকোচ করিতে পারা যায়, ততই হরিসেবায় উৎসাহ বৃদ্ধি হইবে।

সমর্থ-পক্ষে ব্রত-পালনের বিধিসমূহ

চাতুৰ্মাস্য-কালে সম্ভবপর হইলে ব্রতী একবার মাত্র প্রসাদ পাইবেন, প্রত্যহ দ্বান করিবেন, হরিনিষ্ঠ হইবেন ও চারিমাস হরির অর্চন করিবেন। হরি-শয়ন-কালে বিলাস শয্যাাদি গ্রহণ নিষিদ্ধ, ভূমিশায়ী হওয়াই শ্রেয়ঃ।

ব্রতী যোগাভ্যাস করিবেন। সকল যোগের মধ্যে ভক্তিযোগই প্রশস্ত, যেহেতু উহাই আত্মার নিত্যবৃত্তি। রাজযোগ বা জ্ঞানযোগ—মনের অনিত্য-বৃত্তি এবং কর্মযোগ বা হঠযোগ—দেহ ও কিঞ্চিদানস বৃত্তিময় অর্থাৎ অনিত্য।

চারিমাস কাল যৌনব্রত গ্রহণ করিলে কেবল অবিমিশ্র হরি-কীৰ্ত্তনের অযোগ পাওয়া যায়। পাত্র-রহিত হইয়া ভূমিতে ভোজন করিলে স্বাভাবিক হরি-সেবনোচিত দৈন্য উপস্থিত হয়। ভজনের সুষ্ঠুতায় ব্যাঘাত হয় না। অনুকূল-জানে ভক্তের চাতুৰ্মাস্য-বিধি ভজনের সহায় জানিতে হইবে। হরি-শয়ন কালে নিয়মে অবস্থান করা—বিধিশাস্ত্রের আদেশ।

তস্মিন্ কালে চ মন্ত্রকো যো মাসাংশচতুরঃ ক্ষিপেৎ।

ব্রতৈরনৈকৈর্নিয়মৈঃ পাণ্ডব শ্রেষ্ঠমানবঃ ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১৫।৭৩)

হে পাণ্ডব ! ঐকালে (শ্রীভগবানের চারিমান কাল শরন-সময়ে) আমার যে-ভক্ত বহু বহু ব্রত-নিয়মদ্বারা উক্ত চারিমান কাল ক্ষেপণ করেন, তাহারাই মানবশ্রেষ্ঠ ।

এতদ্ব্যতীত নক্তভোজন, পক্ষগব্যাহন, তীর্থস্নান, অযাচিত ভোজন, হরিমন্দিরে গীতবাচ্য, শাস্ত্রাভ্যাসাদি-দ্বারা লোক-প্রমোদন, অতৈলস্নান প্রভৃতিও চাতুর্মাস্যে নিয়মরূপে গ্রহণ করা যাঁহতে পারে ।

সমর্থবান্ পক্ষে অন্ন-পালনের নিষেধসমূহ

সমর্থবান্ ব্রতী লবণ, তৈল, মধু, পুষ্পোপভোগ ত্যাগ করিবেন । সকল রস—কটু, অম্ল, তিক্ত, মধুর, ক্ষার, কষায় বর্জন করিবেন ।

চাতুর্মাস্যে তাখুল সেবা করা তাবিধেয় । সমর্থবান্ গন্ধদ্রব্য গ্রহণ করেন না । দধি-জ্বল-তক্র পরিভ্যাগ করিতে পারেন । স্থালীপাক বর্জন চাতুর্মাস্যে বিধেয় । খুরা, মধু, মাংস, প্রভৃতি পরিবর্জনীয় । সমর্থবান্ একদিবস অন্তর একদিবস উপবাস করিবেন । লবণোমাদির ক্ষৌর-কার্য্য হরিশয়নে করিতে নাই । ক্ষৌরকার্য্যে ভক্ততা বা বিলাসিতা উপাশ্রিত হয় ।

কৃষ্ণসেবা-তাৎপর্য্যই চাতুর্মাস্যের ফল

ফলসমূহ কাম্যের কশ্মিরগণের কুস্ত্র ; জ্ঞানী বা ভক্তগণের লৌকিক ও পারত্রিক ফলের আবশ্যকতা নাই । মুমুক্শু জ্ঞানিগণের মুক্তি ফলও ভক্তের বর্জনীয় । জগদন্তুষ্টি হইলে মোক্ষবাসনা লঘু হইয়া পড়ে । সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণসেবা তাৎপর্য হইতে পারিলেই চাতুর্মাস্যের চরম ফল লাভ হয় ।

— শ্রীল প্রভুপাদ

মনুষ্য-সমাজ ও বৈষ্ণব-ধর্ম্ম (২)

মুক্তজীবের শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম বদ্ধ-জীবে বিকৃত

আমরা বারবার বলিতেছি যে, —যাহাকে পবিত্র জৈবধর্ম্ম বলে, তাহারই নাম বৈষ্ণবধর্ম্ম । জীবের নিত্যধর্ম্মের নাম—জৈবধর্ম্ম । জীব যখন উপাধিশূন্য হয়, তখন তাহার স্বরূপ—শুদ্ধ চিন্ময় । তখন তাহার নিত্যধর্ম্ম কি ?—নিরুপাধিক প্রেম । যখন জড়গ্রন্থিরূপ উপাধিযুক্ত হয়, তখন তাহার ধর্ম্ম—বিকৃতপ্রেম বা জড়োপাধি-মিশ্রিত প্রেম । শুদ্ধ জীবের বৈষ্ণবধর্ম্ম বদ্ধজীবে অনেকটা বিকৃতভাবে প্রকাশ পায় ।

স্ব-স্বরূপ লাভ করিতে হইলেও জড়বিধি অপরিহার্য

বদ্ধজীব জড়দেহে আবদ্ধ হইয়া জড়বিধির অধীন। শাণ্ডিলিক, মানসিক ও সামাজিক যতপ্রকার বিধি আছে, সকলই জড়বিধিময়। জড়-সম্বন্ধ ভাগ করিয়া স্ব-স্বরূপ লাভ করিতে হইলেও জড়বিধি সহসা পরিত্যক্ত হইতে পারে না। এই জড়শরীরে অবস্থিত হইয়াই জীবকে জড়ত্যাগের উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। জড়-সম্বন্ধ ভাল নয় বলিয়া জড়দেহ পাশ করিলে কোন লাভ হইবে না। বরং আত্মগত প্রাপ্তি অধিকতর বন্ধনের আশঙ্কা আছে। অতএব স্ব-স্বরূপ-লাভেচ্ছু জীবের পক্ষে দেহরক্ষার কার্য নিত্য প্রয়োজন। কেবল দেহরক্ষা নয়, দেহের পুষ্টিবর্ধন ও দৈহিক নানাবিধ অঙ্গাঙ্গ নিবৃত্তির জন্য যত্ন করা আবশ্যিক।

নিষ্পাপ দেহ-যাত্রার আশ্রম ও সমাজের আবশ্যিকতা

উত্তমরূপ দেহযাত্রা নির্বাহ করিতে হইলে অর্থোপার্জনের একটি উপায় অবলম্বন করিও নিত্য প্রয়োজন। দেহযাত্রা নিষ্পাপরূপে পরিচালিত হয় তজ্জন্য একটি আশ্রম ও সংসার স্বীকার করা আবশ্যিক। বিবাহিত হই বা গৃহে থাকুন বা অবিবাহিত অবস্থায় বৃহদ্রক্ষার্থ বা সন্ন্যাস-গ্রন্থন করুন, একটি আশ্রম অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। সেই আশ্রম-উপযোগী একটি সমাজকে অবশ্যই পত্তন করিতে হইবে। অতএব বিষয়ী, মুমুকু ও মুক্ত সকলেরই একটি একটি সমাজ আছে।

বিষয়ী, মুমুকু ও মুক্তভেদে সমাজ তিন প্রকার

কেহ কেহ মনে করেন যে, সামাজিক লোককে বৈষ্ণব বলা যায় না। —এরূপ সিদ্ধান্ত ভ্রম। সমাজ বাস্তবিক তিন প্রকার অর্থাৎ বিষয়ী-সমাজ, মুমুকু-সমাজ ও মুক্ত-সমাজ। জীব কোন সময়েই সমাজশূন্য হয় না। জীবের স্বভাব সামাজিক। জড়মুক্ত হইলে জীবের শুদ্ধ-ভক্ত-সমাজ অনিবার্য। অতএব জীব যেনই থাকুন, বা গৃহেই থাকুন, বা বৈকুণ্ঠে থাকুন, তিনি সর্বদাই সামাজিক। বৈষ্ণব-জীব ও ইতর-জীব ভেদ এই যে, বৈষ্ণব-জীবের বৈষ্ণব-সমাজ এবং ইতর-জীবের ইতর-সমাজ। এখানে একমাত্র সিদ্ধান্ত হইল যে, বৈষ্ণব-ধর্ম ও বৈষ্ণব-সমাজের কোন ভেদ নাই।

বৈষ্ণব-সমাজ ও ইতর-সমাজে ক্ষেদ

বৈষ্ণব-সমাজ ও ইতর-সমাজের ক্ষেদ এই যে, বৈষ্ণব-সমাজের একমাত্র চরম উদ্দেশ্য—ভগবৎপ্রেম এবং ইতর-সমাজের উদ্দেশ্য—স্বার্থপর কাম। ইতর-সমাজে বাহারা অবস্থিত, তাঁহারা দেহপুষ্টি, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি, নীতি, জড়ীয় বিজ্ঞান আলোচনা-দ্বারা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকারক বিষয়াবিস্কার এবং জড়ীয় ক্রেশের ক্ষণিক নিবৃত্তি—এইরূপ কার্য্যকেই জীবনের ও সমাজের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া জানেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ মরণান্তর সুখকে, কেহ কেহ পারিত্রিক ভোগকে এবং কেহ কেহ জীবের অস্তিত্ব নাশরূপ নির্ঝাণকে বহুমানন করিয়া থাকেন। বৈষ্ণব-সমাজস্থিত জীবসকল দেহপুষ্টি, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি, বিজ্ঞান, নীতি ও জড়সুখ-নিবৃত্তির দ্বারা ভগবৎপ্রীতি অনুশীলনের আনুকূল্য লাভ করেন। উভয় সমাজের আকৃতি এক, কিন্তু প্রকৃতি ভিন্ন।

বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থাই বদ্ধজীবের সামাজিক ব্যবস্থা

বাহারা সমাজ-বিজ্ঞান শব্দে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা এক বাক্যে ইহাই সিদ্ধান্ত করেন যে, বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থাই সর্বোৎকৃষ্ট সামাজিক ব্যবস্থা। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে অবস্থিত হইলে জীবের প্রকৃতি লোপ হইতে পারেনা এবং তৎসাহায্যে অনেক অবকাশ ও সুবিধার সহিত ভগবৎ-প্রেমালোচনার কার্য্য হইতে পারে। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মই বৈষ্ণবের বন্ধ-দশায় একমাত্র সমাজ। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম কি-প্রকার তাহা 'শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামূর্ত্তে' প্রথম ও দ্বিতীয় বৃষ্টিতে বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে। অতএব ঐ ধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব এক্ষেপে পুনরালোচিত হইল না। কেবল এই মাত্র জ্ঞাতব্য যে, মনুষ্য নিজের স্বভাববশতঃ একটী বর্ণ এবং অবস্থা-বশতঃ একটী আশ্রম স্বীকার করিয়া জীবন নির্বাহপূর্ব্বক দৈবরূপে পরিচুষ্ট করিবে। নানা কর্ম্ম ও 'ঘটনা-দ্বারা' স্বভাব নিম্নিত হয়; তন্মধ্যে জন্মও একটী 'ঘটনা'-বিশেষ।

জন্ম বা বংশক্রমে বর্ণ-নির্ণয়ে বর্ণাশ্রম অপদস্থ

ঘটনাক্রমে, আপাততঃ কেবল জন্ম-দ্বারা বর্ণ নির্ণীত হওয়ায় বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম অপদস্থ হইয়াছে। তাহাতে ফল এই হইয়াছে যে; ধর্ম্মে অবস্থিত ব্যক্তিগণের কোন কার্য্যের সাফল্য হয় না। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের এই প্রকার ব্যতিক্রম দৃষ্টি করিয়া অনেক সম্ভদর লোক ভারতের ভাবী মঙ্গলের বিষয়ে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছেন। এই জন্যই

কৃতবিদ্য ভারতবাসীগণ বর্ণ-ধর্মের উৎসন্ন করুনায় নানাবিধ চেষ্টা করিয়া থাকেন। আমরা দেখিতেছি; বর্ণধর্মের বিনাশ দ্বারা জগতের উন্নতি হইতে পারে না। বর্ণধর্মই সামাজিক মানবের জীবনস্বরূপ। বর্ণাশ্রম দূর হইলে মানবের বৈজ্ঞানিক সমাজ বিনষ্ট হইবে। মানব ‘পুনর্মুখিকো ভব’ এই পুণ্যতন আশ্রম প্রাপ্ত হইয়া স্বেচ্ছাচারী স্বেচ্ছ-দিগের ন্যায় অবৈধ জীবনের হ্রস্বতা লাভ করিবে। বর্ণাশ্রম-ধর্ম বিনাশ করা কোন ‘দেশহিতৈষী’ ব্যক্তির অভিপ্রেত নয়। বর্ণাশ্রম-ধর্ম যে মূল প্রবেশ করিয়াছে, তাহাই দূর করা কর্তব্য।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম পুনঃ সংস্থাপনের ১০টি উপায় নির্দেশ

বর্ণাশ্রম ধর্মকে পুনরায় স্বাস্থ্য-লক্ষণে আনিতে হইলে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিধিকে পুনঃ প্রচলিত করিতে হয়; যথা :—

- ১। কেবল জন্মবশতঃ কোন ব্যক্তির বর্ণ নির্ণয় করা হইবে না।
- ২। বাল্য-সঙ্গ ও জ্ঞান সংগ্রহক্রমে যে স্বভাব যাহাতে প্রবল দেখা যায়, সেই স্বভাব অনুসারে প্রতি ব্যক্তির বর্ণ নির্ণয় করা উচিত।
- ৩। বর্ণ নির্ণয় কালে স্বভাব ও রূপের সহিত পিতামাতার বর্ণ-সম্বন্ধ একটু বিচার করিয়া বর্ণনির্ণয় করিতে হইবে।
- ৪। পুরুষের উপযুক্ত বয়স হইলে অর্থাৎ ১৫ বৎসর বয়সের পর কুল-পুরোহিত, ভূস্বামী, পিতামাতা ও গ্রামস্থ কতিপয় নিঃস্বার্থ বিদ্বাবান ব্যক্তি বসিয়া বর্ণ নির্ণয় করিবেন।
- ৫। প্রাপ্ত-বয়স্ক পুরুষের কি বর্ণ হওয়া উচিত, এরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হইবে না। কিন্তু প্রাপ্ত-বয়স্ক পুরুষ পিতৃবর্ণ-প্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ করিয়াছে কিনা, এইরূপ প্রশ্ন উঠিবে।
- ৬। যদি দেখা যায় যে, পিতৃবর্ণের যোগ্যতা হইয়াছে, তদনুসরণ সংস্কার করা যাইবে। যদি দেখা যায়, উচ্চবর্ণ লাভের যোগ্যতা লাভ করিয়াছে, তাহাতেই তাহার সংস্কার হইবে। যদি দেখা যায় যে, পিতৃবর্ণের অধম বর্ণের উপোযোগিতা হইয়াছে, তবে বালককে আর দুই বৎসর সময় দেওয়া যাইবে।
- ৭। দুই বৎসরের পর পুনরায় পূর্ববৎ বিচারপূর্বক তাহার বর্ণ নির্ণয় হইবে।

- ৮। প্রতিগ্রামে একটি সমাজ-সংরক্ষক-বিধান ভূমায়ী ও পণ্ডিতগণ-কর্তৃক প্রচলিত রাখিতে হইবে।
- ৯। এই সমস্ত কার্য্য যথাবিধি প্রচলিত থাকে, তজ্জন্ত সম্রাটের সাহায্য লইতে হইবে। সম্রাটই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের রক্ষক।
- ১০। যাহার যে বর্ণ হইবে, তাহার তদনুরূপ বিবাহাদি সংস্কার ও অগ্ন্যাগ্নি অধিকার হইবে। তদব্যতিক্রমকারীর রাজদণ্ড বিধান করিতে হইবে।

বিশুদ্ধ বর্ণাশ্রম স্থাপনের বর্তমান প্রতিবন্ধক

এখন দেখা যাউক যে এইপ্রকার সমাজ-সংস্কার আদ্যকাল হইতে পাবে কিনা; আমাদের বিবেচনায় এক্ষণ কার্য্য হইবার সুবিধা নাই। আদৌ রাজ-সাহায্য পাওয়া কঠিন। দ্বিতীয়তঃ রাজ-সাহায্য পাওয়া গেলেও তাহা সইসা গ্রহণ করা উচিত নয়; যেহেতু রাজা যে-পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের আশ্রয়-গ্রহণ না করেন, সে-পর্য্যন্ত তাহার তদ্বিষয়ে নিরপেক্ষ সাহায্য পাওয়া অসম্ভব। নিরপেক্ষ এবং সকল সাহায্য বাঞ্ছিত এক্ষণ বহু সংস্কার কোনক্রমেই ঘটতে পারে না। ভারতবাসিদিগেরও এই বিষয়ে সম্যক সাহায্য পাইবার আশা নাই। স্বার্থপরতাক্রমে অনেকেই এই প্রার্থনায় পরিবর্তনে যত দিবেন না; বরং সংস্কার-সমন্বয়ে অনেক প্রকার ব্যাঘাত উপস্থিত করিবেন। নিম্ন-বর্ণের লোকেরা মূর্থতা ও অজ্ঞানতাবশতঃ বর্তমান কুসংস্কারকে সহসা পরিত্যাগে অক্ষম হইবে। অতএব কতিপয় মহদয় ব্যক্তি মিলিত হইলেও এই বহু কার্য্য সহসা ঘটনীয় নহে।

যে-স্বজ্ঞাব সাহায্যে প্রবল দেখা যায়, সেই অনুসারে প্রতি ব্যক্তির বর্ণ নির্ণয় করা উচিত।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বর্ণাশ্রম-স্থাপনের অসীম

আকাঙ্ক্ষা-সত্ত্বেও বিপদাশঙ্কা ও হতানাজ্ঞাপন

এখন দেখুন, দুই দিকেই বিপদ। একদিকে—কুসংস্কার কীট আমাদের সমাজকে নিঃসার করিতেছে। চূপ করিয়া থাকিলে অমঙ্গল বই মঙ্গল নাই। আমাদের সামাজিক বল-বীৰ্য্য ও মৌজাগ্য সকলই ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হইতেছে। যে আর্ঘ্য-বংশের প্রতাপে বহুকালগ্রধি বহুধরা কম্পমানা ছিল, সেই—

আর্য্য-সন্তানগণ এখন স্বেচ্ছগণ আপেক্ষাও হীন হইয়াছে। এবং ক্রমে ক্রমে অধিকতর হীন হইতেছে। যাঁহার হৃদয় আছে, তিনি এইসকল কথা আলোচনা করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন, যাঁহার হৃদয় নাই, তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া ক্রমশঃ অধোগতি লাভ করিতেছেন।

অত্যাধিকে দৃষ্টি করিলেও নানাবিধ বিপদ দেখা যায়। যদি বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা ত্যাগ করিয়া নূতনরূপে সমাজ স্থাপন করি, তাহা হইলে আর আগানের আর্য্যত্ব থাকে না; যেহেতু বৈজ্ঞানিক সমাজ তিরোহিত হয়। উদাহরণ-স্বল দৃষ্ট হইবে যে, বৌদ্ধ-সমাজ, জৈন-সমাজ, দেশীয় খ্রীষ্টান-সমাজ, ব্রাহ্ম-সমাজ প্রভৃতি বর্ণাশ্রম-রহিত ব্যবস্থাসমূহ কখনই ভারতভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল না। বৌদ্ধ-সমাজ ও জৈন-সমাজ পরীতগুহা-মধ্যে লুপ্তায়িত হইল। দেশীয় খ্রীষ্টান-সমাজ কেবল স্বেচ্ছাচরিত্যে বৃত্ত হইল, ব্রাহ্ম-সমাজ কুটীরস্থ হইয়া পড়িল। তন্মধ্যে আর কাহারও সামাজিক স্বাধীন জীবন নাই। কোথায় বা বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতা, কোথায় বা নববিধান? কেহই কাজে লাগিল না! কখনই এই বিজ্ঞানপীঠ ভারতে কোন কাজে লাগিবে না—যদি আমরা সহসা বর্ণাশ্রম-ধর্মের সংস্কার আরম্ভ করি, তবে আরো ‘ছলছল’ পড়িয়া যাইবে। সকলদিকে অন্ধকার দেখা যাইতেছে।

নানাবিধ বিপদ ও প্রতিবন্ধক-সত্ত্বে ভগবানের নিকট

দৈববর্ণাশ্রম স্থাপনের প্রার্থনা।

এখন উপায় কি? মঙ্গলের প্রয়োজন। কিন্তু মঙ্গল কিসে সহজে লভ্য হয়, তাহা বিবেচনা করা উচিত। বর্ণাশ্রম-ধর্ম যে-পর্য্যন্ত সংস্কৃত হইয়া প্রকৃতিস্থ না হয়, সে-পর্য্যন্ত সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও পারমাণবিক অমঙ্গলসমূহ জাতিদিগকে ওজ্জ্বলিত করিবে। সমস্ত মঙ্গলের নিধান-স্বরূপ ভগবানই সেই মঙ্গল-বিধান করিবেন, সন্দেহ নাই।

সত্ত সত্ত বর্ণাশ্রম স্থাপনের শাস্ত্রীয় আপত্তি খণ্ডন

পুরাণ অবলম্বনপূর্ব্বক কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, কলির অবসানে ত্রীশ্রীকল্কিদেব অবতীর্ণ হইয়া মরু ও দেবাপি রাজ্যদ্বয়ের সাহায্যে বর্ণাশ্রম-ধর্ম পুনর্বার সংস্থাপন করিলে সত্যযুগের উদয় হইবে। কিন্তু আমরা বলি যে, এই কলিয়ুগ সাধারণ কলিয়ুগ নয়। ইহাকে পূর্ব্ব মহাভাগ ‘ধৃত্য কলি’ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সাধারণ কলিয়ুগেই কেবল

কলিকালের অবসানে ধর্ম সংস্থাপিত হয়। ‘ধন্য কলিমুগে’ আর কক্ষি-
অবতারের অপেক্ষা নাই। যে কলিমুগে পরিপূর্ণশক্তি, পরম-কারুণিক,
পরমপ্রেমমূর্ত্তি শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইয়াছেন, সে-কলিমুগের আর কথা
কি? সেট করুণাময় মহাপ্রভুর কৃপায় অবিলম্বে সমস্ত সামাজিক
অমঙ্গল দূরীভূত হইবে সন্দেহ নাই। অকৃতিমরূপে সেই মহাপ্রভুর
চরণাশ্রয় করিলে আর কোন বিষয়ের চিন্তা থাকিবে না।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম-সংস্থাপনই প্রধান ধর্মসংস্কার

এই সংখ্যায় আমরা এই পর্য্যন্ত বলিলাম, সামাজিক মঙ্গল সাধন ও
‘বর্ণাশ্রমরূপ প্রধান ধর্মের সংস্কার-বিষয়ে’ যে উৎকৃষ্ট উপায়
আছে, তাহা আগামী সংখ্যায় আমরা প্রস্তাব করিব। আশা
করি যে, সহস্রয় পাঠকবর্গ বিশেষ মনোনিবেশপূর্ব্বক আমাদের এই ক্ষুদ্র
প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া আগামী সংখ্যায় তৃতীয় প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য প্রস্তুত
হইয়া থাকুন। যে-বিষয়ে আমরা হস্তক্ষেপ করিলাম তাহা অত্যন্ত
গম্ভীর। সংযত গম্ভীররূপে এই বিষয়টির আলোচনা করা আবশ্যিক।
অনেক পিণ্ডু কথা ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে থাকিবে। সংক্ষেপতঃ আমরা
এই বলি যে, বর্ণীয় সমাজের পক্ষে আর অধিকতর গুরুতর বিষয় ইহা
অপেক্ষা নাই।

— শ্রীম ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

জীব

জীব্যতে অনেক ইতি জীবঃ অর্থাৎ শ্রীভগবান্ কর্তৃক যিনি জীবনধারণ-
কারী—তিনিই জীব।

জীবঃ কর্মফলং ভুঙ্ক্তে, আত্মা নিলিপ্ত এব চ, আত্মনঃ প্রতিবিম্বশ্চ
দেহী জীবঃ স এব চ। প্রাণ-দেহানিভূদেহী স জীবঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।—
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তে) অর্থাৎ জীব কর্মফল ভোগ করে এবং পরমাত্মা নিলিপ্ত
থাকেন; দেহী জীব আত্মার প্রতিবিম্ব। প্রাণ, দেহ, ইন্দ্রিয়াদি ধারণকরত
তিনি ‘জীব’ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হন। শ্রীগীতায় আমরা দেখিতে পাই,—

ন জাহতে শ্রিতে বা কদাচিৎপ্রায় ভুজ্য ভবিতা বা ন ভুজঃ।

অজ্ঞো নিত্যঃ শাখতোহং পুরাণো ন হন্যতে হস্তমানে শরীরে ॥ (গীঃ ২।২০)

জন্ম, অস্তিত্ব, বর্ধন, বিপর্যয়, অপক্ষয় ও বিনাশ—এই ষড়্ভাব-
নিকারশূন্য জীবাত্মা অজ্ঞ অর্থাৎ জন্ম হয় না; তিনি অনাদি অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড
সৃষ্টির পূর্বে ভগবানের জীব বা তটস্থাসক্তি হইতে উদ্ভূত। মহাসম্বর্ধনই
তাহার আশ্রয়। ইনি সর্বদা একরূপে অবস্থিত (নিত্য) অর্থাৎ সর্ব-
কালেই বর্তমান; তাহার জন্ম-মৃত্যু নাই অথবা পুনঃ পুনঃ তাহার উৎপত্তি
কি বৃদ্ধি-অদি হয় না। তিনি পুরাতন অথচ নিত্য নবীন; জন্ম-মরণশীল
দেহের নাশে তিনি বিনষ্ট হন না।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতার মাধ্যমে আমাদিগকে আরও জানানোপদেশ
করিয়াছেন—জীবাত্মা অস্ত্র-শস্ত্রাদিতে ছিন্ন হন না, অগ্নিতে দগ্ধ হন না, জলে
আর্দ্র হন না, বায়ুদ্বারা শুষ্ক হন না। ইনি অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেশ্য, অশোধ্য,
নিত্য, সর্বগত, স্থাণু ও অচল। ইনি সনাতন অর্থাৎ সদা বিद्यমান।

জীবদেহের অপর নাম ক্ষেত্র। সেই ক্ষেত্রকে যিনি জানেন, তাঁহাকে
ক্ষেত্রজ্ঞ বা দেহী বলা হয়। এই দেহীর তিনটি দেহ, যথা কারণ, সুক্ষ্ম
ও স্থূল। অস্থি মাংসাদিগুরু দেহই স্থূল, মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার ও চিত্ত—এই
চারিটির সমষ্টি লিঙ্গ দেহ এবং কারণ-বাবিহেতে অবস্থানকালে কারণ শরীর
প্রাপ্তি হয়। কোন কোন শাস্ত্রে এই তিনটি দেহকে জীবাত্মার পোষাক
বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে—‘আমি’ একটি জীব। এই ‘আমি’ দুই
প্রকারের যথা—কাঁচা ‘আমি’ ও পাকা ‘আমি’। পাকা ‘আমি’ বলিতে
প্রকৃত ‘আমি’ (real self) বা জীবাত্মা, এবং কাঁচা ‘আমি’ বলিতে
কৃত্রিম ‘আমি’ (Artificial self) বা দেহ। এই দেহই অনাত্ম বস্তু,
ইহাতে আত্মাভিমান করি। যাহার ফলে পক্ষক্লেষদ্বারা আক্রান্ত হই এবং
ত্রিতাপজালায় দগ্ধীভূত হইতে থাকি।

জীবাত্মা স্বরূপতঃ চিন্ময়। ভগবান্ বিভূচৈতন্য ও জীব অণুচৈতন্য।
শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদে দৃষ্ট হয়,—

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্লিতস্য চ।

ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্তর্য্য কল্পতে ॥ (শ্বেতাশ্বতর ৩।৯)

অর্থাৎ সেই জীবকে কেশাণ্ডের শতভাগের শতাংশতুল্য সূক্ষ্ম জানিতে
হইবে। সেই জীব আনন্ত্য অর্থাৎ মোক্ষলাভের যোগ্য। এই জীবাত্মা
অণু, ইহাতে পাপ-পুণ্যাদি আশ্রয় করিতে পারে।

এই আত্মা অত্যন্ত ক্ষুদ্র। বিস্তৃতিতে ইহাকে উপলব্ধি করিতে হয়।
প্রাণবায়ু—প্রাণ, অপান, বান, সমান ও উদান—এই পঞ্চপ্রকারে বিস্তৃত
হইয়া জীব-শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট রহিয়াছে। যে চেতনা-শক্তিদ্বারা জীবগণের
সমস্ত ইন্দ্রিয় ব্যাপ্ত রহিয়াছে, সেই আত্মা বিস্তৃতিতে প্রকাশিত হন। এক
অর্থাৎ যেকোন সমস্ত জগৎকে প্রকাশ করে, ক্ষেত্রজ জীবাত্মাও সেইরূপ
চেতনশক্তিদ্বারা সমস্ত ক্ষেত্র অর্থাৎ দেহকে প্রকাশ করিয়া থাকে।

শুদ্ধত্বৈতবাদাচার্য্যাদিগের সিদ্ধান্ত (তত্ত্বমুক্তাবলী-১০)

যথা সমুদ্রে বহবন্তরঙ্গা স্তথাবয়ং ব্রহ্মণি ভূরি জীবাঃ।

ভবেৎ তরঙ্গো ন কদাচিদন্ধি স্বং ব্রহ্ম কস্মাস্তবিতাসি জীবঃ।

অর্থাৎ, হে জীব! যেমন সমুদ্রমধ্যে বহু তরঙ্গ আছে, সেইরূপ আমরাও
চিংসমুদ্ররূপ ব্রহ্মে অসংখ্য জীব অবস্থিত। যখন তরঙ্গ কখনও সমুদ্র
হইতে পারে না, তখন তুমি কি করিয়া ব্রহ্ম হইতে পার?

জীব ও ঈশ্বরের ভেদ নিত্য। তাই গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিতা মম সাধুর্দ্ব্যামাগতাঃ।

সর্গেইপি নোপজায়তে প্রলয়ে ন বাধস্তি চ ॥ (গী: ১৪।২)

অর্থাৎ এই জ্ঞান অবলম্বনপূর্বক জীব আমার সাধুর্দ্ব্য অর্থাৎ নিগূর্ণতা
লাভ করিলে সৃষ্টিকালে মরজগতে জন্মগ্রহণ করে না এবং প্রলয়ে বিনাশ-
রূপ বাধাও ভোগ করে না।

শুদ্ধত্বৈত-বাদাচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত (ভগবৎসন্দর্ভযুক্ত সর্বজ্ঞসূক্ত-বাক্য)—

হ্লাদিষ্ঠা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।

স্বাবিচ্ছা-সংবৃত্তো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ।

ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ এবং হ্লাদিনী ও সর্বিৎ-শক্তিদ্বারা আশ্লিষ্ট; কিন্তু জীব
স্বীয় (আরোপিত) অবিচ্ছাদ্বারা আবৃত, স্তবরাং ক্লেশসমূহের আকর।

ভগবানই একমাত্র বাস্তব বস্তু, সেই বস্তুর অংশ জীব, বস্তুর শক্তি—মায়া
এবং বস্তুর কার্য্য—এই জড় জগৎ; স্তবরাং সমস্তই বস্তু হইতে অতিম্ন বলিয়া
এক অদ্বয় বাস্তব বস্তুই সিদ্ধান্তিত হইল।

বিশিষ্টত্বৈতবাদাচার্য্যাদিগের সিদ্ধান্ত—

‘চিং’ ও ‘অচিং’ সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মের শরীর—

যঃ সর্কেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্কৈভো ভূতের্ভোহন্তরো যঃ

সর্কানি ভূতানি ন বিদুর্গন্ত সর্কানি ভূতানি শরীরং যঃ সর্কানি।

ভূতান্যন্তরো যনরত্যেষ আত্মাস্তর্ক্যামায়ুতঃ ॥ (বৃ: আ: ৩।৭।১৫)

যিনি সমস্ত ভূতে অবস্থিত, কিন্তু ভূতসকল যাহাকে জানে না, ভূত-সমূহ যাহার শরীর, যিনি ভূতসকলের অন্তরে থাকিয়া তাহাদিগকে নিয়মিত করেন, তিনিই জীবাত্মার অন্তর্যামী পুরুষ ।

দ্বৈতাহৈতবাদাচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত—

জ্ঞানস্বরূপঞ্চ হরেরধীনং শরীর-যোগ-বিযোগ-যোগান্ ।

অণুং হি জীবং প্রতিদেহে ভিন্নং জাতৃত্ববন্তং যদনন্তমাহঃ ॥

(নিম্বার্ককৃত দশশ্লোকী)

(নিম্বার্ক-মতে) জীব—জ্ঞানস্বরূপ ও জাতৃস্বরূপ, সংখ্যায় অনন্ত, অণু (ক্ষুদ্র) ও হরির অধীন । অণুত্বহেতু তাঁহার মাসিক শরীরের সহিত সংযোগ ও বিযোগ ঘটিয়া থাকে । জীব এক নহে, প্রতি দেহে ভিন্ন ভিন্ন জীব অবস্থান করে ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেন,—বিভিন্নাংশক্রমে আমার নিত্য-দাসরূপ জীবের প্রকাশ । বিভিন্নাংশ-প্রকাশে আমার পান্থমেশ্বর অহংতত্ত্ব থাকে না ; তাহাতে জীবের একটি স্বসিক্ত অহংত্বের উদয় হয় । সেই ভিন্নাংশগত তত্ত্বস্বরূপ জীবের দুইটি দশা—মুক্ত ও বদ্ধ-দশা ; উভয়-দশায়ই জীব সনাতন অর্থাৎ নিত্য ; মুক্তদশায় জীব সম্পূর্ণরূপে মদাপ্রিত ও প্রকৃতিসম্বন্ধশূন্য; আব বদ্ধদশায় জীব স্বীয় উপাদিস্বরূপ প্রকৃতিস্থিত মন ও পঞ্চ বাহ্যেন্দ্রিয়, এই ছয়টি ইন্দ্রিয়কে নিজ-তত্ত্বাবোধে বহন করিয়া থাকেন ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দৃষ্ট হয়, যথা—

সেই বিভিন্নাংশ জীব দুই ত' প্রকার ।

এক নিত্যমুক্ত, এক—‘নিত্যাসংসার’ ।

‘নিত্যমুক্ত—নিত্য কৃষ্ণগুণে উন্মুক্ত ।

‘কৃষ্ণপারিষদ’-নাম, ভুঞ্জ সেবাসুখ ॥

‘নিত্যবদ্ধ’—কৃষ্ণ হৈতে নিত্য বহিস্মুখ ।

নিত্যাসংসার ভুঞ্জ, নরকাদি-ভুংখ ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।১০-১২)

অতএব হে বলিহত জীব ! তত্ত্বদর্শী গুরুপাদাশ্রয়ে স্বীয় জীবতত্ত্ব অবগত হইয়া আত্মকুল্যের সহিত কৃষ্ণাংশীলন করিতে থাকুন, তাহা হইলে মায়াপিপাচী-প্রদত্ত ত্রিতাপজ্বালার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ সম্ভব হইবে ।

—প্রদত্তদ্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত উর্দ্ধমস্থী মহারাজ

নিন্দা ২

নিন্দা কা'রে বলে, হাঁগা নিন্দা কা'রে বলে ?

বল'তে বুঝিয়া সত্য জগত মঙ্গলে ॥

লয়ে লডু বিষমিশ্র মিষ্টান্ন বলিয়া ।

বেচিছ তুমি যে হাটে বিজ্ঞাপন দিয়া ॥

অবোধ বালক ভাই কিমিয়া যতনে ।

করিতেছে আত্মনাশ গরল-অনশনে ॥

তত্ত্বজ্ঞ তাহাতে কেহ তোমার বঞ্চনা ।

দেয় ধরাইয়া যদি করে বিঘোষণা ॥—

“সাবধান ! রে অবোধ বালক সকল ।

না কর পরশ উহা বিষয় গরল ॥”—

বাঁচাতে বিমূঢ় জনে, সেই মহাত্মার ।

বিশ্বহিত এই বাক্য নিন্দা কি তোমার ?

স্বার্থহানি ইহাতেই হয় যদি তব ।

তুলে তব ক্রোধ কাম যদি হা-হা-রব ॥

হ'বে কি নীরব ওই অকৈতব জন ।

রাখিতে অবোধ তব ইন্দ্রিয়-তর্পণ ॥

বিষব্রণে সুভিষক যুক্ত অস্ত্রাঘাত ।

না করি,' রোগীর বশে বুলা'বে কি হাত ?

কি উৎপাত !—রে মোহান্ব মায়াবশ মন ।

হিতে বিপরীত একি ভাবো অলুক্ষণ ॥

জীবহিত জগদ্ধিত সজ্জন নিশ্চয় ।

না করে কাহারো নিন্দা কোন অপচয় ॥

শ্রীচৈতন্য-লীলার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

(পূর্বপ্রকাশিত ৩২শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২১১ পৃষ্ঠার পর)

বৃন্দাবন ঘাইবার পথে বারিখণ্ডের অরণ্যমধ্যে বন্যজন্তুদিগকে
কৃষ্ণনাম বলাইয়া প্রেমভক্তি সঞ্চারণ

শরৎকাল আসিলে মহাপ্রভু বৃন্দাবন ঘাইবার জন্য অধীর হইয়া উঠিলেন এবং রামানন্দ ও স্বরূপের অমুবোধে বলভদ্র তট্টাচার্য্য ও তৎসঙ্গী একজন ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া শেষরাত্রে অন্যান্য ভক্তগণকে লুকাইয়া বৃন্দাবন অস্তিমুখে যাত্রা করিলেন। নগর ও রাজপথ ত্যাগ করিয়া উপপথে বনে প্রবেশপূর্বক বারিখণ্ডের অরণ্যপথ দিয়া কৃষ্ণনাম লইতে লইতে চলিলেন। দুর্গম অরণ্যে হিংস্র স্থাপদসমূহ পথে প্রভু কৃষ্ণ-নামে বিভোর হইয়া যতই অগ্রসর হইতেছেন ততই হস্তী, বাঘ, গণ্ডার, শূকর প্রভৃতি জন্তুগণ প্রভুকে পথ ছাড়িয়া দিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া বলভদ্র তট্টাচার্য্য ভীষণ ভীত হইয়া পড়িতেছেন। এই সময় প্রভু হিংস্র জন্তুদিগকে কৃষ্ণ-প্রেমে উন্নত করিলেন।—

“একদিন পথে ব্যাঘ্র করিয়াছে শয়ন।

আবেশে তাহাতে প্রভুর লাগিল চরণ।

প্রভু কহে,—‘কৃষ্ণ কহ’, ব্যাঘ্র উঠিল।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিল ॥

আর দিন বনে প্রভু করে নদী যান।

মত্ত হস্তিযুথ আইল করিতে জল পান ॥

প্রভু ফলে কৃত্য করেন আগে হস্তী আইলা।

কৃষ্ণ কহ বলি’ প্রভু জল ফেলি মারিলা ॥

সেই জলবিন্দুকণ বাগে যাব গায়।

সেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে প্রেমে নাচে ধায় ॥”

* * *

“ময়ূরাদি পক্ষীগণ প্রভুকে দেখিয়া।

সঙ্গে চলে কৃষ্ণ বলে নাচে মত্ত হইয়া ॥

হাবিবোল বলি প্রভু করে উচ্চধ্বনি।

বৃক্ষলগ্ন প্রফুল্লিত সেই ধ্বনি শুনি’ ॥

বারিখণ্ডে স্থাবর জঙ্গম হয় যত।

কৃষ্ণ-নাম দিয়া প্রেমে কৈল উন্নত ॥”—(চৈঃ চঃ)

প্রভুর এই সমস্ত রঙ্গ দেখিয়া বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের ভয় বিদূরিত হইল ও মনে মনে চমৎকৃত হইয়া মহাপ্রভুর পদতলে পতিত হইয়া কহিলেন,— ‘প্রভু, আপনি কৃপাপূর্ব্বক মাদৃশ অধম জীবকে সঙ্গে আনিয়া আমার হাতে শিক্ষা গ্রহণ করিতেছেন। এইভাবে অধম কাককে গরুড়ের সম্মান প্রদান করিলেন। আপনি ঈশ্বর—স্বয়ং ভগবান্, আমায় ক্ষমা করুন।’ মহাপ্রভু বলভদ্রকে আলিঙ্গন দানপূর্ব্বক কৃপা করিলেন।

বারাণসীতে নিজ অনুকম্পিত তপন মিশ্র ও বৈद्य

চন্দ্রশেখরের সহিত মিলন, এবং গৌড়-রাজ্যহারা

শ্রুত্বাঙ্গিরায়কে কর্ণ-জড়-স্মার্ত্ত পণ্ডিতদের

বিধান হইতে রক্ষা

ক্রমে মহাপ্রভু বারাণসীতে উপনীত হইলেন। সেখানে মনিকর্ণিকার ঘাটে প্রভু যখন স্নান করিলেন, সেই সময় তপনমিশ্রও অদূরে ঘাটে স্নানরত থাকায় মিশ্র মহাপ্রভুকে দেখিয়া চিন্তিতে পারিলেন এবং উল্লসিত হইয়া মহাপ্রভুর পদপ্রান্তে আসিয়া লুটিয়া পড়িলেন। মহাপ্রভু কৈশোর-লীলায় নবদ্বীপ হইতে পূর্ব্ব-দেহে গমন করিলে তথায় উক্ত তপনমিশ্র মহাপ্রভুর কৃপা প্রাপ্ত হইয়া সাধা-সাধন তত্ত্ব-শিক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক মহাপ্রভুর নির্দেশক্রমে বারাণসীতে আসেন। এক্ষণে মহাপ্রভুকে দেখিয়া মিশ্রের আর আনন্দের সীমা রহিল না। মহাপ্রভু মিশ্রকে আলিঙ্গন করিলেন এবং বিশেষ্বর ও বিন্দুমাধব দর্শনপূর্ব্বক মিশ্রের অনুরোধে তাঁহার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। এই সময় তপনমিশ্রের পুত্র রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী বাল্যকালে মহাপ্রভুর পাদ সন্ধান করিয়া কৃতার্ব হন। উক্ত রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী ব্রজমণ্ডলের বড়-গোস্বামীর অন্যতম এবং ‘শ্রীগৌড়গনোদ্দেশ দীপিকা’-যতে তিনি ব্রজের রাগমঞ্জরী নামে অভিহিত। আনুমানিক ১৪২৫ শকাব্দে তাঁহার আনির্ভাব হয় এবং মহাপ্রভুর আদেশে পিতামাতার মিত্যধাম গমনের পর সংসার ত্যাগপূর্ব্বক মহাপ্রভুর পদতলে আত্মসমর্পণ করেন।

মহাপ্রভুর জুতাগমন বার্ত্তা পাইয়া বৈद्य চন্দ্রশেখর দীর্ঘকাল পরে নিজ পরমাত্মীষ্ট প্রভুর পাদপদ্ম দর্শনে তথায় আসিলেন এবং মহাপ্রভুকে প্রণামপূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন,—‘প্রভো! আপনি কৃপা-পূর্ব্বক এই ভূতাকে দর্শন দিলেন। এই বারাণসীতে কেবল মায়া-ব্রহ্ম শব্দ

ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। মিশ্রের কাছেই শুধু কৃষ্ণ-কথা শুনিতে পাই। আমি ও মিশ্র সঙ্গীদাট আশনার পাদপদ্ম চিত্তা করি।' প্রভু তখন নিজ জম্বুকম্পিত চন্দ্রশেখরকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার হৃৎখ মোচন করিলেন।

মিশ্র ও চন্দ্রশেখরের অনুরোধে মহাপ্রভু দশ দিবস ধরিয়া বারাণসীতে চন্দ্রশেখরের গৃহে অবস্থানপূর্বক তপনমিশ্রের আলয়ে শিক্ষা গ্রহণ করিতেন। এই সময় মহাপ্রভু বারাণসীর মায়াবাদী ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্ৰণ গ্রহণ করেন নাই এবং অবৈশ্বক্য মায়াবাদী সম্যাসীদেরও সঙ্গ বর্জন করেন। ক্রমে মহাপ্রভুর অলৌকিক গুণ-মহিমার কথা বারাণসীর প্রখ্যাত মায়াবাদী পণ্ডিত ষট হাজার একদণ্ডী সন্ন্যাসীর গুরু প্রকাশানন্দ শুনিতে পাইলেন। কিন্তু প্রকাশানন্দ অহঙ্কার-ভরে মহাপ্রভুকে ভাবকালী, ঐন্দ্রজালিক সম্যাসী বলিয়া উপেক্ষা করিলেন। মহাপ্রভু জনৈক মহারাষ্ট্রীয়ভক্ত বিশ্বেশ্বর মুখে প্রকাশানন্দের ভক্তিলেশহীন বহিমুখ কথা শুনিয়া এই বারাণসীতে গ্রাহক না পাইলে ভাগী বোঝা অল্প মূল্যে বিকাইয়া ফাইবেন বলিয়া জানাইলেন।

সেই সময় গৌড়-অধিকারী সুবুদ্ধিরায তৎকৃত্য হোসেন শাহ্ কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়া এবং জোরপূর্বক কেরোরার পানি ভক্ষণে বাধ্য হইয়া এবন্নিধ পাপ-দোষ স্ফালনের মিমিশ্র কল্মষ-স্মার্ত্ত পণ্ডিতদের বিধান-মতে তপ্তযুত পান দ্বারা প্রাণত্যাগ প্রায়শ্চিত্ত শুনিয়া মহাপ্রভুর চরণে কৃপা প্রার্থনা করিলে মহাপ্রভু তাঁতাকে বৃন্দাবনে গিয়া শ্রীনাম-ভজনের উপদেশ দিয়া কহিলেন;—

“প্রভু কহে,—ইঁটা হৈতে যাহ বৃন্দাবন।

নিরস্তর কর কৃষ্ণ নাম সঙ্কীৰ্ত্তন ॥

এক নামাভাসে তোমার পাপ-দোষ যাবে।

আর নাম লইতে কৃষ্ণ-চরণ পাইবে ॥

আর কৃষ্ণ নাম লৈতে কৃষ্ণ-স্থানে স্থিতি।

মহাপাতকের হয় এই প্রায়শ্চিত্ত ॥”—(চৈঃ চঃ)

ক্রমে মহাপ্রভু তথা হইতে প্রয়াগে আদিয়া ত্রিবেণী সঙ্গমে স্থান করত তিন দিন অবস্থান করিলেন এবং প্রয়াগে বহুলোককে কৃষ্ণনামপ্রেম বিতরণ করিয়া মধুরার পথে চলিলেন।

বৃন্দাবন ধাম দর্শন ও ‘রাধাকুণ্ড’-‘শ্যামকুণ্ড’ আবিষ্কার

মহাপ্রভু যথুরায় পৌঁছিয়া বিশ্রামঘাটে স্নান সমাপনান্তে শ্রীকেশবের আবির্ভাব-স্থান দেখিয়া প্রেমাবেশে প্রণাম ও ছুঁকারাদি করিতে থাকিলেন। এক বিপ্র আসিয়া তাঁহার চরণে প্রেমাবিষ্টি হইয়া পতিত হইলেন। পরে মহাপ্রভু সেই বিপ্রের পরিচয়ে জানিতে পারিলেন যে, একদা সেই বংশের গৃহে শ্রীমদ মাধবেন্দ্র-পূর্ণপাদ অবস্থানপূর্বক সেই বিপ্রের হস্তে পাতিত অন্ন গ্রহণ করেন এবং তাঁহাকে শিষ্যত্বে বরণ করেন। শ্রীল পূর্ণপাদের সম্বন্ধে প্রভু সেই মনোড়িয়া জাতি-ব্রাহ্মণকে যথোচিত সম্মান প্রদান করিলেন এবং মনোড়িয়া-ঘরে সন্ন্যাসীর ভোজন নিষিদ্ধ হইলেও প্রভু সেই ভক্তবিপ্রের পাতিত অন্ন অঙ্গীকার করিয়া পূর্ণপাদের আদর্শ অনুসরণ করিয়া জানাইলেন,—

“প্রভু কহে, জ্ঞান-স্মৃতি যত ঋষিগণ।

সব একমত নহে মর্মু ভিন্ন ভিন্ন ॥

মর্মু স্থাপন হেতু সাধু-ব্যবহার।

পূরী গোদাঞির আচরণ সেই মর্মু-সার ॥—(চৈঃ চঃ)

অনন্তর প্রভু যথুরায় চাকরশাটে স্নান করিয়া তীর্থস্থানসমূহ দর্শন করিলেন এবং প্রেমাবেশে নৃত্য-কীর্ত্তন করিতে করিতে বৃন্দাবনের দ্বাদশ-বন বিহার করিলেন। আদিষ্ট গ্রামে আর্হিয়া মহাপ্রভু তথায় ছই ধান্য-ক্ষেত্রের অন্ন জলে স্নান করিয়া প্রেমাবেশে সেই ছই স্থান ‘রাধাকুণ্ড’ ও ‘শ্যামকুণ্ড’ নামে চিহ্নিত করিয়া উভয় কুণ্ডের মহিমা বর্ণনপূর্বক রাধাকুণ্ডের শ্রেষ্ঠত্ব জানাইয়া নৃত্য-কীর্ত্তন করিলেন। এই রাধাকুণ্ডই ভজন-জ্ঞানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ! মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীল রূপগোস্বামীপাদ বিবচিত “শ্রীউপদেশামৃতের” ঝুমু শ্লোকের বঙ্গানুবাদ-পরিভাষায় শ্রীল ঠাকুর ভক্তিসিকান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ রাধাকুণ্ডের মহিমা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

“বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠা যথুরা নগরী।

জন্ম লভিলা যথা কৃষ্ণচন্দ্র হরি ॥

যথুরা হইতে শ্রেষ্ঠ বৃন্দাবন ধাম।

যথা সাধিয়াছে হরি রাসোৎসব কাম ॥

বৃন্দাবন হইতে শ্রেষ্ঠ গোবর্দ্ধন শৈল।

গিরিদারী গান্ধারিকা যথা ক্রীড়া কৈল ॥

গোবর্দ্ধন হইতে শ্রেষ্ঠ রাধাকুণ্ডতট ।

প্রেমায়ুক্তে ভালাইল গোকুল-লম্পট ॥

গোবর্দ্ধন-গিরিতট রাধাকুণ্ড ছাড়ি ।

অন্যত্র যে করে নিজকুঞ্জ পুষ্পবাড়ী ॥

নির্কোষ তাহার সম-কেহ নাহি আর ।

কুণ্ডতীর মর্কোত্তম স্থান প্রেমাদার ॥”

ক্রমে শ্রীভূ বৃন্দাবনে কেশিতীর্থে স্নান করিয়া আমলীতলাতে কৃষ্ণদাস নামে এক রাজপুত্র বৈষ্ণবকে কৃপা করিয়া প্রেমোন্মত্ত করিলেন । অতঃপর সোবাক্ষেত্রের নিকটে এক বৃক্ষতলে পাঠান-দর্শনকুসল কর্তৃককর পাঠান দৈত্যকে উদ্ধার করিলেন । শ্রীভূ দক্ষিণদেশে যেক্রপ শক্তি প্রকাশ করিয়া-ছিলেন, পশ্চিমদেশেও সেইরূপ কৃষ্ণ-প্রেম বিতরণ করিলেন । চৌরানী ক্রোশ ব্রজমণ্ডল দর্শনপূর্বক ক্রমে মহাপ্রভু প্রয়াগে ফিরিয়া তথায় দশ দিন অবস্থান করিলেন ।

প্রয়াগে অবস্থানপূর্বক দশাশ্বমেধঘাটে

শ্রীকৃপকে দাক্ষিণ্যসংসার

মহাপ্রভু বৃন্দাবন দর্শনপূর্বক প্রয়াগে আসিলে শ্রীকৃপ ও অনুপম গোড়ের বাদশাহের অধীনে রাজকার্য্য ও প্রচুর ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া তথায় মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইলেন । দশাশ্বমেধঘাটে মহাপ্রভু শ্রীকৃপকে কৃষ্ণভক্তি রসতত্ত্ব শিক্ষা দিয়া শক্তি সঞ্চার করিলেন ।

“শ্রীকৃপ-হৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা ।

সর্বতত্ত্ব নিরূপিয়া প্রধান করিলা ॥”—(চঃ চঃ)

মহাপ্রভু শ্রীকৃপকে লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, স্ত্রীদিগতসেবা-প্রকাশ, শুদ্ধভক্তি গ্রন্থ রচনা ও ভক্তি-সদাচার সংস্থাপন-বিষয়ে ভার অর্পণ করিয়া বৃন্দাবন দর্শনান্তে গোড়দেশ হইয়া নীলাচলে যাইতে আদেশ করিলেন । অনন্তর শ্রীকৃপ ও অনুপম বৃন্দাবন দর্শন করিয়া গঙ্গাতীরপথে গোড়দেশ হইয়া নীলাচলে যাইবার কালে অনুপমের গঙ্গা-প্রাপ্তি হয় । শ্রীকৃপ বৃন্দাবনে অবস্থানের সময় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ব্রজলীলা ও বারকালীলা সম্পর্কে একটি নাটক লিখিতে ইচ্ছা করিয়া নান্দীপ্লোক রচনা করেন এবং গঙ্গাতীরপথে নীলাচলে আসিবার কালে সত্যভামাপুর গ্রামে সত্যভামাদেবী কর্তৃক স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়া তদনুসারে পৃথকভাবে দুইটি নাটক লিখিতে সঙ্কল্প করিয়া নীলাচলে

উপনীত হন। মহাপ্রভু বারাণসী হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিয়া
শ্রীক্লশকে দুইটি নাটক লিখিবার জন্য আদেশ দেওয়ায় শ্রীক্লশ হরষিত
চক্রে ব্রহ্মলীলা সম্বন্ধীয় বিদগ্ধমাধব ও পুরলীলা সম্বন্ধীয় ললিত মাধব
নামে দুইটি নাটক রচনা করেন এবং আরও বহু ভক্তিগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

পুনরায় বারাণসী ধামে ফিরিয়া তথায় দুইমাস অবস্থান-

পূর্বক সনাতনকে শিক্ষাপ্রদান ও বারাণসীর মায়া-

বাদী সম্রাসীগুরু প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে উদ্ধার

মহাপ্রভু প্রয়াগ হইতে বারাণসীধামে উপস্থিত হইলে গোড়দেশের
প্রধান মন্ত্রী সনাতন কৌশলে রাজকাৰ্য্য ও অতুল ধন-সম্পদ ত্যাগ করিয়া
দীন অকিঞ্চনের বেশে মহাপ্রভুর চরণতলে শরণ গ্রহণ করিলেন এবং
দুইমাস ধরিয়া মহাপ্রভুর নিকট অবস্থানপূর্বক সম্বন্ধ-অভিষেয ও প্রয়োজন-
তত্ত্ব সহ ভাগবত শাস্ত্রের গুঢ়মর্য় শিক্ষা করিলেন। সনাতন মহাপ্রভুর
নিকট জানিতে চাহিলেন,—‘প্রভো; আমার স্বরূপ কি এবং কেনই বা
আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই ত্রাপত্র দ্বারা আমি কষ্ট
ইতেছি? কেমন করিয়া আমার হিত হইবে? সাধা-সাধন তত্ত্ব সম্পর্কে
আপনার উপদেশ প্রার্থনা করি।’ তখন প্রভু কৃপাপূর্বক সনাতনকে
কহিলেন,—

“প্রভু কহে কৃষ্ণ-কৃপা তোমাতে পূর্ণ হয়।

সর্বতত্ত্ব জান, তোমার নাহি ত্রাপত্র ॥

কৃষ্ণ-শক্তি ধর তুমি জান তত্ত্বভাব।

জামি দাঢ্য লাগি পুছে সাধুর স্বভাব ॥

যোগ্যপাত্র হও তুমি ভক্তি প্রবর্তাইতে।

ক্রমে সব তত্ত্ব গুন কহিয়ে তোমাতে ॥

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।

কৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ॥

সূর্যাংশ কিরণ যেন অগ্নি-জ্বালাময়।

স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন শক্তি হয় ॥

কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি পরিণতি।

চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি আর মায়াশক্তি ॥

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্গুণ।

অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥

বড় স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায় ।
 দণ্ডাজনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥
 সাধু-শাস্ত্র-কুপায় যদি কখনো মুখ হয় ।
 সেই জীব নিস্তারে মায়া তাহারে ছাড়য় ॥
 মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কক্ষ-স্মৃতি জ্ঞান ।
 জীবের কুপায় কৈল কক্ষ বেদ-পুরাণ ॥
 শাস্ত্র-গুরু-আত্মরূপে আপনা জানান ।
 কক্ষ মোর, প্রভু তাতা জীবের হয় জ্ঞান ।
 বেদ-শাস্ত্রে কহে সন্থক-অভিধেয়-প্রয়োজন ।
 কক্ষ-প্রাপ্তি সন্থক ভক্তি-প্রাপ্তির সাধন ॥
 অভিধেয় নাম ভক্তি, প্রেম প্রয়োজন ।
 পুরুষার্থ-নিরোমণি প্রেম মহাধন ॥—(চৈঃ ৫ঃ)

অনন্তর সনাতনকে মহাপ্রভু আরও জানাইলেন যে, ‘কর্ম-জ্ঞান-যোগ দ্বারা ভগবান্ কক্ষকে পাওয়া যায় না ; পরন্তু কক্ষকে কেবলমাত্র ভক্তি-দ্বারাই পাওয়া যায়।’ কর্মমিশ্রা ভক্তিসম্পন্ন আর্ত, অর্থার্থী ও জিজ্ঞাসু ব্যক্তি এবং জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তিসম্পন্ন জ্ঞানী ব্যক্তিও ভগবানের বা ভগবানের নিজজ্ঞানের প্রসাদে উক্ত ভাবসকল ফীণ হইলে শুদ্ধভক্তির অধিকারী হইয়া থাকেন। এসম্বন্ধে শুদ্ধাক্ষরভক্তির নিরপেক্ষতা ও মহিমা বর্ণনে শ্রীল বিহঙ্গমজল গোস্বামিপাদ-বিচিতি “শ্রীকক্ষকর্ণামৃতম্”-শীর্ষক গ্রন্থের শ্লোক স্মরণ করা যাইতেছে,—

ভক্তিস্বর্যি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্মাদ্-
 দৈবেন ন ফলতি দিব্যাকিশোরমুতিঃ ।
 মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেহম্মান্
 ধর্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ ॥”

অর্থাৎ,—‘হে ভগবন্ ! তোমাতে যদি আমাদের ভক্তি স্থিরতর থাকে, তাহা হইলে তোমার কিশোরমুত্তি স্বভাবতঃ আসিয়া উদ্ভিত হন। ধর্ম ও মুক্তির প্রয়াসে কিছুই প্রয়োজন নাই। কেননা ভক্তি থাকিলে মুকুলিতাঞ্জলি হইয়া মুক্তি স্বভাবতঃ স্বয়ং আনাদিগকে অবাস্তব ফল যে অবিচ্ছিন্ন-যোচন, তদ্রূপে সেবা করিতে থাকে। ধর্মার্থ-কামসকল যেমত যেমত প্রয়োজন, সেইরূপ সময়-প্রতীক্ষা করিতে থাকে। তদর্থে চেষ্টার

প্রয়োজন থাকে না।” এস্থলে মাধুর্য্যময়ী জ্ঞান-বর্নশূন্য ভক্তভক্তি উদ্ভিক্ত করা হইয়াছে।

সেই সময় তথায় মহাপ্রভু ভক্ত সনাতনকে আরও বহু শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত শিক্ষা দিলেন এবং বৃন্দাবনে সেবাকার্য্যের জন্ত পাঠাইলেন। মহাপ্রভুর এই নির্দেশক্রমে সনাতন ব্রজমণ্ডলে গিয়া কিছুদিন অবস্থান করিলেন ও তৎপরে নীলাচলে ফিরিয়া মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হন। পরে মহাপ্রভু কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীসনাতন নীলাচল হইতে মথুরা ও বৃন্দাবনে গিয়া ত্রীত্র বৈরাগ্যের মধ্যে মহাপ্রভুর মনোহিষ্ট পুংনে আত্ম-নিয়োগ করেন।

“মথুরাতে পাঠাইল কৃষ্ণ-সনাতন।

দুই সেনাপতি কৈল ভক্তি প্রচারণ ॥”—(চৈঃ চঃ)

মহাপ্রভুর বারাগসীতে অবস্থানকালে তপনগিপ্র ও চন্দ্রশেখর ভক্তদ্বয় তথায় একদণ্ডী সন্ন্যাসীগণ কর্তৃক মহাপ্রভুর নিন্দা শ্রবণে দুঃখিত হইয়া মহাপ্রভুকে উক্ত সন্ন্যাসীদের উদ্ধারের জন্ত অহুবেদ্য করিলেন। মহাপ্রভু অতঃপর তথাকার একদণ্ডী সন্ন্যাসীদের গুরু প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে উদ্ধার মানসে জনৈক বিপ্র কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তাহার নিমন্ত্রণ অঙ্গীকার করিয়া সন্ন্যাসীদের সম্ভায় গমন করিলেন এবং তথায় তিনি সন্ন্যাসী-গুরু প্রকাশানন্দ সহ অপর সন্ন্যাসীদিগকে উচ্চাসনে উপবিষ্ট দেখিয়া সন্ন্যাসীদিগকে নমস্কার-পূর্ব্বক ‘তৃণাদপি স্থনীচ’ স্বভাবে পদযোত করিয়া পাদ-প্রক্ষালন স্থানে কিছু ক্রেশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। তখন প্রভুর শ্রীঅঙ্গে কোটি সূর্য্যাসম অপরূপ ভৈরোরামি প্রকাশিত দেখিয়া সন্ন্যাসীগণের প্রধান প্রকাশানন্দ সরস্বতী বিস্মিত হইলেন এবং প্রভুর হস্ত ধরিয়া সমস্তানে সম্ভামধ্যে বসাইলেন। এইবার প্রকাশানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন,—‘আপনার প্রভাব দেখিয়া আপনাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়া বোধ হইতেছে, তথাপি শ্রীল কেশবভারতীর শিষ্য হইয়া সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম বেদান্ত পঠন-ধ্যান পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভাবকের কণ্ঠ নর্ত্তন-কীর্ত্তন কেন করিতেছেন? তদন্তরে প্রভু দ্বিযং হাসিয়া কহিলেন,—

“প্রভু কহে, শুন শ্রীপাদ ইহার কারণ।

গুরু যোরে মূর্খ দেখি করিল শাসন ॥

মূখ তুমি, তোমার নাহি বেদাস্তাধিকার ।
 কৃষ্ণ-মন্ত্র জপ সদা এই মন্ত্র সার ॥
 কৃষ্ণ-মন্ত্র হৈতে হবে সংসার মোচন ।
 কৃষ্ণ-নাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ ॥
 নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম ।
 সর্ব-মন্ত্র সার নাম এই শাস্ত্র মর্ম ॥
 এত বলি এক শ্লোক শিখাইল মোরে ।
 কণ্ঠে করি এই শ্লোক করিহ বিচারে ॥
 হরেন্দ্রাম হরেন্দ্রাম হরেন্দ্রামৈব কেবলম্ ।
 কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরনুথা ॥
 এই আশ্রয় পাঞা নাম লই অনুক্ষণ ।
 নাম লৈতে লৈতে যোর প্রস্তু হৈল মন ।
 দৈর্ঘ্য ধরিতে নারি হৈলাম উন্মত্ত ।
 হাদি কান্দি নাচি গাই যৈছে মদমত্ত ॥

* * *

কৃষ্ণ-নাম মহামন্ত্রের এই ত ম্ভাব ।
 যে জপে তার কৃষ্ণ উপজয়ে ভাব ॥
 কৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেমা প্ৰথম পুরুষার্থ ।
 যার আগে তৃণতুলা চারি পুরুষার্থ ॥
 পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃত সিদ্ধি ।
 ব্রহ্মানন্দাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু ॥

* * *

সেই কৃষ্ণ-নাম কভু পাওয়ায় নাচার ।
 গাহি নাচি নাহি আমি আপন-ইচ্ছায় ॥
 কৃষ্ণ-নামে যে আনন্দসিদ্ধি-আবাদন ।
 ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদকসম ॥—(১৫: ৫:)

(ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন কবিতুষণ

“অন্ধস্ত দীপো বধিরস্ত গীতম্”

(পূর্বপ্রকাশিত ৩২শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২২০ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীমদ্ভাগবত ও রূপায়ণ শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুরের এইরূপ অসিদ্ধান্ত দ্বারাও
কি স্পষ্টই প্রমাণিত হয় না যে, অসামুদ্রিক কখনও ‘কৃষ্ণনাম’ উদ্ভূত হয়
না। আবার ‘নামাক্ষর’ কখনও ‘নাম’ নহে, যদি তাহাই হইবে, তাহা
হইলে, যে ‘কৃষ্ণনাম’ একবার জিহ্বাস্পর্শ মাত্র কৃষ্ণপ্রেমা প্রকাশ পান,
সেইরূপ নাম বহুজন্ম ধরিয়া বহুবার কীৰ্ত্তিত হইলেও কেন-ই বা প্রেম
উদ্ভূত হয় না। অতএব ফলের দ্বারা কারণ অনুমান করিবার জ্ঞানিতে
হইবে যে, বহুজন্ম কীৰ্ত্তিত ‘নামাক্ষর’ দেখিতে নামের মত হইলেও নাম
নহেন, নামাপরাধমাত্র। শ্রীমদ্ভাগবত ও শাস্ত্র দেখিতে একরূপ হইলেও
উভয়ে এক বস্তু নহে, তাহা উভয় বস্তুর ফল প্রাপ্তি হইতেই উপলব্ধি
হয়। জোনাকি পোকা, দেখিতে আগুনের মত হইলেও উহা গৃহদগ্ধ
করিতে পারে না, কিন্তু ‘দিঘাশলই’ বা সামান্য একটু টীকার স্পৃশিল গৃহ
দগ্ধ করিয়া দেয়। ফল-প্রাপ্তি হইতেই বুঝা যায় কোন্টি সত্য
সত্য আগুন।

আবার নিসর্গ-নিষ্কল স্বভাববশতঃ বা কৃত্রিম অজ্ঞান জন্মিত অশ্র-
পুলকাদিও প্রেমের লক্ষণ নহে; সুতরাং ‘নামাপরাধ’ আর ‘নাম’ একবস্তু
নহে। আবার ‘নামাভাস’ মধ্যে ‘জায়া-নামাভাস’ ও প্রতিবিম্ব নামাভাসও
একবস্তু নহে, ‘নামাভাস’ ও নামাপরাধও একবস্তু নহে ‘নাম’ ও নামা-
ভাসও একবস্তু নহে। অতদ্বারা ব্যক্তিগণ ভজন হইতে অধিক দূরে অবস্থিত
বলিয়া এই সকল ভজন-জ্ঞান-লব্ধ ভজন-রাজ্যের দৃশ্য পার্থক্যগুলি উপলব্ধি
করিতে পারে না; ইহা তাহাদের দুর্ভাগ্যেরই পরিচায়ক। এই জন্যই
ভূগমসঙ্গমনীতে (দঃ ৩৫২) শ্রীল জীব গোস্বামিচরণ লিখিয়াছেন,—
“নিসত্ত্বানামেবাং সাত্ত্বিকভাসগণনাত্তজেষু সাত্ত্বিকবদ্যভাসন্তে ইত্যপেক্ষয়া”
অর্থাৎ অজ্ঞের নিকট সাত্ত্বিকের ন্যায় প্রতিভাত হয় বলিয়া (এই অপেক্ষায়)
এই সকল নিসত্ত্বদগ্ধকেও সাত্ত্বিকভাসমধ্যে গণনা করা হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণনাম দাক্ষ্যং চৈতন্যস্ববিগ্রহ, পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্য এবং স্বয়ং কৃষ্ণেরই
অধোক্ষজ-শাদি-অবতার। যথা—“একমেব সচ্চিদানন্দ-রসাদি-রূপং তত্ত্বং
দ্বিধাবিভূতম্” (ভূগমসঙ্গমনী ২।১০৮)। অতএব অপ্ৰাকৃত শ্রীকৃষ্ণনাম

কখনও প্রাকৃত ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হইতে পারেন না। সাধুসঙ্গে অর্থাৎ সঙ্গরূপ অনুগত্যে যখন আমাদের জিহ্বা সেবোন্মুখ হয়, তখনই স্বতঃপ্রকাশ শ্রীকৃষ্ণাবতারস্বরূপ শুদ্ধনাম আমাদের সেবোন্মুখ-জিহ্বায় স্বয়ং অবতীর্ণ হন। আমরা আরোহবাদী হইয়া কন্মী, জ্ঞানী বা প্রাকৃত-সহজিয়া, ভূতক-কীৰ্ত্তনীয়া, ভাড়াটিয়া পাঠক, কথক প্রভৃতি বহির্মুখ অসাধুগণের সঙ্গে কখনও নিজ স্বেচ্ছায় বলপূর্ব্বক 'নাম' উচ্চারণ করিতে পারি না। ইহাই শ্রীল রূপগোস্বামিচরণ 'শ্রীভক্তিরসামৃত সিদ্ধি' পূর্ব্ব বিভাগ, ২য় লহরী, ১০০ম সংখ্যাপ্রাপ্ত কারিকায় কীৰ্ত্তন করিয়াছেন—

“অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ”—ইত্যাদি।

“অতএব তা'র মুখে না আইলে কৃষ্ণনাম।

‘কৃষ্ণনাম’, ‘কৃষ্ণ-স্বরূপ’—দুইত’ সমান’ ॥

‘নাম’ ‘বিগ্রহ’ ‘স্বরূপ’—তিন একরূপ।

তিনে ‘ভেদ’ নাহি—‘চিদানন্দ-রূপ’ ॥

দেহ-দেহীরামনাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি ‘ভেদ’।

জীবে-ধর্ম্ম-নাম-দেহ স্বরূপে ‘বিশ্বেদ’ ॥

অতএব কৃষ্ণক ‘নাম’, ‘দেহ’, ‘বিলাস’।

প্রাকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ ॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।১৩১, ১৩২, ১৩৪

অসংসঙ্গে কেন ‘নাম’ হয় না, বহির্মুখের জিহ্বায় কেন বহুবার ‘নামাকর’ উচ্চারিত হইলেও উহা ‘শুদ্ধনাম’ নহে, তাহা আমরা আচার্য্য-গণের বাক্য হইতে আরও দেখাইতেছি—

“স্মার্ত্তাদয়ঃ সদাচার্য্যঃ শাস্ত্রজ্ঞ অপি বহুশো নামগ্রাহিণোহপি * * ঘোরসংসারমেষ প্রাপ্যন্তে” অর্থাৎ স্মার্ত্তাদিব্যক্তি সদাচারী, শাস্ত্রজ্ঞ এবং বহুবার নামগ্রহণকারী হইলেও ঘোর-সংসারগতি-ই লাভ করিয়া থাকে। এই স্থানে “বহুশো নামগ্রাহিণঃ” শব্দের দ্বারা যদি ‘শুদ্ধনাম’-গ্রাহী অনুমান করা হয়, তাহা হইলে ঐরূপনাম-গ্রাহীর ‘প্রেম’ হওয়ার পরিবর্তে “ঘোর-সংসার-গতিই লাভ হয়”—এইরূপ বলার তাৎপর্য্য কি? অতরাং ঐরূপ বহুবার ‘নামগ্রহণ’ (?) কেবলমাত্র ‘নামাকর’ বা ‘নামাপরাধ’ গ্রহণ নহে কি? নামাপরাধের ফল—ঘোর সংসারগতি বা ভুক্তি প্রভৃতি

ফল-লাভ। আর নামের রূপ—“কৃষ্ণপ্রেমা”, আনুবর্তিকভাবে সংসার-ক্ষয়। স্মার্তাদির সাধুসঙ্গের অভাবে সেবোন্মুগতা উদ্ভিত হয় নাই, তাই তাহাদের বহুবার উচ্চারিত ‘নাম’ (১) ‘নামাক্ষর’ মাত্র। শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর সাধুসঙ্গের অভাবে যে কখনও গুণনাম উদ্ভিত হইতে পারে না, তাহাই আবার দেখাইতেছেন, যথা—

“যে গোগর্ভভাদয় ইব নিষয়েহেবেন্দ্রিয়াপি সন্ চারয়ন্তি কো ভগবান্ ক। ভক্তিঃ কো গুরুরিতি যপ্নেহপি ন জ্ঞানন্তি তেষামেব নামাভাসান্বীত্যা গৃহীত-হরিনাম্নামজামিলাদীনামিব নিরপরাধানাং গুরুং বিশাপি তৎতো- বোদ্ধারঃ। হরিভক্তগনীর এব ভক্তনং তৎপ্রাপকমেব তদুপদেষ্টা গুরুরেব গুরুপদিকা ভক্তা এব পূর্বে হরিং প্রাপুরিতি বিবেকবিশেষবাক্ত্বহপি— “নোদীক্ষাং ন চ সংক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্যাং মনোগীক্কে মন্ত্রোহয়ং রমনা- স্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাক্ষক” ইতি (পদ্মাবলী ১৮ অঙ্কধৃত স্বামিকৃতঃশ্লোক) —প্রমাণদৃষ্ট্যা অজামিলাদিদৃষ্টোক্তেন চ কিং মে গুরুকরণশ্রমেণ নামকীর্ণনাদি- ভিবেব মে ভগবৎপ্রাপ্তির্ভাবিনীতি মন্যমানস্ত গুরুংজাগরণমহাপরাধাদেব ভগবন্তং ন প্রাপ্নোতি কিন্তু তস্মিন্লেব জন্মানি জন্মান্তরে বা তদপরাধক্ষয়ে সতি শ্রীগুরুচরণাশ্রিতএব প্রাপ্নোতীতি”।

“কপটতাপশূন্য গুণ-স্বরূপজ্ঞান-বহিতং যদ্ ভগবন্মোচ্চারণং সৈব নামা- ভাসঃ। কপটোন্ম বন্যমগ্রহণং তন্মাপরাধঃ” (মণীষিমালা ১৩শ কিরণ) —কপটতাপশূন্য গুণস্বরূপজ্ঞানবহিত যে ভগবন্মোচ্চারণ, তাহাই ‘নামাভাস’। আর অন্যাভিলাষ, কনককামিনী প্রতিষ্ঠার-লোভে নামগ্রহণের অভিনয়, নাম-দ্বারা পাপক্ষয় বা মোক্ষলাভের অভিলাষাদি সমস্তই নামাপরাধ অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষবাঞ্ছাক্রমে কৈতব বা কপটতার সহিত ‘নামাক্ষর’ উচ্চারণই—নামাপরাধ। শ্রীসনাতন-শিক্ষায় ‘নামাপরাধের’ গর্হণ ও গুণ-নাম-মহিমা স্থাপিত হইয়াছে। ‘নাম’ ও ‘নামাপরাধ’ এক নহে—

“সেবা-নামাপরাধাদি দূরে বিসর্জ্জনঃ ॥

অবৈফল্য-সঙ্গ-ত্যাগ ইত্যাদি”

—(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।১৩-১৪)

* * * ‘নামাপরাধ’ দূরে বিসর্জ্জনঃ।

(ঐ মধ্য ২৪।৩৩)

সম্বন্ধ-জ্ঞান-রহিত অপরাধ-বর্জিত নামোচ্চারণের নাম 'নামাভাস'।
তদ্বারা জীব বিষয়বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া তটস্থভাব লাভ করেন। অজ্ঞামিল
নামাপরাধী ছিলেন না। তাঁহার সাক্ষেত্যরূপ ছায়ানামাভাস তাঁহাকে
বিষয়বন্ধন হইতে মুক্ত করাইয়া তটস্থভাব প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর পূর্বপক্ষ উঠাইয়া লিখিতেছেন, “কেহ যদি বলেন
যে, যে-সকল ব্যক্তি গোপর্দভাদিগ্ণায় বিষয়েই সর্বদা ইন্দ্রিয় চরাইয়া
বেড়ায়, কে ভগবান্, ভক্তিই বা কি, কে-ই বা গুরু—এই সকল কথা
স্বপ্নেও জানে না, সেই সকল ব্যক্তিও যদি নামাপরাধশূন্য অজ্ঞামিলাদির
জ্ঞায় নামাভাসাদি রীতি অনুসারে হরিনাম গ্রহণ করে, তাহা হইলে
তাহাদেরও সাধুসঙ্গ ব্যতীতই উদ্ধার হইতে পারে; শুভ্রমীষ বস্তু—
শ্রীহরি, ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়ই ভজন এবং সেই ভজনের উপদেষ্টাই গুরু
(সাধুশ্রেষ্ঠ), গুরুপদেই ভক্তগণই পূর্বে পূর্বে শ্রীহরিকে লাভ করিয়াছেন,
—এইরূপ বিবেকবান্ হইয়াও “কৃষ্ণনামধরূপ মহামন্ত্র (সেবোন্মুখ) রসনা-
স্পর্শমাত্রই ফলদান করে; দীক্ষা, সংক্রিয়া বা পূরুষচর্যাদি বিধিকে
কিঞ্চিন্মাত্রও অবৈজ্ঞানিক করে না,—এই শাস্ত্রপ্রমাণ দৃষ্টে এবং অজ্ঞামিলাদির
গুরুকরণ ব্যতীতও নামাভাসে মুক্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত দেখিয়া যাহারা মনে
করেন যে, ‘আমার গুরুানুগত্যরূপ শ্রমের আবশ্যকতা কি, নামকীর্তনাদির
দ্বারাই ত’ আমার ভগবৎপ্রাপ্তি হইতে পারে?’—এইরূপ মননশীলব্যক্তিগণ
গুরুবজ্ঞানক্ষণরূপ মহাপরাধ হইতেই ভগবৎপ্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হয়। কিন্তু
সেই জন্মে বা জন্মান্তরে তাহাদের অপরাধ ক্ষয় হইবার পর শ্রীগুরুর
চরণাশ্রয় করিলেই (অর্থাৎ মহাগুরু বা সাধুসঙ্গানুগত্য হইলেই) তাহা-
দিগের ভগবৎপ্রাপ্তি সম্ভব হয়।

উক্ত বিদ্বান্তে কি শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর নামগ্রহণকারীর শ্রীগুরুানুগত্যের
বা সাধুসঙ্গের অত্যাবশ্যকতা প্রদর্শন করিলেন না? সাধুসঙ্গ ব্যতীত
কখনই গুরুনাম উদিত হইতে পারে না। শ্রীঅজ্ঞামিলের দৃষ্টান্তেও আমরা
দেখিতে পাই যে, তিনি সম্বন্ধজ্ঞানরহিত, অপরাধবর্জিত, সাক্ষেত্যরূপ
নামাভাসফলে বিষয়বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া তটস্থভাব লাভ করার পর
বিষ্ণুকিঙ্কর অর্থাৎ সাধু বা বৈষ্ণবসঙ্গলাভে তাঁহাদের প্রমুখাৎ বিগুদ্ধ-
ভাগবতধর্ম অবগত হইয়া সাত্ত্বিক ভক্তিমান্ এবং ভগবন্নামে পরমশ্রদ্ধা-
বিশিষ্ট হইয়াছিলেন। বিষ্ণুকিঙ্করগণের দর্শন ও তাঁহাদের মুখে ভাগবত-

ধর্ম্য শ্রবণ এবং নমস্কারাদি দ্বারা তাঁহাদের সেবা করায় তাঁহাদের নিজ দুষ্কৃতির জন্ত অমৃতাপ ও নামকীর্তনরূপ শুদ্ধাভাগবতধর্ম্য অমূল্যলনের প্রতি ঐকান্তিকী রক্তি উদ্ভিত হইয়াছিল। নামাপরাধের মূলই—‘দেহে আমি ও আমার বুদ্ধি’। অতঃ সমাদি বুদ্ধি হইতেই ‘সাধুনিন্দা, অর্থাৎ অসাধুকে ‘সাধু’ জ্ঞান ও প্রকৃত সাধুকে অসাধুজ্ঞানে গুরু অবজ্ঞা, নামমূলে পাপ-বুদ্ধি প্রভৃতি ‘নামাপরাধ’ উদ্ভিত হইয়া থাকে।

“জন্মৈখর্য্যাক্রান্ত শ্রীভিরেবমানগদঃ পুমান্।

নৈবাহঁতাভিধাতুতং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্ ॥” (ভাঃ ১৮২৬)

‘জগতে আমার কিছু আছে’—এইরূপ অস্মিতাযুক্ত ব্যক্তির মুখে ‘হরিনাম’ কীর্তিত হন না। অকিঞ্চন ব্যক্তির সেবোন্মুখ ভিহ্বায়ই ‘নাম’ উদ্ভিত হন। সাধুসঙ্গ-প্রভাবে অজ্ঞামিল তটস্থাবস্থায় শ্রীসঙ্গাদি অনঙ্গসঙ্গগর্হণ-পূর্বক দেহসম্বন্ধীয় পুত্রাদির স্নেহরূপ সমস্ত বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণু-সম্বন্ধিতীর্থে শুদ্ধনামকীর্তনাদির দ্বারা তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং স্বরূপ-সিদ্ধির পর বস্তৃসিদ্ধি-অবস্থা লাভ করিলেন। যথা—

“মমাহমিতি দেহাদৌ ভিহ্বা মিথার্থধীর্মতিম্।

ধাত্মো মনো ভগবতি শুদ্ধং তং কীর্তনাদিভিঃ ॥

ইতি জাতহর্নির্বেদঃ ক্ষণসংগেন সাধুযু।

গঙ্গাদ্বারমুশেষায় মুক্ত সর্বানুবন্ধনঃ ॥” (ভাঃ ৬২।৩৮-৩৯)

—শ্রীঅজ্ঞামিল কহিলেন, “আমার বুদ্ধি এখন সত্যস্বরূপ পরমার্থ-বস্তুর উদ্ভিত হইয়াছে, এখন আমি দেহাদিতে ‘আমি ও আমার’ এইরূপ মতি পরিত্যাগ করিয়া ভগবন্নাম-কীর্তনাদি দ্বারা শুদ্ধ (সেবোন্মুখ) মন শ্রীভগবানে নিয়োগ করিব।” হে রাজন্, অজ্ঞামিলের ক্ষণকালমাত্র সাধুসঙ্গ হইয়াছিল, তাহাতেই তাঁহার ঐপ্রকার সুন্দর নির্বেদ জন্মিল। তিনি পুত্রাদি স্নেহরূপ সমস্ত বন্ধন মুক্ত করিয়া হরিতত্ত্বনার্থ গঙ্গাদ্বারে গমন করিলেন।

ভাগবতীয় এইরূপ স্পষ্ট উদাহরণ থাকিতেও কি নামাপরাধী প্রাকৃত-সহজিয়াগণ বলিবেন না যে,—

“অসাধুসঙ্গে ভাই, ‘কৃষ্ণনাম’ নাহি হয়,”

“কছু নামাভাস হয়, সদা নামাপরাধ” (ক্রমশঃ)

অষ্ট মহাদ্বাদশী

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে শ্রীল গোস্বামিগণের বিশিষ্ট অবদান হইল অষ্ট মহাদ্বাদশী-ব্রত ব্যবস্থা। ইহা অন্য কোন সম্প্রদায়ে প্রচলিত নাই। শ্রীহরিতত্ত্ববিলাস গ্রন্থই এই সম্প্রদায়ের একমাত্র স্মৃতি-ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণীয়। ইহাকেও বহু বিচারসঙ্কুল করিয়া তাহাতেই বুদ্ধি নিবিষ্ট রাখিয়া ব্রতভঙ্গ-প্রসঙ্গ তাঁহাদের হার্দি নয়। তাই সহজভাবেই তাহা বলিয়াছেন। আরও বিশেষতঃ ব্রতের উদ্দেশ্য ভগবদারাধনাই। তজ্জন্ত যদিবা কিছু বৈষ্ণব্যও হইয়া পড়ে, তাহা অধর্ম বা পাপজনক হইতে পারে না, তাই শাস্ত্রে—স্কান্দে রেবাক্ষণ্ডের “ধর্মোত্তবত্যধর্মোহপি কতো ভক্তৈস্ত্রবাচ্যত” (১০।৭১ হঃ ভঃ বিঃ) মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধর্মায় কল্পতে। মামনাদৃতা ধর্মোহপি পাপং স্থান্যং প্রভাবতঃ” (১০।১২৬ হঃ ভঃ বিঃ) এইরূপই বলা হইয়াছে। শ্রীগীতাতেও তক্তিকেই লক্ষ্য করিয়া “নেহাভিক্রমনাশোহস্তি প্রত্যাবায়ন বিজ্ঞতে” উক্ত হইয়াছে। কাজেই কোন কাজের উদ্দেশ্য শ্রীভগবৎপ্রীতি হইলে তাহাতে ভয়ের কিছুই নাই, বিশেষতঃ ভগবদারাধনা মঙ্গলজনকই, তাহা কখনও অমঙ্গল আনয়ন করে না।

যেমন শুদ্ধাএকাদশী বা দ্বাদশীর মর্যাদার জন্যই কোনও সম্প্রদায় অর্দ্ধরাত্রেও দশমী-বিজ্ঞা একাদশী ত্যাগ করেন, তাহাতে বিষ্ণুতিথিরই সম্মান দেওয়া হয়। সেইরূপ কেহ যদি মহাদ্বাদশীর সম্মানের জন্ত একাদশী ত্যাগও করেন, তাহাতে তত্ত্বধর্মের কোনও দোষ হইতে পারে না। বিশেষতঃ সাধারণ ভাবেই বলা হইয়াছেন, “একাদশী ধ্বংসীপাত্ত্ব দ্বাদশী চক্রপাণিনঃ” ধর্মোব্বিদতোঃ শ্রদ্ধাদ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ”। এখানে মহাদ্বাদশীর অপেক্ষা না করিয়াও দ্বাদশী করিতে বলা হইয়াছে। কাজেই মহাদ্বাদশীর জন্য একাদশী-ত্যাগে প্রত্যাবায়-প্রসঙ্গই আসে না। বরং বিছাগর্ভে গর্ভিত হইয়া কেহ যদি জোরপূর্বক কাহাকেও মহাদ্বাদশী না করিয়া একাদশীতেই ব্রত করাইতে চান, তবে উহাই হইবে পাপজনক। কারণ “তর্কাপ্রতিষ্ঠানাং” ন্যূয়ে তাহার বিচারও কালে অনুথা হইতে পারে বা শ্রীসার্কভোগের ১৮ প্রকার “আত্মারাম...” শ্লোক ব্যাখ্যার স্থায় একটী ব্যাখ্যাও “মূলানুগত বা গ্রন্থকারের হার্দি নাও হইতে পারে। তাই এ সকল বিচার অনাবশ্যক

তথাপি স্বপক্ষের যুক্তিগুলিই দ্বিজ্ঞান্সদের উৎসাহ নিবৃত্তির জন্য আলোচিত হইতেছে।

প্রথমতঃ বিচার্য্য যে, এই ব্রতগুলির অঙ্গী এবং অঙ্গ কি কি অর্থাৎ কাহার জন্ত ব্রত বা কাহার ব্রতস্ববিধান মুখ্যতঃ করা হইতেছে। পূর্ববচনে বলা আছে “নক্ষত্রযোগাচ্চ অপরাচতস্রঃ” পরবচনেও পুষ্পশ্রবণপুষ্পাচ্চরোহিণী-সংযুতাস্ত তাঃ” এখানে দেখা যাইতেছে যে, বিশেষ্য বা মুখ্যরূপে দ্বাদশীই বিহিত, তাহার বিশেষণ রূপেই নক্ষত্রগুলি নির্দিষ্ট হইয়াছে। বিশেষ্যে বাধ থাকিলেই বিধি-নিষেধসী বিশেষণে সংক্রান্ত হয়, কিন্তু এখানে বাধ না থাকায় তাহাই মুখ্য বা অঙ্গী হইবে, কারণ পূর্বেও সন্দেহমাত্রও দ্বাদশীতে উপবাস বিহিত হইয়াছে। যদিও তাহা শ্রীজন্মান্বিতমীর রোহিণী-যোগের ন্যায় ভাগসহ নয়, তিথি-নক্ষত্র পরস্পর অবিশৃঙ্খল সম্পর্কে জড়িতই তথাপি ১৫শ বিঃ শ্রবণা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে “তিথি নক্ষত্ররোম্যোগে যোগশ্চৈব নরাধিপ বিকলো যদি লভ্যতে স জ্ঞেযো হৃষ্টবায়িকঃ। অতাল্পোহি পানয়ো-র্যোগো ভবেত্তিথিভয়োঽধি, উপাদেয়ঃ স এবস্তাদিতাত্রোপবেদধুধঃ।” এসব স্থলেও দেখা যায় যে, তিথি ও নক্ষত্রেরই সম্বন্ধ প্রবল, উভয়ের মুখ্যত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিচারের বিষয় নয়। দ্বিতীয়তঃ যেখানে জয়াদির লক্ষণ করা হইয়াছে, তথায় শুধুমাত্র যোগকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে সমন্যাদির লক্ষণে প্রবেশ নাই যথা দ্বাদশ্যাস্ত্রনিতেনকে ঋকং যদি পুনর্ব্বক্ষঃ, যদাত্তুশ্চ দ্বাদশ্যং নক্ষত্রং শ্রবণং ভবেৎ, দ্বাদশ্যং রোহিণীযোগে জয়ন্তী নামসূত্রতং, যদাত্তুশ্চ দ্বাদশ্যং পুষ্পাভবতি কহিচিং” ইত্যাদি। তাহা হইলেই জয়ন্তীযোগের ন্যায় নিত্যত্ব রক্ষার জন্য তাদৃশ সম নূনাদি যোগকেও ফলবিশেষার্থই বলা যায়, অন্তথা তাদৃশ যোগাভাবে ব্রতলোপাপত্তি হুস্পরিহরই হইয়া পড়ে। তাই সেখানে প্রদর্শিত দ্বিজ্ঞান্সসারে এখানেও তাদৃশযোগাভাবে ব্রতাব্যব প্রযুক্ত হবে না ইহাই বলিতে হয়। এখানেও তাদৃশযোগাভাবে ব্রত হইবে না একরূপ সাক্ষাৎ নিষেধ ক্রটিতে নাই; ঔচিত্যাদির কথাই বলা আছে মাত্র। মূল লক্ষণেও তাদৃশ সমাদির প্রবেশ নাই। তাই অগত্যা তাহাকে বৈশিষ্ট্যার্থই বলিতে হয়। বিশেষতঃ বৈষ্ণবগণের পক্ষে অষ্ট মহাদ্বাদশীরও একাদশীবৎ নিত্যত্বই গোপ্তামিগণ উদ্বোধিত করিয়াছেন। এখানেও “বাসন্ত” গতাযামণিনঃ “তদাপ্যেবা” “ব্রতৌচিতী” প্রভৃতি কথার দ্বারা রোহিণীাদির তাদৃশ যোগফল বিশেষ সাধকই হইবে অন্তথা নিত্যতাহানি।

অর্কোদয়মাত্র নক্ষত্র প্রবৃদ্ধি হয়ত ১০।২০ বৎসরেও মিলিবে না, তাই সেখানে কোন বিচারেরই কাজ নাই বলিলেন, আর পূর্বনিশি প্রবৃত্ত নক্ষত্র প্রায়ই মিলে তজ্জন্য সেখানেও নূনত্বের পরিহার করিলেন, তাহাতে ত্রুত লোপের আশঙ্কা থাকিবে না।

যদি ৬০ দণ্ড থাকে অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে নূন উল্লেখ করিতে পারিতেন না বরং পরকল্পেই নূনত্বের আশঙ্কা থাকায় তাহারই নিবেদন করিতেন। (ক্রমশঃ)

—শ্রীস্বরেজচন্দ্র পঞ্চতীর্থ, বি, এ (অনাস)

প্রাক্তন অধ্যক্ষ,

নবদ্বীপ সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়

শ্রীশ্রীরথযাত্রা-মহোৎসব

শ্রীশ্রীগনাপদেবের রথযাত্রা-উপলক্ষে সমিতির আকরমঠ নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠে রথযাত্রা-মহোৎসব বিপুলভাবে উদযাপিত করা হয়। ফাঁসিতলা ঘাটনিবাসী শ্রীনগেন্দ্রনাথ সাহা মহাশয়ের পূজা-মণ্ডপে শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দিরের স্থানরূপে বেশ কয়েক বৎসর যাবৎ ব্যবস্থা হইয়া আসিতেছে। তাই-রথযাত্রার প্রাকদিবসে শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দির মার্জন উপলক্ষে ২৯শে আষাঢ় (ইং ১৩।৭।৮০) রবিবার কীৰ্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ পূর্বাত্নে শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয়মঠ হইতে যাত্রা করিয়া উক্ত গুণ্ডিচা বাড়ীতে পৌঁছিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তজিবেদান্ত উর্দ্ধমহী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা প্রসঙ্গ উদ্ধৃতপূর্বক পাঠমুখে ব্যাখ্যা করেন। তদনন্তর ভক্তগণ শ্রীমন্দির মার্জনা দি করিলে কীৰ্ত্তনমুখেই প্রত্যাবর্তন করা হয়।

৩০শে আষাঢ় (ইং ১৪।৭।৮০) সোমবার ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে যথারীতি মঙ্গলারতি সমাপনান্তে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তজিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ শ্রীশ্রীগনাপদ-বলদেব-স্বতন্ত্রাজীউর প্রকাশের ইতিবৃত্ত প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া ভক্তগণের প্রচুর আনন্দবিধান করেন।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথখানি নবসাজে সুসজ্জিত হইতে থাকে। মধ্যাহ্নে নানাবিধ উপকরণাদি নিবেদিত হইলে সহস্র সহস্র আগন্তুককে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। পরে অপরাহ্নে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে রথাক্রম করিয়া মহরগতিতে সহস্র সহস্র আবাল-বৃদ্ধ বণিতা সকল শ্রেণীর মানুষই রথাকর্ষণ করিতে থাকেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথখানি মহর গতিতে নবহীপ সহরের মুখ্য মুখ্য পথ অতিক্রম করাকালে অগণিত ভক্তগণের “জয় জগন্নাথ, বলদেব কি জয়”—ধ্বনিতে জনগণ উদ্বেলিত হইয়া পড়েন। পরে সন্ধ্যালগ্নে গুণ্ডিচা-মন্দিরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব উভবিজয় করেন।

শ্রীশ্রীজগন্নাথজীউ গুণ্ডিচা-মন্দিরে অষ্টম দিবস অবস্থান করিয়া নবম দিবসে প্রত্যাবর্তন করেন। ভক্তগণ মানসপটে গুণ্ডিচা-মন্দিরকে সুন্দরাতল ও জগন্নাথ-মন্দিরস্থলীকে নীলাচল-সদৃশ ভাবনা করেন। প্রত্যাবর্তনের দিনই পুনর্ধাত্রা। ইহা এংসর ৬ই শ্রাবণ (ইং ২২/৭/৮০) মঙ্গলবার অমুষ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত কয়েক দিবস গুণ্ডিচাবাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ, কীর্ত্তন ও ছায়াচিত্রে শ্রীগৌর-কৃষ্ণলীলাদিও প্রদর্শিত হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিষামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সম্যাসী মহারাজ, শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী ও শ্রীনকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী প্রমুখ বক্তাগণ বিভিন্ন দিন ছায়াচিত্রে বক্তৃতা করিয়াছেন। পুনর্ধাত্রার পূর্বদিবস শ্রী গুণ্ডিচা-বাড়ীতে আগন্তুকমাত্রকেই প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন শ্রীনগেন্দ্রনাথ সাহা মহাশয়। তাঁহার এইরূপ উদার ব্যবস্থাপনার জন্ত সকলেই ভূয়সী প্রশংসা করেন।

আরও সংবাদ—এই যে, শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অগ্রতম প্রচারকেন্দ্র চুঁচুড়াস্থ শ্রীউদ্ধারণ-গৌড়ীয় মঠ ও শিলিগুড়িস্থ শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয়মঠেও যথারীতি রথযাত্রা-মহোৎসব অনুষ্ঠান হইয়াছিল। স্থানাভাবে সংক্ষেপে প্রকাশ করা যায় যে, ঐ দুই মঠের পরিচালনায় যথাক্রমে ত্রিদণ্ডিষামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিষামী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত-ত্রিদণ্ডী মহারাজ-এর তত্ত্বাবধানে উক্ত দুইস্থানের মহোৎসব সুষ্ঠুভাবে উদ্বাপিত হইয়াছে। স্থানাভাবে উহার বিশদ বিবরণ এখানে প্রকাশিত করিতে না পারায় আমরা তুষিত।

—শ্রীপূর্ণানন্দদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়ন্তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরদোকজে ।

ধর্মঃ স্তুতিতঃ পুংসাং বিশ্বক্সেন কথ্যত্ব যঃ ।



নোংপাদয়েদযদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ।

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়ান্না হুপ্রসীদতি ।

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম ।
অদোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিদগ্ধ ।

অত্র ধর্ম হুটুরূপে গালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে গড় সেই শ্রম ।

৩২শ বর্ষ } ২৩ পদ্মনভ, গর্ভোদশায়ী, ৪২৪ গৌরাঙ্গ { ৮ম সংখ্যা
৩০ শাশ্বিন, শুক্রবার, ১৩৮৭ ; ইং ১৭৮১-১৯৮০

সান্নিহাদং

শ্রীশ্রীবলরাম-শোভন

[ত্রীকান্দে উৎকলখণ্ডে সপ্তবিংশ-অধ্যায়ে]

[স্তব্রথং তং জগন্নাথং বেদার্থঃ সঃ পিতামহঃ ।

জগাম দীর্ঘিণং দ্রষ্টুমবতীর্ণং ধরাধরম্ ॥৩৯॥

প্রণম্য পরয়া ভক্ত্যা তুষ্টাব বলিনং মুদা ॥৪০॥]

[পিতামহ ব্রহ্মা সেই জগন্নাথ হরিকে এইরূপ স্তব করিয়া অবতীর্ণ ধরাধর বলভদ্রকে দর্শনার্থ গমন করিলেন । অনন্তর পরম ভক্তিসহকারে বলদেবকে প্রণামপূর্বক এইরূপে সান্নিহে স্তব করিতে লাগিলেন ॥৩৯-৪০॥]

পাদাশোভ-প্রপন্নানাং নমঃ পাপোষদারিণে ।

অনন্ত-বত্তন-নয়ন-শোভ-পাদাঙ্গি-বাহবে ॥১॥

দেব ! বাহারা আপনার চরণকমলের আশ্রয় গ্রহণ করে, আপনি তাহাদিগের অখিল পাপরাশি বিদূরিত করিয়া থাকেন। আপনার চক্ষু, কর্ণ, মুখ ও হস্ত-পদাদি অনন্ত ; আপনাকে নমস্কার ॥১॥

নমোহনাদি-মহামূল-তমস্তোমৈকভানবে ।

ত্রয়ীময় ত্রিধাদোষ-নাশায় ত্র্যবতারিণে ॥২॥

প্রভো ! আপনার আদি নাই, আপনিই বিশ্বের মহামূলস্বরূপ, তমোরাশি নিবারণের আপনিই অদ্বিতীয় সূর্যাসম ; আপনিই স্বকৃ, যজুঃ, সাম—এই বেদত্রয়ের স্বরূপ, আপনার কৃপায় আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ দোষই প্রশমিত হইয়া থাকে এবং আপনি ত্রিমুখিতে অবতীর্ণ ; অতএব আপনাকে পুনর্বার নমস্কার করি ॥২॥

ফণা-মণিকণাকার ক্ষিতিমণ্ডলধারিণে ।

নমঃ কালাগ্নিক্রুদ্রায় মহাক্রুদ্রায় তে নমঃ ॥৩॥

প্রভো ! আপনি দ্বিজ-বস্ত্রে দীপ্যমান হইয়া কলাতুল্য বিমাল এই ক্ষিতিমণ্ডলকে অঙ্গীলাক্রমে ধারণ করিতেছেন। আপনি কালাগ্নি ক্রুদ্র ও মহাক্রুদ্র-স্বরূপ ; আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥৩॥

ভোগতল্লফণাচ্ছত্র-মধ্যস্থপ্তায় তে নমঃ ।

মহার্ণব-জলে বুদ্ধে একীভূতে জগজ্জয়ে ॥৪॥

দেব ! প্রলয়কালে মহার্ণব-জল বর্ধিত হইলে, যে সময় তদ্বারা জগজ্জয় প্রাবৃত হইয়া একীভূত হয়, যে-সময় আপনি স্বীয় কুণ্ডলিত প্রকাণ্ড শরীরকে শয্যা ও ফণামণ্ডলকে ছত্র করিয়া সুখে নিদ্রা গিয়া থাকেন ; অতএব অনন্ত-মহিম আপনাকে নমস্কার ॥৪॥

ত্বমেব শেষে ভগবন্ সহস্রফণমণ্ডিত ।

ফণামণিগণব্যাজ-সমুত্তাখিলভৌতিক ॥৫॥

হে ভগবন্ ! আপনি স্বীয় অনন্ত ফণামণ্ডলে যেন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অখিল সম্পৎ মস্তকে ধারণ করত সহস্র ফণামণ্ডলে মণ্ডিত হইয়া প্রলয়-পর্যায়কালে সুখে শয়ন করিয়া থাকেন ॥৫॥

ত্বমেব নাথ সর্বেষাং প্রপূর্ণা পালয়িতা প্রভো ।

অন্তা ধারয়িতা নিত্যং সদাশান্তিমিমিত্তকাঃ ॥৬॥

নাথ! আপনিই সকলের শ্রেষ্টা, পালয়িতা ও সংহারকর্তা। একমাত্র আপনিই ধরণীমণ্ডল ধারণ করিতেছেন; প্রভো! আপনি অস্মাদি সকলেরই মূল কারণ ॥৬॥

এব নারায়ণো যো বৈ বেদান্তেষু পণীয়তে ।

ত্বন্তো ন ভিন্নো ভগবন্ কারণান্তেদভাগসি ॥৭॥

ভগবন্! সমুদয় বেদান্ত-শাস্ত্রে ঐহিকই মহিমা বর্ণিত আছে, সেই ভগবান্ নারায়ণ আপনি হইতে ভিন্ন নহেন, কেবল অনির্বচনীয় কারণ-বশতই তিনি পূর্বরূপে বিরাজ করিতেছেন ॥৭॥

শয্যা ত্বং শয়িতা হ্যেয ছাত্তশ্চ ছাদকো ভবান্ ।

যো বৈ কৃষ্ণঃ স বৈ রামো যো রামঃ কৃষ্ণ এব সঃ ।

যুবয়োরন্তরং নাস্তি প্রসীদ ত্বং জগন্ময় ॥৮॥

আপনি শয্যা, নারায়ণ শয়নকর্তা, আপনি ছাদক, নারায়ণ ছাত্ত। বস্ত্রতঃ যিনিই কৃষ্ণ, তিনিই রাম, এবং যিনিই রাম, তিনিই কৃষ্ণ। আপনাদের উভয়ের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই; অতএব, হে জগন্ময়! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥৮॥

প্রতিবন্ধক

প্ৰীতিই জীবমাত্তের প্রাপ্য

জীবমাত্তেরই প্রাপ্য বস্তু প্ৰীতি। সেই প্ৰীতি অনিত্য হইলে তাহাকে শুদ্ধ-অখণ্ড-প্ৰীতি বলা যায় না। প্ৰীতির অহুৎক্ষান-চেট্টা, সকল সময়ে সকল জীবেরই লক্ষিত হয়। পুত্রশোক-কাতরা মাতা প্ৰীতিলভের আশায় শোক করিয়া থাকেন, প্ৰীতিলভের আশায় বিলাসপর জীবগণ নৃত্য-গীত-বাছাদির চেষ্টা করেন, ইন্দ্রিয়তর্পণ-মানসে প্ৰীতির উদ্দেশ্যে কত অবটনীয় শুভাশুভ কর্মের প্রবৃত্তি হয়।

প্ৰীতি-লাভই চेतনের ধর্ম, চেষ্টা, প্রার্থনা

আজও মনবজ্ঞানে প্ৰীতি-লাভ-উদ্দেশ্য ব্যতীত চेतনের অল্প ধর্ম লক্ষিত হয় নাই। চेतনের চেষ্টামাত্রই প্ৰীতিকে লক্ষ্য করিয়া ধাবিত

হইয়াছে। এমন একটী বস্তু কি-প্রকারে পাওয়া যায়, তাহার অনুসন্ধানে সমগ্র চেতন জগৎ সর্বদাই বাস্তব। জীব সর্বদা প্রীতি অনুসন্ধান করেন, সুতরাং নিত্যপ্রীতিই জীবের প্রার্থনীয়।

নিত্য প্রীতির অভাব ও তৎফলভে বাধা

যেখানে প্রীতির অনুসন্ধানকারী নিজের অন্তিহকে অনিত্য অভিমান করেন, সেখানে তাহার লক্ষ্য বস্তুও অনিত্য হইয়া যায়। নিত্য-প্রীতির অভাবে নিত্য প্রীতিলাভ-চেষ্টা জীবে দেখা যায়, কিন্তু সেই প্রীতি কালদ্বারা এবং সীমাদ্বারা পণ্ডিত হওয়ায় নিত্যত্বের ও স্বভাবের ব্যতিক্রম দেখা যায়। জীবের প্রীতি যে-কাল পর্য্যন্ত কাল ও সীমার অধীন থাকে, তৎকালাবধি নিত্য-প্রীতি-চেষ্টা থাকিলেও তাহা বাধা প্রাপ্ত হইতে থাকে।

‘হরিবিমুখ জগৎ কাল ও সীমার অধীন

জগতে যাবতীয় বস্তু কাল ও সীমার অধীন; কেবলমাত্র ভগবত্তা কাল ও সীমার অধীন নহে; কারণ কাল ও সীমা ভগবান্ হইতে জন্মলাভ করিয়া প্রাকৃত জগতে ভগবৎবিমুখকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে। ভগবানের কথা পড়িলেও হরিবিমুখ জনগণ ভগবান্কে দেশ-কালের মধ্যে আনিয়া ফেলেন।

হরিবিমুখতা দূর হইলে ভগবৎস্বরূপের অভিব্যক্তি

জীবের ‘হরিবিমুখতা’ বিগত হইলে তিনিও মায়িক নিম্নভোগ্য দেশ-কালের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হন। হরির বিমুখ জীব তাহার অনিত্য ও সসীম উপলব্ধি ছাড়িয়া দিলে কাল, সীমা ও মায়াভীত জনক-ভগবানের স্বরূপ বুঝিতে পারেন।

প্রীতির অনুসন্ধান স্বভাবগত, এবং তাহা প্রাকৃত- অপ্রাকৃতভেদে দ্বিবিধ

নিত্য ও অসীম প্রীতির অনুসন্ধান ভীষ্মাত্মেরই বৃত্তি। তাহা তিনি সকল সময় লক্ষ্য করিতে পারেন আর নাই পারেন, তাহার ঐ ধর্ম্য কোন সময় তাহার দৃষ্টি ছাড়িয়া যায় না। যাহারা প্রীতি অনুসন্ধান করেন, তাহারা দুই ভাগে বিভক্ত। এক ব্যক্তি অনিত্য-প্রীতির অনুসন্ধানকারী অপর জন নিত্য-প্রীতির অনুসন্ধানকারী; অর্থাৎ এক শ্রেণীর লোক প্রাকৃত ও অপর শ্রেণীর লোক অপ্রাকৃত। অনিত্যতা ও সীমা-বিশেষ

ধর্ম প্রাকৃত; নিত্যতা ও বৈকুণ্ঠ-ধর্ম অপ্রাকৃত। প্রাকৃত হরিবিমুখ জন অনিত্য সুখ-লালসায় প্রমত্ত; অপ্রাকৃত সেবোন্মুখগণ কৃষ্ণসুখ-লালসায় তাৎপর্যবান্।

প্রাকৃত হরিবিমুখের স্বভাব-সংবন্ধে ভোগ্য জ্ঞান

হরিবিমুখতাক্রমে তাহারা অনিত্যের ও মায়িক বস্তুর আদর করিতে শিখিয়াছেন—এমন কি অপ্রাকৃত-জনগণের সেবা কৃষ্ণচন্দ্রকে, কৃষ্ণভক্তিকে ও কৃষ্ণভক্তকে তাহারা নিজের ভোগ্য-বস্তু মনে করেন। মুখে অপ্রাকৃত শব্দ বলিয়া নিজ অনিত্য-প্ৰীতির বিপণি প্রসারণ করেন; ইহার ফলে তাহাদের নিত্য প্ৰীতিময়-বিগ্রহ কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎকার হয় না। অনিত্য প্রাকৃত পিণ্ডবিশেষ-জ্ঞানে কৃষ্ণকে, কৃষ্ণভক্তিকে বা কৃষ্ণভক্তকে নিজ অনিত্য ভোগ্য-বস্তু বলিয়া ধারণা করেন।

অপ্রাকৃত ভক্তের স্বভাব-দুঃসঙ্গ ত্যাগ

অপ্রাকৃত ভক্তের তাদৃশ ধারণা নাই। যে-কালে প্রাকৃত ব্যক্তি অপ্রাকৃত ধারণাকে কলুষিত করিবার অভিপ্রায়ে অনিত্য-প্ৰীতির আবাধন করেন, তৎকালে ভক্ত তাহাকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করেন এবং বিমুগ্ধ দুঃসঙ্গ বলিয়া জানেন।

ভক্তের সহিত হরিবিমুখ অভক্তের পার্থক্য

প্রাকৃত হরিবিমুখ-জনের সহিত ভক্তের পার্থক্য এই যে, ভক্ত প্রাকৃত প্রতিবন্ধক বা দুঃসঙ্গ ত্যাগ করেন, অভক্ত দুঃসঙ্গকে অনিত্যপ্ৰীতির আশায় ছাড়িতে চান না। মাদকদ্রব্যসেবী কোনক্রমে তাহার মাদক দ্রব্য ত্যাগ করিতে পারেন না, জৈন কখনই তাহার সেব্য বোধিতের সঙ্গ ছাড়িতে পারেন না, প্রাকৃত জ্ঞানাজ্ঞান পণ্ড তাহার বৎস পরিত্যাগ করিতে পারে না, দুঃসঙ্গ ছাড়িতে অসমর্থ হওয়াতে তাহাদের এইরূপ অনিত্যে অভিনিবেশ।

দুঃসঙ্গ-ত্যাগই মঙ্গলের আকর

প্রাকৃত বন্ধুসঙ্গে বন্ধ থাকিলে কৃষ্ণকে বা কৃষ্ণভক্তকে একমাত্র বন্ধু বলিয়া বোধ হয় না। প্রমত্তের মাদক দ্রব্যের হস্ত হইতে, জৈনের জী-হস্ত হইতে পরিত্যাগ পাওয়া বড়ই দুর্লভ। কিন্তু দুঃসঙ্গ না ছাড়িতে পারিলে কখনই কোন মঙ্গল হয় না।

অভক্তগণের অপচেষ্টার ফলে সমাজের অহিত-সাধন

প্রাকৃত অভক্তগণ অনেক সময়ে স্ব-স্ব অভিনিবেশ পরিত্যাগ করা দূরে থাক, আত্মপ্রত্যাহার উদ্দেশে কৌশল বিস্তার করিয়া কপটতা আশ্রয়পূর্বক

অপ্রাকৃত সমাজকে বধনা করেন। প্রাকৃত অন্তর অন্তরের সাজে নিরীহ লোকদিগকে গজিকাদি মাদক দ্রব্য খাইতে শিক্ষা দেন; বিলাসিতা, ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা প্রভৃতি দুর্বৃত্তাচরণ—অপ্রাকৃত ভজনের অঙ্গবিশেষ বলিয়া প্রচার করিয়া নিজ প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি করেন।

অপ্রাকৃত ভক্ত-সমাজের অন্তরের প্রতি উপেক্ষা

অপ্রাকৃত সমাজ এই শ্রেণীর মিচ্ছাভক্তগণকে কপট অভিনয়কাণ্ডী জানিয়া তাহাদিগকে উপেক্ষা করেন। অপ্রাকৃত হইবার যে-সকল উপায়—‘অপ্রাকৃত শাস্ত্র’ ও ‘অপ্রাকৃত ভক্তের মুখে পাঠ বা শ্রবণ’—তাহাও প্রাকৃত পাঠক বা শ্রোতা প্রাকৃত হৃৎসঙ্গময় বুদ্ধিক্রমে বিপর্যাস্ত করেন। প্রাকৃত অন্তরগণ নিজ-নিজ দল স্থাপন করিয়া নিরপেক্ষ সত্য আচ্ছাদনপূর্বক হরিবিমুখতা সংগ্রহ করেন।

প্রাকৃত সহজিয়ার অনিত্য-প্ৰীতি

নিত্যপ্ৰীতি-লাভের পরিপন্থী

নিত্যপ্ৰীতি, নিত্য বৈকুণ্ঠবস্ত কৃষ্ণচন্দ্রেট অবস্থিত। নিত্য কৃষ্ণভক্ত নির্বালীক হইয়া সেট নিত্যপ্ৰীতিময়-বিগ্রহ কৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। থোসা লইয়া টানাটানি করিলে যেমন শস্তলাভ ঘটে না, মিচ্ছাভক্তগণ স্ব-স্ব হৃৎসঙ্গ পরিত্যাগ না করিয়া অনিত্য বস্তকে ‘কৃষ্ণপ্ৰীতি’-সংজ্ঞা দিয়া নিত্যপ্ৰীতি লাভ করিবেন, এরূপ আশাও তাহাদের দুরাশা। অনিত্য-প্ৰীতির অনুসন্ধানে প্রাকৃত হৃৎসঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহাকে কখনই অপ্রাকৃত চেষ্টা বলা যাইতে পারে না। কাষ্ঠের সিংহ যেরূপ হিংসা করিতে অসমর্থ, গাভীদ্বয়ের যোগে যেরূপ বৎসোৎপত্তি অসম্ভব, কৃত্রিম স্বর্ণের দ্বারা প্রাকৃত স্বর্ণের সাম্য যেরূপ হয় না, প্রাকৃত সহজিয়া যতই কেন না ভক্ত্যঙ্গসমূহকে নিজকর্ষ-চেষ্টা দ্বারা ভোগে নিযুক্ত করুন, কিছুতেই কৃষ্ণপ্ৰীতি-লাভ তাহার ভাগ্যে ঘটিবে না।

কর্ম, জ্ঞান ও অত্যাভিলাষ কৃষ্ণপ্রেম-লাভের প্রতিবন্ধক

প্রাকৃত কর্মের দ্বারা কলভোগ হয়, প্রাকৃত জ্ঞানের দ্বারা ফলভাগ হয়, যথেষ্ট দ্বারা অনিত্য ইন্দ্রিয়-সুখ লাভ হয়। কিন্তু অপ্রাকৃত ভজন-প্রভাবে কৃষ্ণপ্রেম ফলস্বরূপে উদয় হয়। অতন্নি চেষ্টাবারা অথবা কৃত্রিম হরিসেবা দ্বারা কখনই কৃষ্ণপ্রেম পাওয়া যায় না। চক্ষু বা কর্ণদ্বারা যেরূপ খাদ্য গ্রহণ করিয়া ক্ষুধিবৃত্তি হয় না পরন্তু মুখদ্বারা খাদ্য গৃহীত হইয়া

উদরস্থ হইলে ক্ষুধিবৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ অপ্রাকৃত সেবানুগতা ব্যতীত হরিসেবা হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রাকৃত প্রতিবন্ধক থাকিলে কখনই জীব কৃষ্ণোন্মুখ হইতে পারে না। এতৎপ্রদক্ষে শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটী প্রতি-বন্ধক-বিচারে সৰ্ব্বতোভাবে আলোচ্য।

যস্মান্নবৃদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে, যধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।

যতীর্থবৃদ্ধিঃ সলিলে চ কহিচ্চিজনৈষ্যভিজ্যেযু স এব গোশ্বরঃ ॥

(ভাঃ ১০।৮৪।১৩)

প্রাকৃত সহজিয়া কৃষ্ণভক্ত নহে

গর্দভ দ্রব্য বহন করে, হাতা নৃপ পরিবেশন করে, কিন্তু তাহারা উহার আশ্বাদন পায় না। যেরূপ কাচে আবদ্ধ মক্ষিকো কাচ অতিক্রম করিতে পারে না, সেরূপ প্রাকৃত সহজিয়া নিত্য-প্ৰীতিলভ করে না অর্থাৎ কৃষ্ণভক্ত হইতে পারে না।

প্রাকৃত সহজিয়া ভারবাহী গর্দভ ও তাহার

অমপূর্ণ বিচার

প্রাকৃত সহজিয়া ভারবাহী গর্দভ। ইনি বাতশিত্তকফাত্মক প্রাকৃত শরীরকে অপ্রাকৃত আত্মা মনে করেন, নিজ প্রাকৃত ভোগ্য স্ত্রী-পুত্রাদিকে অপ্রাকৃত বলিয়া বিশ্বাস করেন, বিষু-কলেবরকে প্রাকৃত জ্ঞান করেন এবং সলিলাদি ভড় বস্ত্র-সাহায্যে ভড় চিং হইয়া যাব—মনে করেন। প্রাকৃত ব্যবধান থাকিলে কখনই অপ্রাকৃতের উপলব্ধি হয় না। দেহ, দ্রবিশ, আভিজন্ম সুখ, লোভ, মায়াধীশ ও মায়াবশে সমজ্ঞান প্রভৃতি প্রাকৃত প্রতিবন্ধকসমূহ পরম প্ৰীতি-বিগ্রহের প্রেম-লাভ করিতে বাধা দেয়।

সহজিয়ার প্রতি উপদেশ

ভাই জীব! শ্রীশ্রী প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামী তোমাকেই একদিন বলিয়াছেন,—

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োনিপত্য কৃষ্ণা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।

হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাদ্গৌরাজচন্দ্রচরণে কুরুতাহরাগম্ ॥

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্—চাঃ ১০)

আমরাও তোমাকে বলি, প্রাকৃত যাবতীয় অভিমান ছাড়িয়া দাও, প্রাকৃত বুদ্ধি ছাড়িয়া সহিষ্ণু হও, সকলকে প্রাকৃত মান্য দেও, নিজে প্রাকৃত সম্মান ছাড়িয়া দেও, তাহা হইলেই তুমি নিত্য অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম উজ্জন করিতে পারিবে।

শুদ্ধ কৃষ্ণনাম-সেবায় নিত্যপ্রীতি লাভ

দশপ্রকার নামাপরাম-নামক প্রতিবন্ধকে আবাধন করিও না, তাহা হইলেই তুমি কপটতাপূর্ণা শুদ্ধ স্বরূপ-তত্ত্ব-জ্ঞানরহিত ভগবন্মোচারণরূপ নামাভাস করিতে পারিবে। তাহা হইলেই তুমি প্রাকৃত প্রতিবন্ধকের হাত হইতে মুক্ত হইয়া কৃষ্ণনাম-সেবা করিতে করিতে নিত্য-কৃষ্ণপ্রীতি লাভ করিবে। ব্যবধান বা প্রতিবন্ধকহীন কীর্তন হইলেই নিত্যপ্রীতি করতলগত হয়। তখন কাল ও সীমা বৈকুণ্ঠবস্তু নামকে তোমার প্রতি নিত্যপ্রীতি প্রদান করিবার বাধা দিতে পারিবে না।

ভাই জীব! বুধা কালক্ষেপ করিও না, কুণ-মণ্ডুকের ন্যায় অপ্রাকৃত রাজাকে প্রাকৃত বুদ্ধি করিও না; যদি কর তুমিই ঠিকিবে। অপ্রাকৃতির কোনরূপ মর্যাদা হানি করিতে পারিবে না।

—শ্রীল প্রভুপাদ

মনুষ্য-সমাজ ও বৈষ্ণব-ধর্ম (৩)

(পূর্বপ্রকাশিত ৩২শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৩৬ পৃষ্ঠার পর)

ধর্ম ও সমাজের দুর্গতির কারণ

সনাতন বৈষ্ণব-ধর্মের সহিত মানব-সমাজের যে নিগূঢ় সম্বন্ধ, তাহা প্রথম প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে। সম্প্রতি ভারতবর্ষে যে-প্রকার সমাজ প্রচলিত, তাহাতে সনাতন-ধর্মের যথেষ্ট ব্যাঘাত হইতেছে। কেবল জন্মদ্বারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-চতুষ্টয় ব্যবস্থাপিত হওয়ায়, সনাতন-ধর্মের যে কতদূর অবনতি হয়, তাহা বলা দুঃসাধ্য। উপযুক্ত পাত্র উপযুক্ত কার্য্য না শাইলে—না দেশের উন্নতি, না পাত্রের উন্নতি হয়। এইজন্য ধর্মের এত দুর্গতি। অতএব সমাজ-সংস্কারের নিত্যন্ত প্রয়োজন।

সমাজ-সংস্কারে শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু ও বীরভদ্র প্রভু

পরম কারুণিক চৈতন্যপার্বদ প্রভু নিত্যানন্দ সমাজের এইপ্রকার দুর্দশা দেখিয়া এই বঙ্গভূমিতে একটি অচ্যুতবর্ণের বীজ বপন করিয়াছিলেন। সেই বীজ প্রভু বীরচন্দ্রের হস্তে অঙ্কুরিত হয়। ক্রমশঃ সেই অঙ্কুর আজকাল একটি বৃক্ষরূপে বর্ত্তমান আছে। হে পাঠকবর্গ! আপনারা যে একটি বৈষ্ণব-জাতির কথা শুনিয়া আসিতেছেন, তাহাই আমাদের উল্লিখিত বৃক্ষ।

বৈষ্ণব-জাতির লোকসংখ্যা—১৮৮১ সালে ৫ লক্ষ

বৈষ্ণব-জাতি কি-প্রকার এবং ঐ জাতির মধ্যে কি-প্রকার ব্যক্তিসকল বর্তমান, তাহা অবগত হওয়া আবশ্যিক। আমরা ১৮৮১ সালের নর-সংখ্যা দৃষ্টি করিয়া জানিতেছি যে, সম্ভ্রুতি বঙ্গভূমিতে নিম্নলিখিত-মত একটি জাতি (যাহাদিগকে বৈষ্ণব-জাতি বলে) বাস করে, যথা :—

বর্তমান	২৮৬৫২	বাখরগঞ্জ	৫১৪৯	জলপাইগুড়ী	৩৩২০
বীরভূম	২১৪১১	চট্টগ্রাম	২০৩৫	ফরিদপুর	৭৬৪৫
হুগলী	১২১০৭	বাঁকুড়া	২০৩২৫	মৈমনসিংহ	১৮০২৪
২৪ পরগণা	১৮০২৩	মেদিনীপুর	৮১৮৮৮	নোয়াখালী	২৯৮৩
কলিকাতা	৭১৩০	হাওড়া	১৫২৮৪	ত্রিপুরা	৬১৪৬
যশোহর	১৪৮৬১	কলিকাতা চতুষ্পার্শ্বে	৮৬৩৫	কটক	২৯৬১৪
মুর্শিদাবাদ	২৫০৩৪	নদীয়া	২১৩৩০	বালেশ্বর	২৩০৫৭
রাজসাহি	১৭০৮১	খুলনা	১২৯৩৯	বাঁকী	১৯৮
বগুড়া	১১১১১	দিনাজপুর	১২৩৪২	চট্টগ্রাম পার্শ্বতীয় ভূমি—৫	
দাঙ্গিলিং	৫৭৬	রঙ্গপুর	২৬২৭৪	পুরী	৭২৭৩
ঢাকা	১৭২৩৯	পাবনা	১৩১৫৭	অনগুল	৬৪৩

সর্বসাকল্য ৪৯২৩১০

বৈষ্ণব-জাতি বলিয়া যাহারা পরিচয় দেয়, তাহারা প্রায় পাঁচ লক্ষ। ইহাদের মধ্যে ষোড়শ অংশের দশ অংশ স্ত্রীলোক এবং ছয় অংশ পুরুষ।

আমাদের পাঠকবর্গ এইরূপ মনে না করেন যে, বঙ্গদেশে ও উড়িষ্যার মধ্যে কেবল পাঁচলক্ষ বৈষ্ণব বই নাই। যাহারা বর্ণাশ্রম-ধর্মের অবস্থিত হইয়া বৈষ্ণব-ধর্ম আশ্রয় করিয়াছেন, তাহারাও নিতান্ত কম নন। সে-সকল মহাজ্ঞাদিগকে এই সংখ্যার মধ্যে বৃষ্টিতে হইবে না।

জাতি-বৈষ্ণবের আচার, ক্রিয়া-কলাপ ও উপজীবিকা

এই পাঁচলক্ষ বৈষ্ণব বর্ণাশ্রম-ধর্মের গুণ-দোষ হইতে পৃথক্। ইহারা পতি-পত্নীরূপে সংসারে বর্তমান হইয়া সন্তানাদি উৎপন্ন করেন। ইহাদের বর্ণাশ্রমধর্ম-সম্মত দশবিধ সংস্কার নাই। সংস্কার উপলক্ষে ইহাদের যে ক্রিয়াসকল আছে, তাহা বর্ণাশ্রমীদের ক্রিয়া হইতে বিলক্ষণ। বৈষ্ণব-

জাতির মধ্যে কোন ব্রাহ্ম-কর্তৃক ক্রিয়া হয় না। তাহারা সকল কর্মই কৃষ্ণ-সম্বন্ধে করিয়া থাকেন। অন্য দেবদেবীর পূজা, হোম, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি কিছুই করেন না। মৃত্যুশৌচ ও জাত্যশৌচ অঙ্গীকার করেন না। বিবাহে কেবল মাংস বদল করেন। কোন বৈষ্ণব-পরিবারের মধ্যে ক্রমশঃ বর্ণাশ্রম-সিদ্ধিই কতকগুলি ক্রিয়া, দেবদেবীর আরাধনা এবং স্ত্রীলোক-পরম্পরা কতকগুলি ব্যবস্থা দেখা যায়। এইসকল বৈষ্ণবদিগের মধ্যে রাধা-কৃষ্ণের সেবা, পূর্নদিনে উৎসব, বিশেষ বিশেষ কার্যে মহোৎসব, হরিবাসর প্রভৃতির অনুষ্ঠান দেখা যায়।

এই বৈষ্ণব-জাতি প্রায়ই ভিক্ষাদ্বারা জীবন-নির্ব্বাহ করে। কোন কোনস্থলে উহারা অন্যান্য ব্যবহার দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করে। কোন কোন প্রদেশে উহারা কৃষিকার্য্য করে, কোন কোন প্রদেশে অস্ত্রাস্ত্র বণিক-ব্যবসায় দ্বারা দিনপাত করে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই গীত-বাত্তাদি অন্ত্যাস করত তদ্বারা উদর পালন করে।

কীর্ত্তন ব্যতীত বৈষ্ণব-জাতির অন্য ব্যবসাতে দোষ নাই

প্রভু বীরচন্দ্র যে-সময়ে সংযোগী বৈষ্ণবের পূজন করেন, তখন তাহার এইমাত্র অনুমতি ছিল যে, তোমরা যদিও ইন্দ্রিয়-পরবশ হও, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ স্কীর্তন দ্বারাই সংসার নির্ব্বাহ করিবে। কেহ কেহ বলেন,— তাহার সময় কেবল বারশত নেড়া-নেড়ী ছিল। কিন্তু আজকাল সেই বারশত নেড়া-নেড়ীর স্থলে আমরা সমস্ত বঙ্গ-ভূমিতে প্রায় পাঁচ-লক্ষ বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী দেখিতেছি। বারশত ব্যক্তির অবশ্যই গান-কীর্ত্তন ব্যবসায় দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ হইতে পারিত। কিন্তু পাঁচ-লক্ষ জীবন কেবল কীর্ত্তন ও ভিক্ষার দ্বারা রক্ষা পাইতে পারে না। অতএব বৈষ্ণব-জাতি যে অন্যান্য ব্যবসায় করিতেছে, তাহা তাহাদের পক্ষে দূষণীয় নয়।

বৈষ্ণব-জাতির সামাজিক অবস্থিতি কোথায় ?

পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম স্বাক্ষ্য-অবস্থায় থাকিলে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সহিত তাহার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকিত। সেই ধর্ম্মে কতকগুলি উৎপাত উপস্থিত হওয়ায়, সমাজ-সংস্কারের আবশ্যকতা হইয়াছে। বৈষ্ণব-জাতিও যদি সেই বর্ণ-ধর্ম্মের মূল আকর্ষণ করে, তবে এই জাতির উন্নয়

কুল নষ্ট হয়। অতএব বৈষ্ণব-জাতি সর্ব বিষয়ে পবিত্র না থাকিতে পারিলে, সকল সমাজের অধম হইবে—সন্দেহ নাই। বৈষ্ণব-জাতি হয় সর্ব সমাজের নমস্কৃত সমাজ হইবে, নতুবা সকল সমাজের হেয় হইয়া পড়িবে। এই বৈষ্ণব-জাতির কোন মধ্যবর্তী অবস্থান নাই। কিরূপে থাকিলে এই বৈষ্ণব-জাতি সর্বোচ্চ জাতি হইতে পারে, তাহা বিচার করা যাউক। আমাদের বিবেচনায় নিম্নলিখিত বিধি-বিধানমত কার্য্য করিলে তাহারা পূজনীয় হইবে।

বৈষ্ণব-জাতীর সর্বোচ্চতা-লাভের উপায়

- ১। তাঁহাদের সমাজটিকে একমাত্র কৃষ্ণসেবার যন্ত্র-স্বরূপ করিয়া রাখুন। বাহ্যস্থ-জ্ঞান-কর্ম্ম একেবারে দূর করুন। কৃষ্ণসেবার বাধক হইতে পারেনা—এরূপ যে-সমস্ত সামাজিক ক্রিয়া ও ব্যবহার আছে, তাহা সতর্কতার সহিত অবলম্বন করুন।
- ২। সমাজে থাকিতে হইলে সমাজ অবশ্য বৈজ্ঞানিক গঠন-বিধি পরিত্যাগ করিচা থাকিতে পারে না। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত সনাতন বর্ণ ও আশ্রম-বিধান গ্রহণ করুন। বিশেষ সতর্ক থাকা উচিত যে, কোন-প্রকারে সমাজ যেন জন্মদ্বারা নির্ণীত, অথবা বর্ণবিধি ও অনধিকার-দূষিত আশ্রম-বিধি গ্রহণ না করে।
- ৩। এই পত্রিকার (সজ্জনতোষণী) ১২৩ পাত্রে এক ছুই ক্রমে যে দশটি বিধির সঙ্কলন হইয়াছে, সেই বিধিগুলি বিশেষ সতর্কতার সহিত পালিত হউক।
- ৪। আশ্রম সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিধি প্রতিপালিত হউক; যথা :—
 - (ক) বিবাহযোগ্য স্ত্রী-পুরুষ মহাজনগণের অনুমোদন সহকারে বিবাহিত হইয়া একপত্নী, একপতি-ব্রত গ্রহণপূর্ব্বক সংসার নির্বাহ করুন।
 - (খ) বিদ্যার্থী ব্যক্তি দেশ ভ্রমণার্থে ব্রহ্মচর্য্য ও গুরুকূলে বাস-দ্বারা বিদ্যা উপার্জন করুন। এবদ্বিধ অবস্থায় সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিয়াও তিন শুদ্ধ থাকিতে পারিবেন।
 - (গ) অধিক বয়সে অবস্থা বিবেচনাপূর্ব্বক বাণপ্রস্থ অবলম্বিত হউক।

(ঘ) ব্রাহ্মণ-লক্ষণযুক্ত পুরুষের কৃষ্ণভক্তি-জনিত বিরক্তি উদ্ভূত হইলে
সন্ন্যাসাশ্রম অর্থাৎ তেকাশ্রম স্বীকৃত হউক।

ঙ) সাহস্য লক্ষিত হইলে স্ত্রী বা পুরুষ সমাজ-বহিষ্কৃত হইবেন।

৬। যে-কেহ সরলতা-সহকারে এই বৈষ্ণব-সমাজে প্রবিষ্ট হইতে ইচ্ছা
করিবেন, তিনি গৃহীত হইবেন।

৭। সমাজের উন্নতির জন্য কৃষ্ণভক্তির সাধক সমস্ত পার্থিব ও পারমার্থিক
বিজ্ঞা ও শিল্পের অনুশীলন-দ্বারা জাতীর মূল উন্নতির চেষ্টা করা
যাউক।

মনুষ্য-সমাজ সংস্কারের জন্য নির্দেশ

বৈষ্ণব-জাতি এইরূপে সংস্থাপিত হইলে আর এতদ্দেশে কোন ক্লেশ
থাকিবে না। বোধ হয়, সকল আর্ষ্য-সন্তানগণ অল্পকালের মধ্যেই এই
জাতিকে পুষ্ট করিবেন। উপযুক্ত ব্রাহ্মণ, উপযুক্ত ক্রিয়, উপযুক্ত বৈষ্ণব ও
উপযুক্ত শূদ্র-দ্বারা ভারতের মুখ-শ্রী পুনরায় উজ্জ্বল হইবে। ইহা হইলেই
সত্যযুগ আসিয়া জগতে পুনরায় রাজ্য করিবে। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কৃপায়
আমরা এই উন্নতির বীজ লাভ করিয়াছি। এখন প্রার্থনা করি যে,
সমস্ত সন্তদয় পুরুষ এ বিষয়টির বিশেষ আলোচনা করিয়া
কার্য আরম্ভ করুন।

বর্তমান ভারতের কর্তব্য-নিকূপণে ঠাকুরের নির্দেশ

এই বিষয়ে যত্ন করিলে ভারতবাসীর, বিশেষতঃ বঙ্গবাসীর সকল লাভই
হইবে। জাতি-সংস্কার, বিবাহ-বিধি-সংস্কার, ধর্ম-সংস্কার ও শরীর-সংস্কার
সম্বন্ধে আজকাল যে-সকল খণ্ড উদ্ভূত হইতেছে, সে-সকল উদ্ভূতের আর
প্রয়োজন থাকিবে না। বৈষ্ণব-সমাজকে যথোচিত উন্নত করিয়া তাহাতে
সকলের প্রবেশ করাই কর্তব্য। তাহাতে সমস্ত ভাল কথাই পাওয়া
যাইবে। বৈষ্ণবগণই জগৎভূষণ। তাঁহারা কৃপাপূর্বক এ বিষয়ে সাহায্য
করুন। তাঁহাদের চরণে দণ্ডবৎ করিয়া এইভাবে নিরুত্ত হইলাম।

(সঙ্জনতোষণী ১য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা)

— শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

ভজন

কেবলাবৈতবাদী শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য গাহিয়াছেন,—

ভক্ত গোবিন্দং ভক্ত গোবিন্দং ভক্ত গোবিন্দং মৃতমতে ।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য বহিদৃষ্টিতে কেবলাবৈতবাদী হইলেও অন্তরে-অন্তরে
ভুক্তবৈতবাদকে পোষণ করিতেন। তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ তাঁহারই বরচিত
গানেই দৃষ্ট হয়। কারণ শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে, কেবলাবৈতবাদে সেবা-
সেবক-সেবা—এই ত্রিপুটির সম্পূর্ণ বিনাশ সাধন হইরা থাকে। পরন্তু সাক্ষাৎ
শ্রীশঙ্করের অবতার শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য কলিকত জীবগগণকে আহ্বান করিয়া
বলিতেছেন,—অহে ভক্ত, মায়ামুগ্ধ জীবগণ! মরণ তোমাদের অতি শল্লিকট,
তোমরা শীঘ্র শীঘ্র গোবিন্দের ভজনে প্রবৃত্ত হও। ভজনে সুখ ব্যতীত দুঃখ
নাই। এই প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও বলিয়াছেন,—

তোমার সেবায়. দুঃখ হয় যত

সেও ত' 'পরম সুখ।'

সেবা-সুখ-দুঃখ, পরম সম্পদ

নাশয়ে অবিজ্ঞা-দুঃখ ॥

আবার আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে প্রহ্লাদ মহারাজের উপদেশে দেখিতে
পাই,—

যথা হি পুরুষস্যেহ বিজ্ঞোঃ শাস্তোপসর্পণম্ ।

যদেষ সর্বভূতানাং প্রিয় আশ্লেষনঃ শূন্যং ।

অর্থাৎ মানুষমাত্রেরই শিশু-ভগবানের ভজন বা পাদশয়-সেবন অবশ্যই
কর্তব্য, কারণ ভগবান্ সর্বজীবের প্রিয়, আশ্রয়, স্নেহ ও সন্তান।

পুনশ্চ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার যঃ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সখা অর্জুনকে বলিলেন,—

'অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভক্তস্য মাম্ ॥

অর্থাৎ, হে সখে অর্জুন! এই অনিত্য ও অসুখময় জগতে অবস্থিতি লাভ
করিয়া আমার নিরবচ্ছ ভজন-মাত্রই কর।

এখন ভজন কি বস্তু, তাহাই বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য ও জ্ঞাতব্য
বিষয়। বৈয়াকরণিকেরা বলেন,—ভক্ত্ ধাতুর উত্তরে ভাবে অনট প্রত্যয়
করিলে ভজন শব্দ নিষ্পন্ন হয়। ভক্ত্ ধাতুঃ সেবাদাম্ অর্থাৎ ভক্ত্—এই
ক্রিয়াদেয় অর্থ হইতেছে সেবা করা। ভক্তনের নামান্তর সেবন।

সাধারণ জাগতিক লোক মনে করেন, তুলসীকাঠের মালিকায় লক্ষ লক্ষ নাম জপ করিতে পারিলেই ভজন করা হয়। উহা ভজনের একটি অঙ্গ হইলেও ঐরূপ কেবলমাত্র কোটি কোটি নাম জপ করিলেও কোটি ভ্রম্বেও আগাধা ভগবান্ ত্রৈলোক্যমন্ডন কৃষ্ণের দর্শন-লাভ ভাগ্যে ঘটিবে না।

বাবহারিক জগতে ‘সেবা’ শব্দের বহু প্রয়োগ দেখা যায়, যথা— পিতৃ-মাতৃ-সেবা, জীবেসেবা ও আর্তসেবা প্রভৃতি। উক্ত সেবাবারা জীবের আত্মান্তিক মঙ্গল সাধিত হয় না, কিছু পুণ্য সঞ্চয় হয় মাত্র। সে কারণ আমাদেরকে অনুশ্রবন করিতে হইবে—ভজনীয় বা সেবনীয় বস্তু কি? হরি-গুরু-বৈষ্ণবই আমাদের একমাত্র ভজনীয় বস্তু।

হরি-গুরু-বৈষ্ণব তিনেরই সেবন।

তিনের সেবনে হয় কৃষ্ণ-দরশন ॥

এই সেবা দ্বিবিধা, যথা—মুখ্য অর্থাৎ সাক্ষাৎ ও গৌণ।

ভগবানের শ্রীবিগ্রহের অর্চন ও নামকীর্তনই সাক্ষাৎ সেবা এবং অর্চনের আশুকুলা, যথা—মন্দির-মার্জ্জন, গুল্প-চয়ন, ভোগ-সজ্জন ও অর্ধ-সংগ্রহ—ইহা দ্বারা গৌণ সেবা সাধিত হয়। ভজ্ঞান শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণব-গণের সান্নিধ্যে অস্থান করিয়া ব্যক্তিগত গাভাসংবাহন, বাজন ও আহাৰ্য্য-দ্বারা পরিতোষণ, তাঁহাদের আদেশ-পালন ও ভাবনার পরিতোষণ ও তুষ্টি-বিধান মুখ্য সেবা। আর শ্রীগুরুশ্যাদপদ্য ও বৈষ্ণববৃন্দের জীবন-নির্বাহ-উপযোগী অর্থায়ুকূল্য সংগ্রহ করাই গৌণ সেবা। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, হরি-গুরু-বৈষ্ণবের মুখ্য সেবাকে বাদ দিয়া জগতের লোক গৌণসেবা যে অর্থায়ুকুলা ভাষার সংগ্রহে ব্যতিব্যস্ত। ভজনরাজ্যে প্রবেশ করিয়া সর্জনগ অর্ধ-চিত্তায় রত—এই একশ্রেণীর সাধককে দেখিতে পাওয়া যায় এবং প্রসাদসেবনে প্রণককে জয় করা যায়, এই ধারণার বশে প্রসাদসেবার পরিণতি দেখা যায় আর এক শ্রেণীর মধ্যে। যেহেতু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন,—‘প্রসাদ-সেবা করিতে হয় সকল প্রণক-জয়।’ এই ক্ষুদ্র আশায় নির্ভর করিয়া যাহারা হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা পরিত্যাগপূর্বক প্রসাদভোজনবিলাসী হইবেন, ভজনীয় বস্তু কৃষ্ণপ্রাপ্তি ত দূরে থাকুক, তাঁহারা প্রণকময় সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন না। আবার যাহারা শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ বাজন না করিয়া কেবল দিব্যরাত্রি অর্ধসংগ্রহে প্রমত্ত হইবেন, তাঁহারা পরমার্থ-লব্ধি বঞ্চিত হইয়া যাইবেন।

সনাতন ধর্মের বিষ্ণু, শিব, শক্তি, সূর্য্য ও গণেশ প্রভৃতি পঞ্চপ্রকার দেবতা ভজনের উল্লেখ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। কিন্তু বিষ্ণু ভগবানের ভজন ব্যতীত অন্য যে কোন দেবতার ভজনের ফল অনিত্য ও স্তম্ভনোকে বাসই নির্বন্ধিত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভগবান্ বলিয়াছেন,—যাহারা আমার ভজন করিবে, তাহাদের আমার ধামে বাস হইবে। অতএব সর্বোৎকৃষ্টের শ্রীকৃষ্ণের ভজন শ্রেষ্ঠ। শ্রীমদ্ভাগবত হইতে আমরা জানিতে পারি যে, অধোমুখ কৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তিঘারাই জীবাত্মা অপ্রসন্ন হয়; যথা,—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষণে।

অহৈতুকা প্রতিহতা যস্যাত্মা অপ্রসীদতি ॥

অর্থাৎ যাহা হইতে ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত শ্রীকৃষ্ণে প্রবণাদি-লক্ষণা, কলাভি-সন্ধানরহিতা, ঐকান্তিকী, স্বাভাবিকী, নিরপেক্ষা ভক্তি হয়, তাহাই মানবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম। সেই ভক্তিবলে আত্মা স্পষ্টরূপে প্রসন্নতা লাভ করে।

শ্রীভক্তভজন প্রসঙ্গে অ'নুসঙ্গিক শ্রীগুরুপাদপদ্ম-ভজনের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কারণ শ্রীভগবানের প্রিয়তম শ্রীগুরুদেব। তাঁহার অহৈতুকী কৃপাবলে ভগবদর্শন সহজসাধ্য। তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতীত ভগবানের কৃপা অসম্ভব। স্রগতে একটি ছড়া প্রচলিত আছে, যথা—‘গুরু ছেড়ে গোবিন্দ ভজে, সে পাপী নরকে মজে।’ ইহা নিছক সত্য। শ্রীমদ্ভাগবত আমাদের উপদেশ দান করিয়াছেন—‘এই মহাশয়দেহ সকল ফলের মূল; ইহা সুলভ ও সুদুর্লভ এবং ইহাই পটুতর নৌকা। শ্রীগুরুই ইহার কর্ণধার। এই হৃদয় কর্ণধারের সাহায্যে এবং আমার কৃপা রূপ অনুকূল বায়ুর সাহায্যে মানব যদি সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা না করে, তবে সে আত্মঘাতী।’ সুতরাং সাংগা ও গোপনভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মের ভজন বা সেবা একান্ত কর্তব্য।

ভগবৎ-সুখানুসন্ধানের সহিত গুরুসেবা না করিলে শ্রীগুরুদেবও সুখলাভ করেন না। কারণ শ্রীভগবানের সুখ বাদ দিয়া শ্রীগুরুদেবের সুখ হয় না। শ্রীগুরুদেবের চিত্তবৃত্তির অনুসরণ করাই শ্রীগুরুসেবা। স্নেহসেবাব্যাসা শ্রীগুরুদেবের হৃদয় জয় করিয়া তাঁহার নিকট পরম রহস্যপূর্ণ ভগবৎ-বশীকরণের উপায় জানিতে পারিলে, তবে কণ্ট-চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিতে পারা যায়। আবার শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞানুসারে এবং তৎসেবার অবিরোধে অপর বৈষ্ণবগণের সেবন শ্রেয়স্কর হইয়া থাকে। ‘ছাড়িয়া বৈষ্ণব-

শেবা, নিজার পেয়েছে কেবা।’ এই ভজনরীতি অনুযায়ী হরি-গুরু-বৈষ্ণব—
তিনের সেবন যুগপৎ অবশ্য করণীয়।

অনেকে বলেন যে, হরিতত্ত্বজ্ঞে আবার মধ্যস্থের (mediator) অর্থাৎ
গুরুর কি প্রয়োজন? বাহারা গুরুতত্ত্বে অনভিজ, তাঁহাদেরই এই প্রকার
উক্তি। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, যদি কেহ রাজদর্শন করিতে চায়,
তবে রাজার প্রধান অমাত্য বা মন্ত্রীর সাহায্য ব্যতীত যেমন রাজার দর্শন
সম্ভব হয় না, তদ্রূপ শ্রীগুরুদেব শ্রীভগবানের শ্রেষ্ঠ সেবক, তাঁহার একমাত্র
কৃপায় ভগবদর্শন ঘটে। শ্রীকৃষ্ণ বিষয়-বিগ্রহ ও সেবা-ভগবান্, আর
শ্রীভগদেব আশ্রয়-বিগ্রহ ও সেবক-ভগবান্।

ভগবান্ অপেক্ষা ভগবন্তুভগণ অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ মহাবদান্ত। উহার জলন্ত
নিদর্শন শাস্ত্রে দেখিতে পাই, যথা—শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুর শ্রীমদ্মহাপ্রভুর
নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, তিনি (বাসুদেব ঠাকুর) জগতের সকল
জীবের পাপ গ্রহণ করিয়া অনন্তকাল নরকে বাস করিতে প্রস্তুত—যদি
শ্রীমদ্মহাপ্রভু এককালেই সমস্ত জীবকে উদ্ধার করতঃ লইয়া যান। বৈষ্ণবের
প্রাণ এমনই উদার যে, তাঁহারা জীবের আত্মাত্মিক মঙ্গলের জন্য সর্বদাই
ব্যাকুল, তাঁহাদেরই পাদপদ্মের রক্তোহভিষেক ভিন্ন ভগবানের কৃপালাভ
করিবার অন্য কোন উপায় নাই।

ভজন-রাজ্যে দুই শ্রেণী ভজনানন্দী দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—
বিবিক্তানন্দী ও গোষ্ঠানন্দী। একাকী যিনি নির্জ্ঞানস্থানে ভজন করেন,
তিনি বিবিক্তানন্দী এবং যিনি গোষ্ঠীর মধ্যে থাকিয়া ভজন করেন, তিনি
গোষ্ঠানন্দী বলিয়া কথিত হন। অর্থারামী ও ইন্দ্রিয়ারামী ব্যক্তিদিগের
পক্ষে নির্জনবাসেও ভজন-সমুদ্বিলাভের সম্ভাবনা নাই। যদি যথার্থ
নির্জনবাসে প্রবলভাবে হরিপ্রসঙ্গ ও কীর্তন হয়, তবে উহাই বাঞ্ছনীয়।
শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—

শ্রীদয়িতদাস, কীর্তনেতে আশ,

কর উঠেঃঘরে হরিনাম রব।

কীর্তন-প্রভাবে, স্মরণ হইবে,

সেকালে ভজন নির্জন সম্ভব ॥

অপর পক্ষে গোষ্ঠীতে অবস্থান করিয়া সাধুসঙ্গে নামকীর্তনদ্বারা সর্বসিদ্ধি
হয় বটে, কিন্তু কলির প্রভাব বর্তমানে এত অধিক পরিলক্ষিত হইতেছে যে,

গোষ্ঠীভজন অপ্রীতিকর ও অফলপ্রসূ। যদি নিকপটে কায়মনোবাক্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া ভজন করিতে পারা যায়, তবে গোষ্ঠীর মধ্যেও আত্মমঙ্গল সম্ভব হইতে পারে।

এতক্ষণ ভক্ত-ধাতুর সের্বনার্থে সেবার বৈশিষ্ট্য ও উৎকর্ষ প্রদর্শিত হইল। এইবার ভগদত্তভক্তের ক্রম-পন্থা নিরূপিত হইবে।—

শ্রীগোপাল-তাপনী উপনিষদে দৃষ্ট হয় যে, ‘ভক্তিরস্য ভজনম্’ অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দের ভজনই ভক্তি। যে কোন যোগ্য ও স্ব-মনোহরকুল উপায় অবলম্বন করিয়া গোবিন্দে মনোনিবেশ করিতে পারা যায়, সেই উপায়কে সাধনভক্তি বলা যায়। সেই ভক্তি দ্বিবিধ—‘বৈধী’ ও ‘রাগানুগা’। যে-কালে কেবল শাস্ত্র-শাসনদ্বারা গোবিন্দ অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তিতে জীব প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে ‘বৈধী’ ভক্তি বলে। ইহুবিধে যে বাস্তবিকী পরমাবিষ্টতা— তাহাই রাগ। তন্ময়ী যে কৃষ্ণভক্তি, তাহাই রাগানুগিক ভক্তি। সেই রাগানুগিক ভক্তির অনুগত-ভাবই রাগানুগা ভক্তি। বৈধ-মার্গে প্রেমের ক্রম কথিত হইয়াছে, যথা—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোহথ ভজনক্রিয়া।

ততোহনর্থনিবৃত্তিঃ স্ত্রাস্ততো নিষ্ঠা কৃচিৎকৃতঃ।

অখাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদয়তি।

সাধকানাময়ং প্রেমঃ প্রাতুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ।

(ভ: র: সি: পূ: বি: ৪।১১)

অর্থাৎ, বৈধ-মার্গে আদৌ শ্রদ্ধা, পরে সাধু-সঙ্গ-সঙ্গ, পরে ভজন হইতে অনর্থনিবৃত্তি। তদনন্তর নিষ্ঠা, কৃচি ও আসক্তিক্রমে ভাব হয়। সেই ভাব বা রতি গাঢ় হইলে প্রেমে পরিণত হয়। সেই প্রেমই জীবের এক-মাত্র সাধ্য ও প্রয়োজন।

কৃষ্ণশ্রুতি ও নিজ-বাস্ত্বিত কৃষ্ণপ্রিয়ভক্তের শ্রুতির সহিত ও কৃষ্ণলীলা-কথায় রতিপূরক সর্বদা ব্রজে বাস এবং সাধক ও সিদ্ধরূপে বাস্ত্বিত ভাবের লালসায় ব্রজলোকের সেবাসুসরণদ্বারা কৃষ্ণসেবা করিবে— ইহাই ব্রজ-রাগানুগ ভক্তের পরিপাটী সাধন-প্রণালী।

ভজনের পরাকাষ্ঠা :—

ঐচ্ছৈতচ্চরিতামুতে আমরা দেখিতে পাই—

“দাস, লখা, শিখাদি-প্রেমসীরগণ।

রাগ-মার্গে এই সব ভাবে-গণন।

* * * *

কিছু যাব যেই বস সেই সর্বোত্তম।

তটস্থ হইয়া বিচারিলে আছে তব-তম।

যাহারা শাস্ত্ররস-লুক্ক, তাহারা সনকাদি মুনিগণের; যাহারা দাস্ত্ররস-লুক্ক, তাহারা চিত্রক-পত্রকাদির; যাহারা লখ্যরসের লোভী, তাহারা পুংলাদির; যাহারা বাৎসল্যরসের লোভ করেন, তাহারা নন্দ-বশোদাদির; যাহারা মধুর-রসলুক্ক, তাহারা ব্রজগোপীগণের ভাব ও চেষ্টার মুদ্রাসকল ‘অনুসরণ’ করিবেন।

স্বরূপগত লীলা-ভাবনার সহিত যখন গুণ, রূপ ও নাম হইতে থাকে, তখন লীলায় রসোদয় হয়। রসই চরম লাভ। শ্রীকৃষ্ণদণ্ডের নিকট নিজ অধিকারগত রসের বিষয় জ্ঞাতব্য।

সংসারে জন্ম-সংশ্রাণ্তে যেন নারাদিতো हरिः।

আত্মঘাতী ন বিজেরঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ। (শদ্ভূপুরণ)

অর্থাৎ, যিনি সংসারে আসিয়া মনুষ্য-জন্ম লাভ করতঃ শ্রীহরিভজন না করেন, তিনি আত্মঘাতী ও সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের ভাষায় এই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম—

“শ্রীহরিভজনকারী বাতীত সকলেই নির্বোধ ও আত্মঘাতী।”

—ত্রিদণ্ডীশ্রীমন্তজিবেদান্ত উর্দ্ধমহী মহারাজ

রাজা বীরহাঙ্গরি

“নীরব নিশীথ হের মুগ্ধ চরাচর ।
যাহ শীঘ্রগতি সবে যোগ্য অবসর ॥
ক্লান্ত পথশ্রমে তান নিদ্রা-বিচেতন ।
শকট সহিত কর সর্বস্ব হরণ ॥
না হ’তে প্রভাত পাত, অতি সাবধানে ।
আন, ধনরত্নরাজি সব এই স্থানে ॥—”

মন্ত্রকক্ষে দম্মাগণে ডাকিয়া ডয়াল ।
কলিল আদেশ বা- হাঙ্গরি ভূপাল ॥
দম্মাদলপতি রাজ বনবিষ্ণুপুরে ।
পাইয়াছে সমাচার, আসিছে অদূরে ॥
বহুধনরত্নসহ বৃন্দাব হ’তে ।

মহাজন কয়জন এই বনপথে ॥
পথমাঝে এবে সবে করিছে বিশ্রাম ।
তাহারি সন্ধানে কে এই আজ্ঞা দান ॥
ধায় দম্মাগ্রাম তবে সেই লক্ষ্যস্থলে ।
দেখে গিয়া নিদ্রাগত সবে ভূমিতলে ॥
আনন্দে সকলে তবে সতর্ক হইয়া ।
পলাইল রত্নসহ শকট লইয়া ॥

কে হৈহারা ? কোন্ পত্ন করি আহরণ ।
শকট ভরিয়া, করে গোড়ে আনয়ন ॥

হরি, হরি,—করিতেও স্মরণ সে-কথা ।
আনন্দে উথলে হিয়া আসে বিহ্বলতা ॥

প্রাণের গরণ মো প্রভু গৌরহরি ।
রূপ-সনাতন তাঁর কত কৃপা করি ॥

পাঠাইলা বৃন্দাবনে করিতে উদ্ধার ।
লুপ্ত মহাতীর্থ, আ করিতে প্রচার ॥

অনপিত-পূর্ব প্রেমত ভুভরা ধন ।
ভক্তিগ্রন্থরাজি পরম-খানিক্রপণ ॥

জনমিল তাহাতেই শ্রীগ্রন্থ অপার ।
 অমূল্য রতন সম, নাহি তুল্য যার ॥
 সেই গ্রন্থ-রত্ন-ভার রাখিলে যতনে ।
 শ্রীজীব, শ্রীরাপ-সনাতন-অদর্শনে ॥
 আপনিও কতশত গ্রন্থবিরচিয়া ।
 সঞ্চয় করিল তথা ভাগ্য ভরিয়া ॥
 ভাগ্যবান্ শ্রীনিবাস কতদিন পরে ।
 উতরিল ব্রজপুরে বাকুল অন্তরে ॥
 শ্যামানন্দ নরোত্তম মিলিল তথায় ।
 সকাতির রূপ-আদি-বিরহ-বাথায় ॥
 তাঁদের বিদায়কালে জীব সুপ্রভাতে ।
 শকট ভরিয়া গ্রন্থরত্ন দিল সাথে ॥
 হইল আদেশ তাহা গউড়ে আনিতে ।
 পাষণ্ডলনে যোগ্য জনে বিলাইতে ॥
 উপনীত এত দূরে সেই রত্নরাজি ।
 ভাগ্যোদয়ে দম্ভ্যরাজ লুটাইল আজি ॥
 প্রভাতে উঠিয়া সবে করে হাণ্ডাকার ।
 কি হইল !—সর্বনাশ !—একশ্র কাহার ॥
 হরিল না কেনগো, সে-সবাকার প্রাণ ।
 প্রাণ ল'য়ে যাক্ আসি গ্রন্থ পরি দান ॥
 ত্যজিতে পরাণ সবে সঙ্কল্প করিল ।
 বনমধ্য হ'তে ক্ষণে কে যেন কহিল ॥
 “ভয় নাই !—রাখে হরি, মারে কোন জন ।
 আছে গ্রন্থ বিষ্ণুপুরে রাজার ভবন ॥
 করিয়া শ্রবণ মহা-আনন্দে অমনি ।
 করে শ্রীনিবাস আদি ঘন হরিধ্বনি ॥
 চলিলা তখনি তিনি রাজার সদনে ।
 পাঠাইয়ে নবদ্বীপে সহচরণ ॥ (ক্রমশঃ)

ভক্তপরিচর্যা-মাহাত্ম্য

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদশঙ্কর ও ভক্তবৃন্দের শ্রীচরণকমল স্মরণ করিয়া ভক্তপরিচর্যা-মাহাত্ম্য কিছু লিখিবার প্রয়াস পাইতেছি। ভক্ত-পরিচর্যার অপার মহিমা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। ভক্ত-সেবার মুখফল শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি ও শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমলাভ। এখানে ভক্ত বলিতে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভক্তকেই বুঝায়। শ্রীভগবান্ স্বীয় ভক্ত অর্জুনকে বলিয়াছেন,—

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।

মন্তুকানাঞ্চ যে ভক্তান্তে মে ভক্ততমা মতাঃ ॥ (আদি পুরাণ)

হে পার্থ! যাহারা কেবল আমার ভক্ত তাহারা আমার প্রকৃত ভক্ত নহে, পরন্তু যাহারা আমার ভক্তগণের ভক্ত তাহারাই বস্তুতঃ আমার ভক্ত। শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতে ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন,—

“আমার ভক্তের পূজা আমা হইতে বড়।

সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কৈলা দট।” (চৈঃ ভাঃ আঃ ১।৮)

শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে ভগবান্ শ্রীউকবকে বলিয়াছেন,—‘মন্তুক-পূজাভাষিকা’ অর্থাৎ মদীয় ভক্তের পূজা আমার পূজা হইতে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, শ্রীভগবান্ সকল শাস্ত্রে ভক্ত-সেবাটিকে যে অধিক কর্তব্য এবং ভক্ত-সেবার দ্বারাটিকে তিনি সন্তুষ্ট হন তাহা তারদ্বরে জানাইয়াছেন। এমন কি নিজহাতে দ্বারকাপুরীতে ভক্ত শ্রীমুদামার চরণধৌতাদি পরিচর্যা দ্বারা ভক্তের অপার মতিমার কথা জগতে বিস্তার করিয়াছেন। ভক্ত-সেবার ফলে শ্রীভগবৎ কুপালাভের অলঙ্কার দৃষ্টান্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আমরা দেখিতে পাই,—

“নন্দসুত বলি ধারে ভাগবতে গায়।

সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গৌসাত্ত্বিক ॥” (চৈঃ চঃ আঃ ২।২৯)

শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণাদির প্রমাণবলে আমরা জানিতে পারি যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই এই কলিযুগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাহারই জন্মক ভক্তের নাম শ্রীকালিদাস। ইনি সর্বজনপূজিত শ্রীচৈতন্যপার্বদ শ্রীদাস গোস্বামী প্রভুর পূর্বশ্রমের সম্পর্কে জাতি-খুল্লতাত। শ্রীকালিদাস নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতেন এবং ভক্তের পরিচর্যা তথা উচ্ছ্রিষ্ট সেবা করিতেন। তদানিন্তন সময়ে তিনি অনুসন্ধান করত সেবা-উপকরণ সহযোগে বঙ্গভূমির প্রায় সকল বিমুক্তক বৈষ্ণবের গৃহে

বাইতেন এবং পরিচর্যাশ্বে বৈষ্ণবের প্রসাদ সেবা করিতেন। ভক্তের জাতিভেদ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ আছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলেন,—

“বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধিঃ.....নারকী সঃ।”

যেতে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নহে।

তথাপিহ সর্বোত্তম সৰ্বশাস্ত্রে কথো ॥

যে পাণিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে।

জন্ম জন্ম অধম যোনিতে ডুবি মরে ॥

(শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ১০।১০০-১০২)

প্রভুঘর শ্রীকালিদাস বৈষ্ণবে কোনপ্রকার জাতিবুদ্ধি না করিয়া সকল বর্ণোদ্ধৃত বৈষ্ণবের বাড়ী যাইতেন ও তাঁহার সেবা করিতেন। একসময় কিছু আম লইয়া তিনি শ্রীঝড়ঠাকুর নামক জনৈক নীচকুলোদ্ধৃত গৃহী বৈষ্ণবের নিকটে গিয়াছিলেন। পরস্পর দণ্ডবৎ প্রণামান্তে প্রীতিসন্তোষণ হইলে পর শ্রীঝড়ঠাকুর নীচকুলোদ্ধৃত বশতঃ দৈন্যসহকারে শ্রীকালিদাসকে অন্নপ্রসাদ-দানে অধীকৃত হইয়া জনৈক ব্রাহ্মণবাড়ী হইতে অন্নের ব্যবস্থা করিয়া দিবে বলিলেন। তাহাতে বৈষ্ণব-ঘর শ্রীকালিদাস শ্রীঝড়ঠাকুরকে বলেন,—“আপনি পরম বৈষ্ণব, আপনার দর্শনে আজ পবিত্র হইলাম। আপনার দেয় অন্নপ্রসাদই আমার কাম্য।” ইহাতে শ্রীঝড়ঠাকুর অসম্মতি জ্ঞাপন করিলে শ্রীকালিদাস ব্রাহ্মণের বাড়ী হইতে অন্নগ্রহণে অনিচ্ছুক হইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। শ্রীঝড়ঠাকুরও উপায়স্বরূপ মা দেখিয়া অহুতজ্ঞা করিলেন এবং পরে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এদিকে শ্রীকালিদাস শ্রীঝড়ঠাকুরের চরণচিহ্ন যেখানে যেখানে পড়িয়াছিল সেই সেই চিহ্ন হইতে চরণধূলি তুলিয়া লইয়া সর্বাঙ্গে লেপন করিতে করিতে প্রেমে অগ্নুত হইতে লাগিলেন। পরে তিনি শ্রীমৎ ঝড়ঠাকুরের প্রসাদের অপেক্ষায় লুকাইয়া রহিলেন। এদিকে শ্রীঝড়ঠাকুর বাড়ীতে পৌঁছিয়া শ্রীকালিদাস আনিত আশ্রয়ল সম্মুখীন করিয়া পরমানন্দে শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ লাগাইলেন। তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে উক্ত মহাপ্রসাদ অর্পণ করিলেন এবং নিজেও পাইলেন। পরে চোষা, আঁঠি ও চোকলা আন্তাকুঁড়ে লইয়া গিয়া ফেলিয়া দিলেন। দূর হইতে কালিদাস তাহা দেখিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া আন্তাকুঁড়ে বৈষ্ণবের প্রসাদস্বরূপ উক্ত আঁঠি চোকলা পরমানন্দে তুলিয়া চুষিতে লাগিলেন এবং বৈষ্ণবের প্রসাদ পাইয়াছি জানিয়া প্রেমে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

শ্রীভগবৎ প্রসাদের নাম—“মহাপ্রসাদ”। উহা আবার কোন বৈষ্ণব-সেবা করিয়া প্রসাদ রাখিলে “মহামহাপ্রসাদ” আখ্যা লাভ করিয়া থাকেন, যথা—

কষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ নাম ।

ভক্তশেষ হৈলে মহামহাপ্রসাদাখ্যান ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১৬৬৯)

শ্রীকালিদাস প্রভু একবার পুরীধামে উপস্থিত হইলে ভগবান্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অপার করুণা লাভ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু প্রত্যহ সিংহদ্বারে শ্রীচরণকমল ধোত করিয়া জগন্নাথ দর্শনে যাইতেন। উক্ত চরণামৃত কাহারও গ্রহণ করা বিশেষ নিষেধ ছিল। একদিন যখন শ্রীমন্মহাপ্রভু চরণ ধোত করিতেছিলেন সেই সময় কালিদাসপ্রভু সেখানে উপস্থিত হইয়া এক অঞ্জলি, দুই অঞ্জলি, তিন অঞ্জলি পদধোত জল পান করিলেন। অন্যের দুর্ভাগ্য শ্রীচরণোদক তিনি প্রাপ্ত হইলেন। অন্তর্যামি শ্রীমন্মহাপ্রভু কালিদাসপ্রভুর বৈষ্ণবে ঐকান্তিক বিশ্বাস, ভক্তি ও সেবাপ্রাণতার জন্য উক্ত মহান কৃপাদান করিয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর উচ্ছিষ্ট প্রসাদ পাইবার সৌভাগ্যও লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, যদি আমরা বৈষ্ণবের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সেবা-পরায়ণ না হই তাহা হইলে অবশ্যই একদিন শ্রীভগবানের কৃপালাভ করিতে অক্ষম হইব তাহাতে বিদ্যুৎ সন্দেহ নাই। স্বনামধন্য গোড়ীয়া বৈষ্ণবাচার্য্য-প্রবর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়, গৌরপার্বদপ্রবর শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুবরের মলমূত্রাদি পরিষ্কার করত অশেষ কৃপাভাজন হইয়া-ছিলেন। “শ্রী” বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত মহামতি শ্রীকুরেশ তদীয় শ্রীগুরুদেব ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীল রামানুজাচার্য্যের ঐকান্তিক সেবা ও মনোহরীষ্ট পূরণ করিয়া শেষে চোলরাজ কৃমিকণ্ঠ কর্তৃক নষ্টকৃত চক্ষুও পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং ভগবান্ শ্রীবরদরাজ রিমুর প্রভূত কৃপালাভ করিয়াছিলেন, সুতরাং ভক্ত-পরিচর্য্যার দ্বারাই যে শ্রীভগবানের কৃপালাভ করা যায় সে-স্বক্কে শাস্ত্রীয় প্রমাণ ভুরি ভুরি দেখিতে পাওয়া যায়। ৩৩৫১ সংখ্যক ব্রঃ স্তঃ গোবিন্দ-ভাষ্যধৃত নাড়িলা স্মৃতি-বাক্য, যথা—

সিদ্ধিৰ্ভবতি বা নেতি সংশয়োচ্চাহ সেবিনাম্ ।

ন সংশয়োহত্র তন্তুজ পরিচর্যা রত্নাক্রনাম্ ॥

কেবলং ভগবৎপাদসেবয়া বিমলং মনঃ ।

ন জায়তে যথা নিত্যং তন্তুজ চরণার্চনাং ।

অর্থাৎ, অচ্যুৎ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিলে তাঁহাকে পাইতেও পারি বা নাও পাইতে পারি, কিন্তু তদীয় ভক্তের পরিচর্যা করিলে অবশ্যই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে সন্দেহ নাই। ভগবদ্ভক্তগণের শ্রীচরণ-সেবা-পরিচর্যা-দ্বারা জীবের মন যেরূপ নির্মূল হয়, কেবল ভগবদ্পাদপদ্মের সেবাদ্বারা সেরূপ নির্মূল হয় না।

শ্রীমদ্ব্যাক্রম্য বলিয়াছেন,—

“মোর তত্ত্বপ্রতি প্রেমভক্তি করে যে।

নিঃসংশয় বলি লাভ মোরে পাষ সে ॥”

শ্রীভাগবতে রুক্মণ রাজার প্রতি বিজয়িনী ভরতেও উক্তি, যথা—

রুক্মণৈতৎ তপস্যা ন যাতিন্ চেভান্না নির্কপনাদ্ গৃহাঙ্ঘা।

ন চক্ষুসো নৈব জলাগ্নিস্থৈর্যো বিনা মহৎ পাদরজোহভিষেকম্ ॥

(ভাঃ ৫।১২।১২)

অর্থাৎ, হে রুক্মণ! এই পরতত্ত্বকে তপস্যা দ্বারা বা যজ্ঞের দ্বারা, সন্ন্যাস অথবা গার্হস্থ্যের দ্বারা; কিংবা বেদাভ্যাস, জল, অগ্নি, স্থর্য—ইহাদের উপাসনার দ্বারা কখন লাভ করা যায় না, কিন্তু মহতের পাদপদ্ম-পরাগের অভিষেক দ্বারাই সেই বস্তুকে লাভ করা যায়; এতদ্ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তজ্জন্তু পাদ্মোত্তর-বচনে উপদেশ, যথা,—

“তস্মাৎ সৰ্গ প্রযত্নেন বৈষ্ণবান্ পূজয়েৎ সদা।

সৰ্গং তত্ত্বি তুঃখৌঘং মহাভাগবতার্চনাং ॥”

যেহেতু বৈষ্ণবগণের কৃপা ব্যতীত সেই ভগবন্তত্বকে লাভ করা যায় না; সেইজন্তু বলিতেছেন যে,—সৰ্গতোভাবে বৈষ্ণবগণের সেবা করিবে। তদ্বারাই সৰ্গপ্রকার দুঃখরূপ পাপ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবে। ইতিহাস সমুচ্চরে, যথা—

তস্মাদ্বিষ্ণুপ্রসাদায় বৈষ্ণবান্ পরিতোষয়েৎ।

প্রসাদঅমুখো বিষ্ণুন্তেনৈব স্তান্ন সংশয়ঃ ॥

অতএব বিষ্ণুকে প্রসন্ন করিবার জন্ত বৈষ্ণবগণকে পরিতুষ্ট করিবেন, তাহা দ্বারাই বিষ্ণু প্রসন্ন হইবেন সন্দেহ নাই। পরম পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও বলিয়াছেন,—

ভক্তপদ-ধূলি আর ভক্তপদ-জল ।

ভক্ত-ভুক্ত-শেষ—তিন সাধনের বল ॥

এই তিন সেবা হইতে কৃষ্ণ প্রেমা হয় ।

পুনঃ পুনঃ সৰ্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয় ॥ (চৈঃ চৈঃ অঃ ১৬।৫০০৫১)

মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদৈপায়ন বেদব্যাস বেদান্তসূত্রে বলিয়াছেন,—

অহংকাদিভ্যঃ (৩।৩।৫৪)

অর্থাৎ, সেই পরব্রহ্মকে পাইতে হইলে আগ্রহ-সহকারে মহতের সেবা করিতে হইবে। উক্ত সূত্রের ব্যাখ্যায় শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীশ বলদেব বিদ্যাজুষণ প্রভু তদীয় শ্রীগোবিন্দভাষ্যে বলিয়াছেন,—“অহংকো মহতুপাসনা-নির্বন্ধঃ।” অহংকো শব্দের অর্থ-নির্বন্ধ সহকারে মহতের উপাসনা; শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব উপদেশ করিয়াছেন,—

“প্রভু কহে, “বৈষ্ণব-সেবা, নাম-সঙ্কীৰ্ত্তন ।

হুই কর, শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণচরণ ॥” (চৈঃ চৈঃ মঃ ১৬।৭০)

সুতরাং কৃতি, শ্রুতি, পুরাণাদি-সকল শাস্ত্রেই শ্রীভগবান্ তদীয় ভক্তের পরিচর্য্যার দ্বারাই কেবল সমুপ্ত হন এবং তৎপ্রাপ্তির হেতু বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন। কিন্তু ভক্তপরিচর্যা বাদ দিয়া বাহ্যরা কেবল শ্রীভগবানের সেবা করিতে আগ্রহ হন তাঁহারা কিন্তু কয়দিনকালেও সেই ঈঙ্গিত পরব্রহ্মকে লাভ করিতে সক্ষম হন না। শ্রীহরিভক্তি-সুখোদয়ে উক্ত আছে,—

“অভ্যর্চয়িত্বা গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চয়ন্তি যে।

ন তে বিষ্ণু প্রসাদস্তভাজনং দান্তিক্য জনাঃ ॥”

অর্থাৎ, যাহারা শ্রীগোবিন্দের পূজা করিয়া সেই গোবিন্দের ভক্তগণের পূজা না করে তাঁহারা দান্তিক—তাহারা কখনই বিষ্ণুর কৃপাপাত্র নহেন। সুতরাং ভক্ত-পরিচর্য্যাই আমাদের জীবা তু হউক ! জীবা তু হউক !! জীবা তু হউক !!! ইহা ব্যতীত আমাদের কোনি গত্যন্তর নাই ! গত্যন্তর নাই।

বাঞ্ছাকল্পতরুভাশ্চ কৃণাসিদ্ধুভা এব চ ।

পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

—ত্রিদণ্ডিত্ব শ্রীভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক

শ্রীচৈতন্য-লীলার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

(পূর্বাংশপ্রকাশিত ৩২শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৪০ পৃষ্ঠার পর)

প্রভুর এইরূপ সুমিষ্টবাক্য শ্রবণ করিয়া সন্ন্যাসীদের মনের পরিবর্তন হইল এবং তাঁহারা মহাপ্রভুর নিকট আরও তত্ত্ব-কথা শুনিতে চাহিলে মহাপ্রভু বেদান্ত সূত্রের মর্ম বিবৃত করিয়া জানাইলেন, "ভগবান্ শ্রীনারায়ণ ব্যাসরূপে বেদান্ত-সূত্র রচনা করায় ইহাতে ভ্রম, প্রমাদ, বিশ্লিষ্টতা ও করণাপাটব—এই দোষ চতুষ্টয় থাকিতে পারে না।" উপনিষদ্ ও বেদান্ত-সূত্র ব্রহ্ম শব্দে মুখ্য অর্থে অদ্বয়জ্ঞান 'পরাম্পর' তত্ত্ববস্তু ভগবান্কেই বুঝান। ভগবান্ বহুবিশ ঐশ্বর্য্যপূর্ণ ও পরতত্ত্বসীমা সচ্চিদানন্দাকার। সাক্ষাৎ শক্তরাবতার আচার্য্য ঐশ্বর্য্য ভগবানের আজ্ঞাক্রমে অম্বর মোহনার্থে ভগবানের চিগ্নয়দেহ স্থান, লীলা, পরিবারাদি প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার বলিয়া বেদ-বিরোধী মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। তত্ত্ববস্তু স্বর্ঘ্য-সদৃশ এবং জীব সেই সূর্য্যের কিরণকণ। ভগবানের তটস্থ-শক্তিজাত জীব-সকল ভগবত্ত্ব হইতে নিত্য ভিন্ন, বিভিন্নাংশ পৃথক্ সত্ত্বাবিশিষ্ট হওয়ায় চিক্রম্বে গঠিত ও মায়িক মর্মে বশীভূত হইবার যোগ্য হইয়াছে। ভগবান্ মায়ার অধীশ্বর, আর জীব মায়ার বশ-যোগ্য। ভগবানের চিচ্ছক্তি ও ময়াশক্তির মধ্যবর্তী তটস্থ-শক্তি-জাত ক্ষুদ্র চেতন জীব স্বতন্ত্র ইচ্ছা-ক্রমে চিদ ও মায়া উভয় দিক্ দেখিতে দেখিতে ভোগের প্রতি স্পৃহা উদিত হইলে পূর্ণ চিদ্বস্তু ভগবানের সেবা ভুলিয়া গিয়া মায়াদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। ভগবান্ ও জীবের মধ্যে চিদ্বর্ম-বিষয়ে নিত্য অভেদ থাকিলেও বস্তুতঃ পক্ষে স্বরূপে নিত্য ভেদের পরিচয়ই প্রবল। বেদে বিবর্তবাদ ও মায়াবাদ উল্লিখিত নাই। দৈশ্বরের অনিচ্ছান্ত্য-শক্তি স্বীকার করিলে ঈশ্বর বিকারযোগ্য হইতে পারে না। জীব ও জগৎ ব্রহ্মের বিকার নহে, পরন্তু ভগবদ্ ইচ্ছায় তচ্ছক্তিরূপে জীব ও জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। আবার ভগবদ্ ইচ্ছাতেই তাহা লয় হইতে পারে। প্রণব—
ওঁকারই মহাবাক্য এবং ব্রহ্মের শাস্ত্রিক অবতারা। বেদের প্রতি সূত্রের গোণার্থ ত্যাগ করিয়া সহজার্থ গ্রহণ করিলে তাহা দুষ্পণীয় হয় না। ভগবানের নিত্যরূপ বিজ্ঞান এবং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই স্বয়ং ভগবান্। ভগবান্ সেবা বস্তু এবং জীব সেবক। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তিদ্বারাই কৃষ্ণ-

প্রেমের উদয় হয়। শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে অনুরাগ জন্মিলে কৃষ্ণ ব্যতীত
অন্য বিষয়ে আসক্তি থাকে না। পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমই প্রয়োজন তত্ব।
বাস-স্বত্রে শক্তি-পরিণামবাদই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। সম্বন্ধ, অতিথেষ
ও প্রয়োজনতত্ত্বেই স্বত্বের সকল অর্থ পর্যাবসিত হইয়াছে।”

মহাপ্রভুর এবম্বিধ বহু শাস্ত্র-যুক্তি শ্রবণে সম্যাসিগ্গন সহ তাঁহাদের গুরু
প্রকাশানন্দ মায়ামাদের অসারতা উপলব্ধি করিলেন এবং ‘কৃষ্ণ’ ‘কৃষ্ণ’
বলিতে বলিতে গদগদ চিত্তে মহাপ্রভুর চরণে পতিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা
করিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাদের অপরাধ ক্ষমা করিয়া কৃষ্ণনাম-প্রেমে
আকৃষ্ট করিলেন। ক্রমে বারানসীপুরে মহাপ্রভুর স্মরণ ঘোষিত হইল।

আর একদিন মহাপ্রভুর কৃপা-প্রাপ্ত পণ্ডিত প্রকাশানন্দ তাঁহার জনৈক
শিষ্যকর্তৃক মহাপ্রভুর গুণ-গাথা শ্রবণ করিয়া তাহা সমর্থনপূর্বক উল্লসিত
চিত্তে কহিলেন,—

“আচার্য্যের আগ্রহে অদ্বৈতবাদ স্থাপিতে।

তাতে সূত্রের গাথা করে অগ্নি রীতে।

ভগবন্ত! মানিলে অদ্বৈত না যায় স্থাপন।

অতএব সব শাস্ত্রে করয়ে খণ্ডন॥

যেই গ্রন্থকর্ত্তা চাহে স্বমত স্থাপিতে।

সহজ শাস্ত্রের অর্থ নহে তাহা হৈতে॥

মীমাংসক কহে—ঈশ্বর হয় কণ্ঠের অঙ্গ।

সাংখ্য কহে—জগতের প্রকৃতি কারণ॥

ন্যায় কহে—পরমাণু হৈতে বিশ্ব হয়।

‘মায়ামাদী’ নিবিশেষ জ্ঞানে হেতু কয়॥

‘পাতঞ্জল’ কহে ঈশ্বর হয় স্বরূপ আখ্যান।

বেদমতে কহে—তঁারে স্বয়ং ভগবানু॥

জয়ের জয় মত বাস কৈল আবর্ত্তন।

এই সব সূত্র লঞা ‘বেদান্ত’ বর্ণন॥

‘বেদান্ত’-মতে ‘ব্রহ্ম’ সাকার নিরূপণ।

নির্গুণ-ব্যতিরেকে তিঁহো হয় ত মণ্ডণ॥

পরম কারণ ঈশ্বরে কেহ নাহি মানে।

ব-স্ব-মত স্থাপে পরমতের খণ্ডনে॥

তাতে ছয় দর্শন হৈতে তত্ত্ব নাহি জানি।

মহাজ্ঞান যেই কহে সেই সত্য মানি ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাণী অমৃতের ধার।

তিঁহো যে কহয়ে বস্তু, সেই তত্ত্ব সার ॥” — (চৈঃ চঃ)

শ্রীপ্রকাশানন্দের মুখে উক্তরূপ বৃত্তান্ত শুনিয়া মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ আনন্দিত হইয়া মহাপ্রভুকে জানাইতে চলিলেন। সেই সময় মহাপ্রভু পঞ্চনদে স্নান করিয়া বিন্দু-মাধব দর্শনে যাইতেছেন। পশ্চিমধো তিনি সেই বিশেষ নিকট উক্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দীর্ঘ হাস্য করিলেন এবং মাধব-মন্দিরে গিয়া মাধবের সৌন্দর্য দেখিয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। সেই-স্থানে মহাপ্রভুর সহিত লক্ষ লক্ষ লোক হরিশ্রবণিতে মাতিয়া উঠিলে প্রকাশানন্দ হরি-ধ্বনি শুনিতে পাইয়া তথায় আসিয়া মহাপ্রভুর অষ্টসাত্ত্বিক বিকার ও রূপ-মাধুর্য্য দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন। মহাপ্রভু নৃত্য সংবরণ করিলে প্রকাশানন্দ ভাবে গদগদ হইয়া আঁখি-ধারায় ভাসিতে ভাসিতে মহাপ্রভুর পাদ-পদ্ম বন্দনা করিলেন এবং পূর্বে মহাপ্রভুর নিন্দা করার অশ্রু ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। মহাপ্রভু তখন প্রকাশানন্দকে ক্ষমা করিলেন ও আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া উদ্ধার করিলেন। প্রকাশানন্দ-কর্তৃক ছিজাসিত হইয়া মহাপ্রভু ব্যাস-সূত্রের স্তোত্র, ভাগবতের বিচার-ধারাди সংক্ষেপে বিবৃত করিলেন;—

“প্রভু কহে,—আমি জীব অতি তুচ্ছ জ্ঞান।

ব্যাস-সূত্রের গজীয়ার্থ ব্যাস ভগবান্ ॥

তার সূত্রের অর্থ কোন জীব নাহি জানে।

অতএব আপনে সূত্রার্থ করিয়াছে ব্যাখ্যান ॥

যেই সূত্রকর্ত্তা সে যদি করয়ে ব্যাখ্যান।

তবে সূত্রের মূল অর্থ লোকের হয় জ্ঞান ॥

প্রণবের যে অর্থ গায়ত্রীতে সেই হয়।

সেই অর্থ চতুঃশ্লোকীতে বিবরিয়া কয় ॥

ব্রহ্মাকে দেখির চতুঃশ্লোকী যে কহিল।

ব্রহ্মা নারদে সেই উপদেশ কৈল ॥

নারদ সেই অর্থ ব্যাসেরে কহিল।

শুনি বেদব্যাস মনে বিচার করিল ॥

এই অর্থ আমার সূত্রের ব্যাখ্যাক্রম ।
 শ্রীভাগবত করিব সূত্রের ভাষ্যস্বরূপ ॥
 চারিবেদ উপনিষদ্ যত কিছু হয় ।
 তার অর্থ লঞা ব্যাস করিল সঙ্কয় ॥
 যেই সূত্রে সেই ঋক্ বিষয় বচন ।
 ভাগবতে সেই ঋক্ শ্লোক নিবন্ধন ॥
 অতএব সূত্রের ভাষ্য শ্রীভাগবত ।
 ভাগবত শ্লোক উপনিষদ্ কহে এক অর্থ ॥
 ভাগবতের সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন ।
 চতুঃশ্লোকীতে প্রকট তার করিয়াছে লক্ষণ ॥

অতএব ভাগবত করহ বিচার ।

ইহা হৈতে পাবে সূত্র-স্মৃতির অর্থ সার ॥

নিরন্তর কর কৃষ্ণ নাম-সঙ্কীৰ্ত্তন ।

হেলায় মুক্তি হবে, পাবে প্রেমধন ॥—(১৫: ৮:)

মহাপ্রভু অমরুপ দ্বিদ্ধান্তসমূহ ব্যক্ত করিলে প্রকাশানন্দ বড়ই আনন্দিত হইলেন । মহাপ্রভু যে ভারী বোঝা লইয়া বারাণসীতে আসিয়াছিলেন তাহা এইভাবে বিনামূল্যে বিলাইয়া দিলেন । সন্ন্যাসীগুরু প্রকাশানন্দ সহ বারাণসীর সকল সন্ন্যাসী কৃতকৃতার্থ হইলেন । বারাণসী-ধামবাসীদিগকে বৈষ্ণব করিয়া মহাপ্রভু নীলাচলের পথে রওনা হইলেন ।

নীলাচলে প্রত্যাবর্তনান্তে ভক্তগণসহ বিবিধ লীলা এবং

ছোট হরিদাসের দণ্ডবিধান

মহাপ্রভু নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষারত ভক্তগণ মহানন্দে মাতিয়া উঠিলেন । মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণান্তে ছয় বৎসর ধরিয়া বিভিন্নস্থান গমনাগমনের পরে অষ্টাদশ-বর্ষ নীলাচলেই অবস্থান করিলেন । অষ্টাদশ বর্ষ স্থায়ীভাবে নীলাচলে অবস্থানকালে মহাপ্রভু প্রথম ছয় বৎসর নীলাচলের বিভিন্ন স্থানে বিবিধ লীলা করেন এবং শেষ ছাদশ বৎসর গন্তীরায় দিব্য শ্রেয়োগ্রাদে মত্ত থাকেন ।

বর্তমান পূর্ববঙ্গের (বাংলা দেশের) অন্তর্গত যশোহর জেলার বাটন গ্রামে যখনকূলে আবির্ভূত শ্রীল হরিদাস ঠাকুর পূর্বে শান্তিপুরে শ্রীঅষ্টৈত-গৃহে মহাপ্রভুর পদাশ্রয় লাভ করিয়া শ্রীনাম-প্রচারের আচার্য্যরূপে নিযুক্ত হন এবং মহাপ্রভুর নীপাচলে অবস্থানকালে তিনি অধুনা খ্যাত সিদ্ধ-বকুল-তলে অবস্থানপূর্বক প্রত্যহ তিন লক্ষ হরিনাম জপ করিয়া নিরন্তর ভজনা-নন্দে কাল যাপন করেন। শ্রীল হরিদাস চাঁদপুরের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বলরাম আচার্য্যের গুরুদেব ছিলেন। শ্রীল হরিদাস অধম কুলেতে আবির্ভূত হইয়াও তিনি পতিত-পাবন মহাভাগবত। ভগবদ্ভক্তিগণ শূদ্রকূলে কিংবা অস্বাজ কূলে আবির্ভূত হইলেও শ্রেষ্ঠ। কারণ ভগবান্ কেবলমাত্র ভক্তির দ্বারাই প্রীত হইয়া থাকেন। যথা শাস্ত্রবানী,—

“ব্যাধস্তাচরণং ক্রবস্যা চ বয়ো বিদ্যা গজেন্দ্রস্ত কা

কুজায়াঃ কিমু নামরূপমধিকং কিন্তুং স্যদাম্মো ধমম্।

বংশঃ কো বিদুরস্ত যাদবপতেকগ্রস্ত কিং পৌরুষং

ভক্ত্যা তুষাতি কেবলং ন চ গুণৈর্ভক্তিপ্রিয়ো-মাধবঃ॥”

অর্থাৎ, ব্যাধের আচরণ, ক্রবের বয়স, গজেন্দ্রের বিদ্যা, কুজার রূপ, সুদামার ধন, বিদুরের বংশ এবং যাদবপতি উগ্রসেনের পৌরুষ বলিতে কিছু কি ছিল? ভক্তিপ্রিয় মাধব জড়ীর আচরণ, বয়স, জড়বিদ্যা, জড়দেহের রূপ, পার্থিব ধন, উচ্চ বংশ, পৌরুষ ইত্যাদি গুণে তুষ্ট না হইয়া কেবল-মাত্র ভক্তির দ্বারাই প্রীত হইয়া থাকেন।

‘শ্রীচৈতন্যভাগবত’ বলিয়াছেন—

“অধম কুলেতে যদি বিযুক্তক হয়।

তথাপিহ সেই সে পূজা সর্বশাস্ত্রে কয়॥”

শ্রীকৃষ্ণ এই সময় নীলাচলে আসিয়া শ্রীহরিদাস ঠাকুরের নিকট অরস্থান করেন। শ্রীকৃষ্ণ মহাপ্রভুর নিকট দশমাস শিক্ষালাভ করিয়া মহাপ্রভুর আজ্ঞাক্রমে ব্রহ্মমণ্ডলে চশিয়া গেলে শ্রীসনাতন ঐস্থানে হরিদাসের নিকট অবস্থান করেন। মহাপ্রভু প্রতিদিন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের উপলভোগ দর্শন করিয়া ঐস্থানে আসিয়া তাঁহাদিগকে দর্শন দিতেন ও আলিঙ্গন করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ ও সনাতন ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত হইয়াও নিজেদের স্লেচ্ছাধিক হইতে নীচ ভাবিয়া দৈন্তলীলা প্রদর্শনপূর্বক শ্রীশ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে প্রবেশ করেন নাই; পরন্তু শ্রীকৃষ্ণ-সনাতন ও হরিদাস দুই হইতেই শ্রীজগন্নাথদেবের

মন্দিরের চূড়া দর্শনপূর্বক কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়িতেন। উক্ত মহা-
ভাগবতগণ কোনও বিধি-নিষেধের অধীন না হওয়ায় তাঁহাদের মন্দিরা-
ভাস্করে বাইবার প্রয়োজন হয় নাই। পরে শ্রীমদ্রূপাশ্রমের আজ্ঞামুসারে
সনাতন ব্রজমণ্ডলে গিয়া ভজন করিতে থাকেন। শ্রীসনাতন বৃন্দাবনে
শ্রীরাধা-মদনমোহনের শ্রীবিগ্রহ-সেবা প্রকাশ করেন। বৃন্দাবনে অবস্থিতি-
কালে শ্রীকৃষ্ণ সনাতনের বৈরাগ্য ও শ্রীকৃষ্ণভজন সম্পর্কে “শ্রীচৈতন্য-
চরিতামৃত” গ্রন্থ হইতে জানা যায়,—

“অনিকেত হুঁহে, বনে যত বৃক্ষগণ ।
এক এক বৃক্ষের তলে এক এক রাত্রি শয়ন ॥
বিপ্র-গৃহে স্থল ভিক্ষা, কাঁহা মাধুকরী ।
শুক কুটী চানা চিহ্নায় ভোগ পরিহরি ॥
করৌঁষা মাত্র হাতে, কাঁথা, ছিঁড়া-বহির্কান ।
কৃষ্ণ-কথা, কৃষ্ণ-নাম, নর্ত্তন উল্লাস ॥
অষ্টপ্রহর কৃষ্ণভজন, চারি দণ্ড শয়নে ।
নামসঙ্কীর্ণন-প্রেমে, সেহ নহে কোন দিনে ॥
কক্ষু ভক্তি-রসশাস্ত্র করয়ে লিখন ।
চৈতন্য-কথা শুনে, করে চৈতন্য-চিন্তন ॥”

শ্রীসনাতন, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীহরিদাসের মাধ্যমে মহাপ্রভুর অভিলষিত কার্য
সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইয়াছিল। মহাপ্রভু উক্ত নিজ জনদ্বারা নাম-
প্রেমামৃত জগৎ ভাসাইলেন।

“হরিদাস দ্বারা নাম-মাহাত্ম্য প্রকাশ ।
সনাতন দ্বারা ব্রজের ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিলাস ॥
শ্রীকৃষ্ণ-দ্বারা ব্রজের রস-প্রেম-লীলা ।
কে কহিতে পারে গভীর চৈতন্যের খেলা ॥
শ্রীচৈতন্যের লীলা এই অমৃতের সিদ্ধি ।
জগৎ ভাসাইতে পারে যার এক বিন্দু ॥”—(চৈঃ চঃ)

রঘুনাথভট্ট গোস্বামিপাদ এই সময় নীলাচলে আসিয়া শ্রীমদ্রূপাশ্রমের
সেবায় আট মাস অতিবাহিত করিয়া মহাপ্রভুর আদেশে বৃন্দাবনে গমন
করেন ও তথায় শ্রীকৃষ্ণ-সনাতনের আনুগত্যে হরিভক্তনে ব্যাপ্ত থাকেন।
বৃন্দাবনে রঘুনাথভট্ট গোস্বামীর ভজন সম্পর্কে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার
লিখিয়াছেন,—

“শ্রীকৃষ্ণগোসাঁঞির সভায় করে ভাগবত পঠন ।

ভাগবত পড়িতে প্রেমে আলায় তার মন ॥

অশ্রু-কম্প-গদগদ প্রভুর কৃপাতে ।

মেন্ত্র রোধ ঝড়ে বাষ্প না পারে পড়িতে ॥

পিকষর কর্ত্ত তাতে রাগের বিভাগ ।

এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় তিন চারি রাগ ॥

কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য যবে পড়ে শুনে ।

প্রেমে বিহ্বল হয় তবে কিছুই না জানে ॥

* * * *

গ্রাম্য-বার্ত্তা না শুনে না কহে জিহ্বায় ।

কৃষ্ণকথা-পূজাদিতে অষ্টপ্রহর যায় ॥

বৈষ্ণবের নিদ্রা কর্ত্ত নাহি পাড়ে কানে ।

সবে কৃষ্ণভজন করে এইমাত্র জানে ॥

রঘুনাথদাসও এই সময় মহাপ্রভুর প্রচুর সেবা করিয়া মহাপ্রভুকে তুষ্ট করেন । মহাপ্রভু স্বরূপ দামোদরের উপর রঘুনাথদাসের শিষ্কার ভার অর্পণ করিয়া স্বয়ং সংক্ষেপে কিছু উপদেশ প্রদান করেন :—

“গ্রাম্য কথা না শুনিবে, গ্রাম্য বার্ত্তা না কহিবে ।

ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে ॥

অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণ নাম সদা লবে ।

ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে ॥”

মহাপ্রভু একদিন বহুতে রঘুনাথকে শ্রীগোবর্দ্ধন শিলা ও গুজামালা প্রদান করিয়া আগ্রহভরে সেবা করিতে নির্দেশ দিলেন । রঘুনাথ সানন্দে ভজন-পূজন করিতে করিতে শ্রীগোবর্দ্ধন শিলায় শ্রীগোবিন্দকে এবং গুজামালায় শ্রীমতী রাধারানীকে প্রত্যক্ষ করিলেন । রঘুনাথের বৈরাগ্য ও নিয়মনিষ্ঠার তুলনা নাই ।

“অনন্ত গুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা ।

রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা ॥

সাড়ে সাত প্রহর যায় যাহার স্মরণে ।

সবে চারি দণ্ড আহার নিদ্রা কোন দিনে ॥

বৈরাগ্যের কথা তার অদ্বুত কথন।
 আশ্রয় না ছিল জিহ্বাহ রসের স্পর্শন ॥
 ছিগু কানি কাঁথা বিনা না পরিবে বসন।
 সাবধানে প্রভুর কৈল আঞ্জার পালন ॥
 প্রাণরক্ষা লাগি যবে করেন ভক্ষণ।
 তথা খাটয়া আপনাকে করে নির্বেদন ॥
 প্রসাদান্ন পসারীর যত না বিকায়।
 দুই তিন দিন তৈতে ভাত সড়ি যায় ॥
 সিংহদ্বারে গাবী আগে সেট ভাত ডারে।
 সড়াগন্ধে তৈলজ গাই খাইতে না পারে ॥
 সেই ভাত রঘুনাথ রাত্রে ঘরে আনি।
 ভাত ধুয়া ফেলে ঘবে দিয়া বহ পানী ॥
 ভিতরেতে দড়ভাত মাজি যেট পায়।
 লুন দিয়া রঘুনাথ সেট অন্ন খায় ॥—(চৈঃ চৈঃ)

রঘুনাথের উক্তকণ বৈরাগ্য দেখিয়া মহাপ্রভু বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন এবং
 একদিন আসিয়া ঐ প্রসাদান্ন এক গ্রাস ভক্ষণ করিয়া সানন্দে কহিলেন,—

“প্রভু বলে নিতি নিতি নানা প্রসাদ পাই।
 তেছে স্বাদ আর কোন প্রসাদ না পাই ॥”—(চৈঃ চৈঃ)

একদিন ভগবান্ আচার্য্য মহাপ্রভুর সেবার জন্য ছোট হরিদাসকে ব্রহ্মা
 তপস্বিনী মাধবীমাতার নিকট হইতে কিছু চাউল ভিক্ষা করিয়া আনিতে
 বলিলে ছোট হরিদাস সেট মত ভিক্ষা আনিয়া দেন। ভগবান্ আচার্য্যের
 গৃহে মহাপ্রভু সেট চাউলের অন্ন ভোজনকালে ভগবান্ আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা-
 বাদে জানিলেন যে, সেট চাউল ছোট হরিদাস মাধবীমাতার নিকট হইতে
 আনিয়াছেন। তাহা শুনিয়া মাধবীদেবীর প্রদত্ত চাউলের অন্ন মহাপ্রভু গ্রহণ
 করিলেন বটে, কিন্তু চাউল-ভিক্ষা-চলে ছোট হরিদাসের ছরভিসন্ধি ও
 কপটতা বুঝিতে পারিয়া তিনি ছোট হরিদাসকে বর্জন করিলেন। ছোট
 হরিদাস সেজগত চুঃখিত হৃদয়ে জিবেণীর জলে ডুবিয়া দেহভাগ করিয়া
 সঙ্গতি লাভ করিলেন এবং স্বহৃদেহে মহাপ্রভুর পাশে গমন করিয়া কীৰ্ত্তন
 শোনাইলেন। মহাপ্রভু অন্তর্যোগীসূত্রে শ্রী-সন্তোষকরী ছোট হরিদাসের
 কপটতা বুঝিতে পারিয়া ছোট হরিদাসকে উপলক্ষ্য করিয়া সন্ন্যাসিগণকে
 বিস্তৃত থাকিতে শিক্ষা দিলেন।

“লোক দেখান গোরা-ভজা তিশকমাত্ত ধরি ।

গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি ॥” — (শ্রেয়বিবর্ত্ত)

ভক্ত ছোট হরিদাসের প্রতি মহাপ্রভু দণ্ডবিধান করিয়া যে লীলার অবতারণা করিয়াছেন, তৎসম্পর্কে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার জানাইয়াছেন ;—

“আপন কারণ্যে লোকেব বৈরাগ্য শিক্ষণ ।

ভক্তের গাঢ় অনুরাগ — প্রকটিকরণ ॥

তীর্থের মহিমা, নিজ ভক্তে আশ্বসাৎ ।

এক লীলায় করে প্রভু কার্য পাঁচ সাত ॥” (ক্রমশঃ)

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কবিভূষণ

“অন্ধশ্চ দীপো বধিরশ্চ গীতম্”

(পূর্বপ্রকাশিত ৩২শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৫৪ পৃষ্ঠার পর)

—পণ্ডিতগোস্বামীর এই সকল সিদ্ধান্ত “অদ্বুতসিদ্ধান্ত” ? অজ্ঞামিলের সাধুনিন্দাদি কোন নামাপরাধ না থাকায় তাঁহার ‘নামাভাস’ হইয়াছিল ; কিন্তু অসাধু সঙ্গ-রত সাধারণ বদ্ধজীবের (বিশেষতঃ প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের) ‘সাধুনিন্দা’ ও নাম বলে পাপবুদ্ধিরূপ ছুইটী মহান অপরাধ সর্বক্ষণই সম্ভব, সুতরাং “কছু নামাভাস হয়, সদা নামাপরাধ”—এই কথাটির সার্থকতা সিদ্ধ হইল, আর সাধুসঙ্গ ব্যতীত যে শুদ্ধ-নাম উদ্ভিত হইতে পারে না—তাঁহাও আমরা অজ্ঞামিলের উদাহরণ হইতেই বুঝিতে পারিলাম। ‘ভক্তিসম্বর্ড’ ২৬৫ সংখ্যায় শ্রীল জীব-গোস্বামিপাদের উক্তি—“নামৈকং বস্তু বাচি ‘অরণ্যপথগতং’ ইত্যাদৌ দেহজবিণাদি-নিমিত্তক ‘পাষণ্ড’ শব্দেন চ দশ অপরাধা লক্ষ্যন্তে, পাষণ্ডমমত্বাভেদাৎ ॥” সর্বশক্তি সম্পন্ন স্ত্রীনামও যদি ‘দেহ’ (ইঞ্জিয়তৃপ্তি), ‘দ্রবণ’ (অন্ধ-অর্থসংগ্রহচেষ্টা, নাম-মগ্ন ভাগবত-ব্যবসারাদি দ্বারা অর্থসংগ্রহচেষ্টা), ‘জনতা’ (অসংসঙ্গ বা দুঃসঙ্গ), ‘লোভ’ (জিহ্বালম্পট্য বা লৌল্য) রূপ ‘পাষণ্ডতা’ (বিষুবিশ্রমে শিলা, কাষ্ঠ, স্বর্ণ, পিণ্ডল প্রভৃতি ধাতুবুদ্ধি অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ স্ত্রীবিগ্রহকে প্রাকৃত-সহজিয়ার গৌরাজ, সোনার গৌরাজ, রূপার গৌরাজ, কাঠের গৌরাজ প্রভৃতি জ্ঞান, সদৃশ্যে মর্ত্যবুদ্ধি ও অসদৃশ্যরূপে বার্থসিক্তির জন্য কল্পিত ও আরোপিত

ভগবদ্ভক্তি হ্রলনা, বৈষ্ণবের জাতি বা পার্থিব বুদ্ধি ইত্যাদি ইত্যাদি) মধ্যে পতিত হয়, তাহা হইলে পাষণ্ডময় বা অপরাধহেতু ফলজনক হয় না অর্থাৎ নামের ফলে যে কৃষ্ণ-প্রেমা, তাহা উদ্ভিত হয় না; অতএব অসাধুসঙ্গে কখনই শুদ্ধ-নাম হইতে পারে না। যথা—

“সাধুরূপা নাম বিনা প্রেম না জন্মায়”

(চৈঃ চঃ অঙ্ক ৩২৬৪)

মহাভাগবত তুমি তোমার দর্শনে।

তোমার কীর্তন—‘কৃষ্ণ-নাম’ শ্রবণে।

চিন্তিত হইল, চাহে কৃষ্ণ-নাম লৈতে ॥

(চৈঃ চঃ অঙ্ক ৩২৫০-৫১)

শুভমালার শ্রীকৃষ্ণনামস্তোত্রের ১ম শ্লোকে শ্রীল রূপগদ—যে হরি-নামকে “মুক্তকুলের উপাত্তমান” ও “ভক্তি-রসামৃতসিদ্ধিতে” ‘প্রাকৃত-প্রিয়ের অগ্রাহ’ প্রভৃতি বলিয়াছেন, সেই শ্রীহরিনাম কখনই প্রাকৃত অসাধু-সঙ্গে উদ্ভিত হইতে পারে না।

নিয়ামক-নাথ মহাশয় লিখিয়াছেন, অসাধুর সঙ্গে যাহারা নাম করেন, তাহাদের শ্রীনামের প্রতিট লক্ষ্য থাকে।” এইরূপ অদ্ভুত সিদ্ধান্ত নাম-বিক্রয়ী, নামবলে ভোগমোক্ষপ্রয়াসী ভাড়াটিয়া নামাপরাধি-ব্যক্তিগণের মুখেই শোভা পায়। নাথ মহাশয়ের নিয়ামক পুর্বে “আচার্য্য-সন্তানগণের মংগাদি ভক্ষণ মনুষ্যজাত্যুচিত” (“আচার ও আচার্য্য” ১৩নং উত্তর দ্রষ্টব্য) প্রভৃতি যে সকল অদ্ভুত-সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া তাহার কুটির পরিচয় দিয়াছেন, এবার আবার “গুরু যথা ভক্তিশূন্য তথা শিষ্যগণ” (চৈঃ ভাঃ মধ্য ২১৬৪) এই বাস-বাক্যের সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য নাথ মহাশয় “অসাধু সঙ্গে ‘নাম’ হয়”—এই ভক্তিবিরোধী অত্যদ্ভুত সিদ্ধান্তটি প্রচার করিয়া গুরুর সহিত নিজ-(কাঁসাতোগীর-দলের) কুটির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন না কি।

শ্রীমদ্বাহ্যপ্রভু কুলীনগ্রামিগণের নিকট ‘বৈষ্ণব’র সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়া জগৎকে জানাইলেন যে,—“ঈশ্বর মুখে এক কৃষ্ণনাম, সেই ‘ত’ বৈষ্ণব” (চৈঃ চঃ মধ্য ১৬১১১) আবার তিনিই শ্রীলনাতন-শিক্ষার আসাদিগকে জানাইলেন, “অসংসঙ্গ-ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার” (চৈঃ চঃ মধ্য ২২৮৪) অর্থাৎ শুদ্ধ-কৃষ্ণনামকারিব্যক্তিই বৈষ্ণব এবং সেই বৈষ্ণবের আচারে অসং-

সদৃশ ভাগ্যরূপ লক্ষণটি দেখিতে পাওয়া যায়। অসংসদ্বিবিধঃ—(১) স্ত্রী-সদ্ব বা স্ত্রীসদ্বীর সদ্ব; এবং (২) অস্ফাভিলাষী কৃষ্ণভক্তের সদ্ব। শ্রীমদ্রূপ-প্রভুর উক্ত সিদ্ধান্তের দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, অসংসদ্বী ব্যক্তি কখনও “নামকীর্তনকারী বা বৈষ্ণব” নহেন। নামকীর্তনকারীই—বৈষ্ণব; আর সেই বৈষ্ণবের আচারই—যখন “অসং-সদ্ব-ভাগ্য”, তখন অসংসদ্বী-কখনও নামকীর্তনকারী নহেন, ভোগমোক্ষাদি কামনাহীন নামাপরাধী মাত্র।

শ্রীনামকীর্তনই অভিধেয় বা ভক্তি। “ভক্তিঃপরেশানুভবঃ বিরক্তিরনুভূত” (ভাঃ ১১।২।৪১) অর্থাৎ ভক্তি, ভগবদুপলব্ধি ও কৃষ্ণভক্তের বিষয়বিরক্তি—তিনটাই যুগপৎ উদ্ভূত হয়—এই ভাগবতীয় সিদ্ধান্ত এবং “ভদবধি যত নারীসঙ্গমে স্মর্যমাণে ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠু চীর্ণীবনঞ্চ” (ভাঃ ৪।৩৯) অর্থাৎ যেকালে আমার মন নব নব রসের আলস্য স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে রমণ করিতে উন্মত্ত হইয়াছে, সেট অবধি নারীসঙ্গমের কথা স্মরণ হওয়া মাত্রও আমার মুখবিকৃতি ও থুংকার উপস্থিত হয়—এই সকল বাক্য হইতে কি স্পষ্টই বুঝা যায় না যে, ‘নামকীর্তনকারীর অসংসঙ্গে প্রবৃত্তি থাকিতে পারে না’? শ্রীমদ্রূপপ্রভু সনাতনশিষ্যের (চৈঃ ৫ঃ মধ্য ২২।৫১-৫৪) আরও বলিয়াছেন—“মহং কৃপা দিনা কোন কর্ণে ভক্তি নর। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহ সংসার নচে ক্ষয় ॥ সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয় ॥”

ভাগবতীয়—“নৈষণং মতিস্তাবল্লুকক্রমাজিঘ্রুঃ স্পৃশতি...নিষ্কলম্বানানং ন হনীত যাবৎ” (ভাঃ ৭।৫।২৫) সত্যং প্রসঙ্গান্বয়বীৰ্য্যসংবিদ ইত্যাদি (ভাঃ ৩।২।২৫), সনুখব্রিতাং ভবদীয় বার্তাং (ভাঃ ১০।১।৪৩) প্রভৃতি বাক্য হইতেও স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, অসাধুসঙ্গে ভাড়াটীয়াব মুখে কখনও ‘শ্রীনাম’ হইতে পারে না। আবার—“সত্যং শৌচং দয়া মোদনং বুদ্ধি-হ্রীঃশ্রীযশঃ ক্ষমা” ইত্যাদি (ভাঃ ৩।৩।৩৩-৩৫) অর্থাৎ সত্য, শৌচ, দয়া, মোদন, পরমার্থ-বিষয়া মতি, লজ্জা, শ্রী, কীর্ত্তি, সহিষ্ণুতা, শম, দম, উন্নতি প্রভৃতি সঙ্গুণ অসদ্ব্যক্তিবর্ণের সংসর্গে একেবারেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই সকল অশাস্ত দেহান্তবুদ্ধিবিশিষ্ট ক্রীড়ামুগের ছায় কামিনীকুলের বশীভূত, মূঢ়, অতীব শোচ্য অসাধুব্যক্তিবর্ণের সঙ্গে জীবের যেকোন মোহ ও বন্ধন উপস্থিত হয়, অন্য কোনও বস্তুর সঙ্গদ্বারা সেইরূপ হয় না।

এই সকল ভাগবতীয় সিদ্ধান্তের স-নিয়ামক নাথ মহাশয় “অসাধুজ্ঞে কৃষ্ণনাম হইতে পারে” এই অসংসঙ্গ-জনিত ক্রটিপর সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া তাহাদের ভাগবত-সিদ্ধান্তবিরোধ-সাধনার প্রকৃষ্ট পরিচয় এতদিনে খুব সরলভাবেই প্রদান করিয়াছেন। অনেক বৈষ্ণব মহাজন লিখিয়াছেন,— “কৃষ্ণবিস্মৃত জীব বৈষ্ণবত্ব হইয়া জৈণ পুরুষের স্বেচ্ছাপ্রভাবে নারীর অঞ্চলধ্বক পুরুষেরই বহুমানন করেন এবং তাহাদিগকেই গুরুজ্ঞানে দ্বয়ং জৈণ শিষ্য হইবার যোগাতা লাভ করেন।” প্রবন্ধ বিস্তারের ভয়ে আমরা অগ্র শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের বাক্য-দ্বারা উপসংহার করিতেছি,—

“অসংসঙ্গ সদা ত্যাগ,” ছাড়’ অন্য গীত-বাগ,
কম্পী জ্ঞানী পরিহরি’ দুরে।

* * *

কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ করি’, কৃষ্ণভক্ত-অঙ্গ হেরি’,
শ্রদ্ধাশ্রিত শ্রবণ-কীর্তন।”

আবার শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামীর ‘শ্রীপ্রেমবিবর্তে’র ভাষায় কৃষ্ণভক্ত ও শ্রীসঙ্গী প্রাকৃত-সহজিয়াকুলের বিস্ময়োৎপাদন করিয়া বলিতেছি,—

“অসাধু-সঙ্গে ভাই, কৃষ্ণনাম নাহি হয়।”

শ্রী শ্রী জন্মাষ্টমী-মহোৎসব

এই বৎসর গত ১৬ই ভাদ্র, ২রা সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালিত মঠসমূহে এবং অনেক গৃহস্থ ভক্তের গৃহে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীব্রত-উপবাস পাঠ ও বক্তৃতা, শ্রীগঙ্গাগবত পারায়ণ, সংকীর্তন সহযোগে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে।

সমিতির মূলকেন্দ্র নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ ও তৎশাখা মঠ মথুরাপ্রান্ত শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ, শিলিগুড়িস্থ শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ, আসামস্থ শ্রীগোলোকগঙ্গা গৌড়ীয় মঠ, শ্রীরাঙ্গদেব গৌড়ীয় মঠ, তুরাঙ্গ শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয়মঠ প্রভৃতি প্রচারকেন্দ্রে এই ত্রতোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। সেই সেই স্থানে পাঠ, সংকীর্তন, ধর্মসভা ও প্রদর্শনী

প্রভৃতিতে বহু লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। অর্ধরাত্রে ১২টার সময় বিপুল হরিনাম-সংকীর্্তন, উচ্চ হরিশ্রবণ ও সঙ্ঘনিবাদের মুখরিত শ্রীমন্দিরে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীযশোদা তনয়ের-শাস্ত্রের রীতি অনুসারে পূজাভিষেক ও ভোগরাগ সম্পন্ন হয়। পরদিবস শ্রীনন্দোৎসবে শত শত শ্রদ্ধালু জনগণকে বহুবিধ অস্বাদু মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ মথুরাতে শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে ১৫ই ভাদ্র হইতে ১৭ই ভাদ্র পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী বহুবিধ কার্যক্রম সম্বলিত একটি বহুদায়ুষ্ঠানের আয়োজন হইয়াছিল। মঠ-প্রাপণ এবং শ্রীমন্দিরে বিভিন্ন রঙের বিদ্যুৎ আলোকমালায় সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। বিভিন্ন দ্বারদেশে কদলী-স্তম্ভযুক্ত তোরণে জলপূর্ণ কলসী-ভাত্রা-পল্লব ও ডাবদ্বারা সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। কংস-কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব, বসুদেবের দ্বারা শ্রীমন্দি-গোকুলে আনিয়ন, অষ্টভুজা মগামায়া-দ্বারা কংসকে ভংগনা, পুতনা বধ, কালীয় দমন, শ্রীমদ্বাহুপ্রভুর সপরিবারে নগর-সংকীর্্তন, জগাট-মাধাট উদ্ধার, শ্রীমদ্বাহুপ্রভুর ঝাড়িখণ্ডের যাত্রায় বহু জন্তুগণকে প্রেমদান ও শ্রীমদ্বাহুপ্রভুর শ্রীজগন্নাথ পুরীধামের শ্রীমন্দিরে গুরুভক্তকে অবলম্বন করিয়া ভাববিভোর হইয়া শ্রীজগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রাকে দর্শন, এইসকল লীলার সুন্দর সুন্দর আকর্ষণীয় পুস্তলিকা দ্বারা অতি সুন্দর বিদ্যুৎ পরিচালিত এই ভগবৎ-প্রদর্শনী সকল দর্শক ও ভক্তবৃন্দকে মুগ্ধ করিয়াছিল। মথুরা নগরের এবং বাহিরের সহস্র সহস্র আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এই প্রদর্শনী দর্শনের জন্য সমবেত হইতেন। তাঁহাদের বিশেষ আগ্রহে চারদিন পর্য্যন্ত সর্বসাধারণের জন্য প্রদর্শনী উন্মুক্ত রাখা হইয়াছিল এবং মুক্তকণ্ঠে সকলেই উহার প্রশংসা মুখর হইতেন।

তদতিরিক্ত ১৫ই ভাদ্রে শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমীর অধিবাস তিথিতে সন্ধ্যারতি-কীর্্তন, শ্রীতুলসী-পরিক্রমার পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমুক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ পাঠ করেন এবং ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণ-লীলা সম্বন্ধে সুসিদ্ধান্তপূর্ণ মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেন। ১৬ই ভাদ্র মঙ্গলবার শ্রীজন্মাষ্টমী-দিবসে মঙ্গলারতি, শ্রীতুলসী-পরিক্রমা, প্রাতঃকালীন সংকীর্্তনের পর শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ পাঠ্য আরম্ভ হইয়া মধ্যরাত্রে সমাপ্ত হয়। তৎপরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমুক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ,

ত্রিদিগ্ভিম্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত গদ্যনাভ মহারাজ, শ্রীকৃষ্ণবিহারী ব্রহ্মচারী প্রমুখ বক্তাগণ স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব ও বহুবিধ উপনিষৎ সম্বন্ধে দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ মনোজ্ঞ ও হৃদয়স্পর্শী ভাষণ প্রদান করেন। রাত্রি ১২টার সময় সংকীৰ্ত্তন সহযোগে হরিশ্বনি, সজ্জাদি বাজ-ধ্বনি মাধ্যমে শ্রীবিগ্রহের শাস্ত্রীয় পদ্ধতি অনুসারে মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগ, আরতি সুসম্পন্ন হয়। উপস্থিত শ্রদ্ধালু জনগণকে শ্রীচরণামৃত এবং ফলমূলের প্রসা বিতরণ করা হয়।

পরদিবস ১৭ই ভাদ্র শ্রীশ্রীনন্দোৎসবে প্রায় দেড়হাজার সমাগত শ্রদ্ধালু-জনগণকে বহুবিধ সুস্বাদু মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যার সময় আরতি, কীর্ত্তন ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের পরে শ্রীনন্দনন্দন ব্রহ্মচারী ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরলীলা প্রদর্শন করান।

শ্রীশ্রীজন্মাস্তমী-তিথিতে সমিতির সহ-সভাপতি মহারাজের বক্তৃতার সার

জন্ম ও আবির্ভাব—এই দুইটি শব্দের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। আমরা অতীত শ্রীশ্রীজন্মাস্তমী পালন করিতেছি—আবির্ভাব নহে। মথুরায় কংস-কারাগারে বাসুদেব কৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছিল এবং শ্রীনন্দ-ভবনে শ্রীনন্দ-গৃহিণী শ্রীযশোদা দেবীর গর্ভে যশোদা-নন্দনের জন্ম হইয়াছিল। আবির্ভাব শব্দটি ত্রৈলোক্যময় বা গৌরবময় এবং ‘জন্ম’ শব্দটি মাধুর্য্যময়। মথুরায় কংস-কারাগারে শ্রীবাসুদেব মহারাজ দেবকীর কর্ণে বীজ মস্তকের দ্বারা ভগবানের আবির্ভাব করাইয়াছিলেন সেখানে চতুর্ভুজ বাসুদেব শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম; কিরীট-কুন্তল-কুণ্ডল বেশভূষা অলঙ্কারাদিযুক্ত অবস্থায় জন্মগ্রহণ না করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এখানে বাসুদেব কৃষ্ণের আবির্ভাব-লীলা। কিন্তু নন্দগোকুলে শ্রীযশোদার গর্ভে স্বয়ং কৃষ্ণ জন্মলীলা প্রকাশ করিয়াছেন। সেখানে তাঁহার নাড়ীচ্ছেদ জাতকর্ম্ম, নামকরণ এবং মথুরা বাল্যলীলা সম্পাদিত হইয়াছিল। মথুরাতে যে সময়ে কেবল বাসুদেবকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন সেইকালে নন্দ-গোকুলে কৃষ্ণ, জন্মলীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং সেই রাতে কিছু সময় পরেই মহোদয়।

যোগমায়া দেবী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে “অদৃশ্য তাত্ত্বজা বিষ্ণোঃ” (শ্রীমদ্ভাঃ ১০/৪২) —মা যশোদা গর্ভগ্রসূতা যোগমায়া দেবীকে বিষ্ণুর অর্থাৎ কৃষ্ণের অমুজা বলা হইয়াছে। অতএব যোগমায়া দেবী বাসুদেব কৃষ্ণের অমুজা নহেন, কিন্তু শ্রীযশোদা-নন্দন কৃষ্ণের অমুজা। বলা হইয়াছে। অতএব যোগমায়া দেবী বাসুদেব কৃষ্ণের অমুজা নহেন, কিন্তু শ্রীযশোদা-নন্দন কৃষ্ণের অমুজা। শ্রীযশোদানন্দন কৃষ্ণ এবং যোগমায়া দেবী—ইঁহারা যশোদার গর্ভজাত যমক সন্তান। শ্রীমদ্ভাগবতে ১০/৫১ শ্লোকে আরও স্পষ্টভাবে “নন্দস্তাত্ত্বজ উৎপন্নঃ” শ্রীনন্দ মহারাজের আত্মজ বলা হইয়াছে। পরবর্ত্তী দ্বিতীয় শ্লোকে আরও স্পষ্টভাবে নন্দ-গোকুলে নন্দনন্দনের জাতকর্ষের কথা বর্ণন করা হইয়াছে—

“বাচয়িত্বা স্বস্তায়নং জাতকর্ম্মাত্ত্বজস্য বৈ”—শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাকারগণ বাসুদেব শব্দের অর্থ নন্দনন্দনই করিয়াছেন। ইঁহারা দেখাইয়াছেন যে কৃষ্ণের আর একটি নাম বাসুদেব—যেহেতু নন্দ মহারাজেরই বাসুদেব আখ্যা আছে। ‘হরিবংশ পুবাণে’ নন্দগৃহিণী যশোদার আর একটি নাম দেবকী দেবী। অতএব বাসুদেব কৃষ্ণ বল্লে নন্দতনুজ কৃষ্ণকেই বুঝি, তদ্রূপ দেবকীনন্দন বল্লেও যশোদানন্দন কৃষ্ণকে বুঝা যায়।

অতএব আমরা বাসুদেবের আবির্ভাব-তিথি পালন করিতেছি—এরূপ গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণ মনে করেন না। তাঁরা নন্দাত্মজ কৃষ্ণের জন্মাষ্টমী পালন করিয়া থাকেন। অতএব আমরা কৃষ্ণের জন্মলীলাই উপাসক।

“কৃষ্ণের যত খেলা, সর্বোত্তম নরলীলা,

নরবধু তাহার স্বরূপ।”

নরলীলার জন্মই প্রধান, আবির্ভাব গুপ্ত। অতএব বাসুদেবের অপেক্ষা কৃষ্ণের জন্মের মাধুর্য্য এত অধিক যে শাস্ত্রকারগণ আবির্ভাবাষ্টমী না বলিয়া জন্মাষ্টমী বলিয়াই বর্ণন করিয়াছেন। এই গুঢ় রহস্য কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণানুগ-বৈষ্ণববর্গই উপলব্ধি করিতে সমর্থ, অজ্ঞের পক্ষে তাহা অসম্ভব। অতএব অল্প শ্রীজন্মাষ্টমী-তিথিতে আমাদের শ্রীকৃষ্ণানুগতাই একমাত্র কাঙ্ক্ষণের নিকট প্রার্থনা।

—শ্রীপ্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরানন্দো জয়ন্তঃ

ন বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।



অষ্টভূতাপ্রতিহতা যযাতু হৃপ্রনীদতি ।

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পর ন ।
অধোকজে অষ্টভূত কী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ।

অন্য ধর্ম অষ্টরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতিনেলে পণ্ড সেই শ্রম ।

৩২শ বর্ষ

২৪ দামোদর, বাসুদেব, ৪২৪ গৌরাক
৩০ কার্তিক, রবিবার, ১৩৮৭ ; ইং ১৬/১১/১৯৮০

৮ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীকান্তিকব্রত-মাহাত্ম্যম্

[শ্রীহরিভক্তিবিলাসস্ত্রয়োড়শবিলাসে]

ব্রতস্তু কার্তিকে মাসে যদা ন কুরুতে গৃহী ।

ইষ্টাপূর্তং বৃথা তস্য যাবদাহুতনারকী ॥১॥

গৃহস্থ মণ্ডল যদি কার্তিকমাসে ব্রত না করে, তাহা হইলে তাহার
ইষ্টাপূর্ত কর্ম বিফল হইবে এবং সে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত নরকে বাস করিবে ॥১॥

ইষ্ট, ৮ বহুভির্ঘজৈঃ কৃত্বা শ্রাদ্ধশতানি চ ।

স্বর্গং নাপোতি বিপ্রেন্দ্র অকৃত্বা কার্তিকে ব্রতম্ ॥২॥

হে বিপ্রেন্দ্র! যদি কোন ব্যক্তি কার্তিকমাসে ব্রত না করিয়া বহু বহু
ঘজ্জ্বারা যাগ এবং শত শত শ্রাদ্ধ করে, তথাপি সে স্বর্গ প্রাপ্ত হয় না ॥২॥

যদন্তঃ পরং জগুং কৃতং সুমহত্তমঃ ।

সর্বং বিফলতামেতি অকৃত্য কান্তিকে ব্রতম্ ॥৩৥

যাহা দান করিয়াছে, যাহা জপ করিয়াছে এবং যে কিছু সুমহৎ তপস্যা করিয়াছে, কার্তিকমাসে ব্রত না করিলে তৎসমুদায় বিফলতা প্রাপ্ত হয় ॥৩৥

নিয়মেন বিনা চৈব যো নয়েৎ কার্তিকং মুনৈ ।

চাতুর্মাস্যং তথা চৈব ব্রহ্মহা স কুলাধমঃ ॥৪৥

হে মুনৈ! যে ব্যক্তি বিনা নিয়মে “কার্তিক মাস” অথবা “চাতুর্মাস্য” যাপন করে, সে কুলাঙ্গার ব্রহ্মহত্যাকারী হয় ॥৪৥

ন গৃহে কার্তিকে কুর্যাদ্বিশেষণ তু কার্তিকং ।

তীর্থে তু কার্তিকীং কুর্য্যাৎ সর্বযত্নেন ভাবিনি ॥৫৥

হে ভাবিনি! কার্তিকমাসে বিশেষ করিয়া “কার্তিকব্রত” গৃহে করিবে না, সর্বপ্রকার যত্নসহকারে তীর্থে কার্তিকব্রত করিবে ॥৫৥

বিষ্ণোঃ পূজা কথা বিষ্ণোর্বৈষ্ণবানাঞ্চ দর্শনং ।

ন ভবেৎ কার্তিকে যস্য হস্তি পুণ্যং দশাঙ্গিকম্ ॥৬৥

যাহার পক্ষে কার্তিকমাসে বিষ্ণুর পূজা, বিষ্ণুর কথা এবং বৈষ্ণবদিগের দর্শন না ঘটে, তাহার দশবৎসরের পুণ্য বিলুপ্ত হয় ॥৬৥

মেরুতুল্যাসুবর্ণানি সর্বদানাদি চৈকতঃ ।

একতঃ কার্তিকে বৎস সর্বদা কেশবপ্রিয়ঃ ॥৭৥

হে বৎস! একদিকে মেরুতুল্য সুবর্ণ ও সর্বপ্রকার দান, আর একদিকে সর্বদা কেশবপ্রিয় কার্তিকমাস ॥৭৥

ন কার্তিকসমো মাসো ন কৃতেন সমং যুগং ।

ন বেদসদৃশং শাস্ত্রং ন তীর্থং গঙ্গয়া সমম্ ॥৮৥

(হে ব্রহ্মন্!) কার্তিকের সমান মাস নাই, যত্নযুগের সমান যুগ নাই, বেদের সদৃশ শাস্ত্র নাই, গঙ্গার সমান তীর্থ নাই ॥৮৥

প্রবৃত্তানাঞ্চ ভক্ষ্যাণাং কার্তিকে নিয়মে কৃতে ।

অবশ্যং কৃষ্ণরূপং প্রাপ্যতে মুক্তিদং শুভম্ ॥৯৥

যে সকল দ্রব্য নিতা ভক্ষণ করে, কাৰ্ত্তিকমাসে যদি তাহার কিছু
মস্কেচ করা যায়, তাহা হইলে সে অবশ্য মুক্তিপ্রদ পরম মঙ্গল শ্রীকৃষ্ণের
সাক্ষ্য লাভ করিবে ৷৯৷

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা মুনিসত্তম ।

বিযোনিং ন ব্রজত্যেব ব্রতং কৃত্বা তু কাৰ্ত্তিকে ॥১০॥

হে মুনিসত্তম ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্র, ইহারা যদি কাৰ্ত্তিক-
মাসে ব্রত করে, তাহা হইলে কখন বিযোনি প্রাপ্ত হইবে না ॥১০॥

কাৰ্ত্তিকে মুনিশার্দূল সশক্ত্যা বৈষ্ণবং ব্রতং ।

যঃ কৰোতি যথোক্তস্ত মুক্তিপ্তস্য করে স্থিতা ॥১১॥

হে মুনিশার্দূল ! যে ব্যক্তি কাৰ্ত্তিকমাসে যথোক্ত বৈষ্ণব-ব্রত ধারণ
করে, মুক্তি তাহার করে অবস্থিত হয় ॥১১॥

প্রদক্ষিণঞ্চ যঃ কুৰ্য্যাৎ কাৰ্ত্তিকে বিষ্ণুসন্মানি ।

পদে পদেহৃদয়েমেষস্য ফলভাগী ভবেন্নরঃ ॥১২॥

যে নর কাৰ্ত্তিকমাসে বিষ্ণুসন্নিব প্রদক্ষিণ করে, সে পদে পদে হৃদয়ে
যজ্ঞের ফলভাগী হয় ॥১২॥

গীতং বাচ্যঞ্চ নৃত্যঞ্চ কাৰ্ত্তিকে পুরতো হরেঃ ।

যঃ কৰোতি নরো ভক্ত্যা লভতে চাক্ষয়ং পদম ॥১৩॥

যে মনুষ্য কাৰ্ত্তিকমাসে হরির অগ্রে ভক্তিপূৰ্ব্বক গীত, বাচ্য ও নৃত্য
করে, সে অক্ষয় পদ প্রাপ্ত হয় ॥১৩॥

সৰ্ব্বধৰ্ম্মান্ পরিত্যজ্য কাৰ্ত্তিকে কেশবাগ্ৰতঃ ।

শাস্ত্রাবতরণং পুণ্যং শ্রোতব্যঞ্চ মহামুনে ॥১৪॥

হে মহামুনে ! সৰ্ব্বধৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কাৰ্ত্তিকমাসে কেশবের অগ্রে
পুণ্য-স্বরূপ শাস্ত্রাবতরণ শ্রবণ করিবে ॥১৪॥

সৰ্ব্বান্ ধৰ্ম্মান্ পরিত্যজ্য ইষ্টাপূৰ্ত্তাদিকান্নরঃ ।

কাৰ্ত্তিকে পরয়া ভক্ত্যা বৈষ্ণবৈঃ যঃ সংবসেৎ ॥১৫॥

মনুষ্য ইষ্টাপূৰ্ত্ত প্রভৃতি সকল ধৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কাৰ্ত্তিকমাসে পরম
ভক্তিসহকারে বৈষ্ণবগণের সহিত বাস করিবে ॥১৫॥

যঃ পঠেৎ প্রযতো নিত্যং শ্লোকং ভাগবতং মূনে ।

অষ্টাদশপুরাণানাং কান্তিকে ফলমাপ্নুয়াৎ ॥১৬॥

হে মূনে ! যে ব্যক্তি কার্তিকমাসে যত্নবান্ হইয়া নিত্য ভাগবতের শ্লোক পাঠ করেন, তাহার অষ্টাদশ পুরাণ-পাঠের ফল হয় ॥১৬॥

কার্তিকে ভূমিশায়ী যো ব্রহ্মচারী হবিষ্যভুক্ত ।

পলাশপত্রং ভুঞ্জানো দামোদরমথার্চয়েৎ ।

স সর্বপাতকং হিহা বৈকুণ্ঠে হরিসন্নিধৌ ।

মোদতে বিষ্ণুসদৃশো ভক্তনানন্দনিবৃত্তঃ ॥১৭॥

যে ব্যক্তি কার্তিকমাসে ভূমিশায়ী, ব্রহ্মচারী ও হবিষ্যাদী হইয়া পলাশ-পত্রে ভোজন করত দামোদরের অর্চন করে, সে সকল পাপ পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুসদৃশ ও ভক্তনানন্দে নিবৃত্ত হওত বৈকুণ্ঠে হরি-সন্নিধানে আনন্দ লাভ করে ॥১৭॥

বিষ্ণোঃ শিবস্ত বা কুর্যাদালয়ে হরিজাগরণং ।

কুর্যাদম্বথমূলে বা তুলসীনাং বনেষু চ ॥

আপদগতো যদাপ্যন্তো ন লভেৎ স বনায় সঃ ।

ব্যধিতো বা পুনঃ কুর্যাদ্বিষ্ণোর্নামাপমার্জনম্ ॥১৮॥

বিষ্ণু অথবা শিব কিম্বা অম্বথমূল বা তুলসী-কানন—এই সকল স্থানে হরিজাগরণ করিবে। যদি আপদগত হইয়া স্নানের নিমিত্ত জল প্রাপ্ত না হয় অথবা ব্যধিগ্রস্ত থাকে, তাহা হইলে বিষ্ণু নাম দ্বারা অপমার্জন অর্থাৎ জলস্পর্শ করিবে ॥১৮॥

শ্রীগৌরানন্দ

শ্রীগৌরানন্দ—সর্বশক্তিমান ও মায়াভীত

পরমেশ্বর-তত্ত্বের মূলবস্তু অনাদি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ গোবিন্দই শ্রীগৌরানন্দ । শ্রীগৌরানন্দকে কখন প্রকৃতি স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি অপ্রাকৃত স্বয়ং কৃষ্ণ । প্রকৃতি-স্পৃষ্ট বস্তু কালক্ষুর, আধার-সাপেক্ষ ও সীমাবদ্ধ । শ্রীগৌর নিত্য, শক্তিমান ও বৈকুণ্ঠ । পাঠক । গৌরকে মায়াসহ মিশাইবেন না । যেখানে মায়া, তথায় গৌর নাই ।

কাল্পনিক গৌরঙ্গ-বাদের নিরাস

শ্রীকৃপাহুগগণের একমাত্র পরমাবস্থা বস্তু গৌরহৃদয় অভক্তি-মার্গাশ্রিত
অন্যে বস্তু রূপান্তরিত বা চিত্রিত হইলে বা কেহ যার মিশাইয়া বিকারী
প্রতিপন্ন করিলে, তাদৃশ অভক্তের কল্পনার আহুগত্যকে বিজাতীয়-জ্ঞানে
শুদ্ধ ভ্রমগণ তাগ করেন। শ্রীমদ্ব্যাসপ্রভুর প্রকট-লীলায় এরূপ একটি
ঘটনা শ্রীচরণামৃতের অন্ত্যলীলা পঞ্চম পরিচ্ছেদে প্রকটিত আছে। এক
বঙ্গদেশীয় বিপ্র স্বীয় পাণ্ডিত্য প্রতিভায় গৌরভক্তগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠা-
বাগনায় যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই চেষ্টা শ্রীপাদ দামোদর-বরূপ কিক্রমে
বিফল করেন—নিম্নোক্ত পংক্ত কয়েকটি সেই কথার প্রমাণ করিবে।

উক্ত কাল্পনিক মতবাদের নিরাস-কল্পে

যদ্বা-তদ্বা কবির দৃষ্টান্ত

বঙ্গদেশী এক বিপ্র প্রভুর চরিত।

নাটক করি' লঞা আইলা তুনাইতে ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৫।১১)

সবেই প্রশংসে নাটক 'পরম উত্তম'।

শ্রুতপের ঠাঞি আচার্য্য কৈলা নিবেদন ॥২৪-২৫॥

স্বরূপ কহে,—“তুমি 'গোপ' পরম-উদার।

যে-সে-শাস্ত্র শুনিতে ইচ্ছা উপজে তোমার ॥

'যদ্বা-তদ্বা'-কবির বাক্যে 'রসাতাগ'।

সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস ॥

'রস' 'রসাতাগ' যার নাহিক বিচার।

ভক্তিসিদ্ধান্ত-সিদ্ধ নাহি পায় পার ॥১০১-১০৩॥

গ্রাম্যকবির কবিত্ব শুনিতে হয় 'দুঃখ'।

বিদগ্ধ-আত্মীয় বাক্য শুনিলে হয় 'সুখ' ॥

রূপ যৈছে তুই নাটক করিয়াছে আরম্ভ।

শুনিলে আনন্দ বাড়ে যার মুখবন্ধ ॥১০৭-১০৮॥

কবি কহে, “জগন্নাথ—সুন্দর-শরীর।

চৈতন্য-গোসাঞি শরীরী মহাধীর ॥১১৪॥

শুনিয়া সবার হৈল আনন্দিত মন।

দুঃখ পাঞা স্বরূপ কহে সক্রোধ-বচন ॥

“আরে মূর্খ, আপনার কৈলি সর্বনাশ !
 দুই ত’ দৈশ্বরে তোর নাহিক বিশ্বাস ॥১১৬-১১৭॥
 দুই ঠাঞি অপরাধে পাইবি দুর্গতি !
 অতদুঃখ ‘তত্ব’ বর্ণে, তার এই গতি ॥১২০॥
 শুনিয়া কবির হৈল লজ্জা, ভয়, নিশ্চয় ।
 হংস-মধ্যে বক যেন কিছু নাহি কয় ॥১২২॥
 “বাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে ।
 একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে ॥১৩১॥
 চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর ‘সঙ্গ’ ।
 তবে জানিবে সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ” ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৫।১৩২)
 সেই কবি সর্ব তাড়ি’ রহিল নীলাচলে ।
 গৌরভক্তগণের রূপা কে কহিতে পারে ॥১৫৮॥

প্রাকৃত কবির সঙ্গ ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ-ভক্তের আশ্রয় কর্তব্য

গৌরভক্ত-সমাজে এই পূর্ববঙ্গবাসী কবির জায় গৌরভক্ত সাজিয়া
 অভক্তগণ অনেকে কালে কালে উদ্ভূত হন, আবার তাহাদের অজ্ঞায়
 আচরণ ‘গৌরভক্তি নহে’ জানাইবার জন্য শ্রীগৌরভক্ত, নিত্যশুদ্ধভক্ত নিজ-
 জ্ঞান প্রেরণ করেন । সেই শুদ্ধভক্তি-স্বরূপ হইতে বিপথগামী না হইয়া
 যিনি উহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হন, তিনিই শ্রীমহাপ্রভুর দয়া লাভ করেন ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামের উদ্দেশ্য-ব্যাখ্যা

শ্রীগৌর-দর্শনে স্তুতি করিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রভু শবিনয়ে যুগ্মকরে সন্দেশে
 বলিলেন,—গৌর-কাকিধারী ‘শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য’-নামক কৃষ্ণ তোমাকে নমস্কার ।
 গৌরাজ মহাবদ্যন্ত এবং কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা । এই স্তবে গৌরাজ কি বস্তু
 ও তাঁহার সহিত জীবের কি প্রয়োজন-সিদ্ধির উপায় কি—এই গৌর-বস্তু
 বিষয়ক সঙ্কল্প-অভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্বগণ বর্ণন করিলেন । শ্রীগৌরাজ স্বয়ং
 কৃষ্ণ, কিন্তু কৃষ্ণের ন্যায় অজকাস্তিবিশিষ্ট নহেন, তিনি গৌরহিট । তাঁহার
 নাম—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।

“শ্রীকৃষ্ণ জানারে সব বিশ্ব কৈল ধন্য ।”

(চরিতামৃত আদি, ৩য় পরি, ৩৪ সংখ্যা)

‘কৃষ্ণ’—এই দুই বর্ণ সদা ধীর মুখে ।

অথবা কৃষ্ণকে তিহেঁ। বর্ণে নিজ স্থখে ॥

দেহ-কান্তে হয় তিহেঁ। অকৃষ্ণ-বরণ ।

অকৃষ্ণ-বরণে তাঁর কহে পীত-বরণ ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৩।৫৩-৫৬)

শ্রীগৌরাজের গণ—কৃষ্ণপ্রেম প্রদাতা

পাঠক ! শ্রীগৌরাজের ‘নাম’ ও ‘রূপ’ জানিলেন । এক্ষণে তাঁহার ‘গুণ’ শ্রবণ করুন । তিনি মহাবদান্ত । মাধুর্য্যারসবিগ্রহ কৃষ্ণ হইলেও তিনি মাধুর্য্যারসবিগ্রহের প্রদাতা হইয়া দয়া-গুণধর । পাণ্ডাপাত্র বিচার না করিয়া অহল্লাভ কৃষ্ণমধুরিমা জগৎকে দিয়াছেন । লোকে প্রাকৃত, হেয়, খণ্ডিত, কালজুক, আগম্যাপায়ী বস্তু প্রদান করে ; গৌরহরি তাদৃশ মায়িক বস্তুর দাতা নহেন, তিনি উপাদেষ নিত্য কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা ।

“চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার ।

বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার ॥”

অত্যাশ্র দাতৃবর্গের দানসমূহে কার্পণ্য আছে, দয়ানিধি গৌরার দানে তাদৃশ কুণ্ঠতা নাই । একপ গুণধর পুরুষটির দাতৃত্ব-শক্তির তুলনা চতুর্দশ-ছন্দে বা বৈকুণ্ঠে পাইবেন না । শ্রীদামোদর-স্বরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন—অপরের দয়ায় ‘মন্দ’ উদয় করায়, কিন্তু গৌরহরির দয়া ‘অমনোদয়া কৃপা’ অর্থাৎ কৃষ্ণ প্রেমভক্তি উদয় করায় । ফল চতুর্ভুজ প্রদায়িনী দয়া গৌর-কৃপার নিকট তুলনা হয় না । যিনি কৃষ্ণভক্তিরূপা গৌর-দয়া ছাড়িয়া নিজ বিপাকক্রমে ভ্রমময় মার্গে বিচরণ করেন, তিনি ভক্তিবিশ্ময় জীব । সুকোমলা ভক্তির অভাবে তাঁহার হৃদয় কঠিন অশুসারযয় । অধনে ধনজ্ঞানে যত্ন করিয়া যিনি গৌরসেবা-বিমুখ, সেই ভাগ্যহীন আত্ম-বঞ্চক কখনই প্রেম-রত্ন লাভে কৃতকার্য হন না । শ্রীগৌরের নাম—কৃষ্ণচৈতন্য, গৌরের রূপ—শ্রীগৌরাজ, গৌরের গুণ—মহা-কৃপাময় ।

শ্রীগৌরের লীলা—কৃষ্ণভক্তি প্রচার

এক্ষণে গৌরলীলার কথা শুনুন । তিনি কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা । স্বয়ং কৃষ্ণ হইয়া নিজেই আপনাকে আশ্বাদন করিবার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণভক্ত ; বদান্ত-ভগ্নে কৃষ্ণ ভক্তির প্রচারক । সেব্য বস্তু হইলেও সেবক হইয়া কৃষ্ণভক্তি প্রচারই তাঁহার লীলা । নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়া—এই চারিটিতে যেক্রপ পরস্পর

শ্রেয় প্রাকৃত বস্তু-মাত্রে আছে, অপ্রাকৃত গৌরসুন্দর অদ্বয়জ্ঞান ব্রহ্মেন্দ্র-নন্দন বলিয়া তাঁহাতেও ঐ চারিটি অভিন্নভাবে অবস্থিত। অন্তর মায়ািক ধারণার আধিক্য তাঁহাকে বাড়াইতে বা কমাইতে পারে না। তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলার কেহট পরিবর্তন, পরিবর্তন ও পরিবর্তন করিতে সমর্থ নহে।

শ্রীকৃপানুগতাই সকল মঙ্গলের আকর

শ্রীকৃপানুগ হইলেই শ্রীগৌরসুন্দরের মহিমা ভীষের গুপ্ত-হৃদয়ে প্রকটিত হইবে। কৃষ্ণচৈতন্য-নাম—‘সংস্কৃত’, গৌরকৃপা কৃষ্ণভক্তি—‘অভিধেয়’ ও গৌর-দেয় কৃষ্ণপ্রেম—‘প্রয়োজন’। ভগবদ্-‘রূপ’-বিমুখ হইলে জীব নির্বিশেষ মায়াবাদ বা মায়া-শক্তির অতুভূক্ত করিবার চেষ্টাকে ভাঙত করিয়া গৌর-বিমুগ হইবেন। শ্রীকৃপানুগ-পথ ভাগ বলিয়া বাউল, কর্তা-ভক্তা, নেড়া, বিষয়ী, দরবেশ, সাঁই, রসিক, কিশোরীভক্তা, সহজিয়া, জাতিবৈষ্ণব, গোসাঁই, সাহিত্যিক, নাগরী প্রভৃতি অসংখ্য মতবাদ বিশ্বের অন্তরালে উদ্ভিত হইয়া ভক্তির প্রতিকূলাচরণ করিতেছে। তাই বলি, শুদ্ধভক্ত পাঠক! শ্রীগৌরসুন্দরের ভক্তি প্রচাের সর্বপাশান সহায় শ্রীকৃপ-গোবামীপ্রভুর গ্রন্থ পাঠ করুন-সকল মঙ্গল হইবে। শ্রীকৃপকে অতিক্রম করিয়া যাহা কিছুই করিতে যাইবেন, সকলই আপনার অমঙ্গল সাধন করিবে।

শ্রীকৃপানুগ ভক্তিবিনোদ-ধারাই একমাত্র সাধুসঙ্গ ও

শ্রীগৌরসঙ্গ-তত্ত্ব জানিবার পথ

সাধনভক্তির মূল বস্তু শ্রদ্ধা, ভাসভক্তির মূল বস্তু রক্তি, প্রেমভক্তির মূল বস্তু রস, ভক্তির ত্রিবিধ অবস্থানে লক্ষ্য করিতে ভুলিবেন না। শ্রীগৌর-উপদিষ্ট শ্রীকৃপের কথিত ভক্তিরস বৃত্তিতে ইচ্ছা থাকিলে শুদ্ধ ভক্তিময় জীবন গঠন করুন। শ্রীমন্ত্ৰিক্তিবিনোদ ঠাকুরের অদ্বৈত শ্রীকৃপানুগ-পদ্ধতির সহিত অপর ব্যক্তিগণের মতবাদের পার্থক্য বঝিবার চেষ্টাক্রম সাধুসঙ্গ করুন নিশ্চয়ই আপনি শুদ্ধ ভক্তিমাগে প্রবিষ্ট হইবেন।

শ্রীকৃপানুগ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জগতে যেক্রপ আচার ও প্রচার করিয়াছেন, তাহা আশ্রয় করিলে কখনই কোন বঞ্চক-দলে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের নিকট প্রতিষ্ঠা-লাভের জন্ত ভক্তির নামে অথবা কোন বস্তু নির্ধিতে হইবে না। অপ্রাকৃত প্রেমময় শ্রীগৌর-বস্তুকে মায়ািক বৃত্তির গঠিত কোন দ্রব্য মনে করিতে হইবে না।

— শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীরঘুনাথ গোস্বামী প্রভু

রঘুনাথের জন্ম-কুল ও গৃহভ্যাগ

এ বৎসর ২২শে আশ্বিন শনিবার, ১৩৬১; ইং ১৯০৭৫৪ * শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর তিরো-ভাবোৎসব। রঘুনাথ দাস কায়স্থ-কুলোদ্ভব। ঐ মহাত্মা যৌবনকালেই শ্রীশ্রীগৌরাসুন্দর মহাপ্রভুর প্রেমে উন্মত্ত হইয়া প্রচুর সম্পত্তি ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন পূর্ণ যৌবনা ভার্য্যাকে মলবৎ পরিত্যাগপূর্ব্বক অরণ্যপথ দিয়া তিন দিবসের মধ্যে শ্রীপুরুষোত্তমধামে উত্তীর্ণ হইয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর চরণপ্রান্তে পতিত হইলেন। মহাপ্রভু রঘুনাথকে পাইয়া আনন্দে প্রকাশ করত তাঁহাকে সম্পূর্ণ কৃপা করিলেন।

দাস-গোস্বামি-প্রভুর বৈরাগ্য ও অঘাটক-বৃত্তি

রঘুনাথের বৈরাগ্য বড়ই কঠিন ছিল। মহাপ্রভু রঘুনাথের বৈরাগ্য প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন যে, “রঘুনাথের বৈরাগ্য জীবে না সম্ভবো।” রঘুনাথ অঘাটক ছিলেন; তিনি শ্রীক্ষেত্রে গমন করিয়া প্রথমতঃ শ্রীজগন্নাথ-দেবের সিংহদ্বারে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায়মান থাকিতেন। লোকে তাঁহার সেই বদ্ধাঞ্জলিতে মহাপ্রসাদ তিফা দিত। অঞ্জলিপূর্ণ প্রসাদ হইলেই তিনি স্বস্থানে আসিয়া ভক্ষণ করিতেন। রঘুনাথ ঐক্লপ নিয়ম করিয়াও তৃপ্তি লাভ করিলেন না। তিনি মনে করিলেন যে, অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া সিংহদ্বারে দণ্ডায়মান থাকা ব্যক্তিচারিত্র্যের ন্যায় কার্য্য হইতেছে। তাহারাত্ত (বেশ্যারাত্ত) ত জীবন রক্ষার জন্য স্বদ্বারে দণ্ডায়মানা থাকে। অতএব আমি উক্ত প্রকার নিয়মাবলম্বন না করিয়া পরিত্যক্ত পৰ্য্যুষিত প্রসাদ লইয়া ভক্ষণ-পূর্ব্বক জীবন ধারণ করিব। পরম বৈষ্ণব রঘুনাথ তাহাই করিতে আরম্ভ করিলেন।

মহাপ্রসাদ মাহাত্ম্য-জ্ঞাপনে শ্রীরঘুনাথ ও শ্রীচৈতন্য

একদিন দয়াল চৈতন্যদেব রঘুনাথকে সেই পরিত্যক্ত প্রসাদ ভক্ষণ করিতে দেখিয়া বিজ্ঞাসা করিলেন যে, “রঘুনাথ! তুমি কি ভক্ষণ

* শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সজ্জনতোষণী ২য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যায় এই প্রবন্ধ প্রদান করিয়াছিলেন। সেই বর্ষে শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামীর তিরোভাব ‘৪৪। কান্তিক মঙ্গলবার’ ছিল। — প্রকাশক

করিতেছ ?” রঘুনাথ চৈতন্যদেবের বাক্যের অন্য কোন উত্তর না দিয়া অক্ষুটস্বরে বলিলেন,—“আজ্ঞা ?” তখন সর্কাস্বামী চৈতন্যচাঁদ হাস্য করিতে করিতে তাঁহার পাত হইতে একমুষ্টি প্রসাদ লইয়া ভক্ষণপূর্বক বলিলেন যে, “রঘুনাথ ! তুমি আমাকে বঞ্চিত করিয়া একাকী এমন অমৃত ভক্ষণ করিয়া থাক ?” রঘুনাথ মহাপ্রভুর ঐ প্রকার ব্যবহারে বিশেষ কুণ্ঠিত হইলেন। মহাপ্রভুর সহিত রঘুনাথের পুরুষোত্তম বিহার বিজ্ঞ বৈষ্ণবগণের অবিদিত নাই।

রঘুনাথের রাধাকুণ্ড গমন ও শ্রীশ্যামকুণ্ড-রাধাকুণ্ড

খনন-রহস্য

রঘুনাথ মহাপ্রভুর অনুমতানুসারে পুরুষোত্তম হইতে শ্রীকৃন্দাবনধাম গমন করিয়া তথায় শ্রীসনাতনাদি গোপ্বামিপাদদিগের সহিত সন্মিলিত হইয়া শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড-তীরে অবস্থান করিলেন। অকস্মাৎ একদিবস স্বপ্নবৎ তাঁহার হৃদয়ে উদয় হইল যে, “শ্রীশ্যামকুণ্ড-রাধাকুণ্ড” পুনর্বার খনন হইলে ভাল হয়। পাঠক ! ভক্তের বাসনা পূরণ করিবার জন্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই বাধা আছেন—বদরিকাশ্রম হইতে শ্রীশ্রীনारायणদেব কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা জনৈক ব্যক্তিকে দিয়া আদেশ করিলেন যে, “তুমি এই স্বর্ণমুদ্রাগুলি ব্রজধামে ‘আরিট’ গ্রামস্থিত বৈষ্ণব-প্রধান রঘুনাথদাসকে দিবে। যদি তিনি গ্রহণে অস্বীকৃত হন, তাহা হইলে কহিবে যে, এই স্বর্ণমুদ্রা শ্রীনारायण বদরিকাশ্রম হইতে পাঠাইয়াছেন। আপনি এই মুদ্রা লইয়া শ্যামকুণ্ড-রাধাকুণ্ড খনন করুন।”

বদরীনारायण কর্তৃক অর্থ প্রেরণ ও কুণ্ড খণ্ডনের পরামর্শ

নारायণের আদেশক্রমে সেই ব্যক্তি আরিটগ্রামে আসিয়া রঘুনাথকে মুদ্রাগুলি অর্পণ করিলে, রঘুনাথ তাহা গ্রহণে অস্বীকার করিলেন। তদনন্তর নारायণের প্রেরিত লোক তাঁহার সন্নিধানে নारायণোক্ত সমস্ত কথা নিবেদন করিল। রঘুনাথ শ্রবণ করিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন এবং ‘হা প্রভো ! হা নাথ ! হা শরণাগত-বাপ্পাপরিপূরক’ ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ-পূর্বক রোদন করিতে লাগিলেন। তাহার পর কিঞ্চিৎ স্থির-ভাবালব্ধন করিয়া ব্রজবাসিগণকে আহ্বান করত কুণ্ডদ্বয় খননের পরামর্শ আরম্ভ করিলেন।

যুধিষ্ঠির কর্তৃক রঘুনাথের নিকট স্বপ্ন বৃত্তান্ত

পরামর্শ কালীন সকলে বলিলেন যে, শ্যামকুণ্ডতীরে যে প্রাচীন বৃক্ষটি রহিয়াছে, উহাকে ছেদনান্তর শ্যামকুণ্ডের চতুষ্কোণ সমান করিয়া খনন করিতে হইবে। তাঁহাদের ঐক্যগণ স্থির হইলে রাজা যুধিষ্ঠির সেই রাत्रে স্বপ্নজলে রঘুনাথকে বলেন যে, “আমাদিগকে ছেদন করিবেন না। আমরা পঞ্চভাতা বৃক্ষরূপে শ্যামকুণ্ড তীরে অবস্থান করিতেছি।” রঘুনাথ সেই কারণে বৃক্ষ ছেদন করিতে দিলেন না। এই মিমিত্ত শ্যামকুণ্ড বক্র করিয়া করিয়া খনন করা হইল। শ্রীশ্রীরঘুনাথদাস গোহামীর অদ্ভুত চরিত্রাবলী বৈষ্ণবমণ্ডলীর অজ্ঞাত নাই। অতএব আমরা এইস্থানে লেখনীকে বিশ্রাম দিলাম।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

রাজা শ্রীবীরহাঙ্গীর

(পূর্বপ্রকাশিত ৩২শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৭৮ পৃষ্ঠার পর)

রাজপুরে হেথা বীর হাঙ্গীর ভূপতি ।
 শকট হৈতে ভার ল'য়ে দ্বরাগতি ॥
 দেখে চমৎকার কিবা উজ্জল-অক্ষর ।
 মঞ্জুষা ভিতরে বহু গ্রন্থ মনোহর ॥
 কি নিমি অমূল্য অহো, অতুল রতন ।
 কি শক্তি তাহাতে ত্রিজগতে অনুপম ॥
 হইল দর্শন মাত্র নৃপতি নির্মল ।
 অরুণ উদয়ে নব যথা নভোস্থল ॥
 কি ভাবে অপূর্ব পুনঃ ভরিল হৃদয় ।
 কাতর হইয়া রাজা দম্যগণে কয় ॥
 “বল সত্য, ওরে রক্তমুখ, মহীধর ।
 হরিলি যাঁদের ধন কানন-ভিতর ॥
 দিস্নি তু অঙ্গে তাঁহাদের কোন বাথা ।
 আছে তু কুশলে তাঁরা,—বল সত্য কথা ॥

মহা-মহাজন ওরে, তাঁহারা সকল ।
 বৈকুণ্ঠের পরিকর, করে নানা ছল ॥
 অমূল্য রতন সত্য এই গ্রন্থাবলী ।
 ভাগবত-কথামুতে সার্থক সকলি ॥
 করিয়াছি সর্বনাশ,—প্রাণ-প্রিয়তম ।
 কি ধন তাঁদের ওরে করেছি হরণ ॥
 হায়, হায়, এতক্ষণ হয় ত তাঁহারা ।
 ভাজেছে জীবন শোকে, ফণী মণিহারী ॥
 যাহরে, যাহরে ভরা-ছুটিয়া সকলে ।
 যাইরে আমিও তথা বস্ত্র বাঁধি গলে ॥
 চরণ-কুমলে লুটি আনি সর্বজনে ।
 মাচি ক্ষমা ভিক্ষা দিয়া সর্বস্ব চরণে ॥
 কহে দস্মাগণ—“রাজা, কোন ভয় নাই ।
 কুশলে আছেন তাঁরা, আনি দেখ যাই ॥
 ধাইল সকলে ক্ষণে উচ্চনাদ করি ।
 অধীর হাধীর রাজা কঁাদে ভূমে পড়ি ॥
 হইল আমরি, ক্ষণে কিবা তদ্ভাবেশ ।
 অপূর্ব-দর্শন রূপ দেখিল নরেশ ॥
 কনক-পর্বত জিনি পুরুষপ্রবর ।
 কি চাঁদ বদন চাঁদ ফাঁদ মনোহর ॥
 মূহুহাসি সুধারাসি আসিয়া সম্মুখে ।
 ধীরে কয়,—“ভাগ্যোদয়, কঁাদ কোন দুখে ॥
 জন্মে জন্মে হও তুমি আমার কিঙ্কর ।
 ওই দেখ, দ্বারে তব মোর পরিকর ॥”
 দেখিতে দেখিতে তথা উঠে হরিধ্বনি ।—
 “জয় নিত্যানন্দ, জয় গৌরগুণমণি ॥
 জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত, জয় গদাধর ।
 জয় রূপ-সনাতন পণ্ডিতপ্রবর ॥”

জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরপ্রিয়জন ।
 জয় নবদ্বীপ জয়, জয় বৃন্দাবন ॥—
 চমকিয়া দেখে সবে দিব্য কলেবর ।
 ভূমে উপনীত যেন নবীন ভাস্কর ॥
 মহাভাগবতবর প্রভু শ্রীনিবাস ।
 স্মিতানন সমুদিত নৃপতি-আবাস ॥
 উঠে দ্রুত-গতি নরপতি বাহু তুলি ।
 পড়ে শ্রীনিবাস-পদে লুটাইয়া ধূলি ॥
 সঁপিলা সর্বস্ব রাজা তাঁহার শ্রীপদে ।
 কাঁদিয়া যাচিয়া নিল পরম সম্পদে ॥
 সবংশে সাধুর পদে সব বিকাইয়া ।
 হাঙ্গীর হইল স্থির কৃষ্ণনাম নিয়া ॥
 ধন্য মহাবীর হাঙ্গীর ভূপতি !
 লুঠিলে কি ধন আজি তুমি মহামতি !!
 করি কোটি কোটি নতি তোমার চরণে ।
 অনন্ত প্রণতি আর সেই মহাজনে ॥
 দম্ভাও এমন কৃপা-কটাক্ষে বাঁহার ।
 পাইল দুর্লভ কৃষ্ণভক্তি সারাংশার ॥
 নতি পুনঃ বারম্বার সেই মহাধনে ।
 এমন মলিন মন যে ধন দর্শনে ॥
 হইল নির্মল ওরে, পাইল সম্বল ।
 সেবিতে বৈষ্ণব, বিষ্ণুবস্ত্র স্তমজল ॥
 দম্ভ্যরূপে আমিও ত স্ত্রেয়-আচরণে ।
 ভ্রমি মায়াবনে বৃথা ইন্দ্রিয়-তর্পণে ॥
 বৈষ্ণব-চরণে ডারি হেন শুভ যোগে ।
 রক্ষা কর আমারেও দারুণ-দুর্ভোগে ॥

শ্রীচৈতন্য-লীলার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

(পূর্বপ্রকাশিত ৩২শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২২২ পৃষ্ঠার পর)।

প্রত্যক্ষ মিশ্রকে রসতত্ত্ব শিক্ষার্থে রামানন্দ
রায়ের নিকট প্রেরণ

অন্য একদিন প্রহ্লাদ মিশ্র আসিয়া মহাপ্রভুর পাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম-
পূর্বক কৃষ্ণ-কথা শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে মহাপ্রভু মিশ্রকে রামানন্দ
রায়ের নিকট প্রেরণ করিলেন। মিশ্র রামানন্দের স্থানে গিয়া দেবদাসী-
দিগের প্রতি রামানন্দের সেবা-ব্যবহার দেখিয়া রামানন্দের চরিত্রে সন্মোহ
পোষণ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং মহাপ্রভুকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন।
মহাপ্রভু মিশ্রকে তখন রামানন্দের ন্যায় প্রেমিক শুদ্ধভক্তকে প্রাকৃত জ্ঞান
করিতে নিষেধ করিলেন এবং কহিলেন,—‘দেবদাসীদিগের প্রতি রামানন্দ
রায় নিত্য দাসীভাবে সেবাবুদ্ধিতে সেবা করিয়া থাকেন। তাঁহার দেহ-
মন কাষ্ঠ-পাষণের মত নিষ্কিয়ার। রামানন্দের দেহ অপ্রাকৃত বিষয়
একমাত্র রামানন্দই দেব-দাসীদিগের সেবা করিবার অধিকারী। এক্ষণে
কৃষ্ণ-কথা শুনিতে ইচ্ছা করিলে রামানন্দের নিকট পুনরায় গমন কর।’
মহাপ্রভু কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া মিশ্র পুনরায় রামানন্দ-সঙ্গীণে গমন
করিলেন ও রামানন্দ রায়কে আচার্য্যরূপে বরণ করিয়া তাঁহার নিকট
কৃষ্ণকথা-বসামৃত্বে অবগমপূর্বক পুলকিত ও কৃতকৃতার্থ হইলেন।

এইভাবে মহাপ্রভু প্রেমিকভক্ত শূদ্রকূলে আবির্ভূত রামানন্দ রায়কে
রসতত্ত্বের আচার্য্যরূপে অভিহিত করিলেন এবং ব্রাহ্মণ প্রহ্লাদ মিশ্রকে
রামানন্দের নিকট রসতত্ত্ব শিক্ষার জন্ত পাঠাইলেন। অতএব কৃষ্ণতত্ত্ববিদ
বৈষ্ণবগণ শূদ্রকূলে আবির্ভূত হইলেও আচার্য্যপদবাচ্য। যথা, শ্রীমন্
মহাপ্রভুর উক্তি ;—

কিবা বিপ্র, কিবা ল্যাদী, শূদ্র কেনে নয়।

যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয় ॥—(চৈঃ চঃ)

গদ্যপূরণ বলিয়াছেন,—

“বিপ্রকৃত্রিয় বৈশ্যশচ গুরুবঃ শূদ্রজন্মান।

শূদ্রাশচ গুরুবন্তেষাং জয়ানান্ ভগবৎপ্রিয়ঃ ॥”

অর্থাৎ-“বিপ্র, ক্ষাত্রিয় ও বৈশ্যভাতি শূদ্রকুলোদ্ভূত ব্যক্তিগণের জন্ম হইতে পারেন—তাহাই সাধারণ বিধি। কিন্তু ভগবৎপ্রিয় অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ শূদ্রকুলে অবতীর্ণ হইলেও উক্ত ত্রিবিধ বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষাত্রিয় ও বৈশ্য-কুলোদ্ভূত ব্যক্তির শ্রীভক্তদেব।”

ঠাকুর হরিদাসের নির্যাতনের পর ঠাকুরের দেহ সঙ্কীর্ণ-

যোগে সমুদ্রতীরে সমাধিস্থ করিয়া ভক্তগণের সহিত

বিরহ-মহোৎসব পালনপূর্বক ভক্ত-বাৎসল্য প্রকাশ

মহাপ্রভু প্রতি দিবারাত্রির মধ্যে দিব্যভাগে দৈশ্বর-দর্শন ও নৃত্য-কীর্তনে নিরত রহেন এবং রাত্রিকালে রায় রামানন্দ ও স্বরূপ দামোদরের সহিত বস অন্নাদশে মগ্ন থাকেন। একদিন মহাপ্রভুর সেবক গোবিন্দ আনন্দিত চিত্তে হরিনাম ঠাকুরকে মহাপ্রসাদ দিতে গিয়া দেখিলেন যে হরিদাস-ঠাকুর শাস্তিত অবস্থায় মন্দ মন্দ ভাবে মালিকায় শ্রীনাম কীর্তন করিতেছেন। গোবিন্দ তখন হরিদাসকে ইচ্ছা আদিয়া মহাপ্রসাদ ভোজন করিতে বলিলে হরিদাস সংখ্যা-নাম পূরণ না হওয়ায় ও মহাপ্রসাদ উপেক্ষা করাও অস্বীকার বিধায় কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন। তৎপরে মহাপ্রসাদ বন্দনা পূর্বক এক কণা ভক্ষণ করিলেন ও পুনরায় শ্রীনাম গ্রহণে রত হইলেন।

আর দিন মহাপ্রভু হরিদাসের নিকট আসিয়া কুশল জিজ্ঞাসিলে হরিদাস তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া কহিলেন,—‘প্রভু, আমার দেহ অস্থির থাকিলেও সংখ্যা নাম পূরণ না হওয়ায় বৃদ্ধি-মন বড় অস্থির।’ প্রভু জানাইলেন,—‘হরিদাস, তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ; নামের সংখ্যা অল্প করিলেই হইবে। তোমার এই সিদ্ধ-দেহে সাধনের আগ্রহে প্রয়োজন নাই। জগন্লোকের উদ্ধার করিবার জন্তই তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ ও শ্রীনামের মহিমা প্রচার করিয়াছ।’ হরিদাস কিন্তু মনে মনে বুঝিয়াছেন যে, মহাপ্রভুর লীলা সম্বরণের আর বেশী দেরী নাই। তাই হরিদাস মহাপ্রভুর পদপ্রান্তে নিবেদন করিলেন,—‘প্রভু, আমার বহুদিনের ইচ্ছা যে আপনার শ্রীচরণকমল সন্দেশে ধারণপূর্বক আপনার চাঁদবদন দেখিতে দেখিতে এবং আপনার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম উচ্চারণ করিতে করিতে এই প্রাণ ত্যাগ করিব। আপনার লীলা সম্বরণের পূর্বেই যেন এই দেহ পরিত্যাগ করিতে পারি—ইহাই প্রার্থনা।’

মহাপ্রভু ভক্তের প্রার্থনা অপূর্ণ রাখেন না। তাই পরদিন মহাপ্রভু ভক্তগণ সহ প্রাতঃকালে দৈশ্বর দর্শন করিয়া হরিদাসের সম্মুখে আসিয়া

দর্শন দিলেন। স্বরূপ গোখামী, রামানন্দ রায়, সার্বভৌম জট্টাচার্য্য প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ হরিদাসকে বেঞ্চে করিয়া নাম-সঙ্কীৰ্ত্তন করিতে লাগিলেন। হরিদাস তখন অক্ষপুর্ণলোচনে মহাপ্রভু ও ভক্তগণের পদবর্ণন মন্তকে লইয়া মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম নিজহৃদয়ে ধারণপূর্বক হইনেত্রে মহাপ্রভুর মুখ-পদ্ম দেখিতে দেখিতে ‘শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য’ নাম বলিতে বলিতে নিত্যাধামে প্রস্থান করিলেন। ‘হরি’ ‘হরি’ ‘কৃষ্ণ’ ‘কৃষ্ণ’ ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হইয়া উঠিল। মহাপ্রভু প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া হরিদাসের দেহ কোলে করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। তৎপরে সঙ্কীৰ্ত্তন সঙ্ঘযোগে হরিদাসের দেহ সমুদ্র-তীরে আনিয়া সমুদ্রে স্নান করাইবার পর ভক্তগণ হরিদাসের পাদোদক পান করিলেন। প্রভু জ্ঞানাইলেন,—‘হরিদাসের স্নানে সমুদ্র মহাতীর্থে পরিণত হইল।’ অতঃপর মহাপ্রভু স্বহস্তে হরিদাসের দেহে বালু দিয়া সমাধিস্থ করিলেন এবং সিংহদ্বারে আঁচল পাতিয়া প্রসাদ ভিক্ষা করিয়া তদ্বারা ভক্ত হরিদাসের বিজয়োৎসব সমাধা করিলেন। ভক্তগণের সহিত মহাপ্রভু প্রেমোজ্জ্বলে, ‘জয় জয় হরিদাস’ বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। ভক্ত হরিদাসের নির্ঘাণ-লীলায় মহাপ্রভুর ভক্তবাৎসল্যরূপ রূপা বর্ণনা করিয়া শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার লিখিলেন;—

“চৈতন্যের ভক্ত-বাৎসল্য ইহাতেই জানি।

ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ কৈল সন্ন্যাসী-শিরোমণি ॥

শেষকালে দিল তারে দর্শন-স্পর্শন।

তারে কোলে করি কৈল আপনে নর্ত্তন ॥

আপনি শ্রীহস্তে কুণায় তারে বালু দিল।

আপনে প্রসাদ মাগি মহোৎসব কৈল ॥

মহাভাগবত হরিদাস পরম বিদ্বান।

এ সৌভাগ্য লাগি আগে করিল প্রয়ান ॥”

হরিদাসঠাকুর যখনকূলে আবির্ভূত হইলেও পরম ভাগবত বলিয়া তাঁহার দেহ অপ্রাকৃত। ভগবন্তের দেহ কখনও প্রাকৃত নহে। যথা শ্রীমদ্‌মহাপ্রভুর ভাবায়—“অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময়।” “রামায়ণে” দেখা যায়—বিহগকূলে উদ্ভূত জটায়ু ভক্ত হওয়ায় ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র জটায়ুর দেহের সৎকার করিয়াছিলেন। এক্ষণে ভগবৎ কৈবর্ত্যে নিরত বৈষ্ণবগণের মধ্যে ব্যবহারিক জাতি-সমাজরূপ সঙ্কীর্ণ পরিচয় প্রযোজ্য না

হওয়ায় ও ভক্ত-দেহ অপ্রাকৃত হওয়ার সাক্ষ্যভৌম ভট্টাচার্য্য প্রমুখ ভক্তগণ হরিদাসের পাদোদক পান করিলেন এবং স্বয়ং ভগবান্ মহাপ্রভু ভক্ত-বাৎসল্যগুণে হরিদাসের দেহ কোলে করিয়া স্বচক্ষে সেই দেহে মাটি দিয়া সমাধিস্থ করিলেন।

দিব্যোন্মাদ অবস্থায় গভীরার গৃহ হইতে বাহির হইয়া

কালিঙ্গ গাভীদিগের নিকটে হস্ত-পদাদি সজ্জুচিত

দেহে কুর্ম্যাকারে অবস্থান ও ভক্তগণ কর্তৃক

নাম সঙ্কীৰ্ত্তন প্রভাবে চেতনতা প্রাপ্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভু পকটলীলায় শেষ দ্বাদশ বৎসর গভীরায় থাকিয়া শ্রীল রামানন্দ রায় ও শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামীর সঙ্কীর্ণ কৃষ্ণকথা রসাস্বাদনে দিবারাত্রি অতিবাহিত করিতেন। একদিন রামানন্দ রায় ভাবাবেশে বিজ্ঞাপতি, চণ্ডীদাস ও গীতগোবিন্দ গ্রন্থের শ্লোক পাঠ করিতে থাকিলে মহাপ্রভু শ্লোকের অর্থ নির্ণয় করিয়া বিলাপ করিতে থাকেন এবং স্বরূপদামোদরের কণ্ঠে কৃষ্ণ-লীলা-গীতি শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু আরও প্রেমাবিষ্ট হইলেন। এইভাবে অর্দ্ধরাত্রি কৃষ্ণকথারঞ্জে অতিবাহিত হইলে মহাপ্রভুকে শয়ন করাইয়া রামানন্দ ও স্বরূপ গোস্বামিও বিশ্রামার্থে গমন করিলেন। গভীরার গৃহের দ্বারে গোবিন্দ শয়ন করিয়া রহিলেন। মহাপ্রভু রাত্রি ব্যাপিয়া উচ্চ-সঙ্কীৰ্ত্তন করিতে করিতে ঠাণ্ড গভীর রাতে দিব্যোন্মাদ অবস্থায় কৃষ্ণ-বেণু-গীতি শ্রবণপূর্বক প্রেমাবেশে দ্বার-রুদ্ধ গৃহ হইতে বাহির হইয়া সিংহদ্বারের দক্ষিণে তৈলঙ্গ গাভীদিগের নিকট যাইয়া অচেতন হইয়া পড়িলেন। গোবিন্দ গভীরার গৃহে প্রভুর সঙ্কীৰ্ত্তনের কোন শব্দ না পাইয়া দরজা খুলিয়া প্রভুকে দেখিতে পাইলেন না। তখন গোবিন্দ তাড়াতাড়ি স্বরূপ গোস্বামিকে ঘটনা বলিবারাত্রি ভক্তগণ সকলে দেউটি জালিয়া প্রভুর অবস্থানে বহির্গত হইলেন। অশেষে সচক্ষে প্রভুকে সিংহদ্বারে গাভীগণের নিকট কুর্ম্যাকারে পড়িয়া থাকিতে দেখিলেন। মহাপ্রভুর হস্ত-পদ-সজ্জুচিত হইয়া কুর্ম্যাকারে অবস্থান সম্পর্কে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের বর্ণনায় পাওয়া যায়;—

“পেটের মধ্যে হস্তপদ কুর্মের আকার।

মুখে ফেন পুলকাদ নেত্র অশ্রুধার ॥

অচেতনে পড়ে আছে যেন কুম্ভাশুফল।
 বাহিরে জড়িয়া অন্তরে আনন্দ-বিস্মল ॥
 গাভী সব চৌদিকে শুঁকে প্রভুর অঙ্গ।
 দূর কৈলে নাহি ছাড়ে প্রভু-অঙ্গ-সঙ্গ ॥”

ভক্তগণ মহাপ্রভুকে তদাবস্থায় দেখিয়া অনেক যত্নে চেতনা আনিতে না পারিয়া সেই স্থান হইতে ঘরে আনিলেন। অতঃপর ভক্তগণ অনেকক্ষণ ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে নাম-সঙ্কীৰ্ত্তন করার ফলে মহাপ্রভু চেতনতা প্রাপ্ত হইলে তাঁহার হস্ত-পদ বাহিরে আসিয়া পূৰ্ণবৎ যথাযোগ্য শরীর হইল।

এমতে শ্রীমদ্ব্যাহাপ্রভু অধিকৃত মহাভাবযুক্ত প্রেমময় মূর্তিতে তথা কুম্ভাকারে অবস্থান করায় তাঁহার স্বয়ং ভগবন্তার পরিচয় প্রকাশ পাইল।

অন্তর্দীন-লীলা

গজীয়ায় নিভৃত কক্ষে অবস্থানকালে মহাপ্রভু দিনে দিনে শ্রীকৃষ্ণের বিরহ-বিশাপে মুহমান হইয়া পড়িতেন।

“এইমত মহাপ্রভু বৈসে নীলাচলে।
 রজনী দিবস কক্ষ বিরহে বিহ্বলে ॥
 স্বরূপ, রামানন্দ এই দুই জন সনে।
 রাত্রি দিনে করে রসগীত শ্লোক-আম্বাদনে।
 নানাতাব উঠে প্রভুর হর্ষ-শোক-বোষ।
 দৈন্তোদেগাদি উৎকর্ষা-সন্তোষ ॥”—(চৈঃ চঃ)

মহাপ্রভু ভাবাবেশে দিন অতিবাহিত করিতে করিতে ১৪৫৫ শকে একদিন সন্ধ্যাকালে অকস্মাৎ গুণ্ডিচা মন্দির হইতে বাহির হইয়া ভক্তগণকে বিরহ-রূপ সাগরে নিমজ্জিত করিয়া অন্তর্দীন করিলেন। মহাপ্রভুর অন্তর্দীনের সময় গোপীনাথ-মন্দিরের ভক্তগণ মহাপ্রভুকে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া অদর্শন হইতে দৌখিলেন। যথা ‘ভক্তিবন্ধাকর’ গ্রন্থের উক্তি;—

“প্রবেশিলা এই গোপীনাথের মন্দিরে।
 হৈলা অদর্শন পুনঃ না আইলা বাহিরে ॥

আবার, সেই সময় শ্রীশ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে স্থিত ভক্তগণ দেখিলেন যে, মহাপ্রভু “ক নন্দকুলচন্দ্রমাঃ, ক শিখি-চন্দ্রকালকৃতিঃ” বলিতে বলিতে

শ্রীশ্রীগঙ্গাধরদেবকে আশিজনপূর্বক শ্রীশ্রীগঙ্গাধরদেবের দেহে বিন্দীন হইয়া গেলেন। কেহ কেহ আবার তখন সমুদ্র-সৈকতে থাকিয়া মহাপ্রভুকে বিপ্রলভভাবে শ্রীকৃষ্ণের বিরহে অধীর ইয়া সমুদ্রের জলে অন্তর্হিত হইতে দেখিলেন। এইভাবে মহাপ্রভু উক্ত তিনস্থানে একই সময়ে তত্ত্বগণকে দর্শন দান করিয়া সশরীরে অদৃশ্য হইলেন।

—শ্রীচিত্তরঞ্জন কবিভূষণ

বড়বহরকুলি (বর্দ্ধমান)।

—সমাপ্ত—

সত্যানুসন্ধান ও লোক-প্রিয়তা

মানুষ সমাজের মধ্যে বাস করে—সমাজের আবহাওয়ার মধ্যে নিখাল-প্রস্থান লইয়া থাকে, কাজেই সমাজের অন্তিমতকে অতিক্রম করিতে পারে না। সমাজ ‘ভাল’ বলিলে তাহার হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠে আর সমাজ ‘মন্দ’ বলিলে তাহাকে সরসে মরিয়া যাইতে হয়। মানুষ সমাজের অন্তিমত অনুসারেই ‘বড়’ ও ‘ছোট’। সমাজের চিন্তা-শ্রোতে যিনি চিন্তা মিলাইতে পারিয়াছেন—সমাজের অধিকাংশ লোকের অনুমোদনে যিনি অনুমতি দিতে পারিয়াছেন—সমাজের কোন বিশিষ্ট বেদনায় যিনি ব্যথিত হইতে পারিয়াছেন—সমাজের কোন করুণ-রাগিণীর সহিত যিনি সহানুভূতির জর মিলাইতে পারিয়াছেন, তিনিই সমাজের প্রিয় হইতে পারিয়াছেন। সমাজের ‘ভয়’—‘বড় ভয়’; সমাজ ‘এক-ঘরিয়া’ করিবে—এ আতঙ্কটী যেন-যম-ভয় হইতেও অনেক বেশী। ইহার মূল কারণটী কি, তাহা কি আমরা কেহ অনুসন্ধান করিরাছি? লোকপ্রিয়তা বা জন-প্রিয়তানুসন্ধিসাই ইহার কারণ। মানুষ মনুষ্য-সমাজের কাছেই প্রিয় হইতে চায়, পশুসমাজের নিকট মানুষের প্রিয়তা বা অপ্রিয়তার কিছু আশে যায় না। যদি মনুষ্য-সমাজ পশু-সমাজের নিকট ‘অপ্রিয়’ হওয়া সত্ত্বেও পশু-সমাজের দ্বারা মনুষ্য-সমাজের প্রিয়তানুসন্ধান সমর্পন করে, তাহা হইলে মনুষ্য-সমাজ পশু-সমাজের প্রিয়তা, অপ্রিয়তা বা মতামতের দিকে না তাকাইয়া মনুষ্য-সমাজেরই প্রিয়তা-অর্জনে ব্যস্ত হইয়া পড়ে। আবার পশু-সমাজের মনুষ্য-সমাজের প্রতি ব্যবহারও তদ্রূপ। মনুষ্য-সমাজের

অপ্রিয় হইতে হইবে বলিয়া সিংহবাহাদুরাদি-পশু সমাজ কখনও নিজ-সমাজের প্রিয়ধর্মের উদাসীন হয় না। এইরূপ সঙ্গীর্ণ-সাম্প্রদায়িকতা 'জাতীয়তার ধর্ম' বলিয়া প্রচারিত ও প্রশংসিত হইলেও চৈতন্য মূলে ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়-তর্পণৈষণাই রাজত্ব করিতেছে। এই ইন্দ্রিয়-নিরতৃপ্তির চেষ্টাটি ব্যক্তিগত-ভাবে প্রত্যেক সাধারণ মানব ও প্রত্যেক পশু-পক্ষী অনুসন্ধান করে বলিয়া উহা ব্যাধি হইতে সমষ্টিতে শাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ সমাজের আবশ্যিকতা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং ব্যাধি-সজ্জ-রূপ সমাজ-সমষ্টি বা লোক-মণ্ডলীর প্রিয়তানুসন্ধানের মূলে ব্যাধির ব্যক্তিগত ইঞ্জিয়-অনুসন্ধানই উদ্দিষ্ট হইতেছে। একরূপ লোকপ্রিয়তা বা জন-প্রিয়তার অনুসন্ধান কতদূর নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধান সম্ভবপর তাহা বিচার্য।

যাহারা এই সমাজের আবহাওয়ায় অনুক্ষণ চলাফেরা করিতেছেন, তাঁহাদের বিচারে কিন্তু লোক-প্রিয়তাই সর্বাপেক্ষা বড় কামনার বস্তু। তাঁহাদের এইরূপ বিচারপ্রণালী হইতে তাঁহারা জন-মতকেই সর্ববিষয়ের দণ্ড-মুণ্ডবিধাতা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। জন-মত জাগতিক সর্বকর্মার্থের দণ্ড-মুণ্ডবিধাতা হোক ক্ষতি নাই, কিন্তু জনমতকে অবিমর্জ্য-ব্যাপারের দণ্ড-মুণ্ডবিধাতা বলিয়া বিচার করিলে বিচারকারীর যে অতি-ব্যাপ্তি-দোষ হয়, তাহা ভাবিয়া দেখিবার আবসর জন-মত বা লোক-প্রিয়তা-নুসন্ধানকারী ব্যক্তিগণের নাই।

আমরা প্রকৃত সত্যানুসন্ধানের পরিবর্তে লোক-প্রিয়তাই অন্তরের অন্তঃস্থলে অনুসন্ধান করি বলিয়া জন-মতকেই সত্য-নির্ণয়ের পরিমাপক-যন্ত্র বলিয়া ধরিয়া লই। আমাদের ধর্ম্মাঙ্কুরের ছলনার অন্তঃপুরে লোক-প্রিয়তাই পাটরাণী হইয়া বিরাজ করে। যখন আমরা ধর্ম্মকর্ম্মে বা সত্য-নির্ণয়ের শোভাযাত্রায় জন-মতকেই গজাকূট করাইয়া তাহার গলায় জয়মাল্য দেই, তখনই নেপথ্য-প্রদেশ হইতে সেই অন্তঃপুরবাসিনীও গুপ্ত চকিত চাহনীটী নিরপেক্ষ দর্শকগণের চক্ষে পড়িয়া যায়।

আমরা লোকপ্রিয় হইবার জন্যই ধর্ম্মের সজ্জা গ্রহণ করি। ধর্ম্মটো যেন সমাজের অতীত-নিম্নস্তরের অজানা, অচেনা, ভুঁইফোড় মাছকেও সহজেই দশটা সামাজিক লোকের নিকট introduced (পরিচিত) করাইয়া দিবার একটা medium (মধ্যবর্তী উপায়) বিশেষ। যিনি দশটা লোকের নিকট introduced (পরিচিত) হইবার অন্য কোনও medium (মধ্যবর্তী উপায়) পান না, তিনি এইরূপ ধর্ম্মকেই তাঁহার কার্য্যসিদ্ধির সর্বাপেক্ষা

জলভ ও সহজ medium দিয়া স্থির করণ। যে ধর্মের বাঞ্ছনে বা যে ধর্মের সহিত কোনরূপ সহায়ভূতি দেখাইতে গিয়া আমাদের লোক-প্রিয়তার লাভ হয়, সে ধর্ম বা সেক্ষণ ব্যক্তিগণের সহিত আমরা কিছু এই ভিড়ি না। অনেক সময় কপটতা করিয়া আমরা কেহ কেহ তাহাদের সচিৎ ও যুগে একটা ভালমাহুষী চাল রাখি বটে; কিন্তু বাস্তব কার্যক্ষেত্রে—যেখানে দেখি লোক-প্রিয়তার হানি হইবে, সেখানে আদৌ যাইতে চাই না। কেহ কেহ বা লোক-প্রিয়তা-নিরপেক্ষ-ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে যে কোনও উপায়ে একটা অভিযান উপস্থাপন করিয়া লোক-প্রিয়তা অর্জনের একটা বেশ সুগম উপায় খুঁজিয়া লইয়া থাকি। কখনও বিচার করি, লোক-প্রিয়তানিরপেক্ষ-ব্যক্তিগণের সহিত মিশিতে গেলে আমাদের যখন কোনরূপ ইন্দ্রিয়-তর্পণই হইবে না—লোক-প্রিয় হইতে পারিব না—অল্প সময়ের ভিতরে আত্মডঙ্কা বাজাইতে পারিব না, তখন সে পথে গিয়া লাভ নাই। প্রকৃত ভগবন্তজনের অনুকূল পথে গেলে যখন সাত জন্মের আবশ্যক হয়, আর প্রতিকূল পথে গেলে যখন তিন জন্মেই কাজ উদ্ধার হয় আর তা'তে আপাত-উদ্ধাদনাও আছে—বিশেষতঃ যে-জগতে বাস করি, সে-জগতের প্রায় যোল আনা লোকই যখন সেইভাবে ভাবিত, তখন এরূপ পথে চলিলেই অতি সহজে বহুলোকের প্রিয় হওয়া যাইবে। এরূপবিচারে অনুকূল-পথ না লইয়া আমরা প্রতিকূল-পথে ধাবিত হই—অনুকূল-পথে কৃষ্ণের ভোগ আর প্রতিকূল-পথে কৃষ্ণকে ভোগ-বিবর্তিত করিবার চেষ্টা। স্বতরাং অনুকূল-ভজনময়ী বিশেষ-গতির অহুসন্ধান করিয়া কৃষ্ণের খাওয়া আমার পণ্ডিত্যের বিস্তৃত ভাণ্ডা করিয়া লাভ কি? কৃষ্ণকে দেউলিয়া করিয়া ‘আমার দাঁড়ে ছোলা’ এই নীতিপুঙ্টা প্রতিকূলময়ী নির্বিশেষ-গতি যখন লোক-প্রিয়তা অর্জন করিতে পারে, তখন তাহা'র আমার আদর্শ হউক। আমাদের এইরূপ চতুরালি কিন্তু বিষ্ঠা-ভোজী বাঘদের অতি চতুরতার ন্যায় আবহবন্ধনারই কারণ হয়। ভক্তের প্রতি বিদ্রোহে অনন্তকাল কুন্তীপাক-যন্ত্রণাই লাভ হইয়া থাকে। সেই কুন্তীপাক কখনও অধর্ম, অনর্থ ও কামনার অতৃপ্তির নাগর-দোলায় অপরাধীকে পাক দিতে থাকে, কখনও

বা ধর্ম অর্থাৎ লৌকিক স্বার্থ, অর্থ এবং কামনার নবীচিকায় ধাবিত করা হয়। অপরাধীকে অনন্তকাল মায়ামুক্তিতে ঘুরাট্টে থাকে।

লোক-প্রিয়তানুসন্ধানে মাত্র দুই চারিটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি। আমরা মনে করি, যদি লোক-প্রিয়-সমাজের মধ্য হইতে কোন ব্যক্তি—কোন মন্ত্রী মহাশয়, এম, এল, এ, কোন পি, এইচ, ডি, বা এল, এল, ডি, কিংবা কোন মহামহোপাধ্যায় মহাপ্রভুর কোন কথা রূপাপূর্বক অনুমোদন করেন, তাহা যতই সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ বা রসাতাসদুষ্ট হোক না কেন, ক্ষতি নাই। তাহা হইলেই যেন মহাপ্রভু তাঁহার কোটি পুরুষ সমেত উদ্ধার হইয়া যান। এম, এল, এ-র সুপারিস-পত্রে মহাপ্রভুর ধর্ম লোক-সমাজের পাতে দিবার মত একটা বস্তু বলিয়া গণ্য হয়। তত্বা মহাপ্রভুকে কে-ই বা নিনে, আর মহাপ্রভুর কথা কে-ই বা শুনে? সপ্রকাশ সূর্য্যকে প্রদীপের আলো জ্বালিয়া দেখিবার প্রায়—আমাদের এইরূপ বিচার। আমরা লোক-প্রিয়তাকে কত বড় মনে করি।

আমরা মনে করি, মহাপ্রভুর প্রবক্তিত-ধর্ম্যে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের সংখ্যা খুবই কম—অস্পৃশ্য, অচলনীয়, ছোট, দীন, দরিদ্র, অশিক্ষিত, সল্প-শিক্ষিত যত ‘অকেজো’ ‘অথন্তে’ লোকগুলিই এ ধর্ম্যে প্রবেশ করে। সুতরাং মহাপ্রভুর ধর্ম—ছোট ধর্ম—সকল সাংসারিক-ধর্ম, আর শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য-পাদাদি-প্রচারিত ধর্ম্য কিরূপ জন-প্রিয়-ধর্ম—ভারতবর্ষের যত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, কুলীন, পণ্ডিত, বিজ্ঞান, বুদ্ধিমান, মহারাজা, সর্বদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য-ক্ষম, সমর্থ ও সুশিক্ষিত ব্যক্তি সকলেই সেই ধর্ম্যের গ্রাহক; সুতরাং সেই ধর্ম্যই মহা উদার। কারণ উহা জনপ্রিয়—লোক-প্রিয়। একবার লোক-প্রিয়-সমাজ-বরণে কোন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়াছিলেন যে, তিনি যে ধর্ম্য গ্রহণ করিয়াছেন, সেই ধর্ম্যটাই পরম সত্যাপূর্ণ উদার ধর্ম্য; যেহেতু বর্তমান সমাজের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ সেই ধর্ম্যে দীক্ষিত হইয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহার যুক্তি এই যে, সামাজিক লোক-প্রিয়তা ও জনপ্রিয়তাই সত্যের পরিমাপক-যন্ত্র।

আমরা অনেক সময়ই লোক-সংখ্যা দেখিয়া ধর্ম্যের উদারতা, অনুদারতা, সাধু-গুরু শ্রেষ্ঠত্ব ও অবরুদ্ধ পরিমাপ করিয়া থাকি। ইহার অন্তরালেও সেই কপট-অবগুণ্ঠনবত্তী, সেই লোক-প্রিয়তা-কুহকিনী নৃত্য করিতেছে।

আমরা মনে করি, মহাপ্রভুর প্রবর্তিত ধর্ম আর কয়জনই বা গ্রহণ করিয়াছেন, শঙ্কর, যৌক্তীষ্ট, হজরত মহম্মদ ও বুদ্ধের প্রচারিত মতে লোক-সংখ্যা কত বেশী! কেহ কেহ এখানে বলিতে পারেন যে, মহাপ্রভুর মত বুদ্ধ ও শঙ্কর বা যীশু, মহম্মদ প্রভৃতির অনেকের পরে প্রচারিত হইয়াছে বলিয়াই মহাপ্রভুর ধর্মগ্রহণকারী লোকের সংখ্যা অনেক কম। কিন্তু বিচার করিলে ইহাই কারণ নহে; যেহেতু দেখিতে পাওয়া যায়, মহাপ্রভুর অভ্যুদয়ের প্রায় পাঁচশত বৎসর পরে মহাপ্রভুর অনুকরণে আধুনিক যে-সকল ধর্মাবতার !! সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাদের মত অতি অল্প সময়েই জগতের লোক গিনা বিচারে গ্রহণ করিয়াছে ও করিতেছে। আর মহাপ্রভু কে ছিলেন ও কি করিয়াছিলেন, বাংলা দেশেরই অনেক লোক তাহা জানেন না। বাংলার অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ আদিম গ্রন্থ ‘শ্রীচৈতন্যভাগবত’, ‘শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’ বাংলার অনেক শিক্ষিত লোকও দেখেন নাই, কিন্তু অগ্ন্যান্য অনেক পাঁচালি-পুঁথি, অনেক পুস্তক, বহু পরে রচিত হইয়াও বাংলার ঘরে ঘরে গৃহ-পঞ্জির দ্বারা প্রচারিত রহিয়াছে কেন? সুড়ি-মিশ্র-সমন্বয়ের ধর্ম লোক-প্রিয়তা রাজত্ব করিতেছে বলিয়াই উহা বহিস্মুখ-লোক-সমাজে অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রিয় হইয়া পড়িয়াছে। জগতের প্রায় ষোল আনা লোকই পেয়ের অনুসন্ধান করেন। প্রকৃত শ্রেয়ঃ খুঁজিয়া দেখিবার ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, তিতিল্লা, মিকপট অতিলাষ বা ঐকান্তিকী চেষ্টা তাহাদের নাই। জাগতিক-সমস্যা-ব্যাপারটা অক ভাষায় বলিতে গেলে—‘লোক-প্রিয়তা’ ছাড়া আর কিছুই নহে। সকলের মন রাখিয়া চলা—কাহারও বিরুদ্ধে কিছু না বলা—(শ্রেয়ঃ কথা বলিলেই যে রোগী চটিয়া যাইবে—আর গ্রাহক থাকিবে না) এক কথায় কপটতার ধর্ম—আজ বন্ধন ও পরবন্ধনার ধর্ম—প্রয়ো ধর্মের নামাস্তরই—জাগতিক সমন্বয়ের ধর্ম। কাজেই লোক-প্রিয়তা-প্রাধি-সমাজ সেইরূপ ধর্মই তাহাদের বাঞ্ছিত মধু আশ্বাদনের লোভে দলে দলে আসিয়া জুটিয়া থাকেন। প্রকৃত বিচার তাঁহারা কিছুতেই শোনে ন। ইহা একটু ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত বর্তমান বিচার-সম্প্রদায় নিরপেক্ষভাবে বিচার করিবেন কি?

শাস্ত্রীয় বিচার মতে মহাপ্রভু বা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপতত্ত্ব। বুদ্ধ, শঙ্কর প্রভৃতি কেহ বা সেই স্বয়ংরূপের অংশ-কলারূপ অবতার, কেহ বা ভগবদাদেশে

বহিষ্কৃত-জীব-মোহন-কার্যে ভাবপ্রাপ্ত — শক্তিশালী জীব-বিশেষ। শাস্ত্রেও
 রহিয়াছে, বৃদ্ধ ও শরীর অস্থির-মোহনার্থ কল্পিত ও আচ্ছাদিত মত প্রচার
 করিবার জন্য জগতে আসিয়াছিলেন। স্বয়ং ভগবানের প্রচারিত অকৈতব-
 সত্যাপূর্ণ সিকাণ্ডের গ্রাহক অপেক্ষা সেইরূপ লোক-নিমোহনকারী মতের
 গ্রাহক এত অধিক হইল কেন, তাহা একটু অহুসন্ধান করিলে জানা যায়
 যে লোক-প্রিয়তায় ‘বিমুখতা’ আছে বলিয়া তাহাই অনাদিবহিষ্কৃত-জীবের
 প্রিয়া। জগতে ভগবৎ-প্রেমিত মহাপুরুষ ও তাঁহাদিগের প্রতি একান্ত
 আসক্ত দুই চারি জন ছাড়া আর বাদ-বাকী সকলেই বহিষ্কৃত। স্মরণ্য
 এ রাজ্যে প্রেম্যকথাই লোক-প্রিয় হয়, আর গতানুগতিক-ন্যায়ানুসারে
 সেই লোক প্রিয়তাই লোকের অনুসন্ধানের বিষয় ছিল।

যে মতটী অস্থির-মোহনার্থ জগতে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা এত
 লোক-প্রিয় হইয়া পড়িল যে লোক-সমূহকে সেট মতপ্রাপ্ত হইতে উদ্ধার
 করিবার জন্য চারিজন বৈষ্ণবচার্য্য এবং তৎপরে স্বয়ং বিষ্ণুর অবতরণ
 আবশ্যক হইয়াছিল। এক শীশঙ্করাচার্য্য প্রচারিত মত গণ্ডন করিয়া
 শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত স্থাপনের জন্য বিষ্ণুস্বামী, নিম্বাদিত্য বামানুজ ও মধ্ব—
 এই আচার্য্যচতুষ্টয়, তাঁহাদের অসংখ্য অনুগতবর্গ ও তৎপরবর্ত্তিকালে
 আচার্য্যালীগণভিনয়কারী সপার্বদ ভগবান্ শ্রীগৌরানন্দরের অভ্যুদয়। কিন্তু
 যে মত চার চার জন আচার্য্য এবং সপার্বদ স্বয়ং ভগবানের দ্বারা “অসং
 মত” বলিয়া নিরস্ত হইল, সেট মত আজ পর্য্যন্ত এত লোকপ্রিয় হইয়া
 রহিয়াছে কেন? তাহা হইলে দেখা যায়, ‘লোক-প্রিয়তা’ এত বড় যে,
 সেখানে আশু-বাক্য, মহাজন-বাক্য, এমন কি স্বয়ং ভগবানের বাক্য
 পর্য্যন্ত অনাদৃত হয়। সেই নির্বিশেষ মতকে কেন্দ্র করিয়া বর্ত্তমানে যে
 সকল নূতন নূতন মত সৃষ্টি হইতেছে—যে সকল মত সমূহের আপাতমোহন
 বেশ লইয়া পরিণামে সেই নির্বিশেষ-মতেই আপনাদিগের শেষগতি
 খুঁজিতেছে, সেই সকল মতগুলিট কিন্তু এই জগতের লোকের নিকট খুব
 বেশী প্রিয়। নিরপেক্ষভাবে ইহার কারণ অহুসন্ধান করিলে জানা যাইবে
 যে, মানুষের ধর্ম্ম-কর্ম্ম বাস্তব সত্যানুসন্ধান নহে—তাহা লোক-প্রিয়তানু-
 সন্ধান মাত্র। বহিষ্কৃত মানুষ জ্ঞাতদাবে, অজ্ঞাতদাবে লোক-প্রিয়তাকেই
 ‘ধর্ম্ম’ বলিয়া বরণ করে। প্রকৃত সত্য অনেক সময়েই লোক-প্রিয়তার
 প্রতিযোগী বা নিরপেক্ষ বলিয়া সেখানে লোক খুব কম জোটে। (ক্রমঃ)

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

ভগবতপরায়ণ শ্রদ্ধাস্পদেষু.

সম্পাদক মহারাজ—

আমি শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার গ্রাহক ও পাঠক ।.....

“যে কোন দেবতাই আসুন না কেন, বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের অন্তর্যামি
স্থিত্রে বিষয়-পরতত্ত্ব ভগবান্কেই দর্শন করেন, যেমন আকাশে সূর্যের উদয়,
সূর্যের অন্তর্ভুক্ত সূর্যদেবতা, তদন্তর্ভুক্ত বসুদেব প্রভু, বলদেব প্রভুর হৃদ্যে
মহালক্ষ্মী, মহালক্ষ্মীর হৃদ্যে চিল্লীলা-মিথুন রাধা-গোবিন্দ ।অনু-
পরমাণুতে এইরূপ পঞ্চতত্ত্ব আছে । ভূতন্তুষ্টি হয় না ও’লে আমাদের
পঞ্চতত্ত্ব দর্শন হয় না।”

মিঃ—শ্রীভূষণচন্দ্র দাস

বহরমপুর (পঃ বঙ্গ) ।

উত্তর

উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত গূঢ় ও অপ্রাকৃত তত্ত্ব—অহুভূতি-সাধা ।
যদিও উহা সর্বসাধারণে প্রচারিত হইয়াছে, তথাপি জীবমুক্ত না হওয়া
পর্যন্ত উহা কাহারও উপলব্ধির বিষয় হয় না । আমরা কেবল শ্রীগুরু-
মুখশ্রুতবাক্যটি বিচারমুখে ব্যক্ত করিবার প্রয়াস করিলাম মাত্র । অব্য-
ক্তানে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তাহা কাহারও বুঝিবার বা বুঝাইবার
সামর্থ্য নাই ।

আর্য্যগণের শাস্ত্রে দেবাসুরাদির কথা হিন্দুমাতেই অবগত আছেন ।
মানব অপেক্ষা সর্বতোভাবে পৃথ্বীভূমিকার উন্নত স্বর্গরাজ্যে দীপ্তিমন্ত দেব-
গণ অবস্থান করেন । এজন্য দেবগণ মানবগণের পূজ্য । অম্বরগণ দেবতা-
গণের সহিত কোন কোন ক্ষেত্রে সমকক্ষ হইলেও তাহারা ব্রহ্মসমোক্তনাবলম্বী
হওয়ায় দেবগণের স্থায় পূজ্য নহে । সাধ রণতঃ জীবন বল জীব প্রবল-
দেবগণের সম্মানবাতা । দুর্বল জীবসজ্জ প্রবল দেবগণকে নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ
জ্ঞান করিতে অভ্যস্ত । এই বৃত্তি হইতে ভারতবর্ষে নানাবিধ দেবোপাসক
সম্প্রদায় উৎপত্তি হইয়াছে ।

শ্রীশ্রী শঙ্করাচার্য্য যে-কালে তাত্‌কালিক ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের 'একম্‌ই' করিয়াছিলেন, তৎকালে তাহার মধ্য হইতে পাঁচটা সম্প্রদায়কে তিনি তাঁহার অধীনতায় আনয়নপূর্ব্বক সকলকেই সমর্থন করেন। এই পঞ্চোপাসক-সম্প্রদায় বদ্ধাবস্থায় অজ্ঞান-দ্বারা চালিত হইয়া লগ্ণ দেবসমূহের উপাসনা করেন। পরে জীৱমুক্ত অবস্থায় শৌৰিক উপাস্ত্র দেবতার সন্মান করিলেও বস্তুতঃ সেই দেবতাকে বিশেষ অসম্মানিত করিয়া তাঁহার সিংহাসন হইতে তাঁহাকে অর্দ্ধচন্দ্র প্রদানপূর্ব্বক পঙ্কিত করিয়া স্বয়ং তদ্বন্দেবান্তিমাণে তথায় বাস করেন। অতঃপর গির্দেহমুক্তিকালে স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয় ভেদরূপ জলাঞ্জলি দিয়া নির্ভেদ নির্বিকার রূপে নির্বিশিষ্ট হইয়া গড়েন। নির্বিশেষবাদী বৈদান্তিকগণের পঞ্চোপাসনার সমর্থনের পূর্বে ভারতবর্ষে বেদের সংহিতা-অংশে উল্লিখিত দেব-গণের পূজক-সম্প্রদায় কৰ্ম্মকাণ্ডের আবাহন করিতেন এবং কতিপয় দেব-বিশেষের প্রাধিক্ত স্বীকার করিয়া অপর দেবগণকেও সন্মান করিতেন। সকাম-দেবোপাসক সম্প্রদায় বিষ্ণুর পরমপদ বিচারে অসমর্থ হইয়া লৌকিক বণাদির কামনা করিতেন। কামনামুক্ত দেবোপাসক-সম্প্রদায় ঐহিক ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি বাতীত বিষ্ণুর পরদেবত্ব লক্ষ্য করিতেন। সম্প্রতি পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণের মধ্যে সংহিতোক্ত দেববিচার-বিশ্লেষণে আমরা লক্ষ্য করি যে, বিষ্ণুকে কেহ কেহ দ্বাদশাদিত্যেরই অল্পতম জ্ঞান করেন। অর্ধামা, ভগ, পুষ্প প্রভৃতি দেবসমূহ বিষ্ণুপর্ধ্যায়ের কথিত, একথাও তাঁহার বলিয়া থাকেন। বিষ্ণুবাতীত অল্প দেবদর্শন জীবের কামনামগ্নী দৃষ্টিতে আবদ্ধ মাত্র। যিনি যেক্রপ কামনার বণবন্তী হইয়া পরমপূজা বিষ্ণুদেবকে তাঁহার কামনা পরিতৃপ্তির যন্ত্রবিশেষ জ্ঞান করিতেন, তিনি বিষ্ণু বস্তুকে দর্শন করিবার প্রবৃত্তি-রহিত হইয়া ইত্যৎ দেবতা পাকৃতপাক্তো তাঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠ ভূতা জ্ঞান করতেন। এখনও নৃনাদিক সেট প্রবৃত্তিই কৰ্ম্মকাণ্ডে বদ্ধজীবের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবগণ নিকাম; বিষ্ণু বাতীত বৈদিক অন্য দেবোপাসকগণ অবৈষ্ণব সংজ্ঞায় কথিত হন। বিষ্ণুর দ্বারা স্মৃণ স্মরণেহের কাহানির্বাহের ব্যবস্থা নাই। কিন্তু অল্পদেবগণদ্বারা কামনাপরিতৃপ্তিরূপ স্মৃণ-স্মরণেহের সেবা আবদ্ধ আছে। বিষ্ণুই সেব্য বস্তু। তাঁহার সমর্থ পূজ্য দেববস্তুতে বিষ্ণুর অধিষ্ঠান লক্ষ্য করিতে অসমর্থ, তাঁহারাই কৰ্ম্মকাণ্ডাশ্রিত বৈদিক। উপাসনাকাণ্ডে নিকাম বিষ্ণুভক্তগণ

বিষ্ণুসেবাই করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহাদের ভোগ-প্রবৃত্তি নাই এবং বিষ্ণুতে ভোগ্য বৃদ্ধি নাই। এজন্যই আমরা শুনিয়াছি যে, “যে কোন দেবতাই আসুন না কেন, বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের অন্তর্যামিসূত্রে বিষ্ণুপরতত্ত্ব ভগবান্কেই দর্শন করেন।”

বিষ্ণুবস্ত্র নরজাতির সেবকবস্ত্র না হইলেও তাঁহারই অংশসম্মত দেবগণ নরজাতির স্কুল-সূক্ষ্মাদি শরীরের সেবা করিয়া থাকেন এবং তদ্বারা লব্ধ-বিষ্ণুশক্তিক হইয়া বিষ্ণুর পালনী শক্তির নিদর্শন জ্ঞাপন করেন। সূর্য্য-দেবতা জীব-জগতের চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বা বৃত্তিজীবীর খাদ্য প্রদানকালে সাহায্য করেন। তাঁহা হইতেই জগতে আলোক বিস্তৃত হইয়া শস্যাদি উৎপত্তির সাহায্য করে, পৃথিবীর আত্যন্তিক শৈতা নিবারণ করে, সূর্য্য-দেবতা বৃষ্ণ-স্ক্রজাদি ছয়টি গ্রহের কেন্দ্ররূপে অবস্থান করিয়া দেশকালের আধার বা পাত্ররূপে অধিষ্ঠিত থাকেন। এইগুলি আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দ্বারা সূর্য্যামিষ্টানের প্রয়োজনীয়তা। সেই প্রোতিঃপিণ্ডের মালিক হুত্রে বিষ্ণুর অংশদেবতা বায়ুদেবতা হইতে ভিন্ন। বায়ু দেবতার সম্পত্তি রূপে ভৌতিক নাসিকা বায়ু প্রাণাপানাদি ভেদে বহুরূপী। বিষ্ণুশক্তির অংশবিশেষ বায়ু বহুজীবের শরীর-পালনে বিষ্ণুশক্তির ক্রিয়া প্রদর্শন করেন। ইন্দ্র বিষ্ণুকে বহন করেন এবং বারিবর্ষণদ্বারা প্রপঞ্চাগত বৈষ্ণবগণকে শস্যাদি প্রদানের সাহায্য করেন। তিনিও উণেন্দ্রের একটি মাত্র অংশ। তলবকার শ্রুতিতে দেবগণে বিষ্ণুশক্তির আংশিক প্রকাশরূপে বর্ণন আছে। বিষ্ণুরই বিভিন্ন অংশে দেবগণ, মনুষ্যগণ, স্বকরকপিশাচাদি প্রাণিগণ, প্রস্তুতাদি জড় পরমাণু হ্রস্ব-দীর্ঘ-পরিমণ্ডল সমষ্টি। বিষ্ণুর্জিত ভাবে যে ‘অভাব’ নামক ইন্দ্রিয়জ বৃত্তিগ্রাহ্য ব্যাপার অনুভূত, তাহাই বিষ্ণুর নির্কিংশেষ শক্তিপ্রকাশ মাত্র। নির্কিংশেষ ঐশ্বর্য বা সত্ত্ব দেবসমূহ সকলেই বিষ্ণুর আংশিক প্রকাশ দর্শন মাত্র। তাঁহাদের পৃথক্ পৃথক্ অধিষ্ঠানে মিশ্রণতার অভাব ও পরস্পর বিচারের অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ঋণ্ডিত বস্তু বা বিষ্ণুবাচীত অন্য দেবতা বা জীবের নির্কিংশেষ শ্রুতিগত ব্রহ্ম সকলেই বিষ্ণুর অংশবিশেষ, কেহই পূর্ণতত্ত্ব নহেন। অজ্ঞাত গোবিন্দের বৈভবপ্রকাশ বলদেবপ্রভৃ মঞ্চ দেবের অন্তর্যামিসূত্রে—সকল-অণুপরমাণুর অন্তর্যামিসূত্রে তাঁহাদের নিজ নিজ স্কুল সূক্ষ্ম শরীরের অভ্যন্তরে সন্নিবিষ্ট বা জনকসূত্রে অবস্থিত আছেন। তিনি শক্তিমত্ত্ব; তাঁহারই আংশিক শক্তি লাভ করিয়া দেবগণের তত্ত্ব-

বিষয়ে কর্তৃত্বাত্মক শক্তিমত্তা। প্রাণী ও জড় বা প্রাণরহিত যাবতীয় ভেদাবস্থিতি বিয়ুবিষয়ক উপলব্ধি হইতে বঞ্চিত করে। বৈদিক দেবসমূহ যেরূপ প্রাকৃত রাজ্যে পরন্তু ভাগবতানন্দকের তুর্কবুদ্ধির অসারতা যে দেহাত্মবুদ্ধিরূপ সম্ভীর্ণতা বা বিবর্তজ্ঞানোৎ। তাহা প্রতিপাদন করাই আমার উদ্দেশ্য। শ্রীচৈতন্যভাগবতকারও বলিয়াছেন,—“ভাগবত যে না মানে সে যবন লম। তার শাস্তা আছে জন্মে জন্মে প্রভু যম॥” কেহ কেহ কহেন যে, শ্রীমদ্ভাগবত মুগ্ধবোধ-রচয়িতা বোপদেবের রচিত, তাহা যে নহে, উহা বহুপূর্বের সমালোচনার প্রমাণ করা হইয়াছে। কেহ প্রতিবাদ করিলে অস্বী হইব।

পরিশেষে বিদ্রোহকারিগণের চরণে ধরিয়া নিবেদন যে, শিশুপালের হৃদয় ত্যাগ করিয়া একবার গৌরজনগণের নিকট গিয়া বিবিধাত্মবাগ্নি নিখিল বৈষ্ণবশাস্ত্রের অন্তর্জটী পূজ্যপাদ পরম ভাগবতগণের সহিত বিপুলভাবে আলাপ করুন, তাহা হইলে সাধুসঙ্গ প্রভাবে মনের মলিনতা দূর হইয়া বিশুদ্ধ মন হইবে, তখন বিদ্রোহ ভাব থাকিবে না এবং মেঘেব নায় হইবেন, কারণ মেঘ যেরূপ ত্রিভুবনের তিজ, কষাঘাদি রস আকর্ষণ করিয়া নির্মল স্বাক্ষর বর্ষণ করেন তদ্রূপ হইবেন, সর্পের নায় হইবেন না, কারণ সর্পকে প্রচুর দুগ্ধ পান করাইলেও সে কখনও বিষ-স্তিম্ন দুগ্ধ দিবে না—

গুণাক্ষে দোষাঃ সূজন-বদনে তুর্জ্জনমুখে
 গুণা দোষায়ন্তে কিমিতি পরমং বিশ্বয়পদম্।
 যথা জীমূতোহয়ং লবণজলবার্ধেঃ কমম্বুতং
 কলী পীত্বা ক্ষীরং বমতি গরলং দ্বঃসহতরম্ ॥

[অর্থাৎ, সূজনের মুখে দোষও গুণে পরিণত হয়, কিন্তু তুর্জ্জনের মুখে গুণও দোষযুক্ত হইয়া থাকে। ইহা কি পরমার্শচর্য্যের কথা! দৃষ্টান্ত যথা,—মেঘ লবণ-জলাদি (সমুদ্র হইতে) আকর্ষণ করিয়া অমৃত-রূপ জল বর্ষণ করে, কিন্তু সর্প দুগ্ধ পান করিয়াও দুঃসহতর বিষ বমন করে অর্থাৎ দুগ্ধের পরিবর্তে বিষ দান করে।]

জগদগুরু পরমহংসস্বামী ঔ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের দ্বাদশবর্ষ-পুত্তি বিরহ-মহোৎসব

পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় এ বৎসরেও গত ৩ই কার্তিক ২৩শে অক্টোবর
বৃহস্পতিবারে শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত-সমিতির মূলকেন্দ্র, শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
নবদ্বীপে এবং তদধীনস্থ সমগ্র ভারতের শাখা মঠসমূহে শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত
সমিতির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীহরুণ-রূপাঙ্গুগাবর নিত্যলীলাপ্রতিষ্ট ঔ বিষ্ণুপাদ
অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের
দ্বাদশবর্ষ-পুত্তি শ্রীবিরহ-মহোৎসব সমারোহের সঙ্কিত সুসম্পন্ন হইয়াছে।

মূলকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীবিরহ-তিথির পূর্বদিন
সন্ধ্যারতি কীর্তনের পর সমিতির সমসভাপতি ত্রিদাণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-
বেদান্ত নারায়ণ মহারাজ পরমারাধা শ্রীশ্রীল পরম গুরুপাদপদ্ম কর্তৃক লিখিত
শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধ “বিরহ-মাজল্য”
পাঠ করিয়া ভাবপূর্ণ ব্যাখ্যার দ্বারা উপাস্তৃত শ্রদ্ধালু শ্রীগুরুসেবক-সেবিকা-
গণকে ভাবে বিভোর করিয়া দেন। তাহাতে তিনি তদীয় শ্রীল গুরুপাদ-
পদ্মের বহুমুখী বৈশিষ্ট্য ও অতিমর্ত গুণাবলী কীর্তন করেন।

ঐ দিবস সন্ধ্যাকালে শ্রীসমাদি মন্দির, মূল মন্দির এবং নাট্যমন্দির
বিবিধ প্রকারের গল্প-পুষ্পমালা, কদলী-স্তম্ভ, ধ্বজা-পতাকা, জলপূর্ণ কলস,
রত্নীন বজ্র, বিচিত্র বিদ্যুৎ আলোক-মালাদি দ্বারা সজ্জিত করা হয়।

পরদিনস শ্রীবিরহ-তিথির দিনে মঙ্গলাত্রি-কীর্তন, তুলসী-পরিক্রমা ও
উষা-কীর্তন আরম্ভ হয়। ত্রিদাণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্যটক মহারাজ,
শ্রীকানাঈদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী, শ্রীচন্ময় ব্রহ্মচারী এবং
শ্রীগৌরাজদাস ব্রহ্মচারী তাঁহাদের স্বভাবস্বলভ মধুর এবং মর্মস্পর্শী করুণ-
সুরে ক্রেশমঃ শ্রীগুরুটক, শ্রীগুরু-পরম্পরা, শ্রীগুরুচরণপদ্ম, গুরুদেব কৃপানিন্দু
দিয়া, গুরুদেব কবে তব করুণা প্রকাশে, শ্রীকৃপ-মঞ্জরীপদ, শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা,
পঞ্চতত্ত্ব ও হরিনাম মহামন্ত্র কীর্তন করেন। তদনন্তর ত্রিদাণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-
বেদান্ত নারায়ণ মহারাজ শ্রীল গুরুপাদপদ্মের লিখিত গ্রন্থসমূহ, সাহিত্য-

প্রবন্ধ, শ্রীতুলসী-পরিক্রমা কীর্তন, শ্রীল প্রভুপাদের আরাতি কীর্তন ও প্রদত্ত ভাষণে বাক্য ও পদসমূহ উদ্ধৃত করিয়া প্রাঞ্জলভাবে তাহার শ্রীক্লপানুগত্য প্রতিপাদন করেন। বিশেষ করিয়া শ্রীল পরমগুরুশ্রীপাদেশ্বরের গুরুনিষ্ঠা এবং গুরুসেবার আদর্শ চরিত্রসমূহ অবরুদ্ধ গলায় বর্ণন করিতে সকলকে ভাবমগ্ন করিয়া তোলেন।

পূর্বাহ্ন দশটার সময় কীর্তনমুখে বিরহ-সভার আয়োজন করা হয়, তাহাতে ত্রিদণ্ডিষামী শ্রীমন্ত্ৰিবেদান্ত পর্যাটক মহারাজ, শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, শ্রীনিবুজবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীকানাইলাল ব্রহ্মচারী প্রমুখ বক্তাগণ তাঁহাদের শ্রীগুরুশ্রীপাদেশ্বরের মহিমা কাণ্ডনমুখে ভাবপূর্ণ শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। পরে শ্রীধাম মায়াপুর হইতে শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘের ত্রিদণ্ডিষামী শ্রীমন্ত্ৰি অমৃত অবধূত মহারাজ এবং আনুষ্ঠানিক কৃষ্ণভাবনামৃত সঙ্ঘের শ্রীপাদ হংসদূত স্বামী ও শ্রীপাদ ভক্তিচাল স্বামী শ্রীল পরমগুরুমহারাজের জতিমর্ত্য চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সমূহ ও বিবিধ উপদেশাবলী সম্বন্ধে ভাষণমুখে তাঁহাদের শ্রদ্ধা-পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন। তৎপশ্চাৎ সমিতির শ্রীল আচার্য্যাদেবের অনুগত্যে কীর্তনমুখে সমাগত বৈষ্ণবগণ, শ্রীগুরুসেবক এবং সেবিকাগণ যথাক্রমে শ্রীসমাধি পীঠে পুষ্পাঞ্জলি ও মাল্যার্পণ করেন। মধ্যাহ্ন ভোগারতির পর আহুত ও রবাহত সকলকে বিভিন্ন প্রকারের অন্নাদি মহাপ্রদাদ বিতরণ করা হয়।

সন্ধ্যারতি ও তুলসী পরিক্রমার পর পুনঃ শ্রীবিরহ-সভার আয়োজন করা হয়। সমিতির স্বর্গস্থান সভাপতি পরিব্রাজকচার্য্য ত্রিদণ্ডিষামী শ্রীমন্ত্ৰিবেদান্ত বামন মহারাজের সভাপতিত্বে প্রথমে শ্রীগুরুসেবক-সেবিকাগণের লিখিত শ্রদ্ধা পুষ্পাঞ্জলিসমূহ পাঠ করা হয়। তদনন্তর ত্রিদণ্ডিষামী শ্রীমদভক্তিবাদান্ত নারায়ণ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিষামী শ্রীমন্ত্ৰিবেদান্ত উর্দ্ধমুখী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিষামী শ্রীমন্ত্ৰিবেদান্ত পর্যাটক মহারাজ, ত্রিদণ্ডিষামী শ্রীমন্ত্ৰিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ প্রমুখ বক্তাগণ শ্রীল গুরুশ্রীপাদেশ্বরের গুরুনিষ্ঠা, গুরুসেবা, শিষ্য-বাৎসল্য, শ্রীতিপূর্ণ শাসন, নিরপেক্ষ সত্যের নিষ্ঠিক বক্তা ও প্রচারক, পুষ্প হইতে মুহূ এবং বজ্র হইতে কঠোর স্বভাব, 'জল্প সেবাকে বহু করি মানে'-যুক্ত স্বভাব, বৈষ্ণবের ২৬ গুণের মূর্ত্ত-বিগ্রহ, মহাবদান্যতা, মায়াবাদি সহজিয়া অপসম্প্রদায় সমূহের সাফাৎ যম, তুষ্টির দমন এবং শিষ্টের পালনকারিতা প্রভৃতি মহিমাগুলি উল্লেখপূর্বক উদাহরণ সহ কতি

মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেন। অবশেষে শ্রীল আচার্য্যদেব কিছু কিছু অসুস্থ থাকিলেও স্বভাবসুলভ সুসিক্ত এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংক্ষিপ্ত ভাষণে তদীয় শ্রীল গুরুপাদপদ্মের অতিমর্ত্য চরিত্রের বিবিধ বৈশিষ্ট্য সমূহ বর্ণনা করিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। অবশেষে মহামন্ত্র কীর্তনাতে বিরহ-মহোৎসব সভা শেষ হয়।

শ্রীকেশবজী গোড়ীয় মঠ মথুরায়— শ্রীল পরম গুরুপাদপদ্মের ভক্তনকুলীয়ে নানা প্রকার পুষ্প-বল্লব, গাল্য, বস্ত্র, ঘট, কদলী বৃক্ষাদি মামূলিক দ্রব্যো সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। মঙ্গলারতি উষাকীর্তনের পর ত্রিদণ্ডিষামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত পদ্মনাভ মহারাজ শ্রীভাগবত পত্রিকা হইতে তদীয় পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুপাদপদ্মের উপদেশাবলী পাঠ করেন। পূর্বাঙ্ক দশটার সময় শ্রীধাম বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন, নন্দগাঁও ও রাধাকুণ্ড, গোকুল এবং শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডলে অজ্ঞাত স্থানবাসী শ্রীসারস্বত গোড়ীয় বৈষ্ণব সকল উপস্থিত হইলে একটী মহতী বিরহ-সভার আয়োজন করা হয়। তাহাতে শ্রীগুরুঐক, শ্রীশ্রীগুরু-মহিমা-সূচক কীর্ত্যসমূহ, বৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতন্ত্র এবং শ্রীমহামন্ত্র কীর্তনের পর ত্রিদণ্ডিষামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত পদ্মনাভ মহারাজ, শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীনন্দনন্দন ব্রহ্মারী, শ্রীপ্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ ব্রজাগণ শ্রীল পরমগুরুপাদপদ্মের মহিমা কীর্তন করেন। অনন্তর সকলেই শ্রীল গুরুপাদপদ্মে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিলে ভোগরাগ ও আরাট্রিক সম্পন্ন হইলে উপস্থিত সকলকে বিবিধ প্রকারের সুখাদ্য মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

—শ্রীভক্তানন্দ ব্রহ্মচারী

ব্রজমণ্ডল-পরিভ্রমণ

(পূর্বপ্রকাশিত ৩১শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ৪২৬ পৃষ্ঠার পর)

অন্নকুট-মহোৎসব শাঙ্খবিধিসমতে ২১শে অক্টোবর রবিবার দিন উৎযাপিত হইল। প্রায় ২ হাজারের মত ভক্তবৃন্দ প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। বহু উপচারে উৎসব বেশ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইল। স্থানীয় ভক্তগণই এই উৎসবের বায়ভার বহন করিয়া থাকেন। অস্বদীয় গুরুপাদপদ্মের ধারা ব্রজা করিয়াই এই অন্নকুট-মহোৎসব পালিত হইয়া আসিতেছে। এখনও

বহু পুরাতন মথুরাবাসী ভক্তগণ এমনকি শ্রীল গুরু মহারাজের আয়োজিত উৎসবের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার অতিমর্ত্য চরিত্রের কথা আশ্বাদন করেন।

পুনরায় আমাদের বন-পরিক্রমার যাত্রা আরম্ভ হইল। গৌর-তৃতীয়া তিথিতে শ্রীমঠে মধ্যাহ্নের প্রসাদ গ্রহণ করিয়া বেলা তিন ঘটিকার সময় দুখানা রিক্সার্ত্ত বাসযোগে প্রায় ১৫০ জন যাত্রীসহ শ্রীগোবর্দ্ধন-পরিক্রমার উদ্দেশ্যে যাত্রা আরম্ভ করিয়া বৈকাল ৪৩০ মিঃ গোবর্দ্ধনে গোবিন্দ ধর্ম-শালাতে পৌছি। আসাম ও পশ্চিমবঙ্গ হইতে আগত যাত্রীগণও আমাদের সঙ্গেই আছেন। পরম পূজনীয় শ্রীল নারায়ণ মহারাজ বিশ্রামের সুযোগ না দিয়াই সংকীর্্ত্তন সহযোগে পরিক্রমা আরম্ভ করিলেন এবং যাহা যাহা দর্শন করিলাম তাহা বর্ণন করিতেছি। শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের ভজন-কুটীর। দ্বিধাবার (কৃষ্ণদাস) ভজন কুটীর ও সমাধি। শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ এখানে ভজন করিতেন, কিন্তু মশার উৎপাতে স্থান ত্যাগ করিবার বাসনা করিলে শ্রীচক্রেশ্বর মহাদেব বারণ করেন এবং মশার উৎপাত আর হইবে না বলেন। সেই হইতে এইস্থানে মশকের দর্শন মেলে না। বুদ্ধবয়সে গোস্বামিপাদের নিত্য গোবর্দ্ধন পরিক্রমায় ক্লেশ হইলে শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রবেশে আসিয়া তাঁহাকে বাতাস করিয়াছিলেন এবং একথণ্ড শ্রীকৃষ্ণচরণ-চিহ্নযুক্ত গোবর্দ্ধন-শিলা প্রদান করিয়া বলিলেন যে, এই শিলা পরিক্রমা করিলে শ্রীগিরিরাজ পরিক্রমা করা হইবে। সেই অবধি শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ ঐ শিলা পরিক্রমা করিতেন। ঐ শিলা অজ্ঞাপিও বৃন্দাবনে শ্রীরাধাদামোদর মন্দিরে আছেন—যাহা আমরা বৃন্দাবন পরিক্রমার সময় দর্শন পাইয়াছিলাম।

শ্রীমানসীগঙ্গা—শ্রীকৃষ্ণের মানস-সঙ্গম মাত্রে এই তীর্থ প্রকটিত হইয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম মানসীগঙ্গা হইয়াছে। মানসীগঙ্গার উত্তরে চক্রেশ্বর মহাদেব, শ্রীনিতাই গৌরান্দ মন্দির, মানসী গঙ্গার দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক আসিয়া গোবর্দ্ধন গ্রাম। কৃষ্ণ ও সখীগণের জলবিহার স্থান মানসী-গঙ্গাকে শ্রীরাধাকৃষ্ণের নৌকাবিহার-লীলাস্থান বলিখাও বর্ণনা আছে। নন্দ মহারাজ গোপগণসহ গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেছিলেন; শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আপনাদের দূরে যাঁতে হইতে হইবে না, এইখানে গঙ্গা আছেন। শ্রীকৃষ্ণের কথায় গঙ্গা মকরবাহিনীকপে সকলকে দর্শন দিয়াছিলেন। এই ঘটনা দীপাবলির দিন হইয়াছিল বলিয়া মানসীগঙ্গার দীপাবলী দান হইয়া থাকে

ও সহস্র সহস্র ব্রজবাসী ও ভক্তগণ ইহা দর্শন করিবার জন্য দীপালী উপলক্ষে গো বর্দ্ধনে আসেন এবং গিরিরাজ পরিক্রমা করেন। শ্রীগিরিরাজের মুখারবুদ্ধকে (মহুরাক্তি) ভূক্ত দিয়া স্নান করান হয়। আমরা সন্ধ্যার মুখে আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলাম। যাত্রিগণের ভিতরে দীপদান ও ভূক্তদান করিবার জন্য হুড়াহুড়ি পড়িয়া যায়।

শ্রীহরিদেব—মানসীগঙ্গা পরিক্রমার প্রথমেই শ্রীহরিদেবের মন্দির। ইহা প্রাচীনতম মন্দির। এই মন্দিরের চূড়াও আওরঙ্গজেব বিনষ্ট করিয়াছে। শ্রীমদ্বাচস্পতি বৃন্দাবনে আদিয়া শ্রীহরিদেবের বিগ্রহ দর্শন করিয়াছিলেন। মন্দির প্রান্তরের মন্দিরটি রাজা টোডরমল নির্মাণ করিয়াছিলেন। আমরা গোবর্দ্ধনধারী শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিলাম। শ্রীহরিদেবের মন্দির—কেহ কেহ ইহাকে মনসা দেবীর মন্দির বলিয়া থাকেন। ব্রহ্মকুণ্ড ও তার তীরে মানসী দেবীর মন্দির। মানসীগঙ্গার অভ্যন্তরে পূর্বদিকে গিরিরাজ আছেন তাহাতে মুকুট চিহ্ন রয়েছে। বজ্রনাভ গিরিরাজ স্থাপনা করিয়াছিলেন।

শ্রীগোবর্দ্ধন-পরিক্রমা—চতুর্থীর ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে আমরা মনের আনন্দে খুব উল্লাসেই সংকীর্ণনাগমনে শ্রীল নারায়ণ মহারাজের নির্দেশে শ্রীগিরিরাজ-পরিক্রমা আরম্ভ করিলাম। তখনও সূর্যোদয় হইতে প্রায় ১৩০ মিনিট বিলম্ব। “জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন, শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন”—এই কীৰ্ত্তন ধ্বনি করিতে করিতে প্রথমেই ‘দানবাটীতে’ উপস্থিত হইলাম। দানবাটী গোবর্দ্ধন পর্বতোপরি অবস্থিত। এখানে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাসহ দানলীলা করিয়াছিলেন, এই দানলীলার বর্ণনা করিয়া শ্রীশ রূপগোস্বামিপাদ দানকেলি কৌমুদী গ্রন্থ রচনা করেন। রলিক ভক্তগণের নিকট ইহা এক উপাদেয় গ্রন্থ। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই ভোরের রাতে বালু অতিক্রম করিয়া অগ্নিসর হইতেছেন এবং সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীল মহারাজজী তাঁহার জুমধূর কণ্ঠে ঠাকুর শ্রীল ভক্তিগিনোদের অপূর্ব গীতি,—“উদিল অরুণ পূর্ব ভাগে, বিজয়নি গোরা অমানি জাগে, ভক্ত সমূহ লইয়া সাথে, গেলা নগর ব্রাজে” কীৰ্ত্তন আরম্ভ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভক্তগণ অল্পকীৰ্ত্তন আরম্ভ করিলেন। সে এক অপক্লপ শোভা ধারণ করিয়াছিল। সমস্ত দুঃখ-কষ্টকে লাঘব করিয়া চলার পথকে সুগম করিবার এক অপূর্ব সন্মোহন শক্তি প্রত্যক্ষ করিলাম। পরিক্রমার পথে নিম্নলিখিত স্থানগুলি দর্শন লাভ হইল—

শ্রীরাধাগোবিন্দ মন্দির, শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, পর্যাশ্রমিক বা পর্যাশ্রমিকী গ্রাম
শ্রীল মহারাজকী বর্ণনামুখে বলিলেন এখানে শ্রীকৃষ্ণের বাসলীলা
হইয়াছিল। নিকটেই চন্দ্রসরোবর। ইহাতে রাসলীলার সময় চন্দ্র অমৃত বর্ষণ
করিয়াছিলেন। এই পর্যাশ্রমী হইতে দুই মাইল দূরে 'পেঠোগ্রাম'।
শ্রীকৃষ্ণ বসন্তরাসের সময় অন্তর্দান হইয়া শ্রীব্রজসুন্দরীগণকে পরীক্ষা
করিবার জন্য চতুর্ভুজ-মূর্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীরাধার দর্শনে
তাহার চতুর্ভুজ দ্বিভুজে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই স্থান পেঠোগ্রাম বলিয়া
পরিচিত। দেহে শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজ পৈঠে অর্থাৎ প্রবেশ করে, সেই হেতু
গ্রামের নাম 'পৈঠ' হইয়াছে।

আনোর—আনোর গ্রামের পূর্বদিকে গৌরীকুণ্ড। গৌরীপুজার
छলে শ্রীচন্দ্রাবতী এখানে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইতেন। আনোর
অর্থাৎ অন্নকূট গ্রাম (আরো আন)। শ্রীকৃষ্ণের 'আদেশে ব্রজবাসীগণ
শ্রীগিরিরাজের পূজা করিয়াছিলেন এই আনোর গ্রামে এবং শ্রীল মঙ্গলেন্দ্র
পুরী ঐষ্টস্থানে ভূগর্ভ হইতে গোপাল মূর্তি উদ্ধার করিয়া গ্রামের পশ্চিমদিকে
পর্বতের অপরদিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই স্থানকে গোপালপুবা
বা যতিপুবা বলে। আমবা পরিক্রমার মুখে ঐষ্টস্থান দর্শন করিবা। ধানার
গ্রামের দক্ষিণদিকে গোবিন্দ কুণ্ড।

গোবিন্দকুণ্ড—গোবিন্দকুণ্ডে পৌঁছিয়াই আমরা ভক্তিভরে দণ্ডবৎ
করিলাম এবং শ্রদ্ধাপূর্বক কুণ্ডের জল স্পর্শ ও পান করিলাম, ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণচরণে
তাহার অপরাধ হেতু সূরভিকে অগ্রণী করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে উপস্থিত
হন এবং ক্ষমা পাইবার জন্য সর্বতীর্থের জলের দ্বারা কার্ত্তিক মাসের
কৃষ্ণা-ত্রয়োদশীতে এই কুণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক করেন এবং কুণ্ডকে
গোবিন্দনাগে অভিহিত করেন। কুণ্ডের নিকটে শ্রীগোবিন্দের মন্দির ও
শ্রীনাথজীর মন্দির আছে। নিকটেই কুণ্ডতীরে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের
আসন আছে। ঐষ্ট স্থানেই কৃষ্ণ দুগ্ধপান ছলে গোপবালকরূপে শ্রীল
পুরীপাদকে দর্শন দিয়াছিলেন। কুণ্ডতীরে অনেক ভজনানন্দী সাধু আছেন।

পুছরী—পুছরী গ্রামে শ্রীগোবর্দ্ধনের শেষ সীমা। এর পরেই ভবত
রাজের সীমা আরম্ভ। পুছরী শব্দের অর্থ পুচ্ছদেশ। নিকটেই পুছরী বা
লোঠা। লোঠা অর্থে পালোয়ান। কেহ কেহ বলেন ঘুরে চলো। ইনি
নন্দবাবার দাররক্ষক ও ব্রজযুবকগণের অতীত প্রিয়পাত্র ছিলেন। ঐষ্টস্থানে

আমরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণ করি। সর্বক্ষণই পরিভ্রমাকারী ভক্তগণ চপিতেছেন। 'ব্রজনামের' সার্থকতা এখানেই। 'ব্রজ' ধাতু অর্থে চলাফেরা করা। গিরিরাজ পরিভ্রম করিতে করিতে ব্রজবাসীগণ গিরিরাজ মহারাজ, হনুমানজী ও পুষ্কীর লোঠার বন ঘন জয়ধ্বনি দিয়া থাকেন, গিরিরাজ পরিভ্রমায় ব্রজবাসীগণের আনন্দ আর ধরে না। গিরিগোবর্দ্ধন তাঁদের প্রত্যক্ষ দেবতা। এইরূপ সাক্ষাৎ দর্শন না হইলে বর্ণনা পড়িয়া হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। তবে ভক্তের হৃদয়ে সহজেই অঙ্কভূতি আসে।

আমরা পুনরায় যাত্রা শুরু করিলাম। চলার পথে নবলকুণ্ড দর্শন করি। শ্রীকৃষ্ণ নব নব রূপ ধারণ করিয়া লীলা করিতেন। মিকটেই অঙ্গরাকুণ্ড (রাধারানীর নাম অঙ্গরা)। এখানে তমাল ও কদম্ব বৃক্ষের বন-শোভা পরিভ্রমাকারী ভক্তবৃন্দের চিত্তকে আনন্দে অভিভূত করিয়াছিল। বনে বনে বিভিন্ন লীলার স্থান-শ্রামটক সংখ্যাতীত। স্থান। শ্রীল মহারাজজী একটি বৃহৎ তমালবৃক্ষের পাদদেশে বসিয়া কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন দিক বর্ণন করিতে করিতে ভাবে বিভোর হইয়া পরিলেন। উপস্থিত ভক্তবৃন্দও নিজদিগকে হারাইয়া ফেলিলেন। রাসস্থলী হইতে রাধারানীর অঙ্ককান, কৃষ্ণ রাধার জঙ্ঘা বাকুল। সঙ্গীদের কৃষ্ণের বাঁশী প্রার্থনা, রাধা বড়, না বাঁশী বড়; বিপাখা কৃষ্ণের বাঁশী টেনে নিলেন—শ্রীল জীবগোষাঙ্গী মরোত্তম ঠাকুর রঘব পণ্ডিতের পরিভ্রমার ভাব বর্ণন ইত্যাদি। পরিভ্রমাকারী ভক্তগণ নূতন উজ্জমে অগ্রসর হইতেছেন। সুরগীকুণ্ড—এখানে সুরভী নিজে দুগ্ধদ্বারা কৃষ্ণের অভিষেক করিয়াছিলেন। ঐরাবত কুণ্ড—এখানে ঐরাবত স্বর্গ হইতে শুণ্ডদ্বারা আকাশগঙ্গার জল আনয়ন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক করিয়াছিলেন।

গোপালপুরা বা যতিপুরা—এখানে শ্রীনাথজী গোপাল ছিলেন। বর্তমানে নাথদ্বারে আছেন। যতিপুরায়—মথুরেশ ও মদনমোহনের মন্দির। এখানে শ্রীবল্লভের গদী আছে। এই সম্প্রদায়ের ভক্তরা বিপুল উৎসাহের সহিত এখানে অন্নকূট উৎসব করিয়া থাকেন। এখানে গিরিরাজের মুখারবিন্দ আছেন। জুগের দ্বারা গিরিরাজকে প্রতাহ স্নান করা হইয়া থাকে। ভক্তগণও উৎসাহভরে দুগ্ধদান করিলেন। উদ্ধব কুণ্ড—এইস্থানে উদ্ধব কৃষ্ণবিহারী গোপীদের সঙ্গে আলাপন। মানসী গঙ্গাতে উপস্থিতি ও স্নান সমাপন। এইস্থান হইতে পুনরায়—শ্রীরাধাকুণ্ডের উদ্দেশ্যে যাত্রারম্ভ। রাধাকুণ্ড হইতে

এক মাইল দীমার মধ্যে আমরা শ্রীবলবীর সিং বংশলজীর নূতন মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম। পূর্ব হইতে প্রসাদ পাওয়ার এখানে ব্যবস্থা ছিল। প্রথমে কলা, আপেল পাওয়ার পরে প্রচুর পরিমাণে মধ্যাহ্নের প্রসাদ গ্রহণ করা হয়।

আমরা রাধাকুণ্ড হইতে প্রায় একমাইল পশ্চিমে শ্রীবলবীর সিং বংশল মহাশয়ের শ্রীগিরিরাজ ধর্মশালাতে মধ্যাহ্ন প্রসাদ গ্রহণ করিলাম, প্রসাদের আয়োজন শ্রীজ্ঞানবীর সিং বংশল মহাশয়ই করিয়াছেন। চকী-চুমা-লেখ-পেয় নানাবিধ প্রসাদ সেবনে তীর্থযাত্রীরা ক্ষুধার জ্বালা প্রশমিত করিয়া প্রসাদ দাতাকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

বিশ্রামান্তে বৈকাল ৩৩০ মিঃ শ্রীরাধাকুণ্ডের উদ্দেশ্যে সংকীর্তনভূগমনে যাত্রা আরম্ভ করিলাম। শ্রীরাধাকুণ্ডের দীমানার মধ্যে উপস্থিত হইয়া আমরা নিম্নলিখিত স্থান দর্শন করিলাম—পরম পূজাপাদ শ্রীল নারায়ণ মহারাজের আনুগত্য।

শ্রীরাধাকুণ্ড—শ্রীল ভক্তিদ্বন্দ্বান্ত সরস্বতী ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধাকুঞ্জবিহারী মঠ, মানন্দসুখদকুঞ্জ; সূর্যাকুণ্ড—এইস্থানে শ্রীল ভগ্ননাথদাস বাবাজী মহারাজ ভজন করিতেন। বক্রেখর পণ্ডিত-প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাধাকান্ত বিগ্রহ দর্শন। নিত্যানন্দশক্তি জাহ্নবা দেবীর ভজনস্থল। বসুধা-পুত্র শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু জাহ্নবা দেবীর বিভূতি দর্শনে তাঁহার নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন। শ্রীল নারায়ণ মহারাজ এসম্বন্ধে সংক্ষেপে জাহ্নবাদেবীর ত্রৈলোক্যের কথা বর্ণনা করিয়াছেন। জাহ্নবাঘাট—এই স্থানে জাহ্নবা ঠাকুরাণী উপবেশন করিয়াছিলেন। শ্রীল জীব গোস্বামীও বৈঠক। শ্রীল রঘুনাথ দাসগোস্বামীর পুষ্প সমাধি। শ্রীল গোপাল ভট্টগোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ দাসগোস্বামী ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর মূল সমাধি (চিত্তাসমাধি)। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কর্তৃক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লেখনীস্থল। শ্রীল রঘুনাথ দাসগোস্বামীর ভজন-কুটীর—এইস্থানে শ্রীল নারায়ণ মহারাজ শ্রীরঘুনাথ দাসগোস্বামী সম্বন্ধে গুচরহস্য-লীলা ভাবাবেগে ব্যক্ত করিয়া উপস্থিত শ্রোতৃ-মণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করেন।

(ক্রমশঃ)

—শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিব্রষণ

শ্রীশ্রী গুরুগেরাজে জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।



অষ্টৈতু ক্যপ্রতিহতা যগাক্সা সুপ্রসীদতি ।

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরমর ।
অধোক্ষজে অষ্টৈতু কী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ।

অন্য ধর্ম সূচকপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পও সেই শ্রম ।

৩২শ বর্ষ } ২৩ কেশব, সঙ্কর্ষণ, ৪২৪ গোলাক
২৯ অগ্রহায়ণ, সে'মবার, ১৩৮৭ : ঈং ১৫১১২১১২৮০ } ১০ম সংখ্যা

সান্ন্যাসাদং

শ্রী কার্তিকব্রতে বিধিনিবেধাঃ

(শ্রী হরিশক্তিবিনায়ক পঞ্চদশবিনামে)

বিষয় :—

কার্তিকশ্রু ব্রতানীহ তস্মাৎ কুর্ঘ্যাদতন্ত্রিতঃ ।

নিত্যং জাগরণায়ত্তো যামে কাত্রেঃ সমুখিতঃ ।

শুচিভূত্বা প্রবোধাথ স্তোত্রৈর্নী রাজয়েৎ প্রভুন্ম ॥ ১ ॥

নিত্য কার্তিকমাসের ঋাত্রির শেষপ্রহরে জাগরণের নিমিত্ত
গাত্রোখান করিয়া শুচিপূর্বক স্তোত্র-পাঠ-সহকারে প্রভুকে জাগরিত করত
নীরাজন অর্থাৎ আরাত্রিক করিবে ॥ ১ ॥

নিশমা বৈষ্ণবান্ ধর্মান্ বৈষ্ণবৈঃ সহ হৃষিতঃ ।

কৃষ্ণা গীতাদিকং প্রাতর্দেবং নীরাজয়েৎ প্রভুন্ ॥ ২ ॥

বৈষ্ণবধর্ম-সকল শ্রবণ করিয়া বৈষ্ণবগণ-সহ সহর্ষে গীতাাদি করিয়া
প্রাতঃকালে প্রভুকে নীরাজন করিবে ॥ ২ ॥

নিত্যং বৈষ্ণবসঙ্গত্যা সেবেত ভগবৎকথাং ।

সপিষাহনিশং দীপং তিলতৈলেন চার্চয়েৎ ।

বিশেষতশ্চ নৈবেদ্যাহুর্পয়েদাচরেত্তথা ।

প্রণামাংশ্চ যথাশক্ত্যা একস্তোত্রাদিকং ব্রতন্ ॥ ৩ ॥

কার্ত্তিকমাসে নিত্য বৈষ্ণবদিগের সহিত ভগবৎকথা সেবন এবং দিবা-
রাত্র যত বা তিলতৈল দ্বারা প্রদীপ দিয়া অর্চনা করিবে। অন্যান্য
মাস অপেক্ষা কার্ত্তিকমাসে বিশেষ করিয়া নৈবেদ্যাদি অর্পণ ও বিশেষরূপে
প্রণামাদি করিয়া যথাশক্তি একস্তোত্রাদি অর্থাৎ একবারমাত্র ভোজনরূপ
ব্রত ধারণ করিবে ॥ ৩ ॥

দামোদরাষ্টকং নাম স্তোত্রং দামোদরার্চনং ।

নিত্যং দামোদরাক্ষি পাঠেং সত্যব্রতোদিতন্ ॥ ৪ ॥

কার্ত্তিকমাসে দামোদরের অর্চনপূর্বক সত্যব্রত মুনি-কথিত
'দামোদরাষ্টক' নামক স্তোত্র নিত্য পাঠ করিবে, তাহাতেই
দামোদর বশীভূত হইয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

নিষেধঃ—

কার্ত্তিকে তু বিশেষেণ রাজমায়াংশ্চ ভক্ষয়ন্ ।

নিষ্পাবান্ মুনিশাস্ত্রান্ যাবদাহুতনারকী ॥ ৫ ॥

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যে ব্যক্তি বিশেষতঃ কার্ত্তিকমাসে রাজমায়া (বরবটী
কলাই) এবং নিষ্পাব (পিষ্টী) ভোজন করে, সে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত নারকী
হইবে ॥ ৫ ॥

কলিঙ্গানি পটোলানি বৃন্তাকং সন্ধিতানি চ ।

ন ত্যজেৎ কার্ত্তিকে মাসি যাবদাহুতনারকী ॥ ৬ ॥

যে মনুষ্য কার্তিকমাসে কলিঙ্গ (কলমীর শাক), পটোল, বৃদ্ধাক (বাতাকী) এবং সন্ধিত (আসবাদি) যদি পরিত্যাগ না করে, তাহা হইলে সে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত নারকী হইবে ॥ ৬ ॥

তৈলাভ্যঙ্গং তথা শয্যাং পরাম্ভং কাংস্তভোজনং ।

কার্তিকে বর্জয়েদ্যন্তু পরিপূর্ণব্রতী ভবেৎ ॥ ৭ ॥

যে ব্যক্তি কার্তিকমাসে তৈলমর্দন, শয্যা, পরাম্ভ এবং কাংস্তপাত্রে ভোজন বর্জন করেন, তাহার ব্রত পরিপূর্ণ হয় ॥ ৭ ॥

কার্তিকে বর্জয়েতৈলং কার্তিকে বর্জয়েন্মধু ।

কার্তিকে বর্জয়েৎ কাংস্তং কার্তিকে শুক্ল-সন্ধিতম্ ॥

ন মাংস্তং ভক্ষয়েন্মাংসং ন কোর্মং নান্যদেব হি ।

চাণ্ডালঃ স ভবেৎ সুদ্র কার্তিকে মাংসভক্ষণাৎ ॥ ৮ ॥

হে সূন্দরি! কার্তিকমাসে তৈল, মধু, কাংস্ত, শুক্ল (কাপ্তিকাদি পয়ুষিত অল্পদ্রব্য), সন্ধিত (অঃসবাদি মৃগবিশেষ), মৎস্ত, কূর্ম, মাংস এবং অন্য (আমিষতুল্য) দ্রব্য ভোজন করিবে না। যে ব্যক্তি কার্তিকমাসে মাংস ভোজন করে সে চণ্ডাল হয় ॥ ৮ ॥

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনা

লালসাময়ী গীতি

গৌরাঙ্গ 'বলিতে' হ'বে 'পুলক' শরীর ।

হরি হরি বলিতে 'লয়নে' বাবে নীর' ॥

আর কবে 'নিতাই' টাঁদ' করুণা করিবে ।

'সংসার'-'বাসনা' যোর কবে তুচ্ছ হ'বে ॥

বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হ'বে মন ।

কবে হাম্ হেরব 'শ্রীবৃন্দাবন' ॥

'রূপ-রঘুনাথ' বলি' হইব আকৃতি ।

কবে হাম্ বুঝব সে 'মুগল পীরিতি' ॥

রূপ, রঘুনাথ-পদে র'ছ যোর আশ ।

প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তমদাস ॥

প্রার্থনা-রস-বিস্তৃতি :-

বৈধ ও রাগানুগ-ভেদে প্রার্থনা দ্বিবিধ

চতুষষ্টি প্রকার ভক্ত্যন্তরে অন্যতম বিজ্ঞপ্তি বা প্রার্থনা । বৈধ ও রাগানুগ উভয় প্রকার সাধন-ভক্তিতে বিজ্ঞপ্তি আছে । শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনাগুলি রাগানুগ ভক্তেরই বিশেষ উপযোগী । যেখানে শাস্ত্র শাসনভয়ে শ্রবণ-কীর্তনাদি সাধিত হয়, উহাই বৈধ-সাধন । রাধাকৃষ্ণ সেবালভের দ্বারা শ্রবণাদি সাধিত হইলে উহাই রাগানুগ সাধন ।

প্রার্থনা ও বিজ্ঞপ্তির প্রকার-ভেদ—সম্প্রার্থনাত্মিকা

সাধারণতঃ বিজ্ঞপ্তি তিন প্রকার, যথা :—সম্প্রার্থনাময়ী, দৈন্তবোধিকা ও লালসাময়ী । এতদ্ব্যতীত নির্ভ্রাময়ী, মনঃশিকাময়ী বিরহময়ী, উপলক্ষিময়ী প্রভৃতি নানাপ্রকার বিজ্ঞপ্তি হইতে পারে । কৃষ্ণে, ভগবন্তুকে, নিজের মনের প্রতি ও কোথাও বা আশ্রিত জনের প্রতি বিজ্ঞপ্তিসমূহ দেখা যায় । অনুৎপন্ন-ভাববিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সাধারণভাবে প্রার্থনাই সম্প্রার্থনাত্মিকা । অজ্ঞাত-ভাবজনগণের উপযোগী করিয়া লিখিত হওয়ায় প্রার্থনার প্রথম গীতিটি কেহ কেহ সম্প্রার্থনাময়ী মনে করেন, কিন্তু উহা শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের লিপিত লালসাময়ী প্রার্থনা ।

লালসাময়ী বিজ্ঞপ্তি

যেখানে জ্ঞাতভাব ব্যক্তি নিজ প্রতিষ্ঠাভয়ে সৌভাগ্যপূর্ণ প্রকৃত অবস্থা আবরণ করিয়া অজ্ঞাত-ভাবপ্রদর্শন করেন, তথায় এরূপ লালসাময়ী প্রার্থনা সম্প্রার্থনাত্মিকা বলিয়া সাধারণের ভ্রম হইতে পারে । শিকাষ্টক-লিখিত—

“নহনং গলদশ্রদ্ধারয়া বদনং গদগদরুদ্ধয়া গিয়া ।

পুলকৈমিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥” অথবা

“কদাহং যমুনাতীরে নামানি তব কীর্ত্তম্ ।

উদ্বাঙ্গাঃ পুণ্ডরীকাক্ষ রচয়িষ্যামি তাস্তবম্ ॥” প্রভৃতি লালসাময়ী

বিজ্ঞপ্তি এই জাতীয় গীত । শ্রীচরিতামৃত অঙ্ক, বিংশ পরিচ্ছেদে উল্লিখিত,—

“প্রেমের স্ভাব যাহা প্রেমের সন্থক ।

সেই মানে,—কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তি-গন্থ ॥” ২৮,

আমার দুর্দৈব,—নামে নাহি অমুরাগ ।” ১৯,

“প্রেমধন বিনা বার্থ দরিদ্র জীবন ।” ৩৭, এবং মধ্য দ্বিতীয়

৫৫ সংখ্যার “ন প্রেমগন্ধে হস্তি দগাপি মে হরৌ” প্রভৃতি ভাবসমূহ জ্ঞাতভাব নির্দেশ করিতে বিশেষভাবে আলোচ্য ।

বিভিন্ন ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে কীর্তনই সর্বশ্রেষ্ঠ

ভাগবতগণের সঙ্গ-তালিকা, শ্রীমদ্ভাগবত তদঙ্গ-শাস্ত্রসমূহে বিস্তৃতভাবে উল্লিখিত আছে। শ্রীহরিভক্তিবিলাসেও আমরা অনেকগুলি ভক্ত্যঙ্গের কথা দেখিতে পাই। শ্রীপ্রহ্লাদোপাখ্যানে নবধা-ভক্তির কথা ভক্ত-সমাজে সর্বদাই আলোচিত হয়। শ্রীভক্তিরসামুতসিদ্ধি-গ্রন্থে শ্রীমদ্বাহ্যভূ-কথিত চতুষষ্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গ লিখিত আছে। “দামুদঙ্গ, নামকীর্তন, ভাগবত-শ্রবণ। মধুবাণাস, শ্রীমূর্ত্তির প্রদ্বায় সেবন ॥ সকল সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ ভঙ্গ। কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প মঙ্গ ॥” আবার এই পাঁচ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের চারিখকার, কীর্তনমাখা-ভক্তির যোগেই সাধিত হইবার কথা শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব বিশেষভাবে আজ্ঞা করিয়াছেন। কীর্তনীয়ঃ সদা হরি”-শ্লোকে ‘সদা’-শব্দে অগ্ন্য অঙ্গ-সাধনের স্বতন্ত্রতার কালগত ব্যবধান নিরস্ত হইয়াছে। অর্থাৎ কীর্তনযোগেই অগ্ন্য অঙ্গের স্বীকরণ জানিতে হইবে। শিক্ষাক্ষেত্রের আদিতে সংকীর্তনের সর্ব-শ্রেষ্ঠাভিধেয়ত্ব সুস্পষ্টভাবে প্রচারিত হইয়াছে। রাগানুগভক্তগণের একমাত্র আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণনাম-কীর্তন।

শ্রীগৌর-নামই সর্বাত্মে কীর্তনীয় ও

ভজ্ঞামেই রূপ-গুণাদির ক্ষুরণ

কৃষ্ণ ও গৌর অভিন্ন। শ্রীগৌরনাম অগ্রে করিয়া কৃষ্ণনাম গ্রহণ করাই মহাজনের পথ। শ্রীগৌর-পদাশ্রয় ছাড়িয়া কৃষ্ণনাম ভজনের কথা শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ স্বীকার করেন না। শ্রীরূপ-গোষ্ঠামিপাদ বলেন—

“নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায়তে।

কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরভিষে নমঃ ॥”

নাম-ভজনেই প্রয়োজন-সিদ্ধি। নামকীর্তন হইতেই রূপ-গুণ-লীলা স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। সেবার উল্লুপতা হইলেই নাম কীর্তিত হন। নাম কীর্তিত হইলে অপ্রাকৃত রূপ-গুণাদি অলৌকিক বিষয় সমাগমে সাধক-দেহে পুঙ্খক এবং নয়নে অশ্রুধারা বিগলিত হয়। ‘কৃষ্ণচৈতন্য’-নাম সাক্ষাৎ অভিন্ন কৃষ্ণ। কৃষ্ণচৈতন্যের রূপ গৌর অর্থাৎ তিনি গৌরাঙ্গ। তাঁহার গুণ—মহাবদাঙ্গ এবং তাঁহার লীলা—কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান। গৌরনামে রূপ-গুণ-লীলোদয়ে গৌর-নামোচ্চারণকারী অপ্রাকৃত হন, তখন গৌরাভিন্ন-হরিনামে হরির অপ্রাকৃত রূপ, গুণ ও লীলা প্রকাশমান হন। নামে রূপাদি স্ফূর্ত্তি হইলে জীব

অপ্রাকৃত আনন্দে নিজ প্রাকৃত অনুভূতি বৎকালের জন্য বিস্মৃত হইয়া পুলক ও নয়ন-ধারায় আপ্ত হন। নামভজন-ফলে অশ্রু-পুলকাদি অবস্থান্ধাবী।

শ্রীনামবলে কপটাচরণ

নামে অশ্রু-পুলকাদি ভক্তে দৃষ্ট না হইলে তাঁহার অপরাধ আছে জানিতে হইবে—এরূপ জানিয়া অনেক কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ-মানসে নিজ কপট সৌভাগ্য জ্ঞাপন করেন; তজ্জন্যে শ্রীমন্তাগবতের—

“তদশুসারং হৃদয়ং বতেদং, যদগৃহ্মাগৈর্হরিনামধৈয়েঃ।

ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো, নেত্রে জলং গাত্ররুহেযু হর্ষঃ ॥”

উক্ত শ্লোক দ্বারা তাঁহাদিগের আচরণ নিতান্ত গর্হণযোগ্য জানাইয়াছেন। অপরাধযুক্ত কৃষ্ণনামে তাঁহাদের হৃদয় দ্রব না হয়, অথচ নৈসর্গিক পিচ্ছিলতা বা কপটতা-বশে অশ্রু-পুলকাদি প্রদর্শন করিয়া যাহারা জাতভাব প্রকাশ করেন, তাদৃশ হৃদয় বাস্তবিকই লোক-সদৃশ কঠিন। সর্বোত্তম প্রাপ্তপ্রেম ব্যক্তি আপনাতে চীনজ্বানে রাগ সম্বন্ধহীন শেমধন বসিত বলিয়াই প্রচার করেন। মূঢ় প্রতিষ্ঠাশাস্ত্রি দর্শক জাতভাব ব্যক্তিকে কঠিন-হৃদয়, বিচার গ্রাণ, অপ্রাপ্ত ভাব জানিয়া নিজের অমঙ্গল সংগ্ৰহ করেন।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের নিকপট আচরণ-শিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় শ্রীকৃপানুগগণের মধ্যে অত্যাচ্ছ আসন লাভ করিয়াও তাঁহার অহংগতজনের কলাণের জন্য ভাগবিত ভক্তের কীৰ্ত্তনে প্রয়োজন-লাভ-লালসাবিশিষ্ট ভক্তদের উপদেশ দিয়াছেন। অপাকৃত সম্বন্ধ-জ্ঞান-সম্বিত ভক্ত গৌর-কৃষ্ণনাম কীৰ্ত্তনেই অভিধেয় এমন জানিয়া নাম-কীৰ্ত্তন-ফলে আনন্দাশ্রু-পুলকাদি প্রয়োজন লাভ করেন—এইরূপ বস্তু নির্দেশ মঙ্গলাচরণাদিতে করিয়াছেন।

অতন্ত্র লীলাস্মরণ রূপানুগ ভজন নহে—উহা কীৰ্ত্তনাধীন

শ্রীগৌরকৃষ্ণ-নামে শ্রীনামকীৰ্ত্তনকারীর সহক, শ্রীনামকীৰ্ত্তনই অভিধেয়-ভক্তি এবং প্রাপ্ত-কৃষ্ণপ্রেম ব্যক্তির আনন্দাশ্রু-পুলকাদিই প্রয়োজন-লাভ। বলা বাহুল্য (মূল পয়ারে) ‘বলিতে’-শব্দ প্রয়োগদ্বারা নাম-কীৰ্ত্তনই অভিধেয়। রূপ-দর্শন, গুণ-শ্রবণ বা লীলা-স্মরণ নামকীৰ্ত্তন হইতে পৃথক বুদ্ধিতে অভিধেয়-ভক্তি নির্ণয় করা শ্রীপাদের অভিপ্রেত নহে। ‘শ্রীনামই সর্বদা কীৰ্ত্তনীয়’—এই কথা শ্রীগৌরভক্তের নিজ শিক্ষায় জগজ্জীবকে নিরন্তর উপদেশ করিয়াছেন। এতদ্বাতীত অল্প উপদেশ তাঁহার আচরণাশ্রিত-জনের

নাই বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণভগবৎ বিশ্বাস করেন। ‘নাম-কীর্ত্তন ছাড়িয়া স্বতন্ত্র-ভক্ত্যজ্ঞানে লীলা স্মরণ রূপাভুগগণের ভজন-পদ্ধতি নহে। ঐগুলি কীর্ত্তনধীন। শ্রীনামট সেবোন্মুখ সেবকের অপ্ৰাকৃত বদনে কীর্ত্তনীয়। শ্রীরূপ, গুণ, লীলা সেবকের সাধনকালীয় ওষ্ঠের দর্শনীয়, শ্রবণীয় বা গমনীয় নহেন। পরন্তু অপ্ৰাকৃত সেবোন্মুখতায় শ্রীনাম-কীর্ত্তনেই সেবনোপযোগী ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ে শ্রীরূপ-গুণ-লীলাদির স্তুতি হয়। শ্রীমদ্ ভাগবত ২য় স্কন্ধ, ৮ম অধ্যায়, ৪র্থ শ্লোকে লিখিত “শৃংখতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গুণতশ্চ অচেষ্টিতম্” শ্লোকের অর্থে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন—

‘সোহপি স্মরণ-প্রযত্নঃ শ্রবণ-কীর্ত্তনবতো ভক্তস্য নাবশ্যক ইত্যাহ। শৃংখত ইতি স্বপ্রযত্নং বিনাপি ভগবান্ স্বয়মেব হৃদয়ং প্রবিশতীতি। শ্রবণ-কীর্ত্তনধীনমেব স্মরণমিতি জ্ঞাপিতম্।’

শ্রীনিত্যানন্দ তত্ত্বোপলক্ষিতে সংসার-বাসনা-নাশ

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু অতির বলদেব, শ্রীগৌরসুন্দরের বৈতন-প্রকাশ। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুব স্বরূপ মহাবৈকুণ্ঠে সঙ্ঘর্ষণ। সঙ্ঘর্ষণের ঈক্ষণক্রমে কারণ-সমুদ্রে কারণশায়ী, গর্ভ-সমুদ্রে হিরণ্যগর্ভ অন্তর্ধামী পরমাত্মা এবং গৌর-সমুদ্রে শীরোদকশায়ী বাষ্টি-মহাবিশুঃ ভ্রজাণ্ড সৃষ্টি ও রক্ষণ-পালনাদি করিয়া থাকেন। এই ত্রিবিধ বিকৃতত্বের উপলক্ষি হইলে বদ্ধজীব-সমস্ত ‘সংসার’ হইতে বিমুক্ত হন। পুরুষাবতারগণের সহিত মাযার সঙ্ঘর্ষ থাকিলেও তাঁহারা মায়াবীশ। বদ্ধজীব গৌর অবিত্রাবন্ধনে মাযিক সংসারে হরিসেবা বিম্বত হইয়া নিজভোগময় ‘বাসনা’-বিশিষ্ট হন। শ্রীনিত্যানন্দ স্বরূপ-তত্ত্বজ্ঞান হইলে তাঁহার রূপায় জীবেও সংসারে ভোগ-বাসনা থাকে না।

শ্রীনিত্যানন্দের রূপায় বৃন্দাবন-দর্শন

শুদ্ধজীব নিত্যানন্দের সেবাভিযানে বিষয়সমূহ ত্যাগ করিয়া নির্মূল হন। অপ্ৰাকৃত নিত্য-সেবকাভিমান প্রবল হইলে ভোগময় প্রাকৃত রাজ্য তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। তিনি প্রেম-নয়নে অপ্ৰাকৃত ভূমি শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিহারস্থলী দর্শন লাভে যোগা হন। শ্রীনিত্যানন্দের ‘করুণা’ই জীবের অপ্ৰাকৃত দিব্যজ্ঞান লাভের মূল।

নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৫১৬)

আরে আর কৃষ্ণদাস, না করহ ভয়।

বৃন্দাবনে যাহ, তাঁহা সর্বলভা হয় ॥ ৫।১২৫ ॥

জয় জয় নিত্যানন্দ, নিত্যানন্দ-রাম।

যাঁহার কৃপাতে পাইলু বৃন্দাবন-ধাম ॥ ৫।২০০ ॥

যাঁহা হইতে পাইলু রূপ-সনাতন-শ্রয়।

যাঁহা হইতে পাইলু রঘুনাথ-মহাশয় ॥ ৫।২০১-২০২ ॥

প্রভৃতি শ্রীচরিতামৃতোক্ত কবিতা এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য। যাঁহার সাধকরূপে ‘বৃন্দাবন’ দর্শন করিয়া প্রাকৃত বিষয়-সুখান্বেষণ করেন, তাঁহাদের অপ্রাকৃত ভূমি দর্শনের দৌভাগ্য হয় না।

শ্রীকৃপ-রঘুনাথের দাণ্ডেই

শ্রীবৃন্দাবনীয় শ্রীরাধা-কৃষ্ণপ্রেম লাভ

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগৌরপার্বদ ‘শ্রীকৃপ-রঘুনাথ’ দাস গোষামীর আছেন। রাগানুগ ভক্তগণের পরম আরাধ্যবস্তু শ্রীকৃপ-গোষামী এবং রূপানুগ শ্রীযুনাথ দাস গোষামী। ইঁহাটাই গৌর-পদাশ্রিত গৌড়ী-বৈষ্ণবগণের সেবা অপ্রাকৃত বৃন্দাবনের অধিকারী। তাঁহাদের পাদপদ্ম-সেবায় অতোৎসুক হইলে রূপানুগ-চরণোপজীবগণের ‘রাধাকৃষ্ণের প্রেমবিচিত্রতার উপলব্ধি ঘটে।

সাধক ও সিদ্ধ-রূপে সেবা দুই প্রকার

“সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্ত্বি হি।

তদ্ভাব-লিপ্সুনা কার্য্য ব্রজলোকানুসারত ॥ (ভঃ রঃ সিঃ ১।২।১৫১)

শ্রীকৃপ-রঘুনাথ-প্রমুখ ব্রজবাসিগণের আগমনে অন্তর্নিহিত সেবনোপযোগী সিদ্ধদেহে ব্রজভাবলুক রূপানুগগণ রাধা-গোবিন্দের ‘মানস-ভাব-সেবা’ করিয়া থাকেন। আবার শ্রীকৃপ ও শ্রীরতিমঞ্জরীর আনুগত্যে সেবাভিলাষপর হইয়া ব্রজবাসী গৌরপার্বদদ্বয়ের প্রদর্শিত আদর্শ-জীবনে সাধকরূপে অবগ-কীৰ্ত্তনপর হন।

শ্রীকৃপানুগতাই জালসাময়ী ভজন

শ্রীনিত্যানন্দের করুণায় জীব অনর্থ-নিবৃত্তি হইয়া বিষয়মুক্ত হন এবং অপ্রাকৃত ভূমিতে কৃষ্ণাশ্রিত মঞ্জরীদ্বয়ের কৃপালাভ করিয়া ধন্য হন—ইঁহাই শ্রীকৃপানুগগণের জীবিকা। রূপানুগের কৈঙ্কর্য্য বাতীত অন্তরঙ্গ ভক্তের আর কোন লালসা নাই। শ্রীঠাকুর মহাশয়ের “শ্রীকৃপ-মঞ্জরীপদ” প্রভৃতি গীত এই আশার অক্ষুট-বিকাশ।

—শ্রীল প্রভুপাদ

বৈদিক আৰ্য্যধৰ্ম্মের শ্রেষ্ঠতা

বৈদিক আৰ্য্যধৰ্ম্মের সৰ্বকালোপযোগীত্ব

পৃথিবীতে যে-সমস্ত ধৰ্ম্ম প্রচলিত আছে, সে-সমুদয় ধৰ্ম্ম অপেক্ষা বৈদিক আৰ্য্য-ধৰ্ম্ম শ্রেষ্ঠ ও উদার। বৈদিক আৰ্য্য-ধৰ্ম্মের বিশেষ মাধ্যম্য এই যে, ঐ ধৰ্ম্ম সৰ্বপ্রকার অবস্থায় জীবের মঙ্গলবিধান করে। অন্যন্ত্ৰ সমস্ত ধৰ্ম্মই জীবের কোন কোন বিশেষ অবস্থায় উপযোগী; সৰ্বাবস্থায় কাৰ্য্য করিতে পারে না।

ধৰ্ম্মের পঞ্চপ্রকার শ্রেণী-বিভাগ

জগতে যে-সকল ধৰ্ম্ম প্রচলিত আছে, তাহাদিগকে পাঁচভাগে বিভক্ত করা বাইতে পারে; যথা:—

- ১। জীবের-নিত্য সুখোদ্দেশক ধৰ্ম্ম।
- ২। জীবের সুখ-দুঃখ-নাশক ধৰ্ম্ম।
- ৩। জীবের অনিত্য সুখোদ্দেশক ধৰ্ম্ম।
- ৪। জীবের সমষ্টি সুখবৰ্দ্ধক নৈতিক ধৰ্ম্ম।
- ৫। জীবের জড় সামর্থ্য-সম্বৰ্দ্ধক ধৰ্ম্ম।

নিত্যসুখোদ্দেশক ধৰ্ম্মের পরিচয় ও প্রধান কয়েকটির নাম

জীবের নিত্য সুখোদ্দেশক ধৰ্ম্মের অন্য নাম—ভগবদ্ভক্তি। যে-ধৰ্ম্মে জীবকে 'নিত্য' বলিয়া দিদ্ধান্তিত হইয়াছে এবং নিত্যানন্দই জীবের পরম প্রয়োজন বলিয়া পরিজ্ঞাত আছে, সেই ধৰ্ম্মের নাম—ভক্তি। সেই ধৰ্ম্মে ভগবৎ তত্ত্বের নিত্যত্ব, জীবের নিত্যত্ব, জীবের ভগবদাস্ত, জড়ীয় সম্বন্ধের অনিত্যতা, প্রীতি-তত্ত্বের নিত্যতা ইত্যাদি প্রধান প্রধান কয়েকটি বিষয় সৰ্বত্র স্বীকৃত আছে। যে-সকল ধৰ্ম্মে উক্ত মূল বিষয়গুলি স্বীকৃত হইয়াছে, সেই সকল ধৰ্ম্ম জীবের নিত্য-সুখ-উদ্দেশক ধৰ্ম্ম বলিয়া অবশ্য অভিহিত হইবে। যাহারা ধৰ্ম্ম-সকলকে বৈজ্ঞানিক-চক্ষে দৃষ্টি করেন, তাহারা স্বক্লেষ্ট স্বীকার করিবেন যে, খ্রীষ্টধৰ্ম্ম, মুসলমান ধৰ্ম্ম, ব্রাহ্মধৰ্ম্ম প্রভৃতি ধৰ্ম্মসকল জীবের নিত্য-সুখোদ্দেশক। ঐ সকল ধৰ্ম্মে যত প্রকার অবাস্তব ভেদ থাকুক না কেন, উহারা মূলে সমজাতীয়।

সুখ-দুঃখ নাশক ধর্মের পরিচয় ও তালিকা

জীবের সুখ-দুঃখ-নাশক ধর্মটি অনেক আকারে জগতে পরিলক্ষিত হয়। তন্মধ্যে বৌদ্ধধর্ম, পেগিমিসম্ ও কেবল অদ্বৈতবাদ প্রধান। এই মতটি সময়ে সময়ে উদ্ভূত হইয়া জগতের অনেক স্থানে ব্যাপিত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ইহার আকার ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু ফলে ইহাতে চরম সিদ্ধান্ত সর্বত্রই এক। এই সমস্ত মতকে জীবের সুখ-দুঃখ নাশক ধর্ম বলা যায়, যেহেতু ঐ সমস্ত মতে জীবের সন্তাই অমঙ্গলময়। জীবের সন্তানাশই পরম লাভ। সন্তানাশ দুই প্রকারে সিদ্ধান্তিত হয়। এক প্রকার এই যে, বস্তু একমাত্র আছে, তাহা নিতাই নিঃশূন্য ও বিকারশূন্য। জীবের সন্তাসমূহ, বিকার ও ভেদময়, অতএব মিথ্যা ও ক্লেমময়। যে-অবস্থায় ঐ সমস্ত ব্যবহারিক ভেদ চরম অভেদ-তত্ত্বে পর্যাবসিত হয়, সে-অবস্থার নাম—মুক্তি বা নির্বান। নির্বানই একমাত্র ভেদ-জ্ঞানিত সুখ-দুঃখনাশক। সেই নির্বান যে ধর্ম আচরণ করিলে লাভ্য হয়, সেই ধর্মকে জীবের সুখ-দুঃখনাশক ধর্ম বলি। জেনোফেনিস্ ও পারমিনাইডিস্ প্রভৃতি নির্বানবাদী পণ্ডিতগণ ঐ মত গ্রীকদেশে প্রচলিত করেন। মধ্য ইউরোপপ্রদেশে ঐ মত কিছু কিছু ভিন্নাকারে স্পিন্জা, ফিট্টৌ, সেলিং ও হেঙ্গেল প্রভৃতি পণ্ডিতগণ-কর্তৃক প্রচারিত হয়। স্কুপেন-হয়ার ও হার্টমান প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ঐ মতকে একটী ভিন্নাকারে পেগিমিজম্ বলিয়া জগতে প্রচার করেন। অস্মদেশে জৈনমত বৌদ্ধমত এবং কেবল-অদ্বৈতমত ঐ মতের অন্তর্গত। নানক, শিবনারায়ণ, গোরক্ষনাথ, আউলে চাঁদ, জগন্নাথ দাস প্রভৃতি আধুনিক লোকগণ ঐ মতকে উপাসনা-সম্প্রদায় মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়াছেন। যে আকারেই থাকুক, যে-মতে চরম লক্ষ্যরূপ মুক্তিকে অন্বেষণ করে, সে-মতকে আমরা নির্ভয়ে জীবের সুখ-দুঃখ-নাশক ধর্ম বলিয়া উল্লিখ করিতে পারি।

অনিত্য-সুখোদ্দেশক ধর্মই কর্মমার্গ; মুসলমান ও

খ্রীষ্টান ধর্মে ইহা গুণ্ডভাবে প্রবিষ্ট

জীবের অনিত্য-সুখোদ্দেশক ধর্ম অনেক আকারে জগতে লক্ষিত হয়। ইহাকেই কর্মমার্গ বলে। এই মতে কোনস্থলে ঈশ্বর-প্রতিধান আছে, কোন-স্থলে তাহাও নাই। শরীর-গত সুখ, এই শরীর পতন হইলে দিব্য-শরীর-গত বিষয়-সুখ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-সুখই এই মতের তাৎপর্য। দ্রব্যসংঘটন ও

বিশেষ বিশেষ কাৰ্য্যাদাৰা ঐ সুখের লাভ হয়। এই মত অনেক প্রকার নিত্য-সুখোদ্দেশক ধৰ্ম্ম মণোও গোপনে গোপনে প্রবিষ্ট হইয়াছে। মুসলমান-ধৰ্ম্মটী ঐক্যতপ্রহাৰে নিত্য-সুখোদ্দেশক ধৰ্ম্ম বটে, কিন্তু সেই ধৰ্ম্মের স্বৰ্গ-সুখের ইন্দ্রিয়গণত্যা বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্টে প্রতীত হইবে যে, অনিত্য-সুখোদ্দেশক ধৰ্ম্ম তন্মধ্যে গুপ্তভাবে প্রবিষ্ট হইয়াছে। খ্রীষ্টান-ধৰ্ম্মে অনিত্য-সুখোদ্দেশক ধৰ্ম্মের তত প্রাবল্য নাই, কিন্তু ঐ ধৰ্ম্ম যে তাহাতে কিছুমাত্র নাষ্ট—একুপ বলা যায় না। পুনরুত্থান ব্যাপারটী ভাল করিয়া বিচার করিলে আমাদের সন্দেহটী দূততর হইয়া পড়ে। গার্ডেন অব ইডেন সম্বন্ধীয় ভাবদকলও ঐ সন্দেহকে পুষ্টি করে।

সমষ্টি-সুখবর্দ্ধক নৈতিক-ধৰ্ম্ম সৰ্ব্বাবস্থায়

অনিত্য সুখোদ্দেশক

জীবের সমষ্টি-সুখবর্দ্ধক নৈতিক-ধৰ্ম্ম জড়ীয় বিজ্ঞানকে অবলম্বন করত অনেক পণ্ডিতগণের প্রিয় হইয়াছে। জড়বাদ, স্থিরবাদ, সমাজবাদ প্রভৃতি সমস্ত নাস্তিক ধৰ্ম্ম সমষ্টি-সুখবর্দ্ধক নৈতিক ধৰ্ম্মের অন্তর্গত। সমষ্টি-সুখবর্দ্ধক নৈতিক-ধৰ্ম্ম যে পূৰ্ব্বোক্ত তিনটী ধৰ্ম্মে থাকিতে পারে না, তাহা নয়। যে-সময়ে সমষ্টি-সুখবাদ পূৰ্ব্বোক্ত ধৰ্ম্ম হইতে স্বাধীন হইয়া মানববৃন্দকে আহ্বান করে, তখনই উহা হয় জড়বাদ বা স্থিরবাদ অথবা সমাজবাদ হইয়া পড়ে। জীবের অনিত্য-সুখোদ্দেশক ধৰ্ম্মকে সকল অবস্থাতেই এই সমষ্টি-সুখবর্দ্ধক-ধৰ্ম্ম স্বীকার করিয়া থাকে। উহাদিগকে পৃথক্ করিবার হেতু এই যে, জীবের অনিত্য-সুখোদ্দেশক ধৰ্ম্ম কোন কোন অবস্থায় সমষ্টি-সুখজনক ধৰ্ম্ম হয় না, কিন্তু সমষ্টি-সুখবাদ সকল অবস্থাতেই অনিত্য-সুখোদ্দেশক হইবে। কৰ্ম্মকাণ্ডটী অনেক অংশে সমষ্টি-সুখবাদ মতে পরিগণিত। সমষ্টি-সুখবাদ মতে আত্মার নিত্যত্ব নাই, যে-আত্মা যে-কাৰ্য্য করেন, তাহার ফল সমষ্টি জীব লাভ করে। কেহ বলেন যে, শক্তিই এই সমস্ত ফলের চালক। কেহ বলেন, অদৃষ্টই ঐ ফল প্রদান করে। কেহ বা বলেন,—‘অপূৰ্ণ’ নামক তত্ত্বই ঐ ফল জীবকে ভোগ করান।

জড়-সামৰ্থ্য সম্বন্ধক ধৰ্ম্ম জড়-শরীর লিঙ্গ-শরীর বা

জ্যোতিৰ্ম্ময় শরীরের শক্তিবৃদ্ধিকেই লক্ষ্য করে

জীবের জড় সামৰ্থ্য-সম্বন্ধক ধৰ্ম্ম নানাদেশে নানাপ্রকারে লক্ষিত হয়। কোন দেশে কেবল এই জড় শরীরের বৈজ্ঞানিক সামৰ্থ্য বৃদ্ধি করার পরামৰ্শ

দেখা যায়। কোন দেশে বা কোন মতে,—এই জড় শরীরের অতীত কোন লিঙ্গশরীর বা জ্যোতির্ময় শরীরের গুপ্ত সামর্থ্য প্রকাশ করার বিশেষ উপদেশ দেখা যায়। দেশ বিদেশে যত প্রকার তান্ত্রিক, যাজ্ঞিক, মূদ্রাঘটিত ও ধর্ম-প্রথা প্রচলিত আছে, সে-সমুদায় এই মতের অন্তর্গত। বডঙ্গ যোগ, অষ্টাঙ্গ যোগ, বৌদ্ধ যোগ, থিয়সফি—এ সমুদায়ই এই মতের অন্তর্গত। থিয়সফি যদিও জীবের সুখ-দুঃখ-নাশক ধর্মের সহিত অনেকটা সম্বন্ধ রাখে, তথাপি ইহার নিজভূমি এই জড়-সামর্থ্যবোধক ধর্মের অন্তর্গত।

বৈদিক আর্য্যধর্ম্মই পূর্ণ ধর্ম্ম

একটু গাঢ়রূপে বিচার করিয়া দেখিলে স্বীকার করিতে হইবে, যতপ্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছে এবং হটতে পারে, সে-সমুদায়ই এই পঞ্চপ্রকার ধর্ম্মের অন্তর্গত। আরও স্বীকার করিতে হটবে যে, একাল পর্য্যন্ত যতপ্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছে, সে সমুদায়ই হয় উক্ত পাঁচটির মধ্যে একটি, নয় অন্যটিকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত। বৈদিক আর্য্যধর্ম্ম ব্যতীত কোন ধর্ম্মই উক্ত পঞ্চপ্রকার ধর্ম্মের অবস্থিতি ও সামঞ্জস্য দেখা যায় না। বরং তন্মধ্যে একটিকেই ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে এবং অন্য সমস্ত ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করা হইয়াছে। এমত অবস্থায় কোন ধর্ম্মই জীবের সকল অবস্থায় মঙ্গল বিধান করে না। অতএব দৈহিক আর্য্যধর্ম্ম ব্যতীত অল্প কোন ধর্ম্মই পূর্ণ ধর্ম্ম নয়।

একমাত্র বৈদিক আর্য্যধর্ম্মই অধিকারোন্নতির ক্রমোপদেশ

বৈদিক আর্য্যধর্ম্মে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চপ্রকার ধর্ম্মেরই যথাযোগ্য উপদেশ ও সামঞ্জস্য আছে। জীব যে অবস্থাতেই থাকুন, বৈদিক আর্য্যধর্ম্মে সেই অবস্থায় যাহাতে নিষ্ঠার প্রয়োজন, তাহাতে নিষ্ঠার ও অবিকার উপস্থিত হইলে সেই নিষ্ঠার পরিত্যাগের যথাযোগ্য বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। বৈদিক আর্য্যধর্ম্মে যে জীবের বার্থ্য্য মঙ্গল হয়, ইহাতে সন্দেহ কি? জীবের নিতান্ত জড়বন্ধাবস্থা হইতে বিশুদ্ধ চিন্ময় অবস্থা প্রাপ্তি পর্য্যন্ত অনেক সোপান লক্ষিত হয়। সোপান দিয়া উচ্চ চূড়া প্রাপ্ত হইতে গেলে ক্রম অবলম্বন না করিলে কিছুতেই কার্য্যসিদ্ধি হয় না। অত্যান্ত ধর্ম্মে কোন একটা সোপানকে দেখাইয়া দেয়, কিন্তু তন্মিস্ত সোপান অতিক্রম কিরূপে করা যাইবে, তাহার কোন পন্থা বলে না। তাহাতে ফল এই হয় যে, ধর্ম্ম একটা স্বতন্ত্র জপ্য

বস্তু হইয়া পড়ে। কোনক্রমেই জীবনস্বরূপপ্রাপ্ত হয় না। ধৰ্ম্ম যতক্ষণ ধার্ম্মিকের জীবন না হয়, ততক্ষণ তাহা একটী আগন্তুক অতিথির ন্যায় গৃহে অবস্থিতি করে। তাহাতে জীবের কি মঙ্গল হইবে? জড়বাদী জড়বাদীই থাকে, কন্মী কন্মীই থাকে, জ্ঞানবাদী জ্ঞানবাদীই থাকে; উচ্চাধিকার লাভ করে না। বৈদিক আৰ্য্যধৰ্ম্মে ঐ সমস্ত মত স্থানে স্থানে উপদিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু যথাধিকার কার্য্য করিবার জন্য ভূয়ো ভূয়ঃ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। বৈদিক আৰ্য্যধৰ্ম্ম অবশ্যস্বন করিয়া বাহার পরম প্রেম পর্য্যন্ত উচ্চগতি অতি নীচ না হয়, সে ব্যক্তি অত্যন্ত দুৰ্ভাগা। বৈদিক-ধৰ্ম্মের বাহ্য্য এই যে, তাহাতে অনেকরই মঙ্গল সম্ভব, কিন্তু অসংখ্য ধৰ্ম্মে মঙ্গল কদাচ ঘটে। যেহেতু সেই সেই ধৰ্ম্মে অবস্থা-বিশেষে ধৰ্ম্মই জীবের উন্নতির বাধক হইয়া পড়ে।

বৈদিক আৰ্য্যধৰ্ম্মে সমস্ত প্রকার ধৰ্ম্মই ক্রোড়ীভূত,

তদ্বিশেষে শাস্ত্র-প্রমাণ

বৈদিক আৰ্য্য-ধৰ্ম্মে যে পূৰ্ব্বোক্ত পঞ্চপ্রকার ধৰ্ম্মের যথাস্থানে বিচার ও উপদেশ আছে, তাহা স্পষ্ট বুঝাইবার জন্য নিম্নলিখিত বেদবচনগুলি উদ্ধৃত করা গেল। এখানে বিশেষ বিচার হইতে পারে না।

জীবের নিত্য-সুখোদ্দেশক ধৰ্ম্ম সম্বন্ধে শ্রুতিবাক্য; যথা,—

তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দ-রূপমমৃতং যদ্বিভাতি।

অন্যার্থঃ—আনন্দরূপ ও অমৃত-স্বরূপ পরমতত্ত্ব বাহ্য নিত্যরূপে প্রকাশিত আছে, তাহা ধীরসকল বিজ্ঞান দ্বারা দর্শন করেন।

জীবের সুখ-দুঃখ-নাশক ধৰ্ম্ম সম্বন্ধে শ্রুতিবাক্য; যথাঃ (তেজবিন্দুপনিষৎ)

ন ভয়ং সুখ-দুঃখঞ্চ তথা মানাপমানয়োঃ।

এতদ্ভাব-বিনির্মুক্তাং তদ্গ্রাহং ব্রহ্মতৎপরম্ ॥

তথা চ ভাগবতে, তৃতীয়ে ২৫ অধ্যায়ে :—

যোগ আধ্যাত্মিকঃ পুংসাং মতো নিঃশ্রেয়সায় মে।

অত্যান্তোপরতির্থ্য দুঃখস্ত চ সুখস্ত চ ॥

জীবের অনিত্য-সুখোদ্দেশক ধৰ্ম্ম সম্বন্ধে শ্রুতি; যথা :—

“স্বর্গকামঃ অশ্বমেধং যজ্ঞেত।” “যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহয়াৎ।”

অনিত্য-স্বর্গ-সুখকামী পুরুষগণ অশ্বমেধাদি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করুক।

জীবের সমষ্টি সুখবর্দ্ধক নৈতিক ধর্ম সম্বন্ধে একরূপ উক্ত হইয়াছে, যথা :—

“তদেতৎ সত্যং মন্ত্ৰেষু কৰ্ম্মাণি কবয়ো যান্যপশ্যন্তানি ত্রেতায়াং বহুধা সংজ্ঞানি । তান্য্যচরণে নিয়তং সত্যকামা এষ বঃ পন্থাঃ স্বকৃতস্ত লোকে ।”

ত্রেতাযুগে ঋষিগণ দেখিয়াছিলেন যে, বেদবিহিত কৰ্ম্ম সাঙ্গরূপে অনুষ্ঠিত হইলে অবশ্য ফলদায়ক হয় । সেই সকল কৰ্ম্ম আচরিত হইলে তোমাদের সমষ্টিমঙ্গল হইবে । সেই সকল তোমাদের একমাত্র পন্থা ।

জীবের জড়-সামর্থ্য-সম্বর্দ্ধক ধর্ম সম্বন্ধে একরূপ কথিত হইয়াছে :—

কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় অমৃতবিন্দুগণিষদি, যথা—অনেন বিধিনা সমাঙ্ নিতান-ভ্যস্ততঃ ক্রমাৎ । স্বয়মুৎপত্ততে জ্ঞানং ত্রিভির্মাসৈর্ন সংশয়ঃ ॥ পূর্বোক্ত যোগ-বিধিক্রমে তিনমাস অভ্যাস করিলে সমস্ত জড় বিজ্ঞান উপস্থিত হয় ।

এ সমুদায় বিচার করিলে প্রতীত হইবে যে, জগতে যত প্রকার নাস্তিক বা আস্তিক ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রচারিত হইয়াছে, সে-সমুদায়ই বিজ্ঞান-সহকারে বৈদিক আর্ধ্যধর্মের বিচারিত হইয়াছে । অধিকার ভেদে সকল লোকের জন্যই আবশ্যকীয় ধর্মের ব্যবস্থা দেখা যায় । অতএব, বৈদিক আর্ধ্যধর্মই জীবের একমাত্র মঙ্গলজনক ধর্ম ।

বৈদিক আর্ধ্যধর্মের নাম হিন্দুধর্ম । আজকাল লোকেরা অজ্ঞানবশতঃ একরূপ উদার ধর্মের নিন্দা করিয়া থাকে । আমাদের প্রার্থনা এই যে, কোন ব্যক্তি-বিশেষ বিবেচনা না করিয়া যেন কোন ধর্মের নিন্দা না করেন ।

—জগদগুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীগুরু-কৃপা

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচয়িতা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীকৃষ্ণ শিক্ষায় লিখিয়াছেন—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কেনি ভাগ্যবান্ জীব ।

গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ ।

(চৈঃ চঃ মঃ ১৯১০)

তাৎপর্য্য এই যে জীবসকল জুষ্টিফলে নানা যোনিতে ভ্রমণ করিতেছে এবং নব নব কৰ্ম্ম-বাসনার উদয়ে তাহার সংসার ক্রমে বর্দ্ধিত হইতেছে। যে কোনরূপে অজ্ঞানক্রমেও এমনকি পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্ব জন্মেও যদি বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবা হইয়া যায়, তবে সেই প্রকার কৰ্ম্মফলে জুষ্টিফলে সঞ্চয় হয় এবং ঐ সঞ্চিত জুষ্টিফলের উদয়ে গুরুকৃপা লাভ ঘটে। সাধারণতঃ জীবের বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবা-প্রবৃত্তির উদয় হয় না। ভোগোন্মত্ত জীবের স্বভাব এই যে তাহার নখর বস্তুর সেবা করিবে, অস্থান্তিলাষী, কৰ্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতির সেবা করিবে, বিষ্ণু-বৈষ্ণব সেবা করিবার অভিলাষ তাহাদের হইবে না।

গৃহমেধী জীবের কনক কামিনী প্রতিষ্ঠাই একমাত্র কাম্য। বাহারা ঐ সকল ভোগ্য বস্তুর ইচ্ছন যোগ্যইয়া দেয়, তাহাদিগকেই উপদেষ্টা, হিতকামী বা গুরুরূপে বরণ করে এবং তাহার ফলে পরিণামে বাসনাময় সংসারই বৃদ্ধি হয়। পরন্তু যদি কোন জীবের সৌভাগ্যক্রমে ভক্ত্যুদ্ভূত জুষ্টিফলের উদয় হয়, তবে ঐ জুষ্টিফলে তাহার সাধুগুরুর সঙ্গ লাভ হয়। সেই জুষ্টিফলশালী জীবের পরম কল্যাণ বিধানের জন্য নিখিল কল্যানৈকধনি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিজ প্রেষ্ঠজনকে মহাস্তম্ভরূপে এজগতে প্রেরণ করেন। ইহাই কৃষ্ণ-কৃপা। আর শ্রীগুরুদেব জীবগণকে কৃষ্ণসেবারূপ অমুগ্রহ প্রদান করিয়া থাকেন ইহাই গুরুকৃপা। ইহার অপর নাম ভক্তিলতা বীজ। ভক্তিলতা-বীজ লাভই যে ভক্তনের পরিপক্ব অবস্থা তাহা নহে, এতদ্ভিন্ন শ্রীমদ্ভাগবত পুনরায় বলিতেছেন—

মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।

অবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন। (চঃ চঃ মঃ ১৯।১৫২)

শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া তাঁচার শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণী শ্রবণ করত তাহার অনুকীর্ত্তনই জল-সেচন কার্য্য। অন্ধাবান্ জীব সঙ্গুগুরুর চরণাশ্রয় করিলে শ্রীগুরুপাদপদ্ম কৃপা করিয়া শিষ্যের যোগ্যতানুসারে বিবিধ সেবাকার্য্যে নিযুক্ত করিখা তাহার সকল ইন্দ্রিয়কে আত্মেন্দ্রিয় তোষণের পরিবর্ত্তে কুক্ষেন্দ্রিয় তর্পণে নিযুক্ত করেন। এই প্রকার সেবাফলে তাহার ক্রমাধয়ে শ্রীগুরুপাদপদ্মে অঙ্কা, রতি ও ভক্তি লাভ হইয়া থাকে। ইহাই ভক্তিলতাভের সহজ ও স্বর্গম পন্থা। কিন্তু গুরুপাদপদ্ম হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া অর্থাৎ গুরুদেবকে বাদ দিয়া কৃষ্ণভক্তনের চলনা, তাহা "ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাওয়ার" ছায় বৃথা পণ্ডশ্রমে পর্য্যবসিত হইবে। সুতরাং একুপ

অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণসেবা লীলাশা সুদূরপরাঙ্কত । শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—“জ্ঞানঃ স্নিগ্ধস্ত শিষ্যস্ত গুরবো গুহ্যমপাত” । শ্রীগুরুদেব স্নিগ্ধ অর্থাৎ বিশুদ্ধ শিষ্যকে বস্তুর পরম গুহ্য উপদেশ করিয়া থাকেন । অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের উপদেশানুসারে অকপট সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে অজ্ঞান্যামী শ্রীগুরুদেব আমাদের চিত্তবুদ্ধি বুদ্ধিয়া শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম প্রদান করিয়া থাকেন ।

নবযোগেন্দ্রের অন্যতম প্রবুদ্ধ ঋষির বাক্যেও দেখিতে পাওয়া যায়—

ভক্ত ভাগবতান্ ধর্মান শিফেদ্ গুর্কীঅ দৈবতঃ ।

অমায়য়ান্নবৃত্তা যৈস্ত্যেদান্নদো হরিঃ । (শ্রীমদ্ভাগবত)

শ্রীগুরুদেবকে একমাত্র হিতকারী বান্ধব এবং পরমারাধ্যতম ষড়্ভৈরবরূপ জানিয়া নিরন্তর নিরুপটে তাঁহার অঙ্গগমনে ভাগবত-ধর্ম্মের শিক্ষা করিতে হইবে । তদ্বারা আত্মা হরি সঙ্কষ্ট হইয়া থাকেন । মোটকথা শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয়পূর্ব্বক নিরুপটে গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া পালন করাই কর্তব্য । কিন্তু অনেক সময় ভোগোন্মত্ত চিত্ত মানা প্রকার পরামর্শ দিয়া আমাদের শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের মনোহর্ভাষ্ট প্রকারে বাধা প্রদান করিয়া অজ্ঞ বিষয়ীর সেবা করিতে প্রবুদ্ধ করায় । তখন আমরা নিজ বিচারে শ্রীগুরুদেবের কৃষ্ণপ্রীতি-উদ্দেশক কঠোর আদেশ-বাণী স্নানুহেব বাছাই করিয়া লইয়া বলি—“ইচ্ছা আমি পালন করিতে পারিব না, আমার প্রতি অবিচার করা হইয়াছে । তিনি আমার যোগ্যতা বুঝিতে পারেন নাই; বুঝিতে পারিলে এরূপ অন্তায় আদেশ করিতেন না ।” এইরূপ বিচার গুরুতে মর্জ্যবুদ্ধি আনয়ন করে, অথবা পরম বিজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মকে অজ্ঞ মনে করাষ্টয়া থাকে । অনেক সময় তিনি বাহ্যিক অজ্ঞের ভান করিলেও অজ্ঞান্যামীপুত্রে তিনি আগার প্রতি-কার্য্যের প্রতি-পদবিক্ষেপের প্রতি দৃষ্টি করিয়া থাকেন—যাহাতে আমি অন্যাভিলাষ ত্যাগ করিয়া নিরুপটে সেবানিমগ্ন থাকিতে পারি তাহার ব্যবস্থা করেন । অতএব বিনা বিচারে গুরুর আদেশ পালন করিতে পারিলেই গুরুকৃপা সুলভ হয় । আর স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিলে অনর্থ বর্দ্ধিত হয় ও ক্রমে সংসার ভোগের পথস্বরূপ নরকের দ্বার প্রস্তুত হয় ।

আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এ বিষয়ের জলন্ত আদর্শ দেখিতে পাই । গুরু কৃষ্ণপ্রেম-ভক্তির মূল অঙ্গুরস্বরূপ শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের দুইজন শিষ্য ছিলেন । একজনের নাম শ্রীঈশ্বরপুরী অপর শিষ্যের নাম শ্রীরামচন্দ্রপুরী ।

শ্রীল দীক্ষরপুরীপাদ 'গুরোরাজ্য হাবিচারনীচা' এই বাক্যের সার্থকতা করিয়া নির্দিষ্টারে নিকপটে নিরন্তর 'বিশ্রুতেন গুরোঃ সেবা' অর্থাৎ প্রীতি ও অমুরাগের সহিত গুরুর সেবা করিতেন, এমন কি স্বহস্তে গুরুদেবের মণ-মুদ্রাদিও মার্জ্জম করিতেন। যথা :—

দীক্ষরপুরী করে শ্রীপাদ সেবন।

স্বহস্তে করেন মণমুদ্রাদি মার্জ্জম ॥

নিরন্তর কৃষ্ণনাম করয়ে অরণ্য।

কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণলীলা শুনায় অক্ষুণ্ণ ॥

তুষ্ট হঞা পুরী তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন।

বর দিলা,—‘কৃষ্ণে তোমার হউক প্রেমধন’ ॥

সেই হতে দীক্ষরপুরী ‘প্রেমের সাগর’।

(টৈ: চ: অ: ৮, ২৬, ২৯)

আর শ্রীরামচন্দ্রপুরী গুরুদেবে অবজ্ঞা ও নিজে স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করার ফলে চিত্তবৃত্তি নিয়গামী হইয়া সর্ক বৈষ্ণবের নিন্দা এমন কি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরহরির নিন্দা ও পরিশেষে গুরুদেব শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীর অগ্রকটকাণে উহার নিকট আগমন করিয়া তাঁহারও মর্যাদা ভজ্ঞন করেন—

পূর্বে যবে মাধবেন্দ্রপুরী করেন অভ্যর্থন।

রামচন্দ্রপুরী তবে আইলা তাঁর স্থান ॥

পুরী-গাসাঞি করে কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ণন।

‘মথুরা না পাইছ’ বলি’ করেন ক্রন্দন ॥

রামচন্দ্রপুরী তবে উপদেশে তাঁরে।

শিষ্য হঞা গুরুকে কহে, ভয় নাহি করে ॥

“তুমি—পূর্ণ ব্রহ্মানন্দ করহ অরণ্য।

ভ্রঙ্কবিৎ হঞা কেনে করহ রোদন?”

শুন মাধবেন্দ্র-মনে ক্রোধ উপজিল;

‘দূর, দূর, পাপী বলি’ ভৎসনা করিল ॥

কৃষ্ণ-কৃপা না পাইছ না পাইছ ‘মথুরা’।

আপন ছুখে গরোঁ এই দিতে আইল জালা ॥

(টৈ: চ: অ: ৮, ১৬, ২১)

পাৰ্শ্বনা

হরি হরি কো কহুঁ ইহ দুঃখ ওর।

সংসার দাবানলে দহ দহ অন্তর,

ধস ধস জিউ করু মোর ॥

মদন কদনে দিবা-নিশি হাম গোয়ায়লুঁ,

কভু নাহি মিটত আশ।

ঘড়ি ঘড়ি বৈঠত ঘড়ি উত্তরত,

নব নব মুরতি প্রকাশ ॥

চঞ্চল চিত্ত অতি মতি রতি মায়াময়,

দিনে দিনে করত উদাস।

কালবায়ৈ দেহ-তরি—উষাও সো ধাওত,

অব মঝু নিচয় বিনাশ ॥

পাওয়লুঁ সুহৃদহ—জনন চুড়ামণি,

অবতনে রতন সমান।

আহার-বিহারে সোই পশু হেন বিতায়লুঁ,

ধিক মঝু মানব জ্ঞান ॥

ভুবন ভবনে ভব—ভ্রমণে সতয়চিত্ত,

সোঁউরিয়া অভয় চরণ।

অব শুন মাধব—নিদান বচন মম,

তঁহি হাম লইলুঁ শরণ ॥

পতিত পামরবর হামে সব ছোড়ত,

পতিতপাবন কহুঁ ভোয়।

এ অধম দাস আশ পদপঙ্কজ,—

দয়া নাহি ছোড়বি মোয় ॥

মহারাজ চিত্রকেতু

পূৰ্বকালে ‘চিত্রকেতু’ নামে এক মহা-পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন, তাঁহার মণি-মাণিক্য, রত্নসিংহাসন, দাস-দাসী, প্রস্তর-নির্মিত বিচিত্র অট্টালিকা, অতুল ঐশ্বর্য্য ছিল। কিন্তু এইসব বিপুল ঐশ্বর্য্য থাকা-নভেও রাজার মনে বিন্দুমাত্রও সুখ ছিল না। তাঁহার সাত শত রাণী থাকিলেও রাজা একটী মাত্রও পুত্র সন্তান লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি ভাবিতেন—আমার এই বিপুল ধন, রত্ন, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য লইয়া কি হইবে—কে এসমস্ত ভোগ করিবে? আমি পরলোকগমন করিলে, কে আমাকে শ্রাদ্ধ-শাস্তি, নিগুদান করিবে?—এই চিন্তায় রাজা সৰ্বদাই মগ্ন থাকায় তাঁহার বদন ক্লান্তিময় হইয়া পড়িল। দারুণ চিন্তায় রাজা দিনে-দিনে শীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিলেন।

একদিন রাজা চিত্রকেতু রাজসিংহাসনে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে দেবর্ষি শ্রীনারদ গোস্বামী বোণাযন্ত্রে শ্রীহরিগুণগান করিতে করিতে রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। সহসা ঋষিকে দেখিয়া রাজা শশব্যস্তে রাজসিংহাসন হইতে উঠিয়া স্বহস্তে মুনিবরের পাদ-প্রক্ষালন করিয়া সেই জল মস্তকে ধারণ করিলেন এবং সম্মুখে আসনে বসাইয়া পূজা করিলেন। শ্রীনারদ-ঋষি রাজার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া কুশল জিজ্ঞাসা করায়, রাজা চিত্রকেতু বিষাদ মনে ঋষিকে কহিলেন,—“যে অন্তর্য্যামিন! আমার অন্তরের দুঃখের কথা আপনি সমস্তই অবগত আছেন; একটী পুত্র অভাবে আমার এই বিশাল রাজপুরীতে কিছুতেই শান্তি পাইতেছি না।”

শ্রীনারদ-ঋষি রাজাকে ‘তত্ত্বজ্ঞান’ প্রদান করিতে পারিতেন, কিন্তু পাষাণে বীজ রোপণ করিলে তাহা যেমন অঙ্কুরিত হয় না, তজ্জন রাজাকে রজোগুণোৎকর্ষ বিষয়াসক্তিতে মগ্ন দেখিয়া। এ অবস্থায় তত্ত্বজ্ঞান প্রদানে কোন ফল হইবে না ভাবিয়া, ঋষিবর রাজাকে একটী পুত্র লাভের বর প্রদান করিলেন। তাহাতে রাজার আর আনন্দের সীমা রহিল না। এঁকেই বলে মায়ায় লেশা; গীতায় শ্রীভগবান্ অর্জুনকে বলিয়াছেন,—“দৈবী হেমা গুণময়ী মম মায়া দুবত্যা।” এই সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণময়ী দৈবীমায়া দেবতা-দিগের মোহকারক। ক্লদ জীব গুরু-কৃপা ব্যতীত কখনই এই দুস্তরা মায়ায় হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে না।

মুনিবর রাজাকে বর প্রদান করিয়া চলিয়া গেলে, যথাসময়ে রাজার একটি রূপ-লাবণ্যযুক্ত পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। তখন রাণপুত্রীতে আর আনন্দের সীমা নাই। রাজা সম্যোচিত পুত্রের জাতকর্মাদি করাইয়া দীন, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব সকলকেই প্রচুর পরিমাণে রক্ত-কাঞ্চনাদি দান করিলেন এবং চর্যা, চূড়, লেহু শিষাদি ভক্ষা-দ্রব্য দ্বারা সকলেরই তৃপ্তি বিধান করিলেন। পুত্ররত্ন লাভ করিয়া রাজার আর সুখের অবশিষ্ট রহিল না।

কিন্তু কালচক্র কি ভীষণ! অতি নির্মম!! নিষ্ঠুর!! আজ যে দরিদ্র, কাল সে রাজা। হুসেন সাহ বাদশাহ প্রথম জীবনে দরিদ্র অধিপাল হইয়া পরিশেষে বাঙ্গালার নবাব হইয়াছিলেন। আজ যিনি মহারাজা, কালের কবলে পড়িয়া তিনিও দুঃখী কাদাল হন। রাজা হরিশ্চন্দ্র সর্বদা হারাইয়া পথের ভিখারী হইলেন। শাস্ত্রে এইরূপ দৃষ্টান্ত শত-সহস্র রহিয়াছে। দুরন্ত কাল সে কাহারও মুখের দিকে তাকায় না। অতুল ঐশ্বর্য্য, কোঠাবাড়ী, মর্ম্মর-নির্ম্মিত দ্বিতল-ত্রিতল অট্টালিকা—তাহাও হঠাৎ ভূমিকম্পে নিমেষমধ্যে ধূলিসাৎ হইয়া যায়। সাধের দ্রব্যসকল মুহূর্ত্তমধ্যে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়—ইহাই বিচিত্র কালের গতি।

এই মায়াব সংসারে জীবসকল বিষুয়ায় মোহিত হইয়া—“আমি ভোক্তা, আমি কর্ত্তা, আমি সম্রাট, আমি রাজ্যপাল, আমার বাড়ী, আমার বাগান, আমার অমি, আমার ধন-বস্তু”—এইরূপ সমস্তই ‘আমি ও আমার’ মনে করিয়া পরিণামে শশ্মানের দৃশ্য দেখিয়া হাহাকার করিয়া থাকে। দর্পহারী ভগবান্ জীবের এই অনিত্য ধন-জনের মোহ—ইন্দ্রজালের ন্যায় দেখাইয়া হরণ করিয়া থাকেন। “যস্তাহমনুগ্ৰহামি চরিত্তে তদ্ধনং শনৈঃ।” শ্রীভগবান্ বলিলেন,—বাহাকে আমি অনুগ্রহ করি, এই মায়াব অনিত্য দুর্দিনের সম্পত্তির মোহ ঘুচাইয়া তাহাকে আমার নিত্য চিৎস্বর্ষ্য প্রদান করিয়া থাকি।

মহারাজ চিত্তকেতু পুত্র-সন্তান লাভ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু যে রানীর সন্তান হইয়াছে, রাজা তাহাকে অত্যধিক ভালবাসেন দেখিয়া অন্যান্য রানীগণ (সতীনীগণ) বিদ্রোহ পোষণ করিতে লাগিলেন। একদিন রানীগণ মত্তণা করিয়া দাসীকে দিয়া সন্তানের দুগ্ধপান করিবার হুঁহু বিষ মিশ্রিত করিয়া রাখিলেন। রাজপুত্র দুগ্ধ পান করত দোলায় তুলিয়া ঘুমাইতেছে দেখিয়া তাহার মাতা কার্য্যাগরে গমন করিলেন। নির্দিষ্ট সময়

অতিক্রান্ত হইলেও রাজপুত্রকে গভীরভাবে নিদ্রিত দেখিয়া রাজমাতা শঙ্কান্বিত হইয়া দাসীকে আজ্ঞা করিলেন—“পুত্রকে ঘুম হইতে জাগাইয়া ফ্রোড়ে করিয়া আমার নিকট লইয়া আইস।” ছকুম শুনিবামাত্র দাসী খোকার দোলায় নিকট যাইয়া চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—“রাণী-ম সর্বনাশ হইয়াছে, খোকা আর ঘুম হইতে উঠিবে না—সে চির-নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছে; তাহার মুখ, শরীর নীলবর্ণ হইয়াছে, সে আর এজতে নাই। রাণী-মা ‘বিনা মেবে বজ্রাঘাতের’ ন্যায় এই নিদারুণ দৃশ্য দেখিয়া মুচ্ছিতা হইয়া পড়িলেন; অন্তান্য রাণীরা সকলেই কণ্ট ফ্রন্দন আরম্ভ করিল। প্রহরী রাজসভায় যাইয়া রাজাকে অন্তঃপুর-মধ্যে এই শোকাবহ সংবাদ প্রদান করিলে তিনি নিদারুণ সংবাদে মর্ম্মাহত হইয়া রাজসিংহাসন হইতে ভূমিতে পড়িয়া অচৈতন্ত হইয়া পড়িলেন।

অন্তর্যামী শ্রীনারদঋষি এই মর্ম্মস্তদ ঘটনা জানিতে পারিয়া রাজার এই গলট-সময়ে তাঁহাকে দর্শন দান করিলেন। রাজা চেতনা পাইয়া ঋষিকে সমাদর করত স্নানমুখে কহিতে লাগিলেন, হে মুনিবর! আপনার কৃপায় বর লাভ করিয়া একটা পুত্র পাইলাম বটে, কিন্তু পরিণামে এ কি হইল? হায়! হায়!! আমি কি পাপ করিয়াছি যে, তাহার জন্য এই দারুণ পুত্রশোক ভোগ করিতে হইল?

মুনিবর রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে রাজন্! আমি পূর্বেই তোমাকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিতাম, কিন্তু তোমার অনিত্য বস্তুতে অত্যাশক্ত দেখিয়া পুত্র-বর দিয়াছিলাম; এখন এ সমস্ত দেখিয়া শুনিয়াও কি জ্ঞানের উদয় হয় নাই?—নির্বেদ আসে নাই? কালের কি ভীষণ ক্ষুণ্ণ! কৰ্ম্মসূত্ররূপ কাল ঐ দেখ তোমার পুত্রকে হরণ করিয়া লইল। সন্তানবৎসলা জননী স্নেহবশতঃ শোকাকুলা হইয়া রোদন করিতেছে। কতশত জ্বীলোক স্বামীহারা হইয়া উঠে:স্বরে বিলাপ করে। কত স্বামী বিপত্তীক হইয়া শিশু, পুত্র-কন্যা লইয়া অসহ্য জ্বালায় বিব্রত হইয়া পড়িতেছে। কতশত কবি, কত মনীষী, কত সুসন্তান, কত সিদ্ধ-যোগী-মহাত্মা জন্মভূমির ফ্রোড় হইতে বিচ্যুত হইতেছেন, তাহার সংখ্যা কে করে?—কেহ অনলে, কেহ সলিলে, কেহ ব্রাহ্মগুখে, কেহ সর্পগুখে, কেহ জ্বরে, কেহ রোগে, কেহ শোকে—ঐ কালাগ্নিসদৃশ চিতায় ভস্মীভূত হইয়াছে ও হইতেছে। হে রাজন্, এই অনিত্য ক্ষণভঙ্গুর সংসারে কিছুই চিরস্থায়ী নয়। ‘স বৈ ভূমা সুখম্’।

ভূমাই স্থখ, নিত্য বস্তুতেই স্থখ, অনিত্য বস্তুতে স্থখের অভাব—তুঃখই বর্তমান। এই তত্ত্বজ্ঞান যমরাজ শঙ্কশীল ব্রহ্মচারী নচিকেতাকে প্রদান করিয়াছিলেন।

ঠাকুর শ্রীল শুক্লবিনোদ গাহিয়াছেন—

ধনে যদি প্রাণ দিত, ধনী রাজা না মরিত, ধরামর চইত রাবণ।

ধনে যদি রাখে দেহ, দেহ গেলে নহে কেহ, অতএব কি করিবে ধন ॥

রাবণের একলক্ষ পুত্র ও সপ্তাশলক্ষ নাতি একজনও বংশে বাতি দিতে রহিল না। সোণার লজ্জা ভনুমান পোড়াইয়া ছারখার করিয়া দিলেন। এই অনিত্য ধন-জনের পরিণামই এই। মৃত্যুকালে এ অনিত্য ধন, জন্ম, সম্পদ কেহই জীবকে রক্ষা করিতে পারে না। এখন তোমার মনে নির্ভেদেব উদয় হইয়াছে। আইস রাজা, আমি তোমাকে পারকব্রহ্ম নামে দীক্ষা-মন্ত্র প্রদান করি; সেই অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণনামের বা শ্রীহরিনামের—পরমতত্ত্বের উপদেশ করি। এই বলিয়া মহাবি নারদ পরমভাগবত রাজা চিত্রকেতুকে মতামন্ত্র উপদেশ করিয়া তাঁহাকে এই জ্বরস্ত ভবসাগর হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

(পূর্বপ্রকাশিত ৩২শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৩৩৪ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীমদ্রাজপুত্র অপ্রকটের পর শ্রীব্রজনাথ দাসগোস্বামী আদিট গ্রামে (রাধাকুণ্ড) আসেন এবং তথায় বাস করিয়া ভজন করিতেন। এক সময়ে শ্রীল দাসগোস্বামীর মনে 'শ্রীকৃষ্ণের প্রকট-লীলার' কথা আবির্ভূত হইল এবং অর্ণের চিন্তা করিয়া নিজেকে দ্বিকার দিলেন। ভ্রূনক ধনাঢ্য ব্যক্তি শ্রীভ্রূন'রায়ণ দর্শনে গমন করিয়াছিলেন এবং ব্রজীনারায়ণকে উক্ত ধনাঢ্য ব্যক্তি একখলি মুদ্রা ভেট দিয়াছিলেন। শ্রীব্রজীনারায়ণ ঐ টাকা বন্ধে যাঁইয়া শ্রীব্রজনাথ দাসগোস্বামীকে দিব্যর জন্ম সপ্নাদেশ করেন। সেই আদেশে শেষ্ঠশ্রী শ্রীল দাসগোস্বামীর নিকট আসেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত বলেন। কৃষ্ণদেবের খনন-কার্য্যে স্থানীয় বৃজসমূহ শ্রীদাসগোস্বামীকে প্রায় স্বপ্নাদেশ করিতেন এবং তদনুসারে খনন করিয়া

দেখা গেল যে, শ্রীশ্যামকুণ্ড বামপদ-চিহ্নের আকার ধারণ করিয়াছে এবং তাহার মধ্যে আর একটি ছোট কুণ্ড (বজ্রকুণ্ড) আছে এবং শ্রীরাধাকুণ্ড চতুষ্কোণ হইয়াছে। ১৫৪৫ হইতে ১৫৫৪ সাল পর্য্যন্ত কুণ্ডরয় খোদাই হইয়াছিল। কথাপ্রসঙ্গে গোস্বামীবর্গের বহুলীলাকথা শ্রীল মহারাজজী পরিবেশন করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি সনাতন গোস্বামী ও রূপ গোস্বামীর দু'একটি কথা বর্ণনা করিতে গিয়া জানান,—শ্রীল রূপগোস্বামী শ্রীরাধারানীর বেণীর রূপ বর্ণনে “ব্যালাঙ্গনাকণা” বর্ণন করাতে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর মনঃকষ্ট হইয়াছিল। শ্রীরাধারানীর অপরূপ বেণীর সঙ্গে সাপের তুলনা। একদা শ্রীগোবিন্দ-বাটে শ্রীল সনাতন গোস্বামী স্নান করিবার সময় শ্রীরাধা-কৃষ্ণের বুলনশীলা দর্শন করিলেন এবং শ্রীরূপ গোস্বামীকৃত “চাটু পুষ্পাঞ্জলীতে” শ্রীরাধারানীর বেণীর যে ‘ব্যালাঙ্গনাকণা’ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন তাহার সাক্ষাৎ অমুভব করিয়াছিলেন। শ্রীল নারায়ণ মহারাজের শ্রীমুখে বাহারা এইসব বর্ণনা শ্রবণ করিয়াছেন তাহারা সকলে যেন বিস্ফারিত মস্তকে রূপমাধুরী সাক্ষাৎ দর্শন করিতেছেন। সেই লীলা-মুহূর্ত্তে এক অপূৰ্ণ মধুরিমায় শ্রীল রঘুনাথ দাসগোস্বামীর ভজন-কুটীর প্রাঙ্গণে হরিশ্বনিভে মুখরিত হইয়া উঠিল। নিকটে পঞ্চপাণ্ডব ঘাট—এইখানে ৬টি বৃক্ষ পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী বলিয়া শ্রীল দাসগোস্বামীকে সঙ্গে পরিচয় দিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ অধিকান্তর বধ করিলে শ্রীরাধারানী হাস্য করিয়া বলিয়াছিলেন, “তোমার পাপ হইয়াছে, সৰ্ব্বতীর্থে স্নান না করিলে ঐ পাপ যাইবে না।” তাহাতে কৃষ্ণ বামপদ-দ্বারা আঘাত করায় সৰ্ব্বতীর্থে আবিস্কৃত হইয়া তাহার স্তব করেন। এইরূপ দর্শনে রাধারানী ও তাহার অগণিত সখীগণ সহ শ্রীরাধাকুণ্ড খনন করেন। শ্যামকুণ্ডের পশ্চিমে রাধাকুণ্ড এবং দুই কুণ্ডের সংযোগ রহিয়াছে। সংযোগ স্থলে রত্নবেদী ও তমালবৃক্ষ রহিয়াছে।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজন-কুটীর। শ্রীল গৌর গোস্বামীর ৬৬ন-কুটীর। ললিতা কুণ্ড, ললিতাবিহারী; গোপকুঁড়া—শ্রীদাসগোস্বামীর বাবহারের জন্ত তৈয়ারী হইয়াছিল। কিন্তু তাহা হইতে গিরিরাজ শিলা বাহির হওয়ায় দাসগোস্বামিপাদ ঐ কুঁড়ার জল সাধারণ কার্যে ব্যবহার করেন নাই। নাথবেন্দ্রপুত্রীর বসিবার স্থান। অষ্টমখী, তমালতলা,—শ্রীমদ্ব্যাপ্ত এইখানে বসিয়া তিলক করিয়াছিলেন ও শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্যাম-

কুণ্ডের স্থান নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। বল্লভাচার্য্যের ঠৈঠক মদনমোহন-জীউ, গোপীনাথজীউ হনুমানজী : শ্রীগোবিন্দ মন্দির—এখানে শ্রীগিরি-গোবর্দ্ধনের জিহ্বাকুপী শিলা আছে।

শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডের চারিদিকে বহু দর্শনীয় স্থান মন্দির ও গোস্বামীবর্গের ভজন কুটীর আছে। কার্তিক তৃতীয়ার্থীতে শ্রীকুণ্ডদ্বয় প্রকট হইয়াছিলেন। সেইজন্য এই দিবস রাত্রি দ্বিপ্রহরে চন্দ্রোদয়ে শ্রীকুণ্ডস্নানার্থ বহু যাত্রী দেশ-বিদেশ হইতে আগমন করিয়া থাকেন।

উক্ত কুণ্ডদ্বয়ের কয়েকটি ঘাটের উল্লেখ করা হইতেছে—

শ্রীজাহ্নবা ঘাট—এইস্থানে নিত্যানন্দ-শক্তি শ্রীজাহ্নবাদেবী আদিয়া শ্রীদাসগোস্বামীকে দর্শন দিয়াছিলেন (১৫৮২ সালে), এখানে শ্রীগোপীনাথ-জীউ, শ্রীরাধারানী ও জাহ্নবাঠাকুরাণীর ত্রিবিগ্রহ সেবিত হইয়া থাকেন। শ্রীগোবিন্দঘাট, মানসপাবন ঘাট—ইহা শ্রীরাধারানীর অতি প্রিয়। পঞ্চ-পাণ্ডব ঘাট, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর ভজন কুটীরের পার্শ্বে যে ছোকরাবৃক্ষ আছে তাহা কালীবাসী ব্রাহ্মণ বলিয়া এই বৃক্ষ শ্রীবিষ্ণুনাথ চক্রবর্তীপাদকে বলিয়াছিলেন। শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর অপ্রকটের পর শ্রীচক্রবর্তীপাদ তাঁহার তান্ত্র ভজন কুটীরে বাস করিতেন এবং শ্রীদাসগোস্বামীর গিরিধারী ও গোকুলানন্দ বিগ্রহের সেবা করিতেন। শ্রীরাধাবল্লভ ঘাট, শ্রীজীব গোস্বামীর ঘাট,—ইহার নিকট শ্রীজীব গোস্বামীর ভজন কুটীর, গয়াঘাট—শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর বসিবার স্থান ; তমালঘাট—শ্রীমহাপ্রভুর উপবেশন স্থান। বল্লভাচার্য্য ঘাট ; সঙ্গমঘাট—এইস্থানে যুগলকুণ্ডে স্নান করিতে হয়। ঘাটের উপরে যে তমালবৃক্ষ আছে তাহা অগস্ত্যমুনি বলিয়া খ্যাত। শ্রীকুলন বটের ঘাট—এইস্থানে মহা-সমারে'হে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বুলনলীলা গ্রামবাসীগণ করিয়া থাকেন।

শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড পরিক্রমা করিয়া আগরা মন্দির ৬টা নাগাদ শ্রীগোবর্দ্ধনে প্রত্যাবর্তনের পথে নিম্নলিখিত স্থান দর্শন করিলাম। শ্রীরাধাকুণ্ডের একমাইল পূর্বদিকে কদম্ব কাননের মধ্যে নাগমোহন কুণ্ড। এই কাননে রাধারানীকে উপবিষ্টা দেখিয়া শঙ্কচূড় মত্তস্ত হইয়া পলায়ন করিবার সময় শাখীগ্রামে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক নিহত হয়। দূর হইতে কুণ্ডের উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ জানাইলাম। সেইসঙ্গে সূর্য্যকুণ্ড যেখানে শ্রীরাধারানী প্রতি দন সূর্য্যপূজা করিতেন এবং মালিহারী কুণ্ড—যে কুণ্ডতীরে বসিয়া রাধারানী

শ্রীকৃষ্ণের জন্ত মুক্তাহার রচনা করিয়াছিলেন—তাদের উদ্দেশ্যে তীর্থযাত্রীরা দণ্ডবৎ জ্ঞাপন করিয়া ধীরে ধীরে কুসুম সরোবরে উপস্থিত হইলেন।

শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে দেড়মাইল দক্ষিণে কুসুম সরোবর—শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনস্থল ও কুসুমচন্দন-লীলা এস্থলে হইয়াছিল। স্থানটী অপরূপ বনশোভায়-মণ্ডিত ও আনন্দ উৎসাহের স্থান। এই সরোবরের উপরে পশ্চিমদিকে শ্রীবল্লভদেবের মন্দির আছে এবং উত্তর-পশ্চিম কোণে শ্রীউদ্ধবকুণ্ড আছে। এইস্থলে উদ্ধব মহারাজ দ্বারকা মঠস্থানের নিকট শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ-লীলা কোর্তন করিয়াছিলেন। ভরতপুরের রাজা কুসুমসরোবরের প্রস্তর সোপান মণ্ডিত করেন।

শ্রীনারদকুণ্ড—এখানে নারদঋষি বৃন্দাদেবীর উপদেশে তপস্বী করিয়াছিলেন এবং ৮ লিটা বিশাখা দেবীর কৃপাচ তিনি রাধারাগীর দর্শন লাভ করেন। নিকটেই মুখরাই গ্রাম—শ্রীরাধারাগীর মাতামহী মুখরার নামানুসারে মুখরাই নাম হইয়াছে। ইহা রাধাকুণ্ডের একমাইল দক্ষিণে অবস্থিত। চলার পথে পুনরায় দানঘাটকে প্রণাম জানাইয়া আমরা যোবর্দ্ধনে শ্রীগোবিন্দ ধর্মশালায় প্রত্যাবর্তন করিলাম।

কাম্যাবন—শ্রীগিরিজাজ গোবর্দ্ধনকে এবং রাধাকুণ্ড ও কাম্যকুণ্ডের উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ জ্ঞাপন করিয়া আমরা পরদিবস বাসযোগে কাম্যাবনে যাত্রা করিয়া সকাল ৯টায় পৌঁছিলাম। এখানে শ্রীল নারায়ণ মহারাজের আনুগত্যে পদযাত্রা আরম্ভ হইল। শ্রীল মহারাজজী সর্বত্রই উপস্থিত তীর্থযাত্রীর উদ্দেশ্যে বলিলেন, আমরা শুধু চলছি অর্থাৎ ব্রজধাতুর অর্থ চলাফেরা করা। ব্রজবাসীর আনুগত্যে আমরাও ব্রজের গোপগোপীগণ যেরূপ ক্রয়ের লীলা স্মরণ করিয়া ব্রজের একস্থান হইতে অন্যস্থানে ধান্যমান ছিলেন তজ্জন ব্রজের পথে পথে চলিতেছি। যদি কোন ভাগ্যফলে গোপগোপীকৃষ্ণের পদবক্ষে অভিষিক্ত হইয়া এই মানব-জীবনকে সার্থক করিতে পারি।

কাম্যাবন ভরতপুর রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত ছিল। এখন সেই রাজ্যও নাই—সেই বনও নাই। দিল্লীর বাদশাহ আওরঙ্গজেবের হাত হইতে বক্ষা করিবার জন্য শ্রীবৃন্দাবনের প্রধান প্রধান বিগ্রহগণকে গোপনপথে বৃন্দাবন হইতে জয়পুরে লইয়া যাত্রার সময় (১৬৭০ সালে) কাম্যাবনে আনিয়া শ্রীবৃন্দাদেবী স্বপ্নাদেশ দিলেন যে, তিনি ব্রজমণ্ডল ত্যাগ করিয়া

যাটবেন না। সেই হইতে তিনি কাম্যাবনে শ্রীগৌবিন্দ মন্দিরে অবস্থান করিতেছেন। শ্রীমদনমোহন ও গোপীনাথ জীউর প্রতিভূ-বিগ্রহগণও কাম্যাবনে অবস্থান করিতেছেন। মূল বিগ্রহগণ বর্তমানে জঙ্গপুরে বিরাজিত আছেন। শ্রীমদনমোহনজীউ করৌলাতে সেবিত হইয়া আসিতেছেন।

আমরা ক্রীল মহারাজের আনুগত্যে নিম্নলিখিত স্থানগুলি দর্শন করিলাম। ব্যোমাসুরের গোফা পর্বতোপরি আছে। আমরা দূর হইতে ডহা দর্শন করিলাম। শ্রীকৃষ্ণ এখানে ব্যোমাসুরকে বধ করেন। চরণ-পাহাড়ি—এখানে পর্বতের উপর শ্রীকৃষ্ণের চরণ-চিহ্ন আছে। ভক্তগণ কষ্ট স্বাকার করিয়া পর্বতে আরোহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন দর্শন করিলেন। নামিবার পথে পিচ্ছিল পাহাড়ে গা হেলান দিয়া কাতপয় তীর্থযাত্রী নিজ-দিগকে পিচ্ছিল-দ্বারা উপভোগ করেন। খুউচ চরণ-পাহাড়ের শোভা অতি রমণীয়। এখানে হইতে বহু কুণ্ডের দর্শন লাভ হয়। কাম্যাবনে চৌরাশী কুণ্ড আছে। নিকটে লুকলুশি কুণ্ড—এখানে কৃষ্ণ সখাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতেন। বিমলাকুণ্ড—বিমলাকুণ্ডে অনেক যাত্রী স্নান করিলেন, এই কুণ্ডের তীরে অনেক মন্দির আছে। বিমলাদেবী, দাউজী গঙ্গাজী, রাধাকৃষ্ণ, জগন্নাথ, গোপালজীউ মদনগোপাল প্রভৃতি। কুণ্ডের তীরে বানরের উৎপাত বেশী।

ভোজন খালি—এখানে শ্রীকৃষ্ণ সখাগণ সহ দধিভাত ভোজন করিয়া-ছিলেন, পাত্রের কিছু কিছু চিহ্ন ভক্তগণ শ্রদ্ধাভরে দর্শন করিলেন। দ্বাপর যুগের ঘটনা। সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে শ্রবেস্ত্রিয়ের মাধ্যমে দর্শন করিলেই সত্যিকারের দর্শন লাভ হয়। চৌরাশীকুণ্ডের মাথা সংক্ষেপে কয়েকটি কুণ্ডের নাম করিতেছি যদিও আমাদের কুণ্ড দর্শন সম্ভব হয় নাই। সময় সংক্ষেপ বলিয়াই দ্রুতগতিতে আমাদের যাত্রাপথ শেষ করিতে হইতেছে। কাম্যাবনে কমপক্ষে ২দিন অবস্থান করিয়া পরিক্রমা করিলে কিছু কিছু দর্শনের স্বেযোগ মিলে। কাম্যাবন হইতেছে মনোহর স্থান। শ্রীকৃষ্ণ বংশীবাদনের দ্বারা সখাদের আহ্বান করিতেন—সুবল, শ্রীদাম, মধুমঙ্গল প্রভৃতিকে। বংশীধ্বনিতে পাহাড় দ্রবীভূত হইয়া যাটত। সেঠেকত পাহাড়ে চরণ চিহ্নের দর্শন লাভ সম্ভব হইয়াছে। ব্রহ্মবিমোচন-শীলা এই কাম্যাবনেই হইয়াছিল। কাম্যাবনে কামেশ্বর মহাদেব অবস্থান করিতেছেন। সেতুবন্ধকুণ্ড ও কামেশ্বর মহাদেব আছেন। ঘোষরাণী কুণ্ডদ্বীপ-শ্রীযশোদার

পিতা স্মৃথ ও মাতা পাটলীর বাড়ী। পাটলীর ভ্রাতা গোলগোপ
জটিলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। অভিমন্যু তাহার পুত্র ও কুটীল কন্যা।

মণিকুণ্ডতীর—শ্রীহৰিশ্চন্দ্র মহারাজ এখানে তপস্তা করিয়াছিলেন।
দ্বারকা-কুণ্ডতীরে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা মহিষীদের সহিত ত্রজে আসিয়া শিবির
করিয়াছিলেন। বলভদ্রকুণ্ডতীর—শ্রীবলরাম ব্রজবাদীগণকে দ্বারকা হইতে
আসিয়া প্রবোধ দিয়াছিলেন। রাজা কামসেনের কাছারী—এই গৃহে
ছোরাশীটী থাখা আছে। আরো অনেক কুণ্ড আছে যেমন—নারদ, পাণ্ডব,
মলিকনিকা, প্রয়াগ, পুষ্কর, গয়া, ললিতা, বিশাখা, গোপী, গন্ধর্ব্ব, সার্বভৌম,
গায়ত্রী, ব্রজকুণ্ড প্রভৃতি। কাম্যবনে পঞ্চপাণ্ডব অবস্থান করিয়াছিলেন।
দু্যোধনের প্রার্থনায় দুর্কাসা মূনি ১০ হাজার শিষ্যসহ পাণ্ডবদের আতিথি
হইয়াছিলেন।

কাম্যবন দর্শন শেষ করিয়া আমরা বাসযোগে নন্দগ্রাম বা নন্দগাঁ
পৌঁছিলাম। এখানে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ভজন-কুটীরের সংলগ্ন
নন্দগাঁ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আমরা অবস্থান করিলাম। প্রপূজ্যচরণ
শ্রীল বনমহারাজের প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়। এখানকার বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ
আমাদের আগমনে অত্যন্ত উল্লসিত হইয়া তীর্থযাত্রীদের জন্ত বিদ্যালয়ের
ঘরগুলি বসবাসের জন্য ছাড়িয়া দিলেন এবং তিনদিনের জন্ত জুলা ছুটি দিয়া
দিলেন। শ্রীল নারায়ণ মহারাজও পরম প্রীতিভরে প্রধান অধ্যক্ষকে
এবং বিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদিগকে অভিনন্দন জানাইলেন।

নন্দগ্রাম—ঐকালবেলা আমরা কীর্তন-সহযোগে শ্রীল নারায়ণ
মহারাজের আনুগত্যে পৰ্ব্বতোপরি নন্দভবনে পৌঁছিলাম। সন্ধ্যায়ে নন্দীশ্বর
মহাদেবের পরিক্রমা করিয়া তাঁহার কৃপাপ্রার্থনা করত আমরা শ্রীমন্দির
পরিক্রমা করিলাম, শ্রীমন্দির-অভ্যন্তরের মধ্যস্থলে দুইভ্রাতা কৃষ্ণবলরাম এবং
দুইপার্শ্বে নন্দবাবা ও মা যশোদা বিরাজমান। শ্রীবিগ্রহগণের অপূর্ণ সৌন্দর্য্য
দর্শকের চিত্তকে অভিভূত করে। মন্দিরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া চতুর্দিকে যতদূর
দৃষ্টি যায় শীলাঙ্গুলীগুলির ও রমণীয় বনশোভার অপূর্ণ সৌন্দর্য্য ভক্তচিত্তে
যে কিভাবে তরঙ্গ সৃষ্টি করে তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। দূর
দূরান্তরের গ্রামগুলিকে যেন চিত্রপটে আঁকিয়া রাখিয়াছে। নন্দগ্রামের
প্রাকৃতিক শোভা অতীব মনোরম। পৰ্ব্বতের উপরেই মন্দির ও গ্রাম।

মূল মন্দিরের চতুর্পার্শ্বে অন্যান্য দেবদেবীর এবং রাজা সুসেন ও তাঁর স্ত্রীর বিগ্রহ রহিয়াছেন। ক্রীচৈতন্যমহাপ্রভু যখন নন্দীখরে আসিয়াছিলেন তখন গোফা খুলিয়া এক শিশু কৃষ্ণমূর্তি দর্শন করিয়াছিলেন। আজ আমরা নিম্নলিখিত স্থান দর্শন করিলাম। দধিমহন-শীলাঙ্গন, যশোদাকুণ্ড—শ্রী যশোদা মাতা শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকে লইয়া এই কুণ্ডে স্নান করিতে আসিতেন এবং শ্রীকৃষ্ণ কোন ভূষ্টাশি না করেন, সেইজন্য 'হাউ' আসিবে বলিয়া ভয় দেখাইতেন। নিকটেই "হাউ" মূর্তি অর্থাৎ বাঘ, ভল্লুক প্রভৃতিঃ ন্যায় কিছু মূর্তি দর্শন করিলাম। গোষ্ঠ—নবলক্ষ দেহু লইয়া কৃষ্ণ-বলরাম সখাঃ, ৭২, হ বনে বনে চড়াইয়া বেড়াইতেন। পাণিহারী কুণ্ড—এই কুণ্ডের জল মা যশোদা কৃষ্ণের পানের জন্য লইয়া যাইতেন। এই কুণ্ডের পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ-চরণচিহ্ন আছে ও গাভীর চরণচিহ্ন আছে। এষ্টজন্য এষ্ট স্থানকে 'চরণ পাছাড়ি' বলে। তীর্থযাত্রিগণ খুব উৎসাহ ও উদ্দীপনার সহিত স্থানগুলি দর্শন করিয়া বিজ্ঞানপূর্ণে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

মহাবিজ্ঞানালের উত্তরে সংলগ্ন পাবন সরোবর। বিশাল সরোবর, ইহা বিশাখা সখীর পিতা পালন গোপ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এই সরোবরের দক্ষিণতীরে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ভজন কুটীর। বর্তমানে সাম্প্রতিক গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কয়েকজন ভজননিষ্ঠ বাবাজী মহারাজ এই ভজন-কুটীরে অধিষ্ঠান করিতেছেন।

শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ভজন কুটীর সম্বন্ধে একটি আখ্যায়িকা আছে। এখানে একসময়ে বনমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে কাতর হইয়া শ্রীল গোস্বামিপাদ তিন দিন উপবাসী ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকরূপে তাঁহাকে ভুক্ত দিবার জন্য আসিয়াছিলেন। ভুক্তপান করিয়া শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ অত্যন্ত পরিতাপ করিতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ স্বপ্নে তাঁহাকে দর্শন দিয়া সান্ত্বনা দিয়াছিলেন। ইহার পরে ব্রজবাসীগণ সরোবর-তীরে তাঁহার ভজনকুটীর তৈয়ার করিয়া দেন। কথিত আছে শ্রীমন্দিরে যে শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম শ্রীবিগ্রহ আছেন, তাহা শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত করেন।

পরদিবস আমরা পদব্রজে নন্দগাঁ হইতে সঙ্কীর্্তন সংযোগে পরিক্রমা আরম্ভ করিলাম। পথে দর্শনীয় স্থান—প্রথমেই আমরা সম্মুখে বিহারীর দর্শন পাইলাম; রুদ্দাদেবী, পৌর্ণমাসী (যোগমায়া), বুল্লা, সিংহাসন, শ্রীসঙ্কতদেবীর দর্শনলাভ। সাক্ষত করিয়া সখীগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন

করাইয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্য মঠপ্রভুর উপবেশন স্থান ও শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামিপাদের ভক্তকুঠীর আছে। সঙ্ক্বেতের দক্ষিণে প্রেম-সরোবর দূর হইতে আমরা দৃষ্টব্য প্রাপ্তি জানাইলাম। বর্তমানে প্রেম-সরোবরে জলশূন্য অবস্থা—ইহা রাধাকৃষ্ণের প্রেমবৈচিত্র্যের লীলাস্থলী। ভাদ্র শুক্লা দ্বাদশীতে এখানে মহাসমারোহে লীলাভিনয় হয়। শ্রীল মহারাজজী দূর হইতেই আমাদের স্থান নির্দেশ করিয়া মাহাত্ম্য বর্ণনা করিলেন। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীবাধারানীর সখীর গ্রাম বর্ণন করেন—শ্রীবাধারানীর জন্মস্থান বাঙেল গ্রাম, বাহা পূর্বেই দর্শন হইয়াছে। লালিত্যর জন্মস্থান বর্ধানের পূর্বদিকে করেশা, কেহ কেহ লুধোলী গ্রামও বলেন। বিশাখার জন্মস্থান কামাই, মতান্তরে উচুর্গা ও চিত্রাদেবীর জন্মস্থান চিক্শোলি, মতান্তরে জাঁজনকা। চম্পকলতার জন্মস্থান—সনেরা, মতান্তরে চিক্শোলী। রঙ্গদেবী ও সুরদেবীর জন্মস্থান বজেরা, মতান্তরে কামাই ও রাকোলী। তুঙ্গবিহার জন্মস্থান জভারো। ইন্দুরেখার জন্মস্থান—জাঁজনোক, মতান্তরে লুধোলি। শ্রীচন্দ্রাবলীর জন্মস্থান খিঠোরী। (ক্রমশঃ)

—শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

সমজ্ঞান বা সমদর্শন

ভ্রম, প্রমাণ, বিশ্লিষ্টা, করণাণাটব—এই চতুষ্টয় দোষে দৃষ্ট হওয়ায় বদ্ধজীবের পক্ষে সমজ্ঞান বা সমদর্শন কখনও সম্ভবপর নহে; কিন্তু বর্তমানে সমজ্ঞানরূপ বিকৃত সাম্যবাদ সমাজের প্রতিপত্তিতে প্রবেশ করিয়াছে। শ্রেণীভীন সমাজবাদ, সাম্যবাদ প্রভৃতি বহুবিধ পরিকল্পনা মনুষ্য-সমাজের কল্যাণকল্পে প্রচাৰিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহা কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণ আনয়ন করিতেছে।

কি সামাজিক জীবনে, কি শিক্ষা বিভাগে, কি রাজনীতিতে সর্বত্রই সমসমানের ফলস্বরূপে উচ্ছৃঙ্খলতার হাতের নৃত্য চলিতেছে। সবাই সমান, সুতরাং সকলবর্গের প্রাপ্য যথোচিত সম্মান প্রদর্শনের প্রয়োজন নাই। সপ্ত ঐক্য বা সম্মানগণের প্রতি অবজ্ঞা অসহ্যরূপ মনোভাব আজ সর্বত্রই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। গুপী-নিগুপী, ধনী-দরিদ্র, ছাত্র-শিক্ষক যেন

সবাই সমান—তারতম্যমূলক সম্মান বা আদরের প্রয়োজন নাই, এইরূপ বিচারধারা প্রায় সর্বত্রই পরিদৃশ্য হইতেছে।

ধর্মক্ষেত্রে বা পারমার্থিক-ক্ষেত্রেও সমজ্ঞানরূপ সর্বধর্ম সমান, সর্বধর্ম-সমন্বয় ইত্যাদি গৌড়ামিল দৃষ্টমতবাদ প্রবেশ করিয়া একটী বিষময় ফল আনয়ন করিয়াছে। ভারতের আর্য্য-ঋষিগণ ত্রিকালজ্ঞ, সত্যদ্রষ্টা ছিলেন, নিরপেক্ষ শাস্ত্রাদির বিচার দ্বারা তাহারা দিব্যদৃষ্টি প্রভাবে অজ্ঞানমন করিয়াছেন—শাস্ত্রাদিতে এইরূপ সমতা বা একতার বিচারের বিকল্পে বহু কথাই বলা হইয়াছে। ইহা ছাড়া সাধারণভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে সর্বধর্ম সমান কথাটী নিতান্ত অবাস্তব। যেমন চোরের ধর্ম ও সাধুর ধর্ম কোনদিন এক হইতে পারে না। সৎ-অসৎ, মঙ্গল-অমঙ্গল, মুক্তি-মিছরী প্রভৃতি সব এক—এই বিচার কি ঠিক হইবে? ভাল-মন্দের বিচার সবসময় আছে এবং থাকিবে; সুতরাং সকলধর্ম সমান বা সর্বধর্ম সমন্বয় ইত্যাদি কথাগুলি আপাতত মুখরোচক হইলেও উহা নিতান্ত অধৌক্তিক এবং অলীক ও তাহা বদ্ধজীবের মগজের কল্পনাপ্রসূত ব্যাপার।

যদিও প্রত্যেক জীবের স্বরূপের ধর্ম এক ও অদ্বিতীয় সনাতন, কিন্তু মায়াবদ্ধাবস্থায় তাহার স্বরূপধর্ম বিকৃতরূপ প্রাপ্তি হইয়া থাকে এই বদ্ধাবস্থায় অনেক প্রকার দেহধর্ম মনোধর্ম প্রকাশ পাইলেও উহা অনিত্য। এইসকল বহু ধর্মকে যদি সর্বধর্ম সমন্বয় বলা হয় তবে তাহা ঠিক হয় না। দেহধর্ম, মনোধর্ম, আত্মধর্ম প্রভৃতি এক নয় বা এদের মধ্যে মিলন হইতে পারে না। সমজাতীয় বস্তুর সহিত সমজাতীয়ের মিলন হইয়া থাকে। কিন্তু তথ্যতিরেক বিকল্পতা স্বাভাবিক। সমন্বয়বাদ কথাটী মায়াবাদেরই রূপান্তর বিশেষ। তাহারা মুখে বলেন, ‘আমরা সব মানি’ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহারা কিছুই মানেন না। স্বরূপের ধর্ম বা আত্মার ধর্ম এবং অনাত্ম ধর্ম কখনও এক হইতে পারে না।”

আধিকার্য্যক দেবদেবীর সহিত পরভক্ত শ্রীকৃষ্ণকে এক মনে করা মারাত্মক অজ্ঞায় ও অপরাধজনক। সমস্ত শাস্ত্রেই শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র পরভক্ত ও সকলের উপাশ্রয় বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়াছেন। ব্রহ্মসংহিতায় বলা হইয়াছে, “ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গৌবিন্দঃ সর্বকারণ-কারণম্।” শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংরূপ ভগবান্, এই কথাই বলা হইয়াছে—“এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ বঃ।” শ্রীকৃষ্ণই

পরমেশ্বর তিনি আদি, তাঁহাকে কেহ সৃষ্টি করেন নাই। পরন্তু তিনি অন্যান্য দেবদেবীগণের স্রষ্টা এবং তাঁহার ইচ্ছামতেই সেইসকল দেবদেবীগণ অধিকার-লব্ধ কার্য্য করিয়া থাকেন। সুতরাং মূল মালিকের সহিত অন্যান্য কর্ম্মচারীগণকে এক মনে করা বা বিচার করা ঠিক নহে।

শাস্ত্রে কথিত রয়েছে—“যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈতঃ সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ধ্রুবম্।” “বিক্ষৌ মর্কেশ্বরো তদিতর সমধীর্ষাস্ত বা নারকী সঃ ॥” (পদ্মপুরাণ) মহাজনের বাক্যে আরও বলা হইয়াছে “অন্তদেব সম বিক্ষুকে যে মানে, সে বড় অজ্ঞানমতি দীপ্তরতন্তু নাই জানে।” আধিকারীক দেবদেবীগণ শ্রীভগবানের কিস্কর-কিস্করী বা বহিরদাশক্তি— বিরূপবৈভব।

যিনি যে ভাবে যে কোন দেবদেবীর ভজনা করুন না কেন তাহা শ্রীকৃষ্ণ-ভজন হইতে পৃথক নহে, এইরূপ বিচার অত্যন্ত বিরোধী ও নারকী-পূর্ণ। এই মনোধর্ম্ম জাগতিক লোকের নিকট আদৃত হইলেও দারগ্রাহীত্বের সুপ্রতিষ্ঠিত মহাজনবর্গের নিকট তাহা কুসিদ্ধান্তপূর্ণ বলিয়া অনাদৃত হইয়া থাকে। বেদাদি শাস্ত্রে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগমার্গের কথা বলা আছে, কিন্তু চরমে ভক্তিমার্গের দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তি প্রাপ্তির কথা নির্দেশিত হইয়াছে। জ্ঞান, যোগ, কর্ম্ম “কৃষ্ণভক্তি বিনা দিতে নারে ফল” ভক্তির পথ সহস্র সরল এবং ভগবানও ভক্তবাৎসল্য বলিয়া প্রসিদ্ধ—জ্ঞান, যোগ, কর্ম্ম বাৎসল্য নহেন, যথা শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—ন সাধয়তি মাং যোগো ন মাংখ্য ধর্ম্ম উদ্ধব। ন স্বাধ্যায় স্তপ ত্যাগে যথা ভক্তিমমোর্জিতা ॥” ভগবান্ সম হইয়াও ভক্তি-মধ্যস্থে স্বাপ্রিত বাৎসল্য ও বৈষম্যযুক্ত তথা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

যে যেরূপ কর্ম্ম করিবে তাহার ফল তদ্রূপ হইয়া থাকে, যাহারা অন্যান্য দেবদেবীগণের নানা কামনাবাসনায়ুক্ত হইয়া ভজনা করিয়া থাকেন, আর কামনাবাসনা শূন্য নিকিঞ্চন শুদ্ধ ভগবন্তের ফল কি একই লাভ হইবে? ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ প্রভৃতির ফল ও অহৈতুকী কৃষ্ণভক্তি ফলের মধ্যে জাকাশ-পাতাল প্রভেদ বর্ত্তমান। গীতায় বলা আছে,—“শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া অন্যান্য দেবদেবীর উপাসনা বাহারা করেন তাহারা আমাকেই উপাসনা করিয়া থাকেন, কারণ আমিই সর্ব্ববস্তুর ভোক্তা।” কিন্তু অন্যান্য দেবদেবীগণকে স্বতন্ত্র দীপ্তরক্তানে উপাসনার ফলে কুষোপাসনার নিত্যফল

না পাইয়া দেহোপাসনার অনিত্য ফল পাইয়া থাকেন। অথচ সেইসকল কামা অনিত্য ফলও দেবদেবীগণ যথেষ্টভাবে দিতে পারেন না; অস্বর্ধ্যামৌ-
হুত্র ভগবান্ কর্তৃক তাহা বিহিত হইয়া থাকে। দেবগণ আধিকারিক
অর্থ ও মূলতঃ তাহার। কর্তৃচাৰী। উদ্দেশ্য বখন ভিন্ন, ফলও নিশ্চয় ভিন্ন
হইবে। গীতায় বলিয়াছেন,— “দেবান্ দেবযজো যান্তি মন্তুজা যান্তি মামপি।”
তুগা, গণেশ, শিবের উপাসনার ফল ও লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার
ফল নিশ্চয় এক নহে। মূল মালিকের পূজা ও তাহার কিঙ্কর-কিঙ্করীর
পূজার ফল এক হইতে পারে না। সুতরাং সর্বধর্ম সমন্বয় বা সবধর্ম
সমানরূপে বক্তব্য নিতান্ত অযৌক্তিক। কুরুভাক্ষ রহিত তথাকথিত
সামাজিকগণ সমাজের হিতচিন্তার পরিবর্তে নির্বিশেষ সমন্বয়বাদ প্রবর্তনের
দ্বারা জগজ্জগৎল সৃষ্টি করিয়াছেন।

স্বরূপধর্মী সুপ্রতিষ্ঠিত মুক্ত পুরুষগণের ন্যস্ত সমদর্শন সম্ভব হইয়া থাকে।
তাঁহাদের দর্শন অশুদ্ধ দর্শন নহে, তাঁহারা প্রত্যেক জীবের মধ্যে ভগবানের
অধিষ্ঠান জানিয়া তাঁহাদের যথাযোগ্য সন্মান করিয়া থাকেন। “ঈশ্বর
সর্বভূতানাং হৃদ্যেশেহর্জুং তিষ্ঠতি” (গীতা)। শ্রীকৃষ্ণ নহিলে সম্বন্ধিত হইয়া
তাঁহাদের প্রভুর বৈভব সর্বত্রই দর্শন হইতেছে।

“স্বাবর জজ্জম দেখে না দেখে তাঁর মূর্তি।

সর্বত্র সুরেয়ে তাঁর ইষ্টদেবের মূর্তি ॥ (চৈঃ চঃ)

“বিদ্যা-বিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হৃদিনী।

ভুচি চৈব স্থপাকে চ পাণ্ডুতা সমদর্শিনঃ ॥

সর্বভূতৈষু যঃ পশ্যেত্তমাত্তঃসমাত্মনঃ।

ভূতানিভগবত্যাত্মনেষ ভাগবতোত্তম।” (গীতা)

বদ্ধাবস্থায় এইরূপ দর্শন (?) কখনই সমদর্শন হইতে পারে না। কারণ
ভগবানে ভালবাসা না হইলে যথাযথ সমদর্শন হয় না। উজ্জ্বল সাধন উজ্জ্বলের
প্রয়োজন। শ্রীমন্ চৈতন্যমহাপ্রভুর প্রচারিত বিজ্ঞান-সম্মত সাম্যবাদ
পর্যালোচনা করিলে প্রকৃত সাম্যবাদ উপলব্ধি হয়। তাঁহার প্রদর্শিত
বিমল প্রেমধর্ম পথের অহুসন্ধান দ্বারা প্রকৃত মঙ্গল বা বাস্তব সাম্যবাদ তথা
সমদর্শন সম্ভব।

—শ্রীমতী উমারাগী দে

শ্রীব্যাস-পূজা

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরকৈব নরোত্তমম্ ।

দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ।

অদ্বয়জ্ঞান-কৃষ্ণ-শক্তি-বৈচিত্র্য অখণ্ডকালান্তর্গত-খণ্ডকালের প্রারম্ভে উপাস্তবস্ত পুরুষোত্তম নরপুরুষ নারায়ণ, উপাসনা-দেবী সরস্বতী এবং উপাসক-শ্রীকৃষ্ণদেব-বাসের নিকট আমি সকল অহঙ্কার পরিহার করিয়া মগ্নাচরণ করিতেছি । বেদ-প্রতিপাদ্য নরসিংহই স্বয়ংরূপে ভক্তানন্দ-কৃষ্ণ, অভিধেয়-বেদবাণীই গ্রন্থরূপিনী সরস্বতী এবং বেদজ্ঞ ও বেদপ্রকাশক ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের আদিপুরুষ পঞ্চরাত্রসংগীতারকারী নারদানুগ কৃষ্ণদৈপায়নরূপী কৃষ্ণচৈতন্যমনোহরীষ্ট স্থাপনকাণীকে নমস্কার করি ।

বৈয়াসিকী দেবী সরস্বতী অমায়-পারম্পর্য্যে বৈয়াসিকগণের উপাঞ্জা বৈয়াসিক-অদ্বয়জ্ঞান-কৃষ্ণচৈতন্যের লীলা অমরপূর্ব্বক বাৎসলাভরে গুণজাত-জগতে ব্যাসের সম্প্রদায়বাহন-মুখে আমাদিগের বস্তু নিদ্দিষ্ট হইয়াছে—

যং প্রব্রজন্তমমুপেতমপেতকু ব্যং দৈপায়নো বিরহকাতর আজুহাব ।

পুত্রৈতি তন্ময়তয়া তরবোহিভিনেতুস্তং সর্বভূতহৃদয়ং মুনিমানতোহস্মি ॥

শ্রীব্রহ্মসম্প্রদায়ে বাসনাযয়ে শ্রীনন্দের-বংশ ভারতবর্ষে উদ্ভূত হন । আনুস্তমিক-বিচারে অষ্টাদশ-অধস্তনরূপে শ্রীকৃষ্ণ ব্যাসসম্প্রদায়-সংরক্ষণোদ্দেশে স্বীয় নিতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-লীলা প্রকট করিয়াছিলেন । সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মনোহরীষ্টরূপ-কৃপা-ক্রমেই জগবানের মহাবদ্যানুভার পরিচয় পাওয়া যায় । সর্বৈশ্বর্য্য-প্রভালোক-বিভবী সৰ্বমাধুর্য্য-মূর্ত্তিমান্ কৃষ্ণচন্দ্র স্বীয় উদার-লীলায় যে 'জীবে দয়া' প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাই বৈয়াসিকগণের একমাত্র আরাধ্য ও পূজ্য । চতুর্দশভূবনোদ্ধারণের মূলপ্রায় পতিতপাবন অভিন্ন-শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব শ্রীনিত্যানন্দবিগ্রহ একদিন সেই শ্রীব্যাস-গুরু-পূজা করিয়াছিলেন । সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভৃত্যদ্বয় প্রভু শ্রীনিত্যানন্দ-স্বরূপ এবং শ্রীহরিদাস ঠাকুর বৈয়াসিকগণের কৃত্য, সুমেধোগণের শ্রীনামযজ্ঞের কথা স্বকৃতিসম্পন্ন ব্রহ্মার অধস্তনগণের কর্ণকূহরে নিনাদিত করিয়াছিলেন, আর, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অভিন্নবিগ্রহ শ্রীমদ্বৈতপ্রভু জল-তুলসীমুখে পাঞ্চরাত্রিক কৃত্য অর্চনপদ্ধতির আচরণ করেন । শ্রীগৌরসুন্দরের বংশে উক্ত শাখাদ্বয়ের আরাধনাও

ব্যাসপূজার অন্তর্গত। জগতের সমস্ত অমঙ্গল-নাশোদ্দেশে শ্রীচৈতন্য-মনোহরীষ্টপ্রচারকল্পে ভগবানের বাহিরঙ্গা-শক্তি-প্রকটিত জগতের যাবতীয় অনর্থ বিদূরিত করিয়াছেন। অমৃতরস, অনর্থমুক্ত, শ্রীনিত্যানন্দাষ্টদেহ-শ্রীবাস-হরিদাসগণের বৃন্দাবনসেবাধিকার প্রদানের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ এবং তদনুগগণ সকলেই শ্রীগৌড়ীয়েশ্বর শ্রীদামোদর-স্বরূপের আনুগত্যক্রমে সিদ্ধস্বরূপে বৈয়াসিকগণের সম্পূর্ণ সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন। শ্রীবাস-পূজায় শ্রীনিত্যানন্দানুগ শ্রীগৌরবংশধরগণেরই তজ্জন্ত একমাত্র অধিকার। শ্রীচৈতন্য-শিষ্যকট্টকপ্রাণ ভজনপরায়ণ পরমহংস-বৈষ্ণবাচারে শ্রীবাসপূজারই অধিকার লাভ করিয়াছেন। কৃতি বলেন,—“যস্ত দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরো। তস্মৈতে কথিতা হৃথ্যাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥” গুরুব্রহ্মায় বৈয়াসিকগণ শ্রোতৃপন্থী, সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেবের মনোহরীষ্টপ্রচারকারিগণ শ্রীকৃষ্ণানুগত্বে থাকিবার নিত্যপ্রার্থী এবং তাহাতেই তাঁহারা নিত্য অবস্থিত।

শ্রীকৃষ্ণানুগবর শ্রীল নরোত্তম তৎকৃত ‘প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা’-প্রারম্ভে আমা-
দিগের সর্বদা গায়ত্রীরূপে গান করিবার জন্য লিখিয়াছেন—

“শ্রীচৈতন্যমনোহরীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।

স্বয়ংকপঃ কদা মহং দদাতি স্বপদাস্তিকম্॥”

শ্রীকৃষ্ণের গৌরবগুরুগণের আশ্রয়িতব্য বস্তু ভক্তিদিক্কান্তাচার্য্য শ্রীসনাতন-গোস্বামীকে শ্রীগৌরসুন্দর প্রপঞ্চবিলাসোন্মত্ত জীবকুলের অনর্থনিবৃত্তির উদ্দেশে ভজনানুগ বৈষ্ণবস্মৃতি সঙ্কলনের ভার অর্পণ করেন। সেই শ্রীসনাতনপ্রভু শ্রীবেঙ্কটতনয় শ্রীগৌরসুন্দরের রূপাপাত্র শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীকে শ্রীমদ্ ভাগবতপ্রমুখ ব্রহ্মসংগ্ৰহ অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন, এবং শ্রীগৌররূপালক মহাভাগবতধীশাভিনয়কারী শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীকে শ্রীভাগবত-সম্প্রদায়ের ভক্তনোদ্বোধসহ ভাগবতের ব্যাখ্যাতা করাইয়াছিলেন। বৈয়াসিকগণের পরমসেব্য শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী দৈন্তলীলা প্রচারকল্পে শ্রীমদ্ভাগবতের কোন ব্যাখ্যা নিবদ্ধ রাখিয়া যান নাট। তিনি সমগ্র নিক্কিঞ্চন-ভাগবত-পাঠকগণের হৃদয়ে ভাগবতের সকল উদ্দেশ্য স্ফূর্তি লাভ করাইবার জন্য শক্তি সঞ্চার করাইয়াছেন, আর শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর কড়ক'-গ্রন্থ হইতেই শ্রীজীবপ্রভু “ভাগবত-সন্দর্ভ” ও “সর্বসম্বাদিনী”র বিস্তার করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশেই তিনি শ্রীগোপালভট্ট দ্বারা কমিষ্ঠাধিকারোচিত

অনর্থোন্মোচিনী স্মৃতি সংরক্ষণ করিয়াছেন। কনিষ্ঠোত্তরাধিকারের জন্য শ্রীভক্তিরসামুদ্রসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণগোস্বামী প্রভু স্বয়ং রচনা করিয়াছেন। স্বয়ংক্রপ শ্রীকৃষ্ণের মনোহরীপ্রচারকারী শ্রীকৃষ্ণই—শ্রীকৃষ্ণমঞ্জরী। তিনিই ব্রজ-বিলাসের সুপ্রধানা সহচরী, পরন্তু সখ্যাধিকা সেবাপরা এবং উদারবিশ্রহ স্বয়ংক্রপের বৃন্দাবন-দীপার অধিকার-প্রদাত্রী; সেই জন্যই শ্রীকৃষ্ণানুগবর কীর্তন করিতেছেন—

“আর কবে নিতাই চাঁদ করুণা করিবে।

সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে ॥

বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।

কবে হাম হেরব সেই শ্রীবৃন্দাবন ॥

কৃষ্ণ-রঘুনাথ-পদে হইবে আকৃতি।

কবে হাম বুঝব সে যুগল-পিরীতি ॥

শ্রীকৃষ্ণানুগগণের সাধকরূপে সেবায় আমরা সদাচারসম্পন্ন হইয়া শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনরূপ অনুশীলনের প্রাকটিক সন্দর্শন করি। বৈষ্ণব-সদাচার-বিশিষ্ট হইবার জন্য চতুঃষষ্টিপ্রকার সাধনভক্ত্যঙ্গ নির্দিষ্ট আছেন; আবার অন্তরঙ্গসেবায় এই চতুঃষষ্টিপ্রকার সাধনভক্ত্যঙ্গের ফলস্বরূপ মুক্তপুরুষগণের সিদ্ধরূপের অস্থানে যে-সকল চেষ্টা কথিত হয়, তাদৃশ কীর্তন-শ্রবণকারী সাধকগণ প্রকৃত সিদ্ধির সহিত মিশ্রসাধনের যে সামঞ্জস্য প্রয়াস করেন, তাহা হইতে প্রপঞ্চে বিষময় ফল উদ্ভূত হইয়াছে। কৃষ্ণের তটস্থানশক্তিতে জীবপ্রাকট্য; সেই জীব যখন স্বীয় তটস্থধর্ম্য ভুলিয়া যান, তখনই তিনি অবিজ্ঞাশ্রুত হইয়া অন্যাভিলাষ, কর্ম ও জ্ঞানাদিকেই বেদবাণী বলিয়া সারস্বত-পূজা করিয়া থাকেন। আবার, যে কালে কৃষ্ণানুগ সিদ্ধস্বরূপে অবস্থিত হন, তখনই তিনি—

“কৃষ্ণং অরন্ জনকাসুপ্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্।

তত্ত্বং কথারতশচাসৌ কুর্খ্যাদ্বাসং ব্রজে সদা ॥

—ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব ১৫০ অঙ্ক

নিজাশ্রীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাতে ত' লাগিয়া।

নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হঞা ॥ —চৈঃ চঃ মধ্য ২২শ

—এই শ্রীকৃষ্ণানুগবর শ্রীল কবিরাজগোস্বামীর ভাষা উপলব্ধি করিতে পারেন। আর যাহাদের উহা বুঝিতে অসুবিধা ঘটে তাহারা—

“শ্রুতঃ শ্রদ্ধা নিত্যং গুণতশ্চ স্বচেষ্টিতঃ।

নাতিদীর্ঘেন কালেন ভগবান্ বিপতে হৃদি ॥” ভাঃ ২।৮।৪

—এই ভাগবত শ্লোকের শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের সাকার্যদর্শিনী এবং শ্রীজীবপ্রভুও ভক্তিসম্পদের “প্রথমং নাম্নঃ প্রবণমন্তুঃ করণশ্চকার্যমপেক্ষাং। শুদ্ধে চাত্ত্বঃকরণে রূপপ্রবণেন তত্তদ্রথযোগাতা ভবতি। সম্যগুদ্ভিতে চ রূপে গুণানাং স্মরণং সম্পদ্যেত, সম্পদ্রে গুণানাং স্মরণে পরিকল্পবৈশিষ্ট্যেন তদ্বৈশিষ্ট্যং সম্পদ্যেত। ততন্তেষু নাম-রূপ-গুণপরিবর্ষে সম্যক্ স্মুরিতেষু লীলানাং স্মরণং সুষ্ঠু ভবতীত্যভিপ্রোক্ত্য সাধনক্রমো নিশ্চিতঃ। এতৎ কীর্ত্তনস্মরণয়োজ্যেয়ম্ ॥”—এই কথা উপলক্ষি করিতে পারেন।

শ্রীচৈতন্যের মনোহরীষ্ট বুরিতে কাহারো অসমর্থ? এই প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মবৈষ্ণবসিকদম্প্রদায় বলেন, কাহারো শ্রীকৃপালুগ নহেন; কৃপালুগ নহেন কাহারো—কাহারো নিজদম্প্রভরে মনোগঠিত গোপোপাসনা ও গেরেল-শাস্ত্রের ভাবপ্রদগ্ভাষ যত থাকেন এবং কাহারো ভক্তিরসাসুতসিদ্ধ পাঠ করিয়াও শ্রীকৃপালুগে কতিবিশিষ্ট হন না, কাহারো কখনই কৃপালুগ নহেন। কাহারো অন্তর্দশা ও বাহ্যদশায় বৈদবাণী বুরিতে অসমর্থ, কাহারো সাধক ও সিদ্ধের বৈশিষ্ট্যের অপলাপ করিয়া থাকেন; কাহারো গৌড়ীয়-কৃষ্ণ-পরিচয়ে পরিচিত হইতে গিয়া শ্রীকৃষ্ণ-মতের বিপর্যায় সাধন করিয়া সাধারণ ভ্রম আবাহন করিয়া বসেন কাহারো প্রাকৃত ভোগপরা স্ত্রীপ্রধান-চেষ্টায় বিভোর, কাহারো হরিতত্ত্বম করিতে আসিয়াও প্রাকৃত জগতের ভাবুকতাকে অপ্রাকৃত বসিক ভাবকের সহিত সমদর্শনে আনন্তরিতায়ূলে ভোগ ও ত্যাগ-সম্বন্ধবাদী হইয়া পড়েন। কাহারো শ্রীচৈতন্যমনোহরীষ্টে বাহ্যদশায় কৃত্য ও অন্তর্দশায় সাক্ষাৎসেবা এবং বাহ্যভ্যন্তর মিশ্রদশায় কীর্ত্তন, এই ত্রিবিধ বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করিতে না পারিয়া একের ক্ষুদ্রে অপরের ভার চাপাইয়া দিয়া ভ্রমপথ হইতে বিচ্যুত হন। শ্রীচৈতন্যমনোহরীষ্টপ্রসারে আবরণে কৃষ্ণকে অক্ষজ্ঞ-জ্ঞান-গম্য বস্তুজ্ঞানে কৃষ্ণসেবা না করিয়া কাহাকে অধোক্ষজ-বস্তুজ্ঞানের পরিবর্ত্তে অক্ষভোগ্য ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বস্তুবিশেষ জ্ঞান করিয়া নিজের নশ্বর জড়সেবা করাইয়া লন; তাহা ব্যাপপূজা নহে এবং শ্রীগৌরসুন্দরের অনভিপ্রোক্ত।

শ্রীশ্রীশুক্লগোবিন্দো জয়ন্তঃ

স বৈ পুংসাং পুরো ধর্মো যতো ভক্তি রধোক্ষজে ।



অষ্টভূক্ত্যপ্রাপ্ততঃ বয়স্য স্তম্ভসীবতি ।

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আস-পরশ্ন ।
অধোক্ষজে অষ্টভূক্তী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ।

অন্ত ধর্ম স্তম্ভরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই প্রশ্ন ।

৩২শ বর্ষ } ২৪ নারায়ণ, অনিরুদ্ধ, ৪২৪ গৌরাদ
৩০ পৌষ, বুধবার, ১৩৮৭ ; ১৮৭১/১৮৮১ } ১১শ সংখ্যা

সামুদ্রানন্দ

আর্জুনা-নারায়ণাদশকম্

[শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-বিরচিতম্]

প্রহ্লাদ প্রভুরস্তি চেৎ তব হরিঃ সর্বত্র মে দর্শয়
সুস্ত চৈনামিতি ক্রবন্তুমসুরং তত্রাবিস্রাসীদ্ধরিঃ ।
বন্ধস্তস্য বিদারয়মিজনৈর্বাৎসল্যমাবেদয়ন

আর্জুনাপরাযণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥১॥

হে প্রহ্লাদ ! তোমার প্রভু হরি যদি সর্বত্র থাকে, তবে এই স্তোত্রের মধ্যে
অ'ছে কি ? দেখাও—এই কথা বলিতেই তথায় শ্রীহরি আবির্ভূত হইয়া

জগতে ভক্তবাৎসল্য জ্ঞাপনের জন্য নিজনথ কর্তৃক সেই অসুর সম্রাট হিরণ্য-
কশিপুর বক্ষঃ বিদীর্ণ করিলেন। তাদৃশ একমাত্র শ্রেষ্ঠ আর্ত্তপ্রাণকারী
ভগবান্ নারায়ণ আমার গতি ॥ ১ ॥

শ্রীরামায় বিভীষণোহয়মধুনা ত্বার্ত্তো ভয়াদাগতঃ

সুগ্রীবানয় পাশ্যেহহমধুনা পৌলস্ত্যমেবাগতম্ ।

এবং যোহভয়মশ্রু সর্ববিদিতং লঙ্কাধিপত্যং সদা-

আর্ত্তপ্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ২ ॥

অধুনা আর্ত্ত বিভীষণ সভয়ে আগত হইলে শ্রীরাম সুগ্রীবকে বলিলেন.
“হে সুগ্রীব! বিভীষণকে এখানে আনয়ন কর, আমি তাকে এখন পালন
করিব।” এই সর্বজনবিদিত অভয়বাক্য শ্রবণ করিয়া বিভীষণ শ্রীরামচন্দ্রকে
লঙ্কাধিপত্য দান করিলেন। তাদৃশ অভয়দাতা আর্ত্তপ্রাণকারী ভগবান্
নারায়ণ আমার গতি ॥ ২ ॥

নক্রগ্রস্তপদং সমুচ্চতকরং ব্রজেশ দেবেশ মাং

পাহীতি প্রচুরাৰ্ত্তরবকরিণং দেবেশ শক্তীশ চ ।

মা শোচেতি রক্ষ নক্রবদনাচ্চক্রশ্রিয়া তৎক্ষণাৎ

আর্ত্তপ্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৩ ॥

কুন্তীর কর্তৃক পদে আক্রান্ত হইয়া সমুচ্চতহস্তে “হে ব্রজেশ, হে দেবেশ,
হে শক্তীশ, আমাকে রক্ষা কর” বলিয়া গজরাজ প্রচুর আর্ত্তনাদ করিলে
‘শোক করিওনা’—এই বাক্যে তৎক্ষণাৎ যিনি সেই কুন্তীরের মুখ হইতে
হস্তীকে চক্রসম্পদ্বারা ত্রাণ করিয়াছিলেন, সেই শ্রেষ্ঠ আর্ত্তপ্রাণকারী ভগবান্
নারায়ণ আমার গতি ॥ ৩ ॥

হা কৃপাচ্যুত হা কৃপাজলনিধে হা পাণ্ডবানাং গতে

কাসি কাসি সুযোধনাদবমতাং হা রক্ষ মাং দ্রৌপদীম্ ।

ইত্যুক্তোহক্ষয়বস্ত্ররক্ষিত তনুং যোহরক্ষদাপদ্রণাৎ

আর্ত্তপ্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৪ ॥

দুয্যোধন কর্তৃক অবমানিত হইয়া দ্রৌপদী ‘হা কৃপা, হা অচ্যুত, হা
কৃপাসাগর, হা পাণ্ডবগণের আশ্রয়স্থল, তুমি কোথায়, তুমি কোথায়,
আমাকে রক্ষা কর’ বলিয়া ক্রন্দন করায় যিনি অনন্ত বস্ত্রদ্বারা রক্ষিত।

দ্রোপদীকে আপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই শ্রেষ্ঠ আর্ন্ত্রাণকারী
ভগবান্ নারায়ণ আমার গতি ॥ ৪ ॥

যৎপাদাজনখোদকং ত্রিজগতাং পাপৌষাধিধ্বংসনং

যন্মামৃতপানতো জহুমতাং তাপত্রয়ং শাস্যতি ।

পাষণশ্চ যদজ্জ্বতো বরবধূরূপং মূনেরাপ্তবান্

আর্ন্ত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৫ ॥

বাহার পাদনখোদিত্ত বারি ত্রিভুবনের পাপসমূহ বিধ্বংস করে; বাহার
নামামৃতপানে জীবের তাপত্রয় শাসিত হয়; বাহার পাদপদ্ম স্পর্শদ্বারা পাষণও
মূনির বরবধূরূপ ধারণ করে, সেই শ্রেষ্ঠ আর্ন্ত্রাণকারী ভগবান্ নারায়ণ
আমার গতি ॥ ৫ ॥

যন্মামশ্রুতিমাত্রৈপরিমিতং সংসারবারাং নিধিং

ত্যক্ত্বা গচ্ছতি দুর্জ্জনাহপি পরমং বিম্বোঃ পদং শাস্ত্রতম্ ।

তন্মৈবাত্মতকারণং ত্রিজগতাং নাথস্ত দাসোহস্ম্যহং

আর্ন্ত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৬ ॥

বাহার নাম জীবনমাত্রেই দুর্জ্জনও অপার সংসারসমুদ্র ত্যাগ করিয়া
বিষ্ণুর শাস্ত্রত পরমপদ প্রাপ্ত হয়, সেই ত্রিভুবন-নাথের আমি দাস—
ইহা আত্মতকারণের বিষয় নহে। তাদৃশ আর্ন্ত্রাণকারী ভগবান্ নারায়ণ
আমার গতি ॥ ৬ ॥

পিত্রা ভ্রাতরমুত্তমাস্কগমিতং ভক্তোত্তমং যো ধ্রুবং

দৃষ্ট্বা তৎসমমাকুরুক্ষুর্মুদিতং মাত্র বমানং গন্তম্ ।

যোহদাং তং শরণাগতং তু তপসা হেমাদ্রিসিংহাসনং

আর্ন্ত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৭ ॥

ভ্রাতা উত্তমকে পিতৃকোড়স্থিত দর্শন করিয়া ভক্তোত্তম ধ্রুব ভ্রাতার ন্যায়
পিতৃকোড়ে আরোহণ করিতে ইচ্ছুক হইলে বিমাতা কর্তৃক অপমানিত
হইলেন। তপস্যায় প্রীত হইয়া যিনি শরণাগত ধ্রুবকে হেমাদ্রিসিংহাসন
প্রদান করিয়াছিলেন, সেই আর্ন্ত্রাণকারী ভগবান্ নারায়ণ আমার
গতি ॥ ৭ ॥

নাথেতি শ্রুতয়ো ন তত্ত্বমতয়ো ঘোষস্থিতা গোপিকা ।

জারিণাঃ কুলজাতিধর্মাদিমুখতা আখ্যাভ্যভাবং যযুঃ ।

ভক্তির্ঘস্তা দদাতি মুক্তিমতুলাং জারস্য যঃ সদগতি-

আর্জুত্রাণপারায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৮ ॥

ভগবান্ যে জগতের নাথ বা স্বামী—ইহা বেদসমূহ দ্বিধা তত্ত্ববাদিগণ উপলব্ধি করিতে পারে নাই, কিন্তু গোপকুলজাত গোপিকা-উপলব্ধিগণ কুল-জাতিধর্ম-বিমুখ হইয়াও পরমেশ্বর বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। যিনি তাঁহাদের উপগতি ও একমাত্র সদগতিস্বরূপ, তাঁহার প্রতি ভক্তিই তাঁহাদিগকে অতুলা মুক্তি দান করিয়াছিল সেই আর্জুত্রাণকারী ভগবান্ নারায়ণ আমার গতি ॥ ৮ ॥

ক্ষুভ্ণ্যর্জুসহস্রশিষ্যসহিতং দুর্ব্বাস সং ক্রোড়িতং

দ্রৌপত্যা ভয়ভক্তিবুক্তমনসা শাকং স্বহস্তাংপি তম্ ।

ভুক্ত্বাহতর্পয়দাত্তবৃন্তিগণিলামাবেদয়ন্ যঃ পুনান্

আর্জুত্রাণপারায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৯ ॥

দ্রৌপদী ভয়ভক্তিসহকারে ভগবান্কে স্বহস্তে শাক অর্পণ করিলেন। সেই শাকভক্ষণে ‘তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্’—এই আত্মবৃত্তি জগৎকে প্রদর্শন করিয়া ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর সৎশিষ্যের সহিত সংক্ষুব্ধ দুর্ব্বাসাকে ভগবান্ পরিতুষ্ট করিলেন। সেই আর্জুত্রাণকারী ভগবান্ নারায়ণ আমার গতি ॥ ৯ ॥ (ক্রমশঃ)

গুরুদাস

গুরুদাস হইবার যোগ্যতা

সদংশে জাত-বিনীত, প্রিয়দর্শন সত্যবাদী শুদ্ধাচারী মহাবুদ্ধিমান্, দম্ভহীন, কাম-ক্রোধশূন্য, গুরুভক্তি-বিশিষ্ট, সর্বকাল কার্যমনোবাক্যে ভগবৎ-সেবাতৎপর, রোগ বর্জিত, নিষ্পাণ, প্রকাবিশিষ্ট, হরি-গুরু-পূজাহরক্ত, জিতেন্দ্রিয়, দয়াবিশিষ্ট, যুবকই গুরুদাস হইবার যোগ্য পাত্র। অভিমান-

শূন্য, নির্দ্বন্দ্ব, আলস্যরহিত জড় বস্তুতে সমতাহীন, গুরুতে দৃঢ় মিত্রতা-বিশিষ্ট, বৎসরখানী, গুরুসেবাপর, অচঞ্চল, তত্ত্বজিজ্ঞাসু, গুণিগণের দোষের অদ্বেষী, অপ্রজ্ঞা বাক্তিই গুরুদাস হইতে পারেন।

গুরুদাস হইবার অযোগ্যতা

অলস, মলিন, বুধা কষ্টকারী, অহঙ্কারী, কপণ, দরিদ্র, ব্যাধিগ্রস্ত ক্রোধী, বিষয়াসক্ত, লুক্ক, পরজিজ্ঞাসু, মৎসরতাবিশিষ্ট, বঞ্চক, কুকবাক, অন্যায়রূপে ধনোপার্জন, পরদার-রত, ভক্ত বিদ্বেষী, আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া অভিমানী, দ্রুতব্রত, অস্ত্রের দোষ সূচনাকারী, পরহঃখদায়ক, অধিক ভোজনকারী, কুরকর্ম্ম, চুরাত্মা, নিদ্রিত, পাপিষ্ঠ নরাধম, কুকার্য্য হইতে অনিবৃত্ত এবং গুরু-শাসন-শ্রবণে অসমর্থ ব্যক্তিকে শ্রীগুরুদেব স্বীয়দাস্য দিবেন না। কৈমিনী, সুগত, নাস্তিক, নগ্ন, কপিল, গোতম—এই ছয় হেতুবাদীর আশ্রিত ব্যক্তি গুরুদাস হইতে পারেন না।

গুরুদাসের সাক্ষাৎ গুরু-সেবা সম্বন্ধে কর্তব্য

গুরুদাসের কর্তব্য অনেক হইলেও সাধারণতঃ (সাক্ষাৎ-গুরুসেবা সম্বন্ধে) সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে :—(ক) প্রতিদিন গুরুর জলকুন্তানয়ন, কুশপুষ্প যজ্ঞীয় কাষ্ঠ আহরণ, গুরুর শরীর মার্জন, চন্দন লেপন, গৃহমার্জন, বস্ত্র প্রক্ষালন, গুরুর প্রিয় ও হিতকর কার্য্যানুষ্ঠান করিবে। গুরুর গুরুকে গুরুর ত্রায় ব্যবহার করিবে। গুরুর অনুমতি লইয়া পিতামাতার সন্তাষণ করিবে। সর্বত্রই গুরু দর্শনে ভূমিষ্ঠ হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। প্রাতঃ প্রীতিজনক মনোহর অন্নপানাদি বস্তু গুরুকে সমর্পণ করিয়া তাঁহার উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিবে। কর্ম্ম, মন, বাক্য, প্রাণ ও ধনদ্বারা গুরুর প্রিয়-কার্য্য সাধন করিবে। শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম আশ্রয় করিতে যে অনুষ্ঠান সমর্থ, সেই অপ্রাকৃত দীক্ষা গ্রহণ করিবে। ভগবদ্বক্তিতে গুরুকে প্রণাম, সর্ব সম্পত্তি ও নিজদেহ দক্ষিণা-স্বরূপ গুরুকে সমর্পণ করিবে। সেব্য ভগবান্ কৃষ্ণ গুরু-শরীরে অবস্থিত জানিবে। হরিবাসরে উপবাস করিবে।

গুরুদেবের সাক্ষাৎ-সেবাসম্বন্ধে গুরুদাসের নিষিদ্ধ

(খ) গুরু-সমীপে পদ-প্রসারণ, অনুমতি ব্যতীত অন্যত্র গমন, আক্ষালন উচ্চবাক্য, গুরুর নামোচ্চারণ, গুরুর গমন বচন ও ক্রিয়ার অনুকরণ নিষিদ্ধ। গুরুর বাক্য, আসন, যান, পাদুকা, বস্ত্র ও ছায়া গুরুদাসের লঙ্ঘন নিষেধ।

গুরু-সমীপে পৃথক পূজা করিবে না। আমি যাহা, গুরুও তাহা—একরূপ অহংভাব দেখাইতে নিষেধ। গুরুদেবকে কোন আদেশ করিবে না এবং তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিবে না। গুরুকে নিবেদন না করিয়া কোন বস্তু গ্রহণ করিবে না। তাঁহার কোন দ্রব্য ভোজন করিবে না। তাঁহার আগমনে উঠিয়া দাঁড়াইবে, তাঁহার অনুগমন করিবে, তাঁহার শয্যায় উপবেশন করিবে না। গুরুর তাড়না ও ভৎসনায় তাঁহাকে অবহেলা ও অপ্ৰিয়বাক্য বলিবে না। গুরুসেবা না করিয়া মন্ত্র গ্রহণ করিবে না। গুরু-নিন্দকের সহিত বাক্যালাপ ও লড়াই করিবে না। মংস, মাংস, শূকর, কচ্ছপ ভক্ষণ করিবে না। পাছুকা লইয়া দেব-গুরু-গৃহে যাইবে না।

গুরুবাক্য ও শাস্ত্রানুবাক্যানুসারে গুরুদাসের

পালনীয় ৫২টী অনুষ্ঠান

১। ব্রাহ্মমুহুর্তে উঠান ২। ভগবৎ-প্রবোধন ৩। সবাচ্য আরাধিক ৪। প্রাতঃস্নান ৫। নব বস্ত্র ও উত্তরীয় ধারণ ৬। অভীষ্টদেবার্চন ৭। উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ ৮। শঙ্খচক্রাদি ধারণ ৯। চরণামৃত পান ১০। তুলসীমণিমালাদি ভূষা ধারণ ১১। নির্মালা পরিহার ১২। নির্মালা-চন্দন শরীরে লেপন ১৩। শালগ্রাম ও শ্রীমুক্তিপূজা ১৪। নির্মালা-তুলসী সমাদর ১৫। তুলসী চয়ন ১৬। তান্ত্রিকী সন্ধ্যা ১৭। শিবাবন্দন ১৮। চরণামৃতে পিতৃতর্পণ ১৯। মহোপচারে ভগবৎপূজা ২০। ভক্তির অনুকূলে নিত্য-নৈমিত্তিকানুষ্ঠান ২১। ভূতশুদ্ধি ও জ্ঞাস ২২। নব পুষ্পফলাদি দান ২৩। তুলসীপূজা ২৪। ভক্তিগ্রন্থপূজা ২৫। ত্রৈকালিক হরিপূজন ২৬। পুবাণ শ্রবণ ২৭। নিবেদিত বস্ত্র ধারণ ২৮। ভগবদজ্ঞা জ্ঞানে সদানুষ্ঠান ২৯। গুরুর অনুমতি গ্রহণ ৩০। গুরুবাক্য বিশ্বাস ৩১। মন্ত্র-দেবানুসারে মুদ্রা-রচন ৩২। ভক্তনোদ্দেশে গীত-নৃত্যাদি ৩৩। শঙ্খধ্বনি ৩৪। লীলাঙ্গন ৩৫। ছোম ৩৬। নৈবেদ্যার্পণ ৩৭। সাধু-সমাদর ৩৮। সাধুপূজা ৩৯। নৈবেদ্য ভোজন ৪০। তাম্বুলাবশেষ গ্রহণ ৪১। বৈষ্ণব-সঙ্গ ৪২। বিশিষ্ট ধর্ম জিজ্ঞাসা ৪৩। দশম্যাদি দিনত্রয়ে নিয়ম-দ্বারা স্বাস্থ্যরক্ষা ও সন্তোষ ৪৪। জন্মাষ্টম্যাদি মহোৎসব ৪৫। দেবমন্দিরে গমন ৪৬। অষ্টমহাছাদশী পালন ৪৭। সকল ঋতুতে মহোপচারে হরিপূজা ৪৮। বৈষ্ণব-ব্রত পালন ৪৯। গুরুতে ঈশ্বরবুদ্ধি ৫০। সদা

তুলসী সংগ্রহ ৫১। শয্যা-পাদসম্বাহনাদি, উপহার প্রদান ৫২। রামাদি চিত্তা। এই বায়ান্টি অমুঠানে গুরুদাসের কর্তব্যতা আছে।

গুরুদাসের ৫২টি নিষিদ্ধাচার বর্জনীয়

গুরুদাস নিষিদ্ধ ৫২টি অবস্থা বর্জন করিবেন। ১। উত্তর সন্ধ্যায় শয়ন ২। স্তম্ভিকাশীন শোচ ৩। দাঁড়াইয়া আচমন ৪। গুরু-সমক্ষে পদ প্রসারণ ৫। গুরু-ছায়ালঙ্ঘন ৬। সমর্থপক্ষে স্নানবর্জন ৭। দেবার্চনে শৈথিল্য ৮। দেব-গুরুর অভির্ঘন ৯। গুরুদাসনে উপবেশন ১০। গুরু-সমক্ষে পাণ্ডিত্য-প্রচার ১১। উরুর উপর পদ সংস্থাপন ১২। বিষ্ণুর নৈবেদ্য উল্লঙ্ঘন ১৩। মস্তকীন তিলক ও আচমন ১৪। নীল বসন পরিধান ১৫। ভগবত্তিসুখ বৈষ্ণব-বিবেচীর সহ বন্ধুতা ১৬। অসংশয় সেবন ১৭। তুচ্ছ সঙ্গ-সুখাসক্ত ১৮। মদ্য-মাংস সেবন ১৯। মাদক-ঔষধ সেবন ২০। মসুরী সহ অন্ন গ্রহণ ২১। শাক, লাউ, বেগুন, পেঁয়াজ ভোজন ২২। অবৈষ্ণবের নিকট অন্নগ্রহণ ২৩। অবৈষ্ণব-ব্রতানুষ্ঠান ২৪। অবৈষ্ণব-মন্ত্র গ্রহণ ২৫। মারণ উচাটনাদি অনুষ্ঠান ২৬। সমর্থ হইয়া ঠানোপচারে হরিশেবা ২৭। শোকের অধীন ২৮। দশমীবিক্রা একাদশী-ব্রত গ্রহণ ২৯। গুরু-কৃষ্ণ একাদশীতে ভেদবুদ্ধি ৩০। দ্বাতকীড়া ৩১। সমর্থ-পক্ষে অনুকল্প স্বীকার ৩২। একাদশীতে শ্রাদ্ধ ৩৩। দ্বাদশীতে নিদ্রা ও তুলসী চয়ন। ৩৪। দ্বাদশীতে বিষ্ণুস্নান ৩৫। বিষ্ণুপ্রসাদ ব্যতীত অন্য বস্তুরাশ্রয় শ্রাদ্ধ ৩৬। বৃক্ষশ্রাদ্ধে অতুলসী ৩৭। অবৈষ্ণব বা রাক্ষসশ্রাদ্ধ ৩৮। চরণামৃত থাকাকালে পবিত্রতা জন্ত অন্য জলে আচমনাদি ৩৯। কাষ্ঠাসনে উপবিষ্টের পূজা ৪০। পূজাকালে অসদালাপ ৪১। গৃহ-করবীর এবং আকন্দাদি দ্বারা পূজা ৪২। আয়স ধূপপাত্র ব্যবহার ৪৩। প্রমাদবশত তিথ্যাক্ত পুণ্ড্র ৪৪। অসংকৃত দ্রব্য দ্বারা পূজা ৪৫। চঞ্চল চিত্তে অর্চন ৪৬। একহস্ত প্রণমন ও একবার মাত্র প্রদক্ষিণ ৪৭। অসময়ে ত্রিমূর্তি দর্শন ৪৮। পর্যাসিত অন্ন নিবেদন ৪৯। অসংখ্য জপ ৫০। মন্ত্র প্রকাশ ৫১। মুখ্যকালত্যাগ ও গৌণকাল স্বীকার ৫২। বিষ্ণুপ্রসাদ অস্বীকার।

শ্রীগুরু ও শ্রীগুরুদাস-তত্ত্ব

গুরুদাস নিত্য, গুরু নিত্য। অনান্ন মনের দ্বারা বা দৃশ্য জগতের বস্তু-বিশেষ গুরুকে মনে করিলে বাস্তবিক নিত্য-গুরুদাস হওয়া যায় না। গুরুকে

মর্ত্যজ্ঞান করিলে, গুরুদাসের বাহ্য শরীর ধ্বংসশীল জানিলে, মনের পরিবর্তনীয় অবস্থা বিচার করিলে, আত্মার বা অপ্রাকৃত বস্তুর নিত্য বিধে নানা সন্দেহ উদ্ভূত হয়। গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধ নিত্য ও আত্মমর্মে প্রতিষ্ঠিত তাহাতে হেয়ত্ব নাই। হেয়ত্বের অভিনিবেশ বিদূরিত হইলে শিষ্য বুঝিতে পারেন যে, তিনি স্বরূপে 'কুমারদাস'। গুরুদাস শ্রুতির উল্লিখিত 'তত্ত্বমসি যৈতকেতো' মন্ত্র শুনিয়া আপনাকে বিদ্বদ্ধ 'চিংকন' বা অণুচিং বলিয়া জানিতে পারেন। গুরুদাস স্বরূপে অবস্থিত হইয়া বলেন—

“শ্রীচৈতন্য মনোহভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।

শ্রীকৃপং হি কদা মহ্যং দদাতি স্বপদাস্তিকম্ ॥

—শ্রীল প্রভুপাদ

গর্ভস্তোত্র বা সম্বন্ধতত্ত্ব চন্দ্রিকা

“সত্ত্বাত্তং সত্যপরং” হইতে “ভারং ভূবো হর যদ্বক্ষ্য বননং তে” পর্য্যন্ত ভাগবতোক্ত পঞ্চদশ শ্লোকাত্মক গর্ভস্তোত্র অতিশয় পবিত্র। এই স্তবের বক্তা ব্রহ্মাশিব প্রভৃতি সমস্ত দেবগণ অত্যন্ত যত্নপূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় প্রকাশিত বেদ তন্ত্রাদি হইতে সারস্বত উদ্ধার করিয়া স্বল্লাক্ষরে বর্ণন করিয়াছেন; অতএব ইহার মাহাত্ম্যের তুলনা নাই। এই স্তবে যাহা কিছু লেখা আছে তাহা শ্রুতি প্রমাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, কেবল ইহার সম্যক্ ব্যাখ্যা প্রকাশিত হইলেই ভীষণ চরিতার্থ হয়। এই গর্ভস্তোত্রের বিশেষ ব্যাখ্যা এই যে জগদীশ্বর জগৎ সৃজন করিয়া তাহাতে প্রতিভাত হন। অখিল জীবের প্রকৃতি দেবকীতে ভগবান্ জন্মগ্রহণ করিয়া ভীষণার সতচর হইয়াছেন। জীবের জ্ঞানস্বরূপ বাসুদেব প্রণমে ভগবদ্ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া তৎপ্রকৃতি মনস্বরূপ দেবকীকে ঐ পবিত্র ভাগদী অর্পণ করেন। এতল্লিখন্ধন দেবকীপ্রসূত ভগবানের নাম বাসুদেব হইয়াছে। বাসুদেব শিষ্ট জ্ঞানস্বরূপ পরমেশ্বর। জীবের সঙ্কীর্ণ জ্ঞানে যে পরব্রহ্মের প্রতিভা তাহাষ্ট বাসুদেব। পরব্রহ্ম অবিতর্ক্য ও অচিন্ত্য, অতএব জ্ঞান কর্তৃক স্পৃষ্ট হন না। পরব্রহ্ম পরমেশ্বর ব্যতীত জীবের জীবন বুঝা হয়; এতৎপ্রযুক্ত পরম কারুণিক শিষ্ট অনুগ্রহপূর্ব্বক জীবের জ্ঞানের আত্ম প্রত্যয় বিভাগে স্বয়ং প্রকাশ হইয়া মনোমধ্যে বিচরণ করেন। অব্যবহিক লোকেরা

জগদীশ্বরের অবতার স্বীকার করেন না। ইহাতে কেবল তাঁহারা আমাদিগকে বঞ্চনা করেন মাত্র। পরমেশ্বরের বাসুদেব অবতার স্বীকার না করিলে নিরীশ্বর অথবা সত্যাক্ত হইয়া উঠিতে হয়। এই বাসুদেবের আবির্ভাব কালীন যে দেবস্তুতি তাহা যে অমৃত তুল্য ইহাতে সন্দেহ কি ?

এই অপার জ্ঞান গর্ভস্তোত্রের সদর্থ নির্ণয় করা আমার ছায় ক্ষুদ্র লোকের সাধ্য নহে, তবে আমার জীবন সর্ব্বত্র জগদগুরু ঐচ্ছিত্য মহাপ্রভুর শ্রীচরণ প্রসাদাৎ যাহা কিছু নির্ণীত হইবে তাহা দয়া সমুদ্র বৈষ্ণব মহোদয়গণ অল্পগ্রহ পূর্ব্বক দাস প্রদত্ত পুষ্পাজলির ন্যায় গ্রহণ করেন, ইহাই আমার প্রার্থনা। পূজাপাদ শ্রীশ্রীধর স্বামী-কৃত ব্যাখ্যা যতদূর পারি অবলম্বন করিব। স্থানে স্থানে যদিও স্বামী-বাক্যের অনুরূপ ব্যাখ্যা হইবে না তথাপি দয়াজ্ঞ-চিন্তা পাঠকগণ স্বামী প্রদত্ত ইচ্ছিতালিষিত ব্যাখ্যা বলিয়া আমার এই ভাষ্যকে গ্রহণ করিবেন। বৈষ্ণবগণই আমার বান্ধব, তাহাদের চরণ-রেণুই আমার একমাত্র প্রার্থনা। যেহেতু তাঁহারা কৃপা করিলে আমার হৃদয়েশ্বর মহাপ্রভু আমাকে স্থায়ী দাসানুদাস বলিয়া জানিবেন। ইহা হইলেই আমি চরিতার্থ হইব।

সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং,

সত্যস্য মোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে।

সত্যস্য সত্যং সত্যসত্যনৈত্রং,

সত্যাত্মকং স্থাং শরণং প্রপন্নাঃ ॥

সৃষ্টির পূর্ব্বক একমাত্র পরমব্রহ্ম ছিলেন, তার কিছুই ছিল না। তিনি সর্ব্বশক্তিমান ও পূর্ণস্বরূপ। তাঁহার অনন্ত শক্তির মতো ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীবগণের নিকট তিনটি শক্তির প্রকাশ আছে। অপর সমুদয় শক্তি জীবের পক্ষে অচিন্ত্য ও অবিতর্ক। জীব যদিও স্বয়ং অপ্রাকৃত, জ্ঞান ও আনন্দে ভূষিত তথাপি পূর্ণতার অভাব প্রযুক্ত পূর্ণস্বরূপ পরমেশ্বরকে সম্যক জানিতে পারেন না। এই তিনটি শক্তির নাম চিহ্নক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি অর্থাৎ অন্তরঙ্গা, তটস্থা ও বহিরঙ্গা। চিহ্নক্তিই পরব্রহ্মের স্বভাব। মায়াশক্তি ঐ স্বভাবের বিপরীত। জীবশক্তি চিহ্নক্তির বিভিন্নাংশ মায়াবিমুখ ধর্ম্ম যোগ্য। চিহ্নক্তি পূর্ণরূপে অপ্রাকৃত, জীবশক্তি অপ্রাকৃতের অসম্পূর্ণ লক্ষণ এবং মায়াশক্তি অপ্রাকৃতের বিপরীত অর্থাৎ প্রাকৃত। সমস্ত জড় জগতকে প্রাকৃত বলা যায়, এজন্য

ইহাকে মায়াশক্তির প্রকাশ বলিয়া ব্যাখ্যা হয়। জগদীশ্বরে এই তিনটি শক্তি স্বীকার না করিলে কোন প্রকার বিচারের মীমাংসা হয় না, যেহেতু পরব্রহ্মে অপ্রাকৃত গুণ স্বীকার না করিলে ভগবন্তর মায়াবাদের উদ্ভব হয়। বিপরীত গুণসকল যে-পুরুষে সামঞ্জস্য ভাবে অবস্থিত করে তাহাকেই পরব্রহ্ম বলি, যথা নিরীকার ও সৃষ্টি করণের ইচ্ছা এবং চিচ্ছক্তির আনন্দময় বিলাস ও মায়াশক্তির অক্লান্ত পরিচালনা একই কালে নির্বিরোধ ভাবে পরমেশ্বরে দৃষ্ট হয়। মানব অসম্পূর্ণতা প্রযুক্ত এ প্রকার সামঞ্জস্যের ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় না। মায়া অসং অর্থাৎ অস্তাব সঙ্কল্প, এ প্রযুক্ত জড়জগতে হুঃখ ব্যতীত আর কিছুই নাই। পরিদৃশ্যমান এই জগতেই যে মায়া এমত নহে কিন্তু ইহা মায়াগর্ভ সমুত্ত। মায়া জগদীশ্বরের শক্তি মাত্র। সেই অনাদি শক্তিতে পরমেশ্বর যখন রমণ করেন তখন এই ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়। সমস্ত সূর্য ও নক্ষত্রগণ সহিত এই জড় ব্রহ্মাণ্ড মায়া-প্রসূত। জননীর গুণ সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডে উত্তরাধিকারিক সূত্রে ন্যস্ত হইয়াছে। সত্ত্ব, রজ, তম, দেশ, কাল এই সমস্ত মহাগুণ ও তদমূল্যম বিলোম জনিত আকর্ষিত, বিস্মৃতি, স্থাপকতা, আকর্ষণ প্রভৃতি ক্ষুদ্র গুণসকল গুণবতী। মায়া হইতে দৃশ্য জড় প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের অনুগামী তত্ত্বজ্ঞগণ এই মায়া ও তজ্জাত জগৎকে মিথ্যা বলিয়া ব্যাখ্যা করত ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোন পদার্থ বা গুণ স্বীকার করেন নাই। তাহাদের বিচারে নানাবিধ দোষের উদ্ভব হয়। প্রথমতঃ এই বিশ্বরূপ ভাণ কাহাতে হইতেছে ইহা যুক্তি দ্বারা কোন প্রকারে মীমাংসা গ্রহণ করিলে পাপ-পুণ্য, কর্তব্য-অকর্তব্য ইত্যাদি সমুদয় অবস্তু হইয়া উঠে। মানব জীবনের সারভূত বৈষ্ণব ধর্মের ভিত্তিমূল যে প্রেম তাহাও উৎপাটিত হইয়া জীবসকল ভ্রমরূপে পতিত হইয়া স্বেচ্ছাচার ধর্ম অবলম্বন করত অমঙ্গল প্রাপ্ত হয়। যথার্থ তত্ত্ববিৎ বৈষ্ণব সাধুগণ এই সকল ব্রহ্মা যুক্তি হইতে জীব সকলকে উদ্ধার করিবার জন্য পরমেশ্বরের সর্বশক্তিতে বিশ্বাস করিতে বিধান করিয়াছেন। পরমেশ্বরে স্বীয় চিচ্ছক্তি দ্বারা পুর্নানন্দে অলঙ্কৃত। তাহার জীবশক্তির পরিচালনা দ্বারা স্থিতিকালে সমস্ত জীবের অস্তিত্ব বিধান করেন, এবং মায়াশক্তির দ্বারা বস্তুত অসত্য কিন্তু স্থিতিকালে সত্য এই জড় জগৎকে প্রকাশ করেন। জীব চিন্ময় হইয়াও জগদীশ্বরের শক্তি বশতঃ এই জড় জগতে বদ্ধপ্রায় অনুব্রজিত আছেন। পরন্তু সারগ্রাহী

বৈষ্ণববর্গ পরমেশ্বরকে এক অদ্বয়তত্ত্ব জানেন, যেহেতু জীব ও জড়ের মূল স্বরূপ যে দুই শক্তি স্বীকৃত হইয়াছে তাহা একমাত্র পরমেশ্বরের শক্তি মাত্র, স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। পরম পুরুষ পরমেশ্বর কদাচ একাধিক নহেন, যেহেতু ঋতি, প্রত্যক্ষ অর্থাৎ যুক্তি, ঐতিহ্য অর্থাৎ মহাজন প্রসিদ্ধি এবং অনুমান এই চারি প্রকার প্রমাণের দ্বারা বৈষ্ণবগণ পরব্রহ্মকে অদ্বয় বলিয়াছেন। দ্বিতত্ত্ব ও ত্রিতত্ত্ববাদী বৈষ্ণবগণ ফলতঃ এক পরম তত্ত্বেই তর্কান্ত পরিশ্রমের বিশ্রাম প্রদান করেন। জীব জড় এই দুইটি পদার্থকে তাঁহারা অনাদি ও অনন্ত বলিয়া গীতা-প্রমাণ দিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের গীতার্থ বিবেচনার ত্রুটি বলিতে হইবে, যেহেতু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় শক্তিদ্বয়কে অনাদি ও অনন্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন; তদ্বারা ঐ শক্তিদ্বয়ের পরিণাম স্বরূপ কার্য্য সকলকে অনাদিতে বরণ করেন নাই। পরিণামেরও পরিণাম হইবার সম্ভাবনা, অতএব জগদীশ্বরের ইচ্ছাক্রমে সমুদায় পদার্থ বিনাশ হইতে পারে ইহা সর্ব্বতঃ স্বীকৃত। তদন্ত বিচার করিলে জগদীশ্বর স্বীয় শক্তিগণ হইতে অভিন্ন। যথা আলোক ও দহন এই দুইটি অগ্নির শক্তি কিন্তু ইহারা অগ্নি হইতে স্বতন্ত্র নহে। জীবশক্তি ও মায়াশক্তি অনাদি ও অনন্ত হইলেও তজ্জাত জীব ও জড় স্বতন্ত্র ভাবে অনাদি ও অনন্ত নহে। অর্থাৎ ইহাদের ক্ষয়োদয় স্বীকার করা যায়। পরন্তু বৈষ্ণবগণ জীব ও জড়কে মিথ্যা বলিতে পারেন না। যেহেতু সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর ইহাদের মূল স্বরূপ, অতএব মায়াবাদী ভ্রমাক্ত ব্যক্তিগণের মীমাংসা হইতে বৈষ্ণবতত্ত্ব স্পষ্টরূপে ভিন্ন স্বর্গিবার জন্য অনেকানেক মহাব্যাগণ চিৎ ও অচিৎ অর্থাৎ জীব ও জড় এই উভয়কেও নিত্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জগদীশ্বর সৃষ্টি করণেচ্ছায় সত্যের গঙ্ঘল করেন একারণ দেবগণ তাঁহাকে সত্যব্রত বলিয়া সম্বোধন করিলেন। জড় ও জীব যদিও সত্য তথাপি জগদীশ্বরের স্বীয় সত্যতার সহিত ঐ সাময়িক সত্যের তুলনা হইতে পারে না যেহেতু পরমেশ্বর নিত্য সত্য, এ প্রযুক্ত দেবতাগণ তাঁহাকে “সত্যপরং” বলিয়া সম্বোধন করেন। সত্যব্রত বলিয়া ভগবান্কে সম্বোধন করত দেবতাগণের এরূপ আশঙ্কা হইল যে যদি সত্যব্রত শব্দদ্বারা ভগবানের সৃষ্ট পদার্থকে নিত্য সংজ্ঞা দেওয়া হয় তাহা হইলে মহৎ অপরাধ হইবে; এই আশঙ্কা দূরীকরণ আশায় অবিলম্বেই সত্যপরং উপাধিটী প্রয়োগ করিলেন। এইপ্রকার দৈশ্বরের নিকট নিরপরাধী

হইয়াও দেবতাদিগের সন্তোষ হইল না যেহেতু ‘সত্যব্রতং সত্যপরং’ এই সঙ্কীর্ণ বাক্যের ব্যাখ্যা কেবল ভগবানই বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু অন্যান্য জীবগণ ইহার বিপরীত অর্থ জানিয়া অদ্বৈতবাদী হইয়া উঠিবেন অথবা ভুড় ও জীবকে ঈশ্বরের সহিত নিত্যতায় তুলনা করিয়া কলুষিত হইবেন। এই প্রকার চিন্তা করত ব্রহ্মাদি দেবগণ পরমেশ্বরকে “সত্যাস্ত্র যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে সত্যাস্ত্র সত্যং” এই বাক্যের দ্বারা স্তব করিলেন। হে জগদীশ! তুমি সত্যের জননী অর্থাৎ এই ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান কারণ। অপর তুমি এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ সাময়িক সত্যে নিহিত হইয়া আছ অথচ এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ সত্যের সত্য স্বরূপ অর্থাৎ জীবন। এই ব্রহ্মাণ্ডে ভগবান নিহিত হইয়া আছেন এই ভাবটী অতিশয় উৎকৃষ্ট অথচ আশ্চর্য্য। এই ব্রহ্মাণ্ডের কোন্ ভাগে পরমেশ্বর আছেন ইহা চিন্তনীয় নহে, যেহেতু পরব্রহ্ম অপ্ৰাকৃত ও দেশকাল অপরিচ্ছেদ্য। ভুড়ভগতের অতিশয় ক্ষুদ্র পদার্থকে পরমাণু বলা যায়। প্রতি পরমাণুতে পরব্রহ্ম ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। জগদীশ্বর অণু হইতে অণু ও গুরু হইতে গুরু এক্রূপ বেদসকলও গান করিয়াছেন। বেদসকল পরব্রহ্মের জগতে নিহিত থাকা ভাবকে সুন্দর ব্যক্তি করিতে না পারিয়া ‘ওতপ্রোত’ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। যেহেতু মন ও বাক্য যাহাকে না পাইয়া নিবৃত্ত হয় সেই অচিন্ত্য ঈশ্বরকে যে কোন বাক্যে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করা যায় তাহা প্রাকৃতভাবে কলুষিত হইয়া উঠে। কিন্তু জগদীশ্বরের যশঃকীর্ত্তন ও সংস্মরণ অর্থাৎ নিদিধ্যাসন ব্যতীত জীবের উপায়ান্তর নাই। এ প্রযুক্ত সাধু বৈষ্ণবগণ যে প্রকার বাক্যালঙ্কারে ভগবানকে বর্ণন করুন না কেন ঐ বাক্য সকলের প্রাকৃত ভাবকে পরিত্যাগ করত অপ্ৰাকৃত ভাব গ্রহণ করা কর্তব্য। যদিও এই প্রকার প্রতি পরমাণু খণ্ডে জগদীশ্বর পূর্ণরূপে বিরাজ করেন তথাপি ব্রহ্মাণ্ড ও ঈশ্বরে আধার আধেয় সম্বন্ধ অর্থাৎ পরস্পর ভিন্ন। অনেকেই নিহিত ভাবের আলোচনা করিতে করিতে ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্বে সন্দেহ করিয়া ইহাকে বৃহদ্বস্তুর ক্ষেত্র বিবর্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। এই ভয়ানক মীমাংসাকে নিরোধ করিবার আশাশ্রম দেবগণ তাহাকে ‘সত্যাস্ত্র সত্য’ উপাধি প্রদান করিলেন। এই ব্রহ্মাণ্ড সত্য হইলেও ঈশ্বর নহে। জগদীশ্বর সত্যস্বরূপ। এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব যখন পরমেশ্বরের ইচ্ছায় সমাপ্ত হইবে তখন ইহার পরিণাম স্বরূপ পরম সত্য

পরমেশ্বর একমাত্র অবশেষ রহিলেন। এই সাময়িক সত্যের পর্যাবসান জগদীশ্বরেই সম্ভব। জগদীশ্বরের ইচ্ছায় মায়াশক্তি হইতে এই বিশ্বের প্রাক্তর্ভাব হইয়াছে এবং পরমেশ্বর ইহাতে অনুপ্রবেশ দ্বারা ইহাকে রক্ষা করিয়াছেন। অপর যখন তাঁহার সেই পবিত্র ইচ্ছা নিরস্ত হইবে তখন ইহার কিছুই থাকিবে না। তখন একমাত্র সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান বিরাজ করিবেন। এখানে এক্ষণে প্রশংসা হইতে পারে যে, সৃষ্টির পূর্বে যখন ব্রহ্মাণ্ড ও জীবনকল ছিল না তখন এই বিশ্বের অভাবরূপ একটা অসম্পূর্ণতা দৈশ্বরে লক্ষ্য হয়; অতএব এখানে ত্রিতত্ত্বাদী মহাত্মাগণ নিজ সিদ্ধান্ত উৎকৃষ্ট বলিয়া জীব ও জড়ের নিত্যত্ব স্বীকার করা কর্তব্য এক্ষণে প্রকাশ করিতে পারেন কিন্তু সারগ্রাহী বৈষ্ণবদিগের এক্ষণে সিদ্ধান্ত নহে। জীব ও জড়ের প্রাগ্ভাব জগদীশ্বরের শক্তি মধ্যে থাকায় তিনি সৃষ্টির প্রাক্কালে কোন অংশে অসম্পূর্ণ ছিলেন না। অন্যতর কেটি ব্রহ্মাণ্ড প্রলয়াবসানে সেই পরব্রহ্মের শক্তি মধ্যে প্রবেশ করিবে। এখানে কালত্রেয়স্ব মধ্য কখনই তাঁহাকে অসম্পূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায় না। এইপ্রকার কথিতে কথিতে দেবতাগণ বিবেচনা করিলেন যে সত্যই দৈশ্বরের একমাত্র মহাত্ম্য হয় তবে তাহা সকলের গ্রাহ্যরূপে সামান্য হইয়া উঠে। আহা! আমরা দৈশ্বরকে এইপ্রকার সত্য স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া কতদূর অপরাধী হইলাম। এইপ্রকার শোচনা করত ব্রহ্মাদি দেবগণ ভগবানকে ঋণসত্য মাত্র এইপ্রকার সম্বোধন করিলেন। সত্যের সত্য স্বরূপ যে ব্রহ্ম তাহার প্রবর্তক অর্থাৎ নিয়ন্তা যে পরম পুরুষ পরব্রহ্ম তিনিই ভগবান। ভগবানের শক্তির সমষ্টির নাম ব্রহ্ম, ইহাকে সত্য উপাধি প্রদান করা হইয়াছে সেই সত্যের আদার যে পুরুষ তিনিই পরমেশ্বর। সেই পুরুষকে সত্য বলিতে হইলে গুণের দ্বারা গুণাধারের নামকরণ হইয়া উঠে। অতএব দেবতাগণ কহিলেন, হে সত্যাত্মক! আমরা তোমার শরণাপন্ন হই। জ্ঞানের দ্বারা চিন্তা করিতে কথিতে যখন গুণ সমুদায় অতিক্রম করত সেই গুণাধার পরম পুরুষের সন্নিহিত হইলেন; তখন দেবতাদিগের জ্ঞান একেবারে নিরস্ত হইয়া গেল। তখন তাঁহারা ভক্তি-সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া প্রপত্তিরূপে ভগবদ্-চরণানুত পান করিয়া জ্ঞানশূন্য আনন্দকে প্রাপ্ত হইলেন।

— জগদগুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীল গুরুদেবের দ্বাদশ বর্ষপূর্তি

বিরহ-মহোৎসব উপলক্ষে

ভক্তিপূরিত কুম্মম্যঞ্জলি

জয় পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান,
আজি এ' তিথিতে তব স্মৃতি সদা জাগে মনে অনুক্ষণ ।

দ্বাদশ বর্ষ আগে হেন শুভক্ষণে মোদের সঙ্গ ত্যজি'
সেবিছ হরিরে মঞ্জরী-স্বরূপে শ্রীহরির রাসে পশি' ।

সেথা কুঞ্জকাননে রসরাজ সাথে খেলিছ প্রাণের খেলা,
নানা ফুল সাজে সাজাইছ তাঁরে হয়ে প্রেমে মাতোয়ান ।

হেথায় তোমার বিরহের তাপে জ্বলি মোরা অন্তরে,
তথাপি তোমার গুণ-লীলামৃত গাহি-উল্লাস-ভরে ।

বিষামৃতের একত্র মিলন এ তিথি-বাসরে ভায়,
কীৰ্ত্তনাকারে মহামহোৎসবে মাতি আজি মোরা তাই ।

তোমার প্রকট ও অপ্রকট-লীলা নিত্য নিরন্তর,
লীলা হেতু শুধু জন্ম তোমার এই ধরণীর 'পর' ।

মৃত্যু তোমার হয় না কভুও, তুমি তো মাহুষ নহ,
তুমি আশ্রয়-জাতীয় ব্রহ্মবস্ত, —হরি-সেবা-বিগ্রহ ।

তুমি ছাড়া এই বিশাল ভুবনে আপন তো কেহ নাই,
মোদের প্রকৃত কল্যাণ হয় তোমারি তো করুণায় ।

শ্রীহরি তোমার নিজ সম্পদ, তুমিই তাঁকে দিতে পার,
তব সেবা ছাড়া শ্রীহরি-সেবার মেলে না'কো অধিকার ।

গোলোকের কথা তুমিই জান গো, তুমি তো গোলোকবাসী,
জাগতিক কথা ত্যজিয়া যেন তোমার বাণী ভালবাসি ।

কহেছো মোদেরে ভোগ-ত্যাগ-পথে শুধু হরি-বিমুখতা,
ভোগ-বাঞ্ছা হেতু ভোগী-ত্যাগী কভু পায়না হরির দেখা ।

গৃহত্যাগে কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠাশা লয়ে হ্রদে,
 আধি-ব্যাদিরূপ ত্রিতাপে দহিছে অনিত্য এই ভবে ।
 মোক্ষকামীরা দিশাহারা হয়ে ত্যাগের পথেতে চলে,
 অষ্টাদশ সিদ্ধি-বাঞ্ছা মানিয়া রহে হরিসেবা ভুলে ।
 সেবা-পথ ধরি' সেব্য শ্রীহরির সাক্ষাৎকার সম্ভব,
 ভোগ আর ত্যাগে স্পৃহা থাকিতে মেলে নাকো হরি-পদ ।
 নিজ মুখকামী কর্মী-জ্ঞানী-যে'গী মায়ার গোলামী করে,
 কিন্তু ভক্ত হরি-মুখ লাগি' জীবন উৎসর্গ করে ।
 এহেন তোমার উপদেশাবলী স্মরি মোরা অন্তরে,
 মোদের ভোগ ও ত্যাগ প্রবৃত্তিরে চাহি আজি নাশিবারে ।
 তোমার চরণ আশ্রয় করি' মোদের এ জীবন যন্তু,
 কৃপা কর যেন তোমার সেবাতে নিত্যকাল থাকি মগ্ন ।
 সারা জগতের গুরু তুমি প্রভু, নমস্তু সবাচার ;
 তব কৃপা ছাড়া টুটে না জীবনের অজ্ঞান-অজ্ঞকার ।
 তোমার 'গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি' শত শতাব্দী ধরে,
 ব্রহ্ম-মাধব-গৌড়ীয়ের ঐতিহ্য প্রচারিবে ধরা 'পরে ।
 শ্রীগুরু-চরণে তব নির্ভার তুলনা কি কভু আছে ?
 শ্রীপ্রভুপাদের জীবন বাঁচাতে পীড়ন মহেছো নিজে ।
 ভক্তি-সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ-আচরণ সহিতে পারনি কভু,
 চৈতন্যমনোহরীষ্ট রূপায়ণে সদা ব্যস্ত থেকেছো প্রভু !
 প্রেমধর্মের মহৎ মহিমা ঘোষিয়াছ দিকে দিকে,
 শ্রীরূপ-বাণীর নব-প্রবর্তন এনেছো এ ধরা-বুকে ।
 তোমার লীলার মহিমা কহিতে আমার শক্তি কোথা ?
 ভক্ত জানয়ে তোমার মহিমা, তুমি ভক্তেরই ত্রাতা !
 (তবু) করণ বিলাপে গাহি তব গুণ শুধু তব কৃপালোকে,
 প্রার্থনা ঘোর, তোমারি কৃপায় পাই যেন শ্যামচাঁদে ।

তব প্রেষ্ঠজন আচার্যাদেব শ্রীল বামন মহারাজ,
 তাঁর আনুগত্যে তব গুণ গাহি' কৃতার্থ মোরা আজ।
 ভক্তি-কুণ্ডল নিবেদি' তোমার চরণে আজিকে নমি,
 করুণা করিয়া উদ্ধারহ মোরে তব দাস্ত-যোগ দানি'।

—: শ্রীগুরু-বিরহ-বাসর :—

২৯ পদ্মনাভ, ৪৯৪ গৌরাদ
 ইং তাং. ২৩ অক্টো, ১৯৮০

শ্রীগুরু-কৃপালেশ-প্রার্থী--

শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল
 (বর্ধমান)

শ্রীরজমণ্ডল-পরিব্রজা

(পূর্বপ্রকাশিত ৩২শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৬৩ পৃষ্ঠার পর)

অষ্টমখী— ললিতা চ বিশাখা চ চিত্রা চম্পকবল্লীকা।

রত্নদেবী সুদেবী চ তুঙ্গবিভেন্দুরেখিকা।

এইভাবে আমরা শ্রীল মহারাজের শ্রীমুখে অষ্টমখীগণের লীলাকথা শ্রবণ
 করিতে করিতে চিকশোলী গ্রামের উত্তরে সাকরিখোর অর্থাৎ দুই পর্বতের
 মধ্যবর্তী সঙ্কীর্ণপথে আসিয়া পৌঁছিলাম। এখানে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের
 নিকট হইতে দধিলুপ্তন করিয়া খাইয়াছিলেন। দুইদিকে গৌরবর্ণ ও কৃষ্ণ-
 বর্ণের উচু পাহাড়। ইহাকে ব্রহ্মণাভাড় বলা হয়। গ্রামের অধিবাসীগণ
 এইস্থানে আসিয়া তাঁহাদের গাভীদিগের প্রথম দুগ্ধ দান করিয়া যান, এইরূপ
 প্রচলন এখানে প্রমিত্রি লাভ করিয়াছে। এইস্থলে শ্রীরাধিকার জন্মস্থিতি
 উপলক্ষে বহু কৌতুক হয়, ইহাকে 'বুড়ালীলা' বলে। পর্বতের উপরে
 পূর্বদিকে বিলাসগড়—শ্রীরাধাগোবিন্দের বিলাস স্থল। পশ্চিমে পর্বতোপরি
 দানগড়। শ্রীকৃষ্ণ এখানে দানলীলা করিয়াছিলেন। এই ব্রহ্ম পাহাড়েই
 কৃষ্ণ-সখাগণের সঙ্গে রাধারানী-সখীদের বাক্যদ্বন্দ্ব ও হস্তদ্বন্দ্ব হইয়াছিল।
 রাধারানীর প্রধানা ললিতা, সেইহেতু মুনসীধান একটি স্থানের নাম
 হইয়াছে।

চিক্শৌলী গ্রামের নিকটেই গহ্বর বনের অপরূপ বনশোভা; এখানে অনেক সাধু বাস করেন, পর্বতের উপর ময়ূরকুঠি। অনমর্থ ভীর্থযাত্রী ছাড়া আর সকলেই পর্বতোপরি ময়ূরকুঠি দর্শন করিলেন। এখানে শ্রীরাধাকৃষ্ণকে বেষ্টন করিয়া ময়ূর নৃত্য করিয়াছিল। একসময় কৃষ্ণও ময়ূররূপ ধারণ করিয়াছিলেন। এখানকার বনশোভা ভগবন্তকৃষ্ণের মনে আনন্দের তরঙ্গ উখিত হয়, আর কৃষ্ণলীলা-স্মৃতিলাভ হয়; সার্বক আমাদের পরিক্রমা। গহ্বর বনের পর পর্বতের উপরে মানগড়। শ্রীরাধিকা এখানে মান করিয়াছিলেন; কৃষ্ণকুণ্ড, কুঞ্জগলি, গোপালমূর্তি দর্শন। একসময় কৃষ্ণ রাধারানীর সঙ্গে মিলনের আশায় গোপীবেশ ধারণ করিয়া শ্যামাসখী মেজেছেন, তাঁহার অপরূপ বেশ দর্শন করিয়া সখীগণ বলিলেন, “তুমি কি করিতে পার?” শ্যামাসখী বলিলেন,—“আমি মালা-হার গাঁথতে পারি, প্রয়োজনে পা-টিপতেও পারি। এইভাবে শ্যাম-শ্যামার মিলনক্ষেত্র হইয়াছিল অপরূপ গহ্বর বনের কুঞ্জগলিতে। হংসগোপাল, নির্ঝাক চতুঃসন, কুশলবিহারী ও শ্রীগোপালজী দর্শন করিয়া আমরা অবশেষে পর্বতোপরি শ্রীবৃষভানুপুর বা বর্ধানায় পৌঁছিলাম। চিক্শৌলির পশ্চিমে মুক্তাকুণ্ড এখানে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বিবাদ করিয়া শ্রীরাধারানী মুক্তাক্ষেত করিয়া-ছিলেন। এই লীলা শ্রীল দাসগোস্বামিপাদ তাঁহার ‘মুক্তাচরিত’ গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ভজন-কুটীরের সন্নিকটে পাবন সরোবরের তীরে অবস্থিত নন্দগ্রামের মহাবিদ্যালয়ে আমরা অবস্থান করিয়া নন্দগ্রাম ও বর্ধানায় দর্শনীয় স্থান পরিক্রমা ও দর্শন করিয়াছি।

বর্ধাণা—শ্যাম-শ্যামার মিলন-ক্ষেত্র দর্শন করিয়া ক্রমশঃ আমরা হংসগোপাল, কুশলবিহারীজীউ, শ্রীগোপালজীউ দর্শনান্তে শ্রীবৃষভানুপুর বা বর্ধানায় উপস্থিত হই। বর্ধানায় প্রাকৃতিক শোভা মন হরণ করিয়া থাকে। পর্বতোপরি শ্রীরাধারানীর মন্দির বিরাজমান ও চতুর্নুখ ব্রহ্মাণ্ড আছেন। মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে দাঁড়াইয়া অরণ্যানি ও গ্রামসমূহের অপরূপ শোভা যতদূর দৃষ্টি যায় নখনপথে পতিত হইয়া কি যে আনন্দলহরী শ্রীভগবন্তকৃষ্ণের মনে উখিত হয়, তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা নাই, কে যেন উত্থানরাশি সাজাইয়া রাখিয়াছেন।

শ্রীবার্ভানবীদেবীর নূতন মন্দির হরগুণাল শেঠ মহাশয় কয়েক লক্ষ টাকা দিয়া নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। মন্দিরের কারুকার্যও দর্শনীয়। বর্ষাণা শ্রীরাধারানীর প্রেমে বশীভূত। উচুগ্রামের শ্রীনারায়ণ ভট্টজী বর্ষাণায় শ্রীরাধারানীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করেন, কথিত আছে শ্রীভট্টজী শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য শিল্পেন। এই মন্দিরে শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ বিরাজমান।

শ্রীবৃষভানু মহারাজার মন্দিরের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে বৃষভানুরাজার মূর্তি মাতা কীর্তিদার বিগ্রহ ও অজ্ঞান বিগ্রহগণ বিরাজমান। বর্ষাণার পূর্বদিকে ভানুখোর নামক কুণ্ড আছে। ইহা শ্রীবৃষভানু মহারাজের নামে হইয়াছে, দূর হইতে স্থান নির্দেশ করা হইয়াছে। জাতারো গ্রাম বর্ষাণার দুইমাইল দক্ষিণে, শ্রীভুজবিদ্যা দেবীর জন্মস্থান। সময় সংক্ষেপ বলিয়া দূর হইতেই আমরা দণ্ডবৎ জ্ঞাপন করিয়া অগ্রসর হইতেছি। শ্রীরাধারানীর পিলুফল চরণের স্থানের নাম গিরিপুকুর। শ্রীল নারায়ণ মহারাজজী পরিক্রমার পথে আমাদের শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা বিরয়ক ও অষ্টমথীর লীলা ও স্থান মহাজ্ঞা বর্ণনমুখে আমাদের পথযাত্রার কষ্টকে লাঘব করিয়া দেন। “রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর। জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর॥” শ্রীরাধা-কৃষ্ণের লীলাকথাই আমাদের জীবনসর্বস্ব হউক—ইহাই প্রচারের মূল কথা।

“ব্রজগোপীভাব, হইবে স্বভাব, জ্ঞান ভাব না রহিবে।”

প্রসঙ্গক্রমে রাধারানীর পিতৃ-মাতৃ পরিচয় বলা হইতেছে। পিতা বৃষভানু মহারাজ ও মাতা কীর্তিদা বা কীর্তিকা সুন্দরীর সন্তান—শ্রীদাম, শ্রীরাধারানী ও অনঙ্গমঞ্জরী। বৃষভানু মহারাজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চন্দ্রভানু, তাঁহার কণ্ঠ শ্রীচন্দ্রাবলী। শ্রীকীর্তিদার মাতা মুখরা। নন্দগ্রাম হইতে বর্ষাণার দূরত্ব প্রায় ৮ মাইল, আমরা বর্ষাণার পরিক্রমা শেষ করিয়া বেলা ২টার নন্দগ্রামে প্রত্যাবর্তন করিলাম।

নন্দগ্রাম—হুপুরে প্রসাদ সেবাস্ত্রে বিশ্রাম শেষে পুনরায় নন্দগ্রামের নিম্নলিখিত লীলাস্থানগুলি দর্শন করিলাম, নন্দগ্রামে ৫৬টি কুণ্ড আছে। মাত্র কয়েকটি কুণ্ড আমাদের দর্শন হইয়াছে। নাচকুণ্ড (ঘোল কুণ্ড), কৃষ্ণকুণ্ড, নিত্যাগোপাল শ্রীবিগ্রহ, ললিতাকুণ্ড, শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীর ভজন-

কুটীর, ললিতবিহারী, শ্রীবিগ্রহ মানের শিখা প্রদায়িনী ললিতাদেবীকে প্রণাম, উদ্ধব কেওয়ারী—পূর্বে এইস্থান কদম্ব বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ ছিল। বর্তমানে শুধু মাঠ আর মাঠ,—কোন বনশ্রেণীই নাই। এখানে শ্রীউদ্ধব মহারাজ শ্রীকৃষ্ণবিরহে মৃতপ্রায় শ্রীব্রজবাসীগণকে প্রবোধ দিয়াছিলেন ইহাই ‘ভ্রমরগীতি’ নামে পরিচিত। উদ্ধবকেওয়ারী বিগ্রহস্তুরসের বা বিরহের মূর্ত্যপ্রতীক, আর রাধাকুণ্ড—শ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলনের মূর্ত্তিময় শ্রীবিগ্রহ। একটি ভ্রমর শ্রীরাধিকাপাদপদ্মে ঘোরাফেরা করিয়া মধুপান করিতেছিল তাহাকেই লক্ষ করিয়া ‘ভ্রমরগীতির’ রসাস্বাদন লাভ। উদ্ধব মহারাজ এইস্থানে ১০ মাস অবস্থান করিয়াছিলেন শ্রীব্রজবাসীগণকে প্রবোধ দিবার জন্য।

শ্রীনন্দবৈঠক—শ্রীনন্দমহারাজ গাভী দোহনের সময় বলিতেন ও কেহ কেহ মন্তুণালয় বলিয়া উল্লেখ করেন। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীকৃষ্ণের ও বলদেবের পত্নবংশের পরিচয় লিপিবদ্ধ করিলাম। যত্নবংশীয় দেবমীচ রাজার ক্ষত্রিয়া জ্যৈষ্ঠ-গর্ভে শূর নামক পুত্র হয়, তাঁহার পুত্র বসুদেব বসুদেবের জ্যৈষ্ঠ দেবকী ও তৎপুত্র বাসুদেব। বসুদেবের আর এক স্ত্রী রোহিণী, তাঁহার পুত্র বলরাম। শ্রীদেবমীচের বৈষ্ণা জ্যৈষ্ঠ গর্ভে নন্দ নামে পুত্র হয়, এবং তাঁহার পুত্র নন্দ মহারাজ; নন্দ মহারাজের জ্যৈষ্ঠ যশোমতী বা তাঁহাদের সন্তান কৃষ্ণ ও যোগমায়া। নন্দ মহারাজের পাঁচ ভ্রাতা ও দুই ভগ্নী।

গোপাষ্টমী বা গোষ্ঠাষ্টমী—“ব্রজমণ্ডলে বিশেষ করিয়া রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধনে ও মথুরা-বৃন্দাবনে আজ উৎসবের মেলা। লক্ষ লক্ষ নরনারী ভক্তিভরে—পরিক্রমা করিতেছেন ও আনন্দভরে রাধা-কৃষ্ণের ও গোপীগণের লীলাকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। আমরা নন্দগ্রামে অবস্থান করিয়া সকালবেলাতেই পূজ্যপাদ নারায়ণ মহারাজের আনুগত্যে শ্রীহরিসংকীর্ণনের অনুগমন করিয়া শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর ভজনকুটীর ও শ্রীপাবনবিহারীর মন্দিরে শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া পরিক্রমা করিতে করিতে শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর ভজন-কুটীরে উপস্থিত হইলাম।

শ্রীরূপ গোস্বামীর ভজনস্থলী—এখানে খুব সন্তুর্পণে ও ভক্তিভরে অবনতমস্তকে শ্রীল মহারাজের আদেশে শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদের ভজন-কুটীর পরিক্রমা করিয়া আসন গ্রহণ করিলাম। শ্রীল মহারাজজী এখানে তাঁর অন্তরের ভাব বাণীর মাধ্যমে প্রকাশ করিলেন। শ্রীরূপের বহুবিধ

উপদেশ ও ভজনরহস্য শ্রীল মহারাজজী কীর্তন করিতে করিতে ভাবাবেগে স্বয়ং নয়নজলে পরিশিক্ত হইলেন এবং শ্রোতৃমণ্ডলও অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। কি যে অপরূপ দৃশ্য তখন হইয়াছিল, তাহা চাক্ষুষদর্শন না করিলে অল্পভব করা যাইবে না। তবে সাধারণ শ্রীকৃপানুগ তাঁহারাই এইভাবে উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

শ্রীল রূপগোস্বামীর ভজনস্থলটি অতি অপরূপ শোভায় শোভিত। মনে হয় যেন, প্রকৃতি তাঁহার সমস্ত সুন্দরতম রূপ দিয়া স্থানটিকে ঘিরিয়া রাখিয়াছেন। বিভিন্ন শ্রেণীর গাছপালা নিবিড়ভাবে আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া আপনমনে ভজনস্থলটিকে সাহারা দিতেছে। ছোট একটি টীলার উপর ভজনস্থলটি সকলের চিত্তকেই আকর্ষণ করিয়াছেন। সংলগ্ন কুণ্ডটিও জলপদ্মে ভরপুর। অবশেষে শ্রীল মহারাজজী শ্রীল রূপগোস্বামীর একটি লীলার উল্লেখ করিতে গিয়া বলেন,—একদিন শ্রীল সনাতনগোস্বামী ও শ্রীল রূপগোস্বামী দুইভাই শ্রীরাধাকৃষ্ণ-তত্ত্বালোচনা করিতেছিলেন। ৪ঠাং শ্রীরূপ গোস্বামীর মনে হইল, যদি কিছু দুগ্ধ ও চিনি পাওয়া যায়, তাহা হইলে ক্ষীর করিয়া ঠাকুরের ভোগ দিতেন ও শ্রীল সনাতনগোস্বামীকে পায়স প্রসাদ ভোজন করাইতেন। কিছুক্ষণ পরে একটি বালিকা দুগ্ধ ও চিনি লইয়া আসিয়া শ্রীরূপ গোস্বামীকে দিলেন এবং পায়স রন্ধন করিয়া ঠাকুরকে ভোগ দিতে চলিয়া গেলেন, শ্রীরূপ পায়স রন্ধন করিয়া ঠাকুরকে ভোগ দিলেন। শ্রীল সনাতনগোস্বামী প্রসাদ পাইতে পাইতে প্রেমবিকারে অধৈর্য্য হইলেন এবং শ্রীরূপকে ডিজ্ঞাসা করিলেন যে, দুগ্ধ ও চিনি কেমন করিয়া আসিল। উত্তর শুনিয়া সব বুঝিতে পারিলেন এবং ভবিষ্যতে শ্রীরূপ কার্য্য করিতে শ্রীরূপকে নিবেদন করিলেন। কথায় বলে ভক্তের বোঝা ভগবান বয়। শ্রীরাধাঠাকুরাণী স্বয়ং ভক্তের মনবাসনা পূর্ণ করিবার জন্ত দুগ্ধ ও চিনি বহন করিয়া আনিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ আজ কৃষ্ণার্জুন সংবাদের সার্থকতা বিধান করিলেন—

“অনন্তাশ্চিন্তয়ন্তো মাং-যে জনাঃ পৰ্যুপাসতে।

তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহামাহম্ ॥”

এই প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের একটি বাণীর উল্লেখ না করিয়া নিভেকে সংবরণ করিতে পারিতেছি না,—“শ্রীবৃষভানু-নন্দিনীর কৃপালাভ করতে হলে শ্রীকৃষ্ণমঞ্জরীর আনুগত্য ব্যতীত উপায় নাই।

শ্রীরঘুনাথ দাসগোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের সর্বপ্রধান অঙ্গ। শ্রীজীব রঘুনাথের অঙ্গ। শ্রীকৃষ্ণগোস্বামী যে উপদেশ দিয়েছেন, তাহা পরমহংস বৈষ্ণবগণের হৃদয়ে প্রকাশিত আছে।”

মহাজন গীতিতে পাই,—

“শ্রীকৃষ্ণের কৃপা যেন আমা প্রতি হয়।

সে পদ আশ্রয় বার সেই মহাশয় ॥

প্রভু লোকনাথ কবে সঙ্গে লগ্না যাবে।

শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে মোরে সমর্পিব ॥

শ্রীল মহারাজজীর অপূর্ব পরিবেশন উপস্থিত পরিভ্রমণকারী ভক্তবৃন্দের হৃদয়কে আলোকিত করিয়া দিয়াছেন ক্ষণিকের জন্য। প্রত্যাবর্তনের পথে মহারাজজী আর একটি শুভ সংবাদ পরিবেশন করিলেন যে, বৈকাল বেলা নন্দগ্রামে গোপাষ্টমী উৎসব দর্শন করিবেন। পথিমধ্যে আশ্রয়গ্রহণ মহাদেব দর্শন ও কুণ্ড দর্শন।

গোপাষ্টমী বা গোষ্ঠাষ্টমী—বৈকাল বেলা বাজীরা নিছেরাই মিলিয়া শ্রীনন্দগ্রামে গোপাষ্টমী ও গোষ্ঠাষ্টমী দেখিবার জন্য দলে দলে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে প্রায় দুই মাইল দূরবর্তী স্থানে উপস্থিত হইলেন। স্থানীয় অধিবাসীরা বাশক-বালিকার মধ্য হইতে একজনকে কৃষ্ণবেশে ও একজনকে রাধাবেশে সাজাইয়া পাক্কিতে করিয়া পরিভ্রমণ করেন। তৎসহ কিছু গোবৎস ও গাভীকে সঙ্গে রাখেন। তবে খুব উৎসাহ বাজক নহে। কারণ সাজ-পোষাকে কোন পারিপাট্য নাই রাধা-কৃষ্ণের, লোক সমাগমও তত নয়। উৎসব শেষে সকলে পাহাড়ের সিঁড়ি পার হইয়া শ্রীনন্দবাবার মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। এখানে স্থানীয় মেয়েরা গোপ-গোপী বেশ ধারণ করিয়া রাধাকৃষ্ণের লীলাভিনয় করিতেছেন। মান-অভিমান ও স্নেহভাবে প্রস্তুত করিয়া উপস্থিত দর্শকবৃন্দকে আনন্দদান করিয়াছেন।

শ্রীবিগ্রহগণের সন্মুখোক্ত দর্শন করিয়া আমরা আমাদের বিশ্রামস্থল মহাবিড়ালয়ে ফিরিয়া আসিলাম। গোপাষ্টমী ও গোষ্ঠাষ্টমী উপলক্ষে ভক্তবৃন্দ প্রসাদের উৎসব করিয়াছিলেন। শ্রীল মহারাজজী অল্পসময় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিলেন। ভক্তবৃন্দ শ্রবণ-কীৰ্ত্তন শেষে মহানন্দে প্রসাদ সেবন করিয়া নিদ্রাদেবীর আশ্রয় নিলেন। আগামীকাল সকালবেলা

আমাদের নন্দগ্রামকে বিদায় জানাতে হইবে এবং কোকিল বন, যাবট, কোশী, ছোট বৈঠান, চরণ পাহাড়ী, বিহার বন প্রভৃতির উদ্দেশ্যে যাত্রা করিতে হইবে। এই সংবাদটিও শ্রীল মহারাজজী জানাইয়া রাখিলেন।

যাত্রীগণ শ্রীনন্দগ্রামকে বিদায় জানাতে প্রস্তুত। বাসের অপেক্ষায় অপেক্ষমান। সকাল ৭।৩০ মিঃ ২খানা বাস জালিয়া পরিক্রমাকারী ভক্ত-বৃন্দকে গ্রহণ করিল। তবে একটি বাসে শ্রীশাদ হরিশাধন প্রভুর অধীনের যাত্রীবৃন্দকে এবং শ্রীশাদ বিশ্বরূপ প্রভুর অধীনের যাত্রীবৃন্দকে তোলা হইল। যাত্রাপথ কোকিল বন। বড় রাস্তায় বাস রাখা হইল। সমর্থ ব্যক্তিগণ শ্রীল মহারাজের অনুগত্যে কোকিলবন দর্শন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কুলবৃকে বসিয়া কোকিলের শ্রায় শব্দ করিয়া শ্রীরাধিকাকে সঙ্কেত করিয়াছিলেন। এবং শ্রীরাধারানীর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। যাবট গ্রাম কোকিল বন হইতে এক মাইল দূরে। জটীলা যাবট হইতেই কৃষ্ণের কোকিলসুর শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বনের শোভা অতি চিত্তাকর্ষক। কোকিলকুণ্ড দর্শন হইল।

যাবট—নন্দগ্রামের দুইমাইল উত্তর-পূর্বে শ্রীযাবট গ্রাম। বাসযোগে পৌঁছিলাম। কিছুপথ পরিক্রমা করিতে হইয়াছে। অভিমুখ বা আয়ান ঘোষের বাড়ী, জটীলা কুটিলার গ্রাম। আয়ান ঘোষের মা জটীলা। বোন কুটীলা। শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ শ্রীগোবর্দ্ধন, শ্রীচন্দ্রাবলী, অভিমুখ (আয়ান) শ্রীরাধারানীর মূর্তি দর্শন। রাধারানীর চরণ চিহ্ন দর্শন। রাবণ যেমন ছায়া বা মায়াসীতা হরণ করিয়াছিল। আয়ান ঘোষও তদ্রূপ রাধারানীর ছায়া বিবাহ করিয়াছিল। আত্মশক্তি রাধারানীকে স্পর্শ করিবার ক্ষমতা আয়ান ঘোষের ছিল না। যাবটের অন্তর্গত প্রায় ১৫টি কুণ্ড আছে। সম্ভাব্যভাবে আমরা বাসযোগে কুশী শহরের দিকে অগ্রসর হইলাম।

নন্দগ্রাম হইতে কুশী ৬ মাইল উত্তর-পূর্বে দিকে কুশীতে শ্রীকৃষ্ণ নন্দবাবাকে দ্বারকাধাম দর্শন করাইয়াছিলেন। এখানে গোমতী কুণ্ড আছে। আমরা শহর অতিক্রম করিয়া বড়বৈঠান ও ছোটবৈঠান পৌঁছিলাম। ইহা শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের বসিবার স্থান। ছোটবৈঠানে শ্রীকৃষ্ণ কেশবিন্ধাস করিয়াছিলেন।

চরণপাহাড়ি—আমরা প্রায় তিন মাইল মাঠ-পথ অতিক্রম করিয়া চরণপাহাড়ি পৌঁছিলাম, চলার পথ সহজ ছিল না। দর্শনীয় লীলাঙ্গলগুলি

বর্ণনা করা হইল। এখানে গোপগণ শিলার উপরে দাঁড়াইয়া থাকিবার সময় শ্রীকৃষ্ণ বংশীধ্বনি করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণে প্রস্তুত গলিয়া বর্দ্ধিমতুল্য হওয়ায় গোপগণের পদচিহ্ন অঙ্কিত হইয়া গেল ও তৎসঙ্গে সুরভী, ঘোড়া, হস্তী ও হরিণের পদচিহ্নও শিলায় চিহ্নিত হইয়াছিল। শ্রীল মহারাজ্ঞী অতি আশ্রয়সহকারে পরিক্রমাকারী যাত্রীবৃন্দকে চিহ্নগুলিকে দেখাইয়া দিলেন। শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের শ্রীমন্দির দর্শন ও প্রসাদ গ্রহণ। চরণ গঙ্গা দর্শন। জল লালবর্ণ ধারণ করিয়াছেন। চরণপাহাড়ী ও কোটবনের মধ্যে রাসোলী। শ্রীকৃষ্ণের পরংকালীন রাসলালার স্থান। এই লীলা শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে। রাসোলী, কোটবন ও শেষশায়ীর উদ্দেশে আমরা দণ্ডবৎ জ্ঞাপন করিয়া শেরগড়ের দিকে যাত্রা করিলাম। শেষশায়ী পদক্ষেপ জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ অনন্তশয্যায় কোড়কে শয়ন করিয়া ছিলেন এবং শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের পদসেবা করিয়াছিলেন। মন্দিরে শ্রীনারায়ণ মূর্ত্তি আছেন। ঐতিহ্য-মহাপ্রভু এই বিগ্রহ দর্শন করিয়াছিলেন।

রামঘাট—শেরগড় বা খেলন বন হইয়া আমরা দুই মাইল দূরে যমুনার তীরে রামঘাটে পৌঁছিলাম বেলা ২ ঘটিকায়। যমুনার তীরবর্ত্তী খেলন বনে সখাগণের খেলিবার স্থান। দূর হইতেই আমরা খেলন বনের উদ্দেশে দণ্ডবৎ জ্ঞাপন করিলাম। শ্রীল নারায়ণ মহারাজ দলবলসহ যমুনার তীরে রামঘাটে আসিয়া স্থান সন্মাপন করিলেন এবং স্থান মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে লাগিলেন। গ্রামের নাম উবে। এখানে বলদেব প্রেমসীগণের সহিত দুইমাস রাসবিহার করিয়াছিলেন। নিকটেই বিহার বন। বিশ্রামের পরে আমরা তথায় গিয়া দর্শন করিব, যমুনা দেবী শ্রীবলরামের সঙ্গে সহযোগিতা না করায় শ্রীবলদেবপ্রভু ইমমুনাকে বলদ্বারা আকর্ষণ করিয়া ছিলেন। শ্রীযমুনা এখানে বক্রভাবে প্রবাহিত। এই লীলা শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে। শ্রীল মহারাজ্ঞী যমুনার তীরবর্ত্তী ঘাটগুলির নির্দেশ করিয়া দিলেন। সমস্তাভাবে যাওয়া হইবে না বলিয়া বর্ণনামুখে দর্শন।

রামঘাট হইতে দুইমাইল দক্ষিণে অক্ষয়বট, এইস্থানে বলদেব প্রলম্বাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। এইস্থান বহুতে দুইমাইল দূরে চীরঘাট, কাত্যায়নী ব্রতপরা গোপীগণের বস্ত্রহরণ, শ্রীকৃষ্ণ এইস্থলে করিয়াছিলেন এবং যে কদম্ববৃক্ষের উপর আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহাকে চীর-কদম্ব

কহে। বৃন্দাবনেও চৌরঘাট ও চৌর কদম্বের বর্ণনা আছে। চৌরঘাট হইতে নন্দঘাট তিনমাইল, কার্ত্তিক মাসের একাদশীতে নন্দঘাটে শ্রীমমুনায়ে স্নান করিবার সময় নন্দ মহারাজকে বরুণদেব হরণ করিয়া লয়। শ্রীকৃষ্ণ বরুণালয়ে গিয়া নন্দবাবাকে দ্বাদশীর দিনে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছিলেন। ব্রজবাসীগণ ভয় পাইয়াছিলেন বলিয়া গ্রামের নাম ভয়গাঁও। আশা রাখি শ্রীল মহারাজজী পরবর্ত্তীকালে শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার আয়োজন করিলে এই সমস্ত দর্শনীয় স্থানগুলির বিশদভাবে দর্শন দানের সুযোগ দিবেন। নন্দঘাট হইতে যমুনা পার হইয়া পাণিগ্রামের নিকে রাস্তা গিয়াছে। ঐদিনকার দর্শন বাদ গেল। ব্রহ্মা কর্ত্তক গোপবালক ও গোবৎস-হরণ, তৎকর্ত্তক অপহৃত গোপবালকগণকে শ্রীকৃষ্ণের নিকট হাতির, শ্রীকৃষ্ণের শুবস্তুতি ইত্যাদি লীলাঙ্গলী পরবর্ত্তীকালে দর্শনের আশায় গহিল।

(ক্রমশঃ)

— শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

অষ্ট মহাদ্বাদশী

(পূর্ব প্রকাশিতের ৩২শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা পৃষ্ঠার পর)

আরও দেখা যায় পারগপ্রসঙ্গ “বুদ্ধোভিত্তিখোরমিকা তিথিশ্চেৎ”— “স্ত্যাস্তেতিথিনুমা” ইত্যাদিতে তিথিরই প্রাধান্য এবং তাহাও নক্ষত্র-পেক্ষাই; বলিতে হইবে। আরও লক্ষ্য করুন এই যে তিথি-নক্ষত্র-সম্বন্ধ বিচারেই ‘অধিকা’ ‘নূনা’ শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহা সাপেক্ষ তাই পরস্পরাপেক্ষ কাঙ্ছেই নক্ষত্রের বেলায় অপেক্ষার বিষয় তিথিই হইবে, অন্য নহে। তাই তথায়ও সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে নক্ষত্র প্রবৃত্তির একটিমাত্র বচন থেকেই উদয়ের সঙ্গে নক্ষত্রের মানের অপেক্ষা কল্পনাযুক্ত হয় না। কারণ তাহার পরই “কিঞ্চা সূর্য্যোদয়াৎ পূর্ব্বং” বলার ব্যভিচার হইয়া গেল, অব্যভিচারি সম্বন্ধ হইয়া গেল, অব্যভিচারি সম্বন্ধ থাকিল না। কিন্তু দ্বাদশীর সঙ্গে সম্বন্ধের কখনও ব্যভিচার হইবে না বলিয়া তাহারই গুরুত্ব বেশী। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, হরিভক্তিবিলাসকার তিথিনক্ষত্রের বর্ণনাত্মকতা বুঝাইতে কোথায়ও সম শব্দ ব্যবহার করেন নাই “বুদ্ধৌ ভক্তিদোঃ” স্থলে

বুঝি শব্দই দিয়াছেন ! উভয়ের তুলনাতেই ঐখানেই অধিক শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। কাজেই নূনাত্মিক বলিলেই প্রতিযোগী অযোগ্য শব্দসাপেক্ষ হয়। তাহাতেও পক্ষদ্বী বিতর্কিত প্রযুক্ত হয়। অর্কোদয়মারভ্য বলিলেই তাহা সাপেক্ষ হয় না উহা মুহূর্ত্তের বাণীর ক্ষণবৃত্তি আর নক্ষত্র সম-নূন বলায় তার ঐতিহাসিক বর্ষী দণ্ডের নূনাত্মিককাল—কাজেই তুই এরতুলনা হয় না। সম-স্তরের বস্তুরই তারতম্য বিচার হয়, গাছের সঙ্গে মাছের হয় না। তাই তার জন্ম অপর সূর্যোদয় পর্য্যন্ত কালের লক্ষণা করিয়া দিন-মাস আনিয়ন ব্যাপ্তিতে হয়। যখন শকার্থে অল্প চলি তখন অন্য নিরর্থক। বিশেষতঃ শ্রুতিতে বা পুরাণেও লক্ষ্যার্থ গ্রাহ্য নয়। কাজেই তিথি ও নক্ষত্র উভয়ের মান স্বাভাবিক ৬০ দণ্ড হেতু তাহারি সম এবং মুখ্যতঃ তাদেরই যোগে ব্রহ্ম বলায় উভয়ের মানেরই সম-নূনাত্মিকতা করণা স্বাভাবিক ও স্বরূপ হয়, তদ্বিনেরই মাত্র তিথি নক্ষত্র মানগ্রাহ্য পূর্ণপর দিনের নয়—একথাও অযৌক্তিক যেহেতু একাদশীর রাত্রে দ্বাদশী আরম্ভ হইলেও তিথি সে অংশে একাদশী হয় না দ্বাদশীই থাকে, নক্ষত্রও তাই। কাজেই উভয় দিনের ঋণুমান ধরিয়াই তিথির পূর্ণমান হয়, তাহা লওয়াই যুক্তিসহ হইবে। নক্ষত্রেরও সেক্ষেপ হইবে। তাহা না হইলে তাহাদের বৃদ্ধির প্রমাণই উঠে না। পক্ষবর্জিনী লোপ হয়, উন্মিলন্যাদিও থাকে না। “তিথিমধ্যেই পারণং কথাও থাকে না। কাজেই উভয় দিনের ঋণু তিথিও নক্ষত্রের মান হয়। নতুবা মানবৃদ্ধি কথাটাও নিরর্থক হয়। একদিনের মাত্র তিথি নক্ষত্রে প্রায়ই তাহা সম্ভব হয় না। আরও ব্রহ্মে দ্বাদশীরই মুখ্যতা অথচ সেই দ্বাদশীরই মাত্র সূর্যাস্ত মান পর্য্যন্ত সেদিনে স্থায়িত্বের অপেক্ষা অবশ্যই তাহাও নাই, কাজেই নক্ষত্র সম্বন্ধে ততোধিক স্থায়িত্ব কল্পনা নিরর্থক। বিশেষতঃ অবশ্যই বিজয়া প্রসঙ্গে মাত্র মুহূর্ত্তের যোগ হইলেই ব্রহ্ম কইবে, ইহাই গোয়ামী-মত সিদ্ধ; তাহার প্রমাণও মূল টীকার পাওয়া যায়। স্ততরাং তিথির সঙ্গে নক্ষত্রের যোগ মাত্রই আবশ্যিক এবং নূনাত্মিক্যও তদযুক্ত তিথির অপেক্ষায়ই গ্রাহ্য। ইহাই স্বাভাবিক অভিশ্রায় বলিতে হয়। “যদি ন প্রাপাতে স্বাক্ষং দ্বাদশ্যাং বৈষ্ণবং কচিৎ” টীকার “রাত্রাদাবাপি” এইরূপই বলা হইয়াছে। অন্ততঃ দ্বিকল যোগেও বলা হইয়াছে। দ্বিবারাত্র মানের সঙ্গে ন দ্বাত্রিমান ধরিলে এবং সূর্যাস্ত পর্য্যন্ত দ্বাদশীর স্থায়িত্ব স্বীকার করিলে এসব বচনগুলি নিরর্থক হইয়া পড়ে না কি ? উহাতে সূর্যোদয় হইতে

সূর্যাস্ত পর্যন্ত তিথি নক্ষত্রের স্থায়িত্ব আপত্তিত হইলে ঐসব উক্তি কোন ব্রতকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন? হারও পরের দিন পারণে “তাবত্যাং নিশি” “স্বয়োনিশা ব্যাপ্তৌ” এসব ভাঙ কেমন করিয়া সম্ভব হয়? পূর্কদিনে সূর্য্যোদয় বা তৎপূর্ব প্রবৃত্ত নক্ষত্র বা তিথি কেমন করিয়া পরের দিন রাত্রি পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়? তাহাও ভাবিবার বিষয় নয় কি? আরও শ্রীহরিভক্তি-বিলাসের মৌলী বিচারে দেখা যায় কোথায়ও যজ্ঞী দণ্ডান্বিতা তিথি বুঝাইতে ‘সমা’ শব্দ নাই। “পূর্ণা” বা সম্পূর্ণা’ প্রভৃতিই বলিয়াছেন। অনিষ্টপ্রাপ্তা তিথিতেও ‘বুদ্ধি’ শব্দই ‘অধিকারি’ নয় সর্বত্রই সেক্ষেপ আছে। যদি অন্য নিবন্ধকার সেক্ষেপ কিছু শব্দ ব্যবহার করিয়াও থাকেন, তথাপি নিজের পরিভাষা ছাড়িয়া কোন আচার্য্যই স্বগ্রন্থে অস্ত্রের পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করেন না। একটা দৃষ্টান্ত লওয়া যাক্—মনে করুন যজ্ঞ ও মধু উভয়ের একটি কাজ করার কথা। যদি সূর্য্যোদয় হইতে বা তার পূর্ব হইতেই মধু লে কাজটি আরম্ভ করে, তার আগে বা পরে বা সঙ্গেও যজ্ঞ কাজে লাগে, তবে কাজের কম বেশী করার বিচার কি তাদের মধ্যে হইবে না, অস্ত্রের সঙ্গে করা যাইবে? এখানেও সেক্ষেপ “ঋক্ষস্ত সতি চাধিক্যে তিথি মযো হি পারণং” এই আধিক্য যেমন তিথি অপেক্ষায়, সেক্ষেপই সম-ন্যনাধিক্যও বুঝিতে হইবে।

যদি এসবের পরিহারের জন্ত স্বতঃ ন্যূনাধিক্যাদির মতই গ্রহণীয় বলেন অর্থাৎ ৬০ দণ্ডের অপেক্ষায় ন্যূনাধিক্য বসেন, তাহা হইলেও সূর্য্যোদয়ের পূর্ব প্রবৃত্ত নক্ষত্রের ন্যূনত্বেরই সেদিন সম্ভাবনা বেশী থাকায় তাহার বিধি না থাকায় ব্রতের লোপ-প্রসঙ্গ আসে, ব্রতের নিত্যত্বের অসামঞ্জস্যই হয়। যদিও এখানে দিনমান, তিথিমান বা স্বমান এই তিনের সঙ্গেই ন্যূনাধিক্যের সম্ভাবনা করা যায়, কিছু মুক্তি সবাই দেখাইতে পারেন, তথাপি কাহার সঙ্গে মুখ্য বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, তিথির সঙ্গেই স্বাক্ষাতা বেশী এবং তাহাকে লইয়াই ব্রত বলায় তারই সঙ্গে সমাদি বলিতে হয়। এখানে দিনমান ও স্বমান ৬০ দণ্ড স্থির ধরিলে স্বাক্ষাত্য কমই হয়। তিথি—নক্ষত্র উভয়ই হ্রাস-বৃদ্ধিশীল, স্বতরাং স্বজাতীয় এবং সেজন্য তাহাদের তুলনা গ্রাহ্যমত। ইহাই আমারও দৃঢ় মত।

শ্রীনৃসিংহ পরিচর্য্যার মতেও ৪ নক্ষত্র যোগেই ব্রত হইবে বলা আছে। নক্ষত্র সূর্য্যোদয়ে থাকিতে পারে মাত্র বলিলেন এবং প্রবৃত্ত হইলে পরদিন

ব্রত হইবে, তাহাই সম্ভব। আর নক্ষত্র সমত্ব-ন্যূনাদি পারণ প্রসঙ্গেই আলোচনা করিয়াছেন, ব্রতে নয়। দ্বাদশীর মাত্র জ্যৈষ্ঠই বিচার্য্য, তাহাও প্রণয় ততটা করেন নাই। “চতুস্তথ্যং দিনাদেৰ্ভবেৎ, প্রাগ্তেচ পশ্চাৎ ব্রতম্। স্বৰ্যোদয়মারম্ভ্য নক্ষত্রেণ ভবিতব্যং” এসব বাক্যই তাহার প্রমাণ। আরও “ধদা নক্ষত্রবৃদ্ধৌ সূৰ্যোদয়াৎ শ্রাক্ প্রবৃত্তানি নক্ষত্রানি সামাধিক্যং বা ভজন্তে তদ্বা স্বৰ্যোদয়াত্মণ্যেব নক্ষত্রেণ ভবিতব্যমিতি ন নিয়মঃ”—এই কথাও অসামঞ্জস্য হয়। নক্ষত্র বৃদ্ধি হইলে বলিলেই সূৰ্যোদয় অতিক্রম করিবে বুঝায়। সেমতে পূৰ্ব্বপ্রবৃত্ত হইলে অতিক্রম করিবে না বলিলেন। আবার সামাধিক্যং বা ভজন্তে কথায় কাহার সঙ্গে সামাধিক্য? কাজেই এসবের পারণ প্রসঙ্গেই যোগ রাখিয়া স্বৰ্যোদয়ে প্রবৃত্ত নক্ষত্র স্থলে ব্রত হইবে, পূৰ্ব্বপ্রবৃত্ত স্থলেও হইবে।

সূৰ্যোদয়ে প্রবৃত্ত হইলে বৃদ্ধি ভিন্ন আধিকা সম্ভব নয়। পূৰ্ব্বপ্রবৃত্তে আধিকোর সম্ভব নাই। অরুণোদয় মাত্র প্রবৃত্তে সম্ভাবনা হইলেও তৎপূৰ্ব্ব প্রবৃত্ত নক্ষত্রে ব্রতলোপাপত্তি।

এমতে দ্বাদশী সূর্যাস্ত পর্য্যন্ত থাকিবে। নক্ষত্র প্রায় দিবারাত্র থাকিবে তবে আর “অত্যাল্লোহপোনয়োৰ্যোগঃ” বচনের সার্থকতা কি? তাহাও ভাবিবেন আর দিবারাত্র অতিক্রান্ত তিথিতে “ভূত্বা চ যজ্ঞী ষটিকা দৃশ্যতে প্রতিপদ্বিনে” বলারই বা সার্থকতা কি ভাবুন।

তারপর নির্ণয়সিদ্ধকায় “পূৰ্ণ্যাক্ষয়কায় জয়া পাপনাশিনী” ইত্যাদি তাহার মতেও যোগমাত্রই গ্রাহ্য, প্রবৃত্তির লোপবিচার নাই, স্থিতিরও নাই। তবে তিনি “ব্রতঃ মাপক্ষয় মুক্তিকায় উপবসেৎ” বলায় কাম্যত্বই এবং “একাদশী দ্বাদশ্যোঃ পার্থক্যে তু অশক্তস্ত তু দ্বাদশ্যেব উপোষ্টা” এইরূপ সিদ্ধান্তই করিলেন, তাহাও শ্রীহরিভক্তিবিলাসকার খণ্ডনই করিয়াছেন।

অতএব মহাদ্বাদশী স্থলে সকলেরই তাহা করাই কর্তব্য—ইহাই আমাদের স্থির সিদ্ধান্ত।

—শ্রীশ্রীরামচন্দ্র পঞ্চতীর্থ, বি, এ (অনাস)

প্রাক্তন অধ্যক্ষ,

নবদ্বীপ সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় .

সমাজে মানবতার রূপ-সৌন্দর্য

ইট তৈরী করার সঙ্গে সঙ্গে পর পর একটা একটা ক'রে রেখে সাজান হয়, এইভাবে সাজিয়ে রাখাকে পাঁজা বলা হয়। ইটের পাঁজা মানুষের বস-বাসের উপযুক্ত নয়। ইট পর পর রাখলে ভুটো ইটের মধ্যে যে ফাঁক থাকে তা চুপ, সুরকীর মশলা অথবা সিমেন্ট দিয়ে বন্ধ ক'রে, আলো, বাতাস প্রবেশের জন্য জানালা, দরজা বসিয়ে ঘর তৈরী করলে তখন বসবাসের উপযোগী হবে।

কতকগুলি মানুষ ক'লেট রাষ্ট্র হয় না, রাষ্ট্র না গড়ে উঠলে সমাজ হয় না, আবার সমাজ-ব্যবস্থা না হ'লে জাতি তৈরী হয় না। মানুষে মানুষে ব্যবধান চিরকালই আছে থাকবেও। মানুষে মানুষে দরকার ভালবাসা বা প্রীতিরূপ সিমেন্ট। এই মিলনে গড়ে উঠবে রাষ্ট্র। রাষ্ট্রগঠন হ'লে ঘরে আলো, বাতাস প্রবেশ করানোর জন্য জানালা, দরজার মত প্রয়োজন সমাজ। সমাজ তৈরী ক'রে জাতি। সম্প্রতি ভালবাসা দিয়ে মানুষে মানুষে যে ব্যবধান দূর হয়, তার নাম মানবতা। ঈশ্বরকে ভালোবাসার নাম প্রেম, মানুষকে ভালোবাসার নাম মানব-প্রীতি। ঈশ্বরে বা ভগবানে বিশ্বাস না থাকলে মানব-প্রীতির ভিত্তি দৃঢ় হবে না। আর ভিত্তি সূচুট না হ'লে জাতি সংগঠন হবে না।

আমরা আত্মভোলা জাতি। অতীতে আমরা কী ছিলাম, এখন কী হ'য়েছি তেবে দেখি না। পশ্চিমের দিকে চেয়ে বসে থেকে এটা সারেসের যুগ, সারেসের যুগ বলে চীৎকার ক'রে চারিদিক মুখর করছি ধর্মকে অবহেলা ক'রে। এখানে ধর্ম মানে ইংরাজী ভাষার রিলিজিয়ন (Religion) নয় রাইশাসনেস (Righteousness)। ধর্মের ইংরাজী অনুবাদ, Religion ক'রলে ঠিক হবে না। আমরা বলি আগুনের ধর্মই হচ্ছে পোড়ানো। ইংরাজী অনুবাদ করে যদি বলা হয় Burning is the religion of fire তাহ'লে কথাটা ভুল হবে না কি? যার যা করণীর কর্ম, তাই তার ধর্ম। অলস হ'য়ে কর্মহীন অবস্থায় যার যা কাজ নয় তা করা অর্থাৎ অনুচিত কাজ করা পাপ, তাতে জাতি, সমাজ সংগঠন হয় না। আমরা ষাঁদের দিকে চেয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি না, বিজ্ঞানের যুগ, বিজ্ঞানের যুগ বলে চীৎকার করি, তাঁরাই বলেন, act act in the living present, heart within and God over head. আসল মানে মাথার উপর ঈশ্বর আছেন, মনে শ্রোণে বিশ্বাস রেখে কাজ কর। শ্রীগীতায় আছে— 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।' মূল কথা যার যা কাজ

আত্মপ্রত্যয় রেখে তার তাই করা উচিত। Mr. Arnold একজন ইংরাজ, তিনি তাঁর 'The Song Celestial' কবিতায় লিখেছেন—

"To die performing duty is no ill

But who seeks other roads shall wander still."

এতে বেশ বোঝা যাচ্ছে লোক ধর্ম্মানির্কিশেবে প্রত্যেকেরই নিজ নিজ কাজ করা কর্তব্য—ইংরাজ জাতিও বিশ্বাস করেন এবং মানেন।

দাপর যুগ আর কলিযুগের সন্ধিক্ষণে খ্রীমন্ত্ৰ'গবত জাতিকে অবনতির হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। মানুষের মতি-গতি কালের প্রভাবে মিয়গামী ও ওয়ায় মানুষ আবার দুর্দিশাগ্রস্ত হ'য়ে পড়ে। মানুষকে বাঁচাতে খ্রীণোরাজ মহাপ্রভু আর্গীভূত হ'য়ে জাতিকে বাঁচিয়েছিলেন ঐশ্বরিক প্রেম দিয়ে নিবিড় মানব-প্ৰীতি গাড়ে যার ফলে নীচতা, স্বার্থপরতা, হিংসা, মনের মলিনতা সমাজ থেকে ক'মে গিয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনপথে বাধা স'রে গেল সম-মতাবলম্বী হ'য়ে জাতি বাঁচল।

অতীতের কথা আমাদের ভুললে চলবে না, কারণ সেটাই আমাদের ভিত্তি। পুরাণের সঙ্গে যোগ না থাকলে জাতির মৃত্যু অনিবার্য্য, যেমন গাছের শিকড়ের সঙ্গে যোগ না থাকলে গাছ বাঁচতে পারে না। পুরাণে ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্ঘব না রাখার ফলে রোগ, গ্রীস, ব্যাবিলন প্রভৃতি দেশের সভ্যতা লোপ পেয়েছে। এই লোপ পাওয়াটাই জাতির মৃত্যু। শরীরকে বাঁচাতে যেমন হার্ট (Heart) সবল রাখা একান্ত প্রয়োজন, হার্ট ফেল (Heart fail) ক'রলে মৃত্যু অবধারিত। সেইরকম নিজেদের বাঁচাতে মানব-প্ৰীতি, যার নাম মানবতা, উহা স্মৃদু রাখতে হবে।

আমাদের এই দুর্দিনে সকলের এগটাই মত—প্রথ-শান্তি চাই। আমাদের শাস্ত্র 'শ্রুতি' বলেছেন নাল্লে 'সুখশান্তি'। অল্লে সুখ নাই, অর্থাৎ ছোটতে হবে না বড়কে দরকার। সাম্ভারিক ব্যাপারে আমরা সবাই বড় হ'তে চাই। অফিসের কর্মচারী চান পদোন্নতি অর্থাৎ প্রমোশন (promotion) যার বাড়ী ছোট, তিনি বড় বাড়ী চান আরামে থাকার জন্য। যিনি দরিদ্র, তিনি ধনী হ'তে চান স্বচ্ছলতা লাভ করা তাঁর কাম্য। যিনি আধ্যাত্মিক জীবনে অগ্রসর হ'তে চান তাঁর ইচ্ছা উপাসনা দ্বারা নিত্য-শান্তি লাভ করা। দেখা যাচ্ছে সকলেই বড়কে পেতে বা কাছ আনতে আগ্রহী।

আজন্ম তপস্বী শ্রীশুকদেবের ভাষায় “নমঃ সর্বেষু ভূতেষু।” সম-মতাবলম্বী হ’য়ে আমরা যদি মানব-প্রীতি গড়ে তুলি তাহ’লেই আমাদের রাষ্ট্র, সমাজ মুখ শান্তির মুখ দেখতে পাবে। মানব-প্রীতি আমাদের লক্ষ্য বস্তু এটাই স্মরণ রেখে চলতে হবে। মানবপ্রীতিকে বাদ দিয়ে ঈশ্বরে প্রেম হয় না আর ঐশ্বরিক প্রেম বাদ দিলে মানব-প্রীতি আসবে না। ভগবানের সঙ্গে জীবের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ঈশ্বরকে ভালবেশে মানুষ ভগ্নপোরে ওঠে, সে ভালবাসার নাম প্রেম আর ভগবান মানুষকে ভালবেশে তার কাছে আসেন সেই ভালবাসার নাম করুণা। ভালবাসা জিনিষ একটাই, প্রয়োগরূপ ভিন্ন। বাপ, মাকে ভালবাসাও ভালবাসা আর স্ত্রী, পুত্রদের ভালবাসাও ভালবাসা, মাত্র রূপ ও নাম ভিন্ন যথা—শ্রদ্ধা দ্বেহ ইত্যাদি।

তুলসী মঞ্চে প্রদীপ জ্বলছে না, দেখে জানা গেল প্রদীপে তেল নেই। বাড়ী, ঘর অন্ধকার কারণ জানা গেল লোডশেডিং (Load Shedding) প্রদীপে তেল না থাকার কারণ তেলের সরবরাহ নেই। লোডশেডিং হওয়ার কারণ Plant Elec. Energy Supply ক’রতে পারছে না যার জন্য বাড়ী, ঘর, রাস্তা সব অন্ধকার। সকলেই অন্ধকারে বিব্রত, ভাবছে কখন তেল পাওয়া যাবে আর ইলেকট্রিকই বা কখন আসবে। এই সবেল ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত বিব্রত থাকতেই হবে।

আমাদের দেশের দুর্দিনে সকলে দুর্দশাগ্রস্ত হ’লেও জিনিষ-পত্রের দাম হ্র-হ্র ক’রে বেড়েই চ’লেছে। আমাদের দুর্দশাগ্রস্ত হওয়ার প্রধান কারণ হ’লো আমাদের জ্ঞানের আলো অস্তমিত। অস্তমিত বস্তুর পুনরায় উদয় না হওয়া পর্যন্ত বিব্রত থাকতেই হবে, সূর্য্য অস্ত যাওয়ার পর পুনরায় উদয় না হওয়ার মত। রবির উদয়ে বিশ্ব তাঁরই কিরণজালে জ্যোতিপ্রাপ্ত হ’য়ে আনন্দে পুলকিত হয়।

আমার বক্তব্য—দুর্দশা মোচন ক’রতে মানব-প্রীতি অর্থাৎ মানবতার প্রতি লক্ষ্য রেখে গ’ড়ে তুলতে হবে সামাজিক জীবন, রাষ্ট্র তা’ ক’রতে প্রয়োজন এক ত্র হওয়া, সোজা ভাষায় সম-মতাবলম্বী হ’য়ে কাজ করা।

—শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

(কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাক্তন অফিসার)

কলিকাতা—৫৩

শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয়মঠে ব্যাসপূজা-কালে

ব্যাসপূজা কাহাকে বলে ?

শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব-দিবসে ব্যাসপূজার অধিবেশন হয়। ব্যাসপূজার অর্থই গুরুপূজা। শ্রীগুরুপূজা বা ব্যাসপূজার কোনও ভেদ নাই। গোড়ীর বৈষ্ণবগণ স্ব-স্ব গুরুদেবের আবির্ভাব-তিথিতেই শ্রীবাসদেবের স্মরণ করিয়া থাকেন। শ্রীমন্নৃসিংহপ্রভু মিত্রানন্দ প্রভু দ্বারা শ্রীবাস-অঙ্কনে এই পূজার প্রথম অধিবেশন করেন। শ্রীমন্নৃসিংহপ্রভুর প্রবর্তিত ব্যাসপূজার আচার-বিচার-পদ্ধতি কালক্রমে বিলুপ্ত হইয়া যায়। পরে শ্রীল প্রভুপাদ উহার উদ্ধার সাধন করিয়া ব্যাসানুগত্যের আদর্শ স্থাপন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ কর্তৃক সংগৃহীত ও শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর দ্বারা সংশোধিত ও পরিবর্তিত শ্রীবাসপূজা-পদ্ধতি শ্রীগোড়ীয়-পত্রিকা, ৪র্থ বর্ষ, ৩য় সংখ্যায় উল্লেখ আছে। শ্রীবাসপূজার অর্থ শুধু ব্যাসদেবের পূজা নহে; তদনুগত শ্রীগুরুবর্গের পূজাকেও লক্ষ্য করে। শ্রীবাসপূজা-পদ্ধতি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ-পঞ্চক, শ্রীসনকাদি-পঞ্চক, শ্রীবাসপঞ্চক, ব্রহ্মাদি আচার্য্যপঞ্চক এবং তত্ত্ব-পঞ্চকের ষোড়শোপচারে পূজা ও ভোগরাগ যথাবীতি পালনীয়।

সনাতন ধর্ম ও মায়াবাদ

ভাগবত-ধর্ম বা বৈষ্ণব-ধর্ম তথা সনাতন-ধর্ম কোনও ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ নহে। ইহা জীবের স্বরূপ-ধর্ম এবং সনাতন। সারা পৃথিবীতে ইহা আজ ব্যাপক বিস্তার লাভ করিয়াছে। সনাতন-ধর্মের অজ্ঞতম প্রকাশক শ্রীবাসদেবই আমাদের সর্বকালে সর্ববিষয়ে পথপ্রদর্শক। নিত্য স্থিতিশীল, অপরিবর্তনীয় ও অবিনাশী তাহাকে সনাতন বলা হয়। শ্রীভগবানের সেবা-পূজা একান্ত মনে তাহারই শরণ, শূণ্য-কীর্তন জীবের একমাত্র শ্রেষ্ঠ কর্তব্য। শাস্ত্রের অদ্বৈতবাদ ও বৌদ্ধের শূন্যবাদ সনাতন ধর্ম-বিরুদ্ধ। যাহারা নাস্তিক, যাহারা ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না তাহারাই মায়াবাদী। মায়াবাদ বা *স্বরাচার্য্যের বিবর্তবাদ একই কথা। যে-জিনিষ যাহা নয় সেই জিনিষকে তাহা বলাই বিবর্তবাদ; ইহার নামান্তর মায়াবাদ।

১৫১০ খৃঃ ৭ই বৈশাখ মহাপ্রভু যখন দাক্ষিণাত্যে প্রচারে গিয়াছিলেন তখন বিশেষভাবে শাস্ত্রের অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদ এবং বৌদ্ধের শূন্যবাদ খণ্ডন করিয়া সনাতন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাহার জৈবধর্ম গ্রন্থে মায়াবাদ সম্বন্ধে এরূপ লিখিয়াছেন, “অল্পরগণ ভক্তিপথের ভান করিয়া দুই উদ্দেশ্য সফল করিবার

চেষ্টা করিতে লাগিল ইহা দেখিয়া করুণাময় ভগবান সরলহৃদয় জীবদিগের প্রতি ভক্তবাৎসল্য প্রযুক্ত, ঐ অস্বরগণ যাহাতে ভক্তিপথকে ভ্রষ্ট করিতে না পারে তাহা চিন্তা করিয়া শিশুস্বরূপে আত্মান করিয়া বলিলেন,— হে শস্ত্রো! তামস-প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট অস্বরগণের নিকট আমরা শুদ্ধভক্তি প্রচার করিলে জগতের নন্দন হইবে না। তুমি অস্বরদিগকে মোহিত করিবার জন্য এমন একটি শাস্ত্র প্রচার কর যাহাতে আমাকে গোপন রাখিয়া মায়াবাদ প্রকাশিত হয়। আত্মরিক চিন্তামগ্ন ভীষ্মকল শুদ্ধভক্তি-পথ পরিত্যাগ করিয়া সেই মায়াবাদ আশ্রয় করিলে আমার ভক্ত শুদ্ধভক্তি নিঃসংশয়ে আত্মদান করিবেন।”

গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে দু'চার কথা

গুরুর জয়গান ব্যাসপূজার একটি অঙ্গ। ভগবৎতত্ত্ব ও ভগবানের জয়গান যেক্রপ শ্রুতিমধুর, গুরুতত্ত্ব ও গুরুর জয়গান সেইরূপ শ্রুতি-মধুর, মনে হয় আরও বলি, আরো বলি; যেক্রপ মহারাজ পরীক্ষিৎ গুরুদেব গোয়ামীকে বলিয়াছিলেন, হে দেব! ভগবানের মধুর লীলাকথা আরো বলুন, আরো বলুন। কিন্তু অনুবিধা হচ্ছে সময় অতি অল্প।

যত্বপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।

তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ।

যদিও শ্রীগুরুদেব চৈতন্যের অর্থাৎ ভগবানের দাস, তথাপি আমি তাঁহাকে ভগবানের প্রকাশ-তত্ত্ব বলিয়া মনে করি। গুরুদেব ভগবানের প্রকাশ-তত্ত্ব হইলেও সাক্ষাৎ ভগবান নহেন;—ভগবানের একান্ত প্রেষ্ঠ অর্থাৎ প্রিয়পার্বদ। অনেকে ইহা ভুল করেন। শ্রীল প্রভুপাদ ইহা আমাদের পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। গুরুকে কৃষ্ণ বলিয়া মনে করা মায়াবাদীর মত।

গুরুসেবা দুই প্রকার—যথা (১) পরিচর্য্যারূপা ও (২) প্রসঙ্গরূপা। শ্রীগুরুদেবের নিকট ভগবৎকথা শ্রবণকে প্রসঙ্গরূপা সেবা বলে। প্রসঙ্গরূপা সেবা হইতে পরিচর্য্যারূপা সেবা অধিক ফলদায়ক।

প্রসঙ্গরূপা সেবার ফল, যথা :—

সত্যং প্রসঙ্গান্মম বীৰ্য্যসংবিদো

ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।

তজ্জোষণাদাশ্বপর্ববয়ানি।

শ্রদ্ধাঃ রতির্ভক্তিঃ কৃষ্ণমিত্যুতিঃ। (ভাঃ ৩.২৫/২৫)

সাধুসঙ্গে আমার মাহাত্ম্য-প্রকাশক স্ববর্ণ-রসায়ন কথাসকল আলোচিত হয়। সেই সেই কথাসকল শ্রবণ করিতে করিতে অপবর্ণপদ-স্বরূপ আমাতে প্রথমে জ্ঞান, পরে রতি ও অবশেষে প্রেমভক্তির উদয় হয়।

পরিচর্যাক্রপা সেবার ফল, যথা :—

যৎসেবয়া ভগবতঃ কুটস্থস্ত মধুদ্বিধঃ ।

৪তি রাসো ভগৱৎ তীরঃ পাদয়ো বাদনাদনঃ ॥ (ভাঃ ৩।৭।১৯)

যে ভগবৎসেবায় সেবা-দ্বারা নির্বিকার সর্বকালব্যাপী মধুসূদনের পদযুগলে একান্তিক প্রেমোৎসব উদ্ভিত হয় এবং আনুসঙ্গিক ফলে সংসার বন্ধনাদিরও নাশ হইয়া থাকে।

গুরুদেবের অসুস্থ অভিনয়ে কোনও প্রাকৃত বুদ্ধির আরোপ করিতে নাই তাহাতে দোষ হয়। ভগবানের নিজজন নিত্যদ্বিধ পার্শ্বদগণের যে অসুস্থতার অভিনয়, তাহা একদিকে যেমন অভ্যস্ত বিমূৰ্খ ও অপরাধী ব্যক্তিগণকে বন্ধনা করিয়া মহাপুরুষগণের বিপ্রলম্বন ভক্তনের আদর্শ প্রকাশ করে, অপরদিকে তেমনি সেবামুখ ব্যক্তিগণকে সেবা-সুযোগ দান এবং জাগতিক ক্রেশের মধ্যেও হরিসেবার তীব্রতর ঢেউ ও উৎসাহ প্রদর্শনের শিক্ষার প্রত্যক্ষ আদর্শ প্রচার করিয়া থাকে। নিত্যদ্বিধ ভগবৎপার্ষদ শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীর অসুস্থ অভিনয়ে শ্রীঈশ্বরপুরীর সেবাবৃত্তিই প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু গুরু ও ভগবানের চরণে অপরাধ প্রদর্শনকারী রামচন্দ্রপুরীর তাহাতে অনুরূপ বুদ্ধির উদয় হয়। রামচন্দ্রপুরী শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর বিপ্রলম্ব রোদন শুনিয়া বিচার করিয়াছিলেন, ব্রজাবদ গুরুদেব কেনই বা ক্রন্দন করিবেন? যথা :—

তুমি পূর্ণ ব্রহ্মানন্দ করহ স্মরণ।

ব্রজাবদ হইয়া কেনে করহ রোদন?

অর্থাৎ, তুমি ভগবানকে জান এবং দিব্যরাজ তাহারই স্মরণ কর, তবুও অসুখের জন্ত ক্রন্দন কর কেন? কিন্তু ঈশ্বরপুরীর সে প্রকার ভ্রুবুদ্ধি হয় নাই, তিনি মাধবেন্দ্রপুরীর মল-মূত্রাদি বহন্তে মার্জন করিয়াছিলেন, যথা :—

ঈশ্বর পুরী করে ক্রীণাব সেবন।

বহন্তে করেন মল-মূলাদি মার্জন ॥ (চৈঃ চঃ)

শ্রীঈশ্বরপুরী গুরুপাদপদ্মের শিক্ষা অনুসরণ করিয়া ইহাই জানিয়াছিলেন যে, মহাভাগবতগণ যে-অসুস্থতার অভিনয় করেন তাহা বদ্ধজীবগণের কর্মফলজ্ঞানতের ছায় নহে, পরন্তু বিপ্রলম্ব বিরহময় ভক্তনের আদর্শমাত্র।

গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীগং ভক্তিবাদ্যন্ত স্বামী মহারাজের “Easy journey to other planets” গ্রন্থে উল্লেখ আছে,—

কেমন করিয়া অপ্রাকৃত ধাম বৈকুণ্ঠে যাওয়া যায়—যেখানে জন্ম, মৃত্যু, ব্যাধি ও বার্দ্ধক্য নাই। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবাদ্যন্ত স্বামী মহারাজ এবিষয়ে ২০টি কার্য্যের বিবরণ দিয়াছেন, উহার মধ্যে ১০টি Positive function এবং ১০টি Negative function. আমি এখানে ১০টি Positive function এর বিবরণ দিব কারণ ইহাই স্পষ্ট, উৎকৃষ্টতর ও সুচিন্তিত নিশ্চিত পন্থা।

১। প্রথম অবস্থায় শিক্ষার্থীর মন প্রাকৃত বুদ্ধিতে পরিপূর্ণ থাকে, উহার দ্বারা অপ্রাকৃত বিষয় বুঝা যায় না। কাজেই শিক্ষার্থীর এই প্রাকৃত বুদ্ধিগুলি আধ্যাত্মিক-গুণ-সম্পন্ন গুরুদ্বারা আধ্যাত্মিক বুদ্ধিতে অর্থাৎ অপ্রাকৃত বুদ্ধিতে পরিণত করিতে হইবে। তবেই শিক্ষার্থী অপ্রাকৃত বিষয়গুলি বুঝিতে পারিবেন।

২। শিক্ষার্থীর সমুদ্র মনোভাব হইলে পর, তিনি সেই সমুদ্রের নিকট হইতে দীক্ষা লইবেন, কারণ এই দীক্ষাই আধ্যাত্মিক বিষয়গুলি বুঝিবার আলোক স্বরূপ হইবে।

৩। শিক্ষার্থী তাহার আধ্যাত্মিক গুরুকে সর্বপ্রকারে সম্বন্ধে রাখিতে হইবে। কারণ তিনি আধ্যাত্মিক বিষয়ে ধর্মপুস্তকাদি পড়িয়া বিশেষ জ্ঞান অর্জন করিয়াছেন। তিনি ভগবানের বিশেষ প্রিয়পাত্র। একমাত্র তাঁহার মাধ্যমে বৈকুণ্ঠে ভগবানের নিকট যাওয়া যায়। কাজেই আধ্যাত্মিক বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী হইবার জন্য গুরুকে সর্বপ্রকারে সম্বন্ধে রাখিতে হইবে। তাঁহার শুভেচ্ছা একান্ত রঞ্জনীয়।

৪। বুদ্ধিমান শিক্ষার্থী তাহার গুরুর নিকট প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন, কেমন করিয়া বৈকুণ্ঠে যাওয়া যায়। গুরু তাঁহার শিষ্যকে ঠিক উপদেশ দিবেন, উপদেশগুলি সাবিত্তিক ধর্মগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। আমরা গুরুর নিকট উহা কেবল অনুসরণ করিব। গুরুদেব তাঁহার শিষ্যকে কখনও বিপথে চালিত করিবেন না, কারণ তিনি উক্ত উপদেশ-গুলিতে সম্পূর্ণরূপে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন।

৫। শিক্ষার্থী সর্বদা সিদ্ধ সাধুপুরুষগণকে অনুসরণ করিবেন, কখনও তাঁহাদিগকে অনুকরণ করিবার চেষ্টা করিবেন না।

৬। শিক্ষার্থী সর্বদা শাস্ত্রানুসারে চলিবেন এবং আত্মপ্রীতিবাঞ্ছা ত্যাগ করিয়া, ভগবানের প্রীতি কিসে হয়, তাহার চেষ্টা করিবেন। ভগবান ইহাতে সন্তুষ্ট হইবেন।

৭। শিক্ষার্থী সর্বদা আধ্যাত্মিক পরিবেশের মধ্যে বাস করিবেন।

৮। শিক্ষার্থী সর্বদা জীবন ধারণ করিবার জন্য যতটুকু ধন দরকার কেবলমাত্র তাহাই সংগ্রহ করিবেন।

৯। শিক্ষার্থী সর্বদা শাস্ত্রানুসারে উপবাস করিবেন। একাদশী-তিথি অবশ্যই পালন করিবেন।

১০। শিক্ষার্থী সর্বদা বটবৃক্ষ, গাভী, শিক্ষিত ব্রাহ্মণ এবং ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবেন।

গুরু আহুগত্যে অপ্রাকৃত ধামে যাইবার জন্য উপরোক্ত দশটি বিষয় পালন করা এবং আত্যাত্মিক মঙ্গলকামী শিক্ষার্থীগণের পক্ষে হইবে প্রথম পদক্ষেপ।

“বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ রূপাসিন্ধুভ্য এব চ।

পতিতানাং শাবনেভ্য বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥”

— শ্রীদেবকীনন্দনদাস ব্রজবাসী

নবদ্বীপ (নদীয়া) ।

মুদ্রণ-প্রমাদ

এই ১১শ সংখ্যার ৩৭২ পৃষ্ঠায় ২ নম্বর শ্লোকের বঙ্গানুবাদ নিম্নরূপ পাঠ করিতে পাঠকবর্গকে অম্লবোধ জানাই। — প্রকাশক

অধুনা আর্ন্ত বিভীষণ সভয়ে আগত হইলে সুগ্ৰীব শ্রীরামকে এই সংবাদ নিবেদন করায়, তিনি বলিলেন, “সুগ্ৰীব! উহাকে আমার নিকট আনয়ন কর, আমি উহাকে পালন করিব।” এই অভয়বাক্য প্রদানান্তর যিনি সর্বজনবিদিত লঙ্কাধিপত্য বিভীষণকে দান করিলেন, সেই আর্ন্তজ্ঞাপকারী ভগবান্ নারায়ণ আমার গতি ॥ ২ ॥

॥ শ্রীশ্রীগুরুগোবিন্দো জয়তঃ ॥

শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

(গভ: রেজিষ্টার্ড)

ফোন : ২৪৭

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,

তেবরিপাড়া, পো: নবদ্বীপ (নদীয়া)।

ওশে পৌষ, ১৩৮৭ ; ইং ১৪।১।১৯৮১

“নারায়ণং নমস্কৃত্য নরকৈব নরোত্তমম্।

দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥”

ব্যাসকুল-অমণসজ্জাবাদ্য-বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেশু —

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে শ্রীনবদ্বীপধামস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে আগামী ৩রা গোবিন্দ ৪৯৪ শ্রীগৌরাদ্ধ: ২ই ফাল্গুন, ১৩৮৭ সাল (ইং ২১।২।৮১) শনিবার শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অন্তরঙ্গ প্রিয়গার্বদবর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমন্তুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব মাঘী-কৃষ্ণা তৃতীয়া-তিথি হইতে ব্যাসাভিন্ন জগদগুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমন্তুক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভ প্রকটবাসর মাঘী-কৃষ্ণা-পঞ্চমী ৩ই গোবিন্দ, ১২ই ফাল্গুন (ইং ২৪।২।৮১) মঙ্গলবার পর্যন্ত চার দিবসব্যাপী শ্রীশ্রীব্যাসপূজা ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণপঞ্চক, ব্যাসপঞ্চক, মধ্বাদি-আচার্য্যপঞ্চক, সনাতান-পঞ্চক, শ্রীগুরু-পঞ্চক ও তত্ব-পঞ্চকের পূজা, হোম-প্রভৃতি অহুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহ শ্রীহরিকীর্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, বক্তৃতা, স্তব-পাঠ, গীতরি-গুরু-বৈষ্ণব-সংসন ও অঞ্জলি-প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ।

ধর্মপ্রাপ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যুষ্ঠানে সর্বাক্রমে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবা-কার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে ও ভগবৎসেবায় সুকৃতি অর্জিত হইবে।

বৈয়াক্যাহুগত্যাভিলাষী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য— ২ই ফাল্গুন, শনিবার ব্রাহ্মবৃহস্পতি বধারীতে মঙ্গলারতি, তদনন্তর শ্রীগুরু-মহিমাযুক্ত-বন্দনাদি, মহাজন-কীর্তি-কীর্তন, পূর্বাঙ্কে শ্রীশ্রীপূজা-গণকানি, অঞ্জলিপ্রদান ও মধ্যাহ্নে বিশেষ ভোগারতি এবং মহাপ্রসাদ বিতরণ; অপরাহ্নে বিশেষ সভা, কীর্তন এবং প্রবন্ধাদি পাঠ ও বক্তৃতা।

১০ই ও ১১ই ফাল্গুন, পূর্বাঙ্কে শ্রীগুরুতত্ত্ব ও শ্রীবাস-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং দক্ষ্যায় শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অবদান সম্পর্কে ভাষণ।

১২ই ফাল্গুন, পূর্বাঙ্কে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান; অপরাহ্নে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধাদি পাঠ এবং দক্ষ্যারতি অন্তে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীবাসদেবের সম্বন্ধে আলোচনা।

শ্রীশ্রী গুরুগেরাহোঁ জয়তঃ

ন বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াক্সা সুপ্রসীদতি ।

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরম ।
অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিব্রশূন্য ।

অন্য ধর্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথার রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ।

৩২শ বর্ষ } ২৩ জ্যৈষ্ঠ, কারনোদশমী, ৪৯৪ গোবিন্দ
২৯ মাঘ, বৃহস্পতিবার, ১৩৮৭ ; ইং ১২।২।১৯৮১ { ১২শ সংখ্যা

সান্ন্যাসান্ধ

আর্তত্রাণ-নারায়ণাষ্টাদশকম্

[শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-বিরচিতম্]

(পূর্বপ্রকাশিত ৩২শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৩৭৩পৃষ্ঠার পর)

যেনারক্ষি রঘুত্তমেন জলধেন্তীরে দশাস্যানুজ-

জ্বায়াতং শরণং রঘুত্তম বিভো রক্ষাতুরং মাশ্রিতি ।

পৌলস্ত্যেন নিরাকৃতোহথ সদসি ভ্রাতা চ লঙ্কাপুরে

আর্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১০ ॥

লক্ষ্যপূরে সভায় ভ্রাতা রাবণকর্তৃক দূরীকৃত হইয়া রাবণানুজ বিতীষণ সমুদ্রতীরে রঘুত্তম শ্রীরামের শরণাপন্ন হইলেন এবং বলিলেন, ‘হে রঘুত্তম, হে বিভো ! মানুষ আতুরকে রক্ষা করা’ এই কাতর বচন শুনিয়া যিনি তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই আর্তব্রাণকারী ভগবান্ নারায়ণ আমার গতি ॥ ১০ ॥

যেনাবাহি মহাহবে বসুমতী সংবর্তকালে মহা-

লীলাক্রোড়বপুর্ধ্বরেণ হরিণা নারায়ণেন স্বয়ম্ ।

যঃ পাণিদ্ৰুমসম্প্রবর্তমচিরাক্তা চ যোহগাং প্রিয়ম্

আর্তব্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১১ ॥

মহাপ্রলয়কালে যখন বসুমতী জলমগ্না ছিলেন, তখন তাঁহার উত্তোলন-কালে মহালীল বরাহরূপধারী যেই হরি নারায়ণ পাণবৃক্ষসম হিরণ্যাক্ষ অশ্বরকে অচিরে হত্যা করিয়া পৃথিবীকে উদ্ধার করত জগৎপ্রিয় হইয়া-ছিলেন, সেই আর্তব্রাণকারী ভগবান্ নারায়ণ আমার গতি ॥ ১১ ॥

যোদ্ধাসৌ ভুবনত্রয়ে মধুপতির্ভর্তা নরাণাং বনে

রাধায়া অকরোদ্ভতে রতিমনঃপূর্তিং সুরেন্দ্রানুজঃ ।

যো বা রক্ষতি দীনপাণ্ডুতনয়ান্ নাথেনি ভিত্তিং গতান্

আর্তব্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১২ ॥

যে যোদ্ধা ত্রিভুবনে মধুরাপতি বলিয়া প্রসিদ্ধ ; যে নরনাথ বনে রমণ ব্যাপারে শ্রীমতী রাধারাগীঃ অতিশয় মনোবিশ্রাম পূরণ করিয়াছিলেন ; যিনি সুরেন্দ্রানুজ হইয়াও বামনরূপ ধারণ করিয়াছিলেন এবং যখন যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডুপুত্রগণ ভীতিগ্রস্ত হইয়া “হে নাথ !” বলিয়া আহ্বান করেন, তখন যিনি তাঁহাদিগকে রক্ষা করেন, সেই আর্তব্রাণকারী ভগবান্ নারায়ণ আমার গতি ॥ ১২ ॥

যঃ সান্দীপিনিদেশতশ্চ তনয়ং লোকান্তরাং সমুত্তং

চানীয় প্রতিপাত্ত পুত্রমরণাদুজ্জুগুমানার্তয়ে ।

সন্তোষং জনয়ন্নগেয়মহিমা পুত্রার্থসম্পাদনাং

আর্তব্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণের গুরু সান্দীপনি মুনি পুত্রের মৃত্যুতে অতিশয় আত্মবিকৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার সেই আত্ম প্রশমনের জন্য মুনির আদেশ অবনত মস্তকে ধারণ করিয়া লোকান্তরিত পুত্রকে আনয়ন করত যিনি তাঁহার সন্তোষ উৎপাদন এবং জগতে অপরিমেয় মহিমা প্রতিপাদন করিয়াছিলেন, সেই আর্জুনাগকারী ভগবান্ নারায়ণ আমার গতি ॥ ১৩ ॥

যন্মাস্মরণাদঘৌষসহিতো বিপ্রঃ পুরাহজামিলঃ

প্রাণানুক্ৰমশেষিতামহুচ যঃ পাপৌঘদাবাত্তিবুক্ ।

সন্তো ভাগবতোক্তমাত্মনি মতিং প্রাপাশ্বরীষাভিধ-

আর্জুনাগপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১৪ ॥

যে পাণিষ্ঠ বিপ্র অজামিল পুরাকালে পাপরূপ দাবানলে আত্মবিকৃত ছিল ; প্রাণ হইতে অশেষিতা মুক্তিলাভ করিয়া যাহার নামস্মরণে ভাগবতোক্তম মহারাজ অশ্বরীষে সন্তো স্বীয় মতি স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিল, সেই ভগবান্ নারায়ণ আমার গতি ॥ ১৪ ॥

যোহরক্ষদ্বসনাদিনিত্যরহিতং বিপ্রং কুটৈলাভিধঃ

দীনং দীনচকোরপালনবিধুঃ শ্রীশঙ্খচক্রোজ্জলঃ

তজ্জীর্ণাশ্বরমৃষ্টিমাত্রপৃথুকাগাদায় ভুক্ত্য ক্ষণাৎ

আর্জুনাগপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১৫ ॥

যিনি শ্রীহৃদামা বিপ্রের জীর্ণবস্ত্রাঙ্কল হইতে মৃষ্টিমেষ পৃথুক ভণ্ডুল কণামাত্র গ্রহণ করিয়া ভোজন করেন এবং দীনচকোর পালনকারী চন্দ্রসদৃশ ও শ্রীশঙ্খ-চক্রসমুজ্জল যিনি নিত্যবস্ত্রহীন কুৎসিত-বসন-পরিহিত দীন শ্রীহৃদামা বিপ্রকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই আর্জুনাগকারী ভগবান্ নারায়ণ আমার গতি ॥ ১৫ ॥

যৎ-কল্যাণগুণাভিরামমমলং মজ্জান্ হি সংশিক্ষতে

যৎ সংশেতিপতিপ্রতিষ্ঠিতমিদং বিশ্বং বদন্ত্যাগমঃ ।

যো যোগীন্দ্রমনঃ সরোরুহতমঃ প্রধ্বংসবিদ্ ভাহুমান্

আর্জুনাগপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১৬ ॥

আগম শাস্ত্র বলেন,—ঈহাহার শুভদায়ী পবিত্র মনোরম গুণ মন্ত্রসমূহ শিক্ষা দান করে, যে জগৎপতি কর্তৃক এই বিশ্বপ্রতিষ্ঠিত এবং যিনি দীপ্তিমান স্বর্গোর ছায় যোগিশ্রেষ্ঠের মানসপদ্মের অন্ধকার দূরীভূত করিয়া থাকেন, সেই আর্তব্রাণকারী ভগবান্ নারায়ণ আমার গতি ॥ ১৬ ॥

কালিন্দীহৃদয়াভিরামপুলিনে পুণ্যে জগন্মঙ্গলে

চন্দ্রাস্তোজবটে পটে পরিসরে ধাত্রা সমারাধিতে ।

শ্রীরঙ্গে ভূজগেন্দ্র-ভোগশয়নে শেতে সদা যঃ পুমান্

আর্তব্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১৭ ॥

যমুনার হৃদয়প্রীতিকর ভুবনমঙ্গল পবিত্র পুলিনে বিস্তৃত পল্লীতে চন্দ্রাস্তোজ ভাঙুর বটে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা কর্তৃক যিনি সমাগ্নরূপে আরাধিত হইয়াছিলেন এবং অক্ষবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবীর সহিত অনন্তনাগদেহে যেই পুরুষ শয়ন করিয়া থাকেন, সেই আর্তব্রাণকারী ভগবান্ নারায়ণ আমার গতি ॥ ১৭ ॥

বাৎসল্যাদভয়প্রদানসময়াদার্ভাভিনির্ব্বাপনাং

ঔদার্যাদবশোষণাদগণিতশ্রেয়ঃ পদপ্রাপনাং ।

সেব্যঃ শ্রীপতিরেব সর্ব্বজগতামেতে হি তৎসাক্ষিণঃ

প্রহ্লাদশ্চ বিভীষণশ্চ কবিরাত্রি পাঞ্চালাহন্যাক্রবাঃ ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীচ্ছঙ্করাচার্য্য-বিরচিত আর্তব্রাণ-নারায়ণাষ্টদশকং সম্পূর্ণম্ ।

বাৎসল্যপরায়ণত্ব, অভয়প্রদান সময়ে পীড়িতের আর্ভিবিনাশকত্ব, ঔদার্য্য, পাপমোচকত্ব ও অগণিত শ্রেয়ঃপদপ্রাপকত্বহেতু শ্রীপতি নারায়ণই সর্ব্ব-জগতের একমাত্র সেব্য । এবিষয়ে সাক্ষীস্বরূপ ইহাদের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে, যথা—প্রহ্লাদ, বিভীষণ, আদিকবি বাল্মীকি, দ্রোণদী, অহল্যা ও কুব প্রভৃতি ॥ ১৮ ॥

শ্রীগৎ শঙ্করাচার্য্য-বিরচিত আর্তব্রাণ-নারায়ণাষ্টদশক সমাপ্ত ।

কর্ম্মীর কাণাকড়ি

স্থূলদেহ, চিদাভাস মন ও চেতন আত্মা

মানবের অধিষ্ঠানে ত্রিবিধ মস্তার অবস্থান। মানবের স্থূলদেহ, তাঁহার মন ও তিনি স্বয়ং দেহী। এই দেহীটী অবিমিশ্র চেতন। তাঁহার মন স্বয়ং চেতন হইলেও অচিৎএর ধারণায় সর্বদা ব্যস্ত এবং তাঁহার স্থূল দেহটী বিস্তৃত অচিৎ।

জীবের আত্ম-প্রতীতিতে সবিশেষ ভক্তি ও নির্বিশেষ জ্ঞান
এবং অনাত্ম-প্রতীতিতে নশ্বর কর্ম্ম

চিন্ময় দেহীর বা জীবাত্মার আলোচনা করিতে গিয়া আমরা দুইটী মত দেখিতে পাই। একটী নির্বিশেষপর—জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদস্থূলক, অপরটী আত্মার নিত্য সবিশেষ-ধর্ম্মে—সেবা-সেবকভাবে অন্যান্যাপ্রিত। দেহ ও মনের কবল হইতে যে-সময় আত্মা মুক্ত হন, তখন তিনি নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানপর অথবা নিত্য-হরিসেবাময়। সে-কালে মানবের দেহ ও মনের অধিষ্ঠান সুপ্রবল হইয়া অনাত্ম-বিচারে প্রমত্ত, সে-কালে তিনি জ্ঞান ও ভক্তিমাগের কোন কথায় আদর করিতে পারেন না। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি তাঁহাকে অশান্তিময় রাজ্যে প্রক্ষিপ্ত করে। আত্মা বা দেহী অনিত্য ফল কামনা করেন না বা করিতে অসমর্থ। অনাত্ম প্রতীতি প্রবল হইয়া আত্ম-ধর্ম্মের বিপর্যয়ে নশ্বর দেহ মনকে ‘আত্মা’ বলিয়া সনাক্ত করে—ইহাই জীবের বিবর্ত বা ভ্রান্তি। শক্তির পরিণামফলে নশ্বর-ধর্ম্ম দেহ ও মনে পরিদৃষ্ট হয়—ইহাই আত্মার বিবর্ত-ভাব।

হরিসেবা-দেহমনের চেষ্টাস্বরূপ কর্ম্ম নহে

অনাত্ম দেহ বা মন ফলভোগ করে। নিত্য হরিসেবার ক্রিয়াগুলিকেও কর্ম্মফলের অন্ততম জ্ঞান করে। বাস্তবিক হরিসেবা কখনও দেহ ও মনের কর্ম্মজাতীয় চেষ্টা নহে। বাহ্যদর্শনে সমস্তের উপলব্ধি হইলেও একত্বের নিদর্শন নহে। দেহ ও মন শইয়া বাঁহারা বিব্রত তাঁহাদের কর্ম্মপথ ব্যতীত অল্প গতি নাই। তাঁহারা আত্মাকেও দেহ ও মনের সহিত অতিল্প জ্ঞান করেন; সুতরাং হরিসেবাকেও একটী কর্ম্মবিশেষ জ্ঞান করেন। জড় কর্ম্মের সহিত হরিসেবার পার্থক্য এই যে, জড়-কর্ম্ম নশ্বর এবং কর্ম্মীর উদ্দেশ্যে ফল প্রসব করে, কিন্তু হরিসেবা নিত্য ও চরিত্রেম আনয়ন করে। কর্ম্মের ফল—সুখ-দুঃখ-মিশ্রিত, হরিসেবনের ফল—সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ হরির নিত্য আনন্দ। হরিয় আনন্দ অনন্ত, জীবের কর্ম্মফল অনন্ত বাধাময় দুঃখরাহিত্য ধর্ম্মযুক্ত।

কর্ম্য দ্বিবিধ সম্বন্ধে সংকর্ম্য ও রজস্বমোক্ষণে অসং-কর্ম্য

কর্ম্য দুই শ্রেণীর—কুকর্ম্য ও সংকর্ম্য। সম্বন্ধে জীব সংকর্ম্যপর হ'ন, রজস্বমোক্ষণে তিনিই অসং বা কুকর্ম্যপর হ'ন। সংকর্ম্যপর দেহ ও মন দয়াবিশিষ্ট, অসং-কার্যাতৎপর প্রবৃত্ত অহঙ্কারী জীব পরহিংসাপর। স্বীয় স্বার্থ-সাধনে প্রমত্ত হইয়া নিজ রজস্বমোক্ষণ দ্বারা নানা কর্ম্য কার্য্যে আমরা দেহ ও মনকে নিযুক্ত হইতে দেখি। তাদৃশ কুকার্য্য পোষণের জন্য তাঁহাদের অসংখ্য যুক্তি অবতারণিত হয়, পরিশেষে তাগুব নৃত্য করিয়া কুকর্ম্য হইতে সংযত হন ও পুণ্যময় দাত্তিক কর্ম্মদিগের দ্বারা লাক্ষিত ও দণ্ডিত। যে-কাল পর্য্যন্ত জীব দেহ ও মনের দ্বারা চালিত হইয়া কুকার্য্যে নিরত হন, তদবধি তাঁহার যথেষ্টাচারিতা সুপ্রবল থাকে। যথেষ্টাচার প্রশমনের জন্য সম্বন্ধের আবাহন কর্ম্মবীরের একমাত্র অবলম্বন। তাঁহার কুপ্রবৃত্তি প্রবল থাকিলে তিনি রজস্বমোক্ষণকে পরিত্যাগ করিবার পরিবর্তে গোপনে তাদৃশ গুণদ্বয়ের সাধনামে সেবা করিয়া থাকেন। এক্রপ ঘৃণিত কার্য্য সম্বন্ধের নামে প্রচলিত থাকিলেও উহা যে সম্বন্ধের ক্রিয়া নহে, তাহা জানিতে আর কাহারও বাকী থাকে না।

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়ই নিত্য-ধর্ম্মের প্রতিযোগী

পূর্বোক্ত আলোচনাকালে আমরা জানিতে পারি যে, প্রবৃত্তিও অহঙ্কার-বশে জীব সম্বন্ধে হইতে পরিলক্ট হন, কিন্তু তিনি সর্বদা সম্বন্ধেই অবস্থিত। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই দুইটিই সম্ভার নিত্য-ধর্ম্মের প্রতিযোগী, কিন্তু তাহারা স্ব-স্ব নিত্য সংরক্ষণে অসমর্থ। অনিত্য গ্রহণ বা অনিত্য সম্ভার বিলোপ-সাধন—উভয়ই নশ্বর ধর্ম্মবিশিষ্ট। তাহাদের দ্বারা-নিত্য বৈকুণ্ঠ-বস্ত্ত পরিপুষ্ট হইতে পারে না। রজস্বমঃ পরিহার করাই সংকর্ম্মপর ব্যক্তির ধর্ম্ম যেখানে তাহার বিপত্তি ও প্রতিকূল যুক্তি দ্বারা অনিত্য-গ্রহণ-প্রবৃত্তি, সেইখানেই অসং কুকর্ম্মদিগের রজক্ষেত্র।

নিবৃত্তি-পথে ত্রিবিধ সম্ভ্যাস, যথা—কর্ম্ম-সম্ভ্যাস,

জ্ঞান-সম্ভ্যাস ও ভক্তি-সম্ভ্যাস

কুকর্ম্মবীরদিগের মুখে আমরা শুনিয়া থাকি যে, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের চতুরাশ্রমের উপযোগিতা নাই। চতুরাশ্রমী বলিতে গেলে নিবৃত্ত-জীবনবিশিষ্ট ব্যক্তিকেই লক্ষ্য করা হয়। তাহারা তিন তাগে বিভক্ত—কর্ম্ম-সম্ভ্যাসী, জ্ঞানী ও ভক্ত। উভয়েই তাকর্ম্ম, কেন-না—দেহ বা মনের

চাঞ্চল্যে উভয়েই ব্যস্ত নহেন। কর্ম-সন্ন্যাসী বিরক্ত হইয়া ফলভোগ হইতে স্বদূরে বাস করেন, তাঁহার বাসনায় কর্মের কোনপ্রকার অশাস্তি নাই, সুতরাং শাস্ত্রময় জীবনই তাঁহার লক্ষ্য। জ্ঞানী বলেন,—কর্ম-সন্ন্যাসের অবস্থা নশ্বর-ধর্ম্মে আবদ্ধ, সুতরাং নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানই জ্ঞানীর লক্ষ্য। ভগবদ্ভক্ত বলেন,—ভেদ-জ্ঞানময় জ্ঞানী নিভিন্ন হইবার বাসনায় অশাস্ত মাত্রা-তাঁহার রুতিমাত্রই তাঁহার উদ্দেশ্যকে ধ্বংস করিতেছে। নিত্য-হরিসেবা-পরায়ণতাই সন্ন্যাসের চরম লক্ষ্য। তাদৃশ হরিসেবকেই ভক্ত বলে। তিনি ভেদের সকল আশা-ভরসা ছাড়িয়াছেন, নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানের ফলতা উপলব্ধি করিয়াছেন, সুতরাং বদ্ধাবস্থায় ভোগ বা বন্ধ হইতে মুক্ত হইবার প্রয়াস উভয়েই পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রপন্ন ভক্তই প্রকৃত সম্যক্ ও নিঃসংশয়রূপে বিষয় ভ্যাগ করিতে সমর্থ।

সন্ন্যাসীসকল কর্মী বা বিষয়ীর চেষ্টালব্ধ জীব্যের মালিক,

তাঁহাদের অধীন নহেন

‘সন্ন্যাসী’ বলিলে ইহাই বুঝায় যে, যিনি বিষয়-সেবায় ক্লান্ত হইয়া তাঁহার ফলতা উপলব্ধি করিয়াছেন এবং জগতের জন্য তাঁহার বিবেচনায় প্রচুর কার্য করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি তাঁহার সঞ্চিত বিষয়ের ফল-লাভ করিয়া যে অস্থায় অগম্য, তাহা কু-কর্মী শিশুর গর্ভের বিষয় নহে। কোন কু-কর্মী ‘কর্মবীর’ নামে পরিচিত হইয়া আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় তত্ত্ববায়গণের অসলভ্য ফলসকল অন্যরূপে উপভোগ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে তত্ত্ববায়গণের অসমিদ্ধ ফল হইতে বঞ্চিত করা কর্মবীরগণের কর্তব্য। কিন্তু সেই শিশু কু-কর্মীর জানেন না যে, কর্ম্মালানে কর্ম্মক্লান্ত মহাবীরগণই তাঁহাদের নিজ অসমিদ্ধ ফল-স্বরূপে পেনসন্ পাইয়া থাকেন। তাঁহাদের সঞ্চিত সমাজ-ক্রোড়ে বঞ্চিত বিত্ত হইতে তত্ত্ববায়গণ অন্নজলাদি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের জন্যই জীর্ণ-বাসনহু প্রস্তুত করিয়া দেয়, সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় তত্ত্ববায়গণের কেবল সেবা হইয়া তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া সমাজের

চাপিয়া থাকেন না। যদি অপবাদকারী কু-কর্মী-সম্প্রদায় বলেন যে, উপার্জিত বিত্ত উপার্জনকারীর কার্যে না লাগিয়া দুর্বৃত্ত-সমাজে বাটওয়ালা হউক, এবং উপার্জনকারী পুত্রের দর্যাস-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তত্ত্ববায়ের ‘টানা-প’ড়েন’ লইয়া ব্যস্ত হউন, তাহা হইলে নির্বুদ্ধিতার চরম নীচা আর কি হইতে পারে।

ভ্যাগের দ্বারা সমাজের যে হিতসাধন হইয়া থাকে, তজ্জন্য সমাজ ভ্যাগীদিগের সেবা করিতে বাধ্য

নৈতিক-হিসাবে ধরিতে গেলেও ভ্যাগী-সম্প্রদায়ের দ্বারা গোপভাবে সমাজ যে ফললাভ করেন, তাহার পরিমাণে তাঁহাদিগকে অন্ন-জীর্ণবাসাদি প্রদান করা সমাজের অধিক ব্যয়সাধা বলিয়া সন্তুষ্ট হইতে হইবে না। শাস্ত্র বলিয়াছেন—

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কৰ্ম্মসঙ্গিনাম্। (গী: ৩২৬)

দেহ ও মনের উদ্ধাম চেষ্টায় যাহাদের বুদ্ধি প্রতিহত হইয়াছে, সেই জ্ঞানহীন-কৰ্ম্মবীর সম্প্রদায়ের মূৰ্খতা অগনোদন করিবার জন্ত কোন চেষ্টাই করিও না।

কৰ্ম্মী-সঙ্ঘ ও মিশনের বহুমাননকারী-সকল খাজা বোকা

তত্ত্ববায়ের মোক্তারগণকে আমরা বলি, তাহারা তত্ত্ববায়-সম্প্রদায়ের নির্বুদ্ধিতা-বিবৰ্দ্ধনের জন্য যীর্ষ নিমূৰ্ণ্য কাম-চেষ্টায় যেন মত্ত না হন; সেই মোক্তারগণ চতুরাশ্রমের প্রতিকূলে যে খাজা বোকার যুক্তি লইয়া মূৰ্খতা করিবেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে কেহই বুদ্ধিমান মনে করিবে না। যদি সভ্যসমাজে কৰ্ম্মের প্রচণ্ডতা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত হইত, তাহা হইলে জ্ঞান ও ভক্তিপথ পৃথিবীর চিত্রপট হইতে হতদিন মুছিয়া যাইত।

কৰ্ম্মবীরের কৰ্ম্মের নিষ্ফলতা

কৰ্ম্মবীরের প্রাপ্য-ফলই সন্ন্যাস অর্থীঃ সৰ্ব্বভ্যাগ। ভূত জগতের ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই যে, 'মৃত্যু' এবং 'নিষ্ফল' বলিয়া অবত্যাঘের অবিষ্ঠান আছে, উহাই কি ভ্যাগের বা সংন্যাসের উৎকৃষ্ট আদর্শ নহে? বিষয়-ভোগের সঙ্কোচকেই 'সংন্যাস' বলে। যে বিষয় নিত্যকাল ভোগ করিতে পারা যায় না, যে বিষয়টি অমৃত নহে, তাহাকে 'বিষ' বলিয়া নির্কিষয়ী সম্প্রদায় আখ্যা দিয়াছেন।

সমাজ ভক্ত-সন্ন্যাসিগণের ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে বাধ্য

নির্কিষয়ী বা সন্ন্যাসীকে বিষয়-যুক্ত বলিলেই সমাজ-সেবক বলা হয়। সমাজ-সেবক মাত্রেই সমাজের নূনানধিক ফল-লাভের যোগ্য। হুতরাং কুর্কৰ্ম্মবীরের ভণ্ড সন্ন্যাসীদিগের জীর্ণ-বাস-বঞ্চিত করিবার প্রয়াস—নিজ যুক্তিদ্বারাই খণ্ডিত হইল, আর প্রকৃত ভ্যাগীর আবর্তিত যাত্নিকা-ঘূর্ণনে বাধা

দেওয়া তত্ত্বায়-যোক্তারগণের নির্বুদ্ধিতার চরম-সীমা। এইরূপ চিন্তাত্রোত কোনও কৰ্ম্মবীরের বুদ্ধিতে স্থান পাওয়া উচিত নহে। ইহা পাশব-বলের ক্রীড়া মাত্র। বিনিময়ে দ্রব্যাদি বিক্রয় বা পরিক্রমের জন্য শ্রমজীবির প্রাণ্য দিব্য পদ্ধতি যে-কাল পর্য্যন্ত সভ্য মানব-সমাজে আদরে গৃহীত হইবে, তৎকালাবধি চতুরাশ্রমীর ব্যয়ভার-পীড়িত সমাজ তাঁহাদিগের অপ্রয়োজনীয়তা ও সম্মান দিতে প্রস্তুত থাকিবেন।

ভক্ত-সন্ন্যাসী সমাজের মঙ্গলকারী

বিরক্ত হরিপরাধন সমাজের বিরূপ মঙ্গলকারী, তাহা আসক্ত বিষয়ী তাঁহার সন্ধীর্ণ বিচারেও বুঝিয়া লইতে পারেন। তাঁহার সহিত প্রতিযোগিতা বা হিংসা করা বিরক্তের ধৰ্ম্ম নহে। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের গীতগীত এ বিষয়ে তাঁহাদিগের দুপ্রবৃত্তি দমনের ঔষধি-স্বরূপ কার্য্য করিতে পারে—

গোরা পুঁছ না ভজিয়া গৈলু। প্রেম-রতন-ধনে হেলায় হারাইলু।
অধনে যতন করি ধন ভাগ কৈলু। আপন করম-দোষে আপনি ডুবিলু॥
সংসঙ্গ ছাড়ি, কৈলু অসতে বিলাস। তে-কারণে লাগল মোর কৰ্ম্মবন্ধ-কাঁদ ॥
বিষয় বিষম-বিষ সতত খাইলু। গোর-কীৰ্ত্তন-রসে মগন না হৈলু॥
কেনবা আইয়ে প্রাণ কি-স্থল লাগিয়া। নরোত্তম দাস কেন না গেল মরিয়া।

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীভগবান্ আচার্য্য

শ্রীচৈতন্যপ্রিয় ভগবান্ আচার্য্যের জন্ম, শিক্ষা ও পূৰ্ব্বজীবন
অনন্ত সংহিতায়াং :—

“আচার্য্য শ্রীল ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-প্রিয়াংশভাক্।”

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয়াংশ-স্বরূপ শ্রীশ্রীভগবান্ আচার্য্য নবদ্বীপ ধামে শ্রীকর বংশে জন্ম-গ্রহণ করেন। তিনি ব্যাকরণাদি শাস্ত্রাধ্যয়নানন্তর ন্যায়শাস্ত্র পাঠ করিয়া ‘ন্যায়চার্য্য’ নামে বিখ্যাত হন। বাল্যকালে তাঁহার শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যের সহিত বিশেষ বন্ধুত্ব হয়। সেই সময় নবদ্বীপে

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়া বিষয়েতে ও কদর্যা বামাচাৰ্য্যদ্বিতে বিষম বিমুখ জীবনকলকে, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নিৰ্ম্মল প্রেমভক্তি দ্বারা কৃতার্থ করিতে লাগিলেন। এবং জীবশিক্ষার নিমিত্ত বৈরাগ্য-পথাবলম্বন করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন।

আচার্য্যের বিবাহ, বৈরাগ্য ও স্ত্রী-বন্ধন।

চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস দেখিয়া আচার্য্যের কিঞ্চিদ্ বৈরাগ্যোদয় হইতে লাগিল। তিনি পূর্বের ন্যায় আর সংসারে মনোনিবেশ করেন না। সৰ্ব্বদাই মহাপ্রভুর সঙ্গ করিতে উৎসুক। এই সমস্ত দেখিয়া স্ত্রিয়া ঘোর বিষয়ী-পিতা শ্রীশতানন্দ গান নবদ্বীপ-নিবাসী শ্রীমধুসূদন ঘটকের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। কিছুদিন পরে তাঁহার পিতার পরলোক প্রাপ্তি হইল। ইতিমধ্যেই গঙ্গার প্রবাহে তাঁহার চন্দ্রশেখর আচার্য্যের ও মধুসূদন ঘটকের বাটী ভগ্ন হইয়া জলস্রাং হইলে, সৰ্ব্বাশ্রয়ে মধুসূদন 'দ্বারবাসিনী'-নিবাসী দ্বারপাল নামক শূদ্র রাজার মালধ (ঘাহার নাম এক্ষণে শ্রীপাট মালিপাড়া) গ্রামে কেদারনতী নদীর দীপে আসিয়া বাস করেন। কিন্তু ভগবানের বৈরাগ্য ও চৈতন্যদর্শনেচ্ছা বলবতী হওয়াতে তিনি স্বীয় পত্নীকে চন্দ্রশেখরের নিকট রাখিয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শনচ্ছলে পুরুষোত্তমে প্রস্থান করিলেন।

আচার্য্যপত্নী 'জুলকুলে' আগমন ও শ্রীমহাপ্রভুর বরলাভ

যৎকালে মহাপ্রভু শ্রীপাট কুলীন গ্রামে আগমন করেন, সেই সময় তিনি জগদীশ পণ্ডিতের সহিত 'জুলকুলে' আসিয়া চন্দ্রশেখর আচার্য্যের সহ ও ভগবান্ আচার্য্যের পত্নীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আচার্য্যের পত্নী প্রভুকে প্রণাম করিলেন; প্রভু তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন—“তুমি পুত্রবতী হও”। ইহা শ্রবণ করিয়া আচার্য্যের পত্নী বলিলেন,—“প্রভো! কেমন করিয়া আমার পুত্র হইবে? আমার পতি একপ্রকার বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়া পুরুষোত্তমে আছেন।” প্রভু কহিলেন,—আমার বাক্য মিথ্যা হইবে না। আমি পুরুষোত্তমে যাইয়া আচার্য্যকে পাঠাইয়া দিব; আর তোমার পুত্র হইলে, জগদীশ পণ্ডিতের শিষ্য করিয়া দিবে।”—এইরূপ আদেশ করিয়া প্রভু চলিয়া গেলেন।

শ্রীমন্নহাপ্রভুর আদেশে আচার্য্যের গৃহে প্রত্যাবর্তন এবং মালঞ্চে অবস্থান

কিছুদিন পরে মহাপ্রভু পুরুষোত্তমে যাইয়া নিজ প্রিয় আচার্য্যকে নানা-প্রকার প্রবোধবাক্য দ্বারা সান্ত্বনা করিয়া স্বদেশে পাঠাইয়া দিলেন। আচার্য্য প্রভুর আদেশানুসারে “জুনকুলে” আসিয়া পৌঁছিলেন। পরন্তু তাঁহাদিগের বাসের অসুবিধা হওয়াতে, তাঁহারা উক্ত স্থান পরিত্যাগ করিয়া চন্দ্রশেখরের শিষ্য দ্বারবাসিনী-নিবাসী ‘দ্বারপাল’ নামক শূদ্র-রাজার পুরোঁজ মালঞ্চে আসিয়া বাস করিলেন। ঐ গ্রামের নাম সেই হইতে মালীপল্লী অর্থাৎ মালীপাড়া হইল। প্রথমে তাঁহারা ঘে-পাড়াতে বাস করিয়াছিলেন, অত্যাপি সেই পাড়া ‘আচার্য্যপাড়া’ নামে বিখ্যাত। কিছুদিন পরে ভগবান্ আচার্য্যের দুই পুত্র হয়। একের নাম রঘুনাথ, অপরের নাম রমানাথ আচার্য্য। দুই জনেই জগদীশ পণ্ডিতের শিষ্য।

আচার্য্যের গৃহ-ত্যাগ ও পুরীতে প্রভুর সহিত সখ্যভাবে স্থিতি

তদনন্তর ভগবান্ আচার্য্য তাঁহার শিষ্য মধুসূদন ঘটকের পুত্রের নিকটে পুত্রদ্বয়ের সহিত পত্নীকে রাখিয়া পুনর্বার পুরুষোত্তমে গিয়া যাবজ্জীবন বাস করিলেন।

পুরুষোত্তমে প্রভুপাশে ভগবান্ আচার্য্য।

পরম বৈষ্ণব তিঁহ স্পর্শিত আর্ষ্য ॥

সখ্যতা আক্রান্তচিত্ত গোপ অবতার।

স্বরূপ গোঁসাই সহ সখ্য ব্যবহার ॥

একান্তভাবে আশ্রিতে চৈতন্য-চরণ।

মধ্যে মধ্যে প্রভুরে তিঁহ করে নিমন্ত্রণ ॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

আচার্য্যের বংশাবলী

তাঁহার যে দুই পুত্র ছিল, তন্মধ্যে রমানাথ আচার্য্য অপুত্রক। তিনি জগদীশ পণ্ডিতের “শ্রীপাট ঘণোড়া” নামক স্থানের গদি প্রাপ্ত হন।

জ্যেষ্ঠ রঘুনাথ আচার্য্য পৈত্রিক ধাতুময় শ্রীবিগ্রহ কেশব-রায় ভীউকে লইয়া মালিপাড়ায় বাস করিলেন। তাঁহার প্রথম পত্নীর গর্ভে দুই পুত্র হয়। একের নাম শ্রীগোপীজনবল্লভ, অপরের নাম—শ্রীরামকৃষ্ণ। প্রথম পত্নীর বিয়োগ হইলে রঘুনাথ আচার্য্য পুনর্বার দ্বার-পরিগ্রহ করেন। সেই পত্নীর

গর্ভে রামদাস, শ্যামদাস ও কৃষ্ণদাস নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন। কেবল কৃষ্ণদাসই মালীপাড়ায় রহিলেন। তিনি শিষ্যের নিকট হইতে শ্রীশ্রীরাধাকান্ত নামক শ্রীবিগ্রহ লইয়া স্বয়ং প্রকাশ করেন।

আচার্য্যের পুত্র রঘুনাথ ও তাঁহার পুত্র শ্রীবল্লভের পরিচয়

রঘুনাথ আচার্য্যের প্রথম পত্নীর গর্ভজাত দ্বিতীয় পুত্রের শ্রীবল্লভ নামক এক সন্তান হয়। কালে শ্রীবল্লভ অত্যন্ত সাধক হইয়া উঠিলেন। তিনি শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ নামক শ্রীবিগ্রহের সেবা প্রকাশ করেন। পরে কোন পরম-হংস-প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীমদন-গোপাল নামক শ্রীমুক্তি তাঁহার হস্তগত হয়। তদ্বিবরণ বাহুল্য-বিধায় লিখিলাম না। শ্রীবল্লভের তিরোত্তাব উপলক্ষে মালী-পাড়ায় ক্রমান্বয়ে চৈত্রমাসে তিনটি মহোৎসব মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে। প্রথমটি শ্রীরামনবমীতে, দ্বিতীয়টি শ্রীরামনবমীর পর শুক্লা একাদশীতে আরম্ভ হইয়া সপ্তাহ-কাল হয়। তৃতীয়টি কোন তিথিতে হয়, তাহা আমরা জানি না।

—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশবগোস্বামী মহারাজস্য
দ্বাদশবর্ষপূর্ত্তি বিরহবাসরে
ভক্তিপ্রসূনাঞ্জলিঃ

শ্রীকেশবেষ্টদেবার-ভক্তিপ্রজ্ঞান-নাথিনে।

বিভূতভক্তিনিদ্ধান্ত-মূর্ত্তিবিগ্রহরূপিণে ॥

গৌরশক্তিস্বরূপায় শ্রীকৃষ্ণাখ্যগবত্তিনে।

মায়াবাদ-তমোদ্রায় বেদান্তার্থবিদে নমঃ ॥

যিনি বিগুপ্তভক্তিসিদ্ধান্তের অথবা শ্রীমদ্ভক্তিগিহ্বার সন্মতী গোস্বামী প্রভুপাদের মূর্ত্তবিগ্রহস্বরূপ, যিনি গোরুরির শক্তিরূপা এবং শ্রীপাদুগবর, যিনি মায়াবাদরূপ অন্ধকার বিনাশকারী এবং বেদান্তশাস্ত্রার্থবিৎ ছিলেন, তিনি মদীয় হৃদেব শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী, তাঁহার শ্রীপাদপদে প্রণাম করি।

সুজনাদৃত-বন্দিত-পাদযুগং, কলিপীড়িত-দুর্গত-তাপহরম্।

হরিনাম-সুধারস-মত্তমতিং, প্রণমামি সদা গুরুদেবপদম্ ॥ ১ ॥

ঐহার পাদপদ্ম সজ্জনগণ কর্তৃক বন্দিত ও আদৃত, যিনি কলিহত, দুর্গত-জনের তাপ হরণ করেন এবং যিনি সর্বক্ষণ শ্রীহরিনামরসে প্রমত্ত থাকেন, সেই গুরুপাদপদে প্রণাম জানাই ॥ ১ ॥

গতিমহর-লাস-বিলাসমধং, নটরাজ-ধুবন্ধর-রূপধরম্।

ধরণীজন-চিন্ত-বিমোহকরং, প্রণমামি সদা গুরুদেবপদম্ ॥ ২ ॥

ঐহার নৃত্যবিলাসময় ধীর গতি, যিনি শ্রেষ্ঠ নটরাজ-বেশধারী এবং যিনি পৃথিবীর মানবচিন্তাবিমোহনকারী, সেই গুরুদেবকে প্রণাম করি ॥ ২ ॥

নবনীত-সুকোমল-হেমমধং, কমলীষ-সুদর্শন-দীর্ঘতনুম্।

মদুমন্দ-সুহাস্য-সুভাষ্যুভং, প্রণমামি সদা গুরুদেবপদম্ ॥ ৩ ॥

ঐহার সুবর্ণজ্যোতির্ময়, মাখনসদৃশ সুকোমল, কমলীষ, সুদর্শন দীর্ঘবাহু মদুমন্দহাস্যযুক্ত বদন এবং যিনি সুমিষ্ট ভাবী ছিলেন, সেই গুরুপদকমলে প্রণাম জানাই ॥ ৩ ॥

চলধর্ম-তমো হি নিরাসকরং, অমলোজ্জলভক্তিবিশানপরম্।

পরহুঃখ-নিবারক-বন্ধুজনং, প্রণমামি সদা গুরুদেবপদম্ ॥ ৪ ॥

যিনি চলধর্মরূপ অন্ধকার বিনাশকারী, পবিত্র উজ্জলভক্তিবিশায়ক এবং পরহুঃখোচনকারী বন্ধু ছিলেন, সেই গুরুদেবের চরণকমলে প্রণাম করি ॥ ৪ ॥

রঘুনাথনিষ্ঠ-বিরাগপরং, জড়রঙ্গরসৈকবিহীন-মতিম্ ।

গুরুপাদসরোজনিবদ্ধগতিং, প্রণমামি সদা গুরুদেবপদম্ ॥ ৫ ॥

যিনি শ্রীল রঘুনাথদাস গোবিন্দীয় জায় বৈরাগ্যপরায়ণ, জড়রঙ্গরসবিহীন ছিলেন এবং শ্রীগুরুপাদপদ্মে স্বাহার অভূতপূর্ব একনিষ্ঠা মতি ছিল, সেই গুরুদেবের শ্রীচরণপদ্মে আমি প্রণাম জানাই ॥ ৫ ॥

প্রভুপাদ-মনোমত্ত-প্রেষ্ঠজনং, পৃথিবীভল-তুর্লভ-শব্দপদম্ ।

করুণা-সুধিমণ্ডিত-মুক্তিধরং, প্রণমামি সদা গুরুদেবপদম্ ॥ ৬ ॥

স্বাহার তুর্লভ পাদপদ্ম পৃথিবীর মঙ্গলজনক এবং যিনি করুণার প্রতিমূর্ত্তিরূপ ছিলেন, সেই গুরুদেবের পাদকমলে আমি সর্বদা প্রণতি জানাই ॥ ৬ ॥

শরণাগত-সেবক-কল্পতরুং, বরদাতৃগণাচ্চিত-দিব্যপদম্ ।

জপ-সূত্র-শিখা-পরিদীপ্ততরুং, প্রণমামি সদা গুরুদেবপদম্ ॥ ৭ ॥

যিনি চরণাশ্রিত সেবকবৃন্দের কল্পরক্ষসদৃশ, স্বাহার অলৌকিক পদকমল বরদাতৃগণকর্তৃক অর্চিত হইত এবং যিনি জপ-শিখা-সূত্রদ্বারা পরিশোভিত ছিলেন, সেই গুরুপাদপদ্মে প্রণাম করি ॥ ৭ ॥

বিরহাতুর-ভীষণ-বেদহরং, ব্রজধামগতং চিরকুল্লমুখম্ ।

প্রিয় গোড়জ্ঞনৈক-দয়াজলধিং, প্রণমামি সদা গুরুদেবপদম্ ॥ ৮ ॥

যিনি বিরহকাতর ভক্তগণের দুর্জিবহ আত্মবিনাশকারী, প্রিয় গোড়ীয়-গণের কৃপাসাগরতুল্য ছিলেন এবং যিনি অধুনা নিত্য ব্রজধামে চির প্রফুল্ল বদনে বিরাজিত, সেই গুরুদেবের পাদপদ্মে সর্বদা সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই ॥ ৮ ॥

শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয়মঠতঃ

৬ই কার্তিক, ১৩৮৭

}

শ্রীগুরোঃ কৃপাপ্রাধিনঃ

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু উর্দ্ধমস্থিনঃ

প্রভুপদে মিনতি

সকল দুয়ার হইতে ফিরিয়া

এবে তোমার দুয়ারে আনিয়াছি—

সকলের কাছে বঞ্চিত হইয়া

তাই তোমারই শরণ লইয়াছি ।

কত গ্রাম-নগর-গিরি-কন্দর

উদাস প্রাণে ভ্রমিছিল প্রান্তর—

কতজনের কাছে বাঞ্ছিত প্রাণে

মিনতি করেছি হইয়া কাতর ।

কত যে কাঁটা কুটিয়াছে পায়

কত যে আঘাত লাগিয়াছে গায়,

সকলের কাছে লাঞ্ছিত হইয়া

আজ তোমাকেই ভালবাসিয়াছি ।

এসে_অবেলায় অপরাধী-প্রায়

দাড়ায়ে রয়েছি তোমার দুয়ারে—

অহৈতুকী কৃপার কাদাল আমি,

সেবাধিকার দানে শোধ হে মোরে ।

আমি তো তোমার, তুমি যে আমার

তুমিই আমার সকল-সার—

তুমি মোরে কভু ঠেলিও না দূরে,

কৃপা কর মোরে হইয়া উদার ।

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

(পূর্বপ্রকাশিত ৩২শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৩৯৩ পৃষ্ঠার পর)

রামঘাটের দর্শন শেষ করিয়া সমস্ত তীর্থযাত্রীসহ শ্রীল মহারাজা জী কীর্তনানুগমনে পদব্রজে সোরগড়ের এক গৃহস্থভক্তের গৃহে শুভাগমন করিলেন। তথায় শ্রীল মহারাজা জী নিকটবর্তী যে সমুদয় লীলাস্থল আছে, তাহার সংক্ষেপ বর্ণন অতি উৎসাহ ও আনন্দভরে দান করিলেন। উপস্থিত ভক্তবৃন্দ শ্রীরাধাকৃষ্ণের অপূর্ব লীলাকথা শ্রবণ করিয়া নিজদিগকে ধন্যাতিধন্য মনে করিলেন ও শ্রীল মহারাজাকে হর্ষোৎফুল্ল নয়নে অভিনন্দিত করিলেন।

পয়গাঁও—এখানে শ্রীকৃষ্ণ দুগ্ধপান করিয়াছিলেন। এই গ্রামে সুন্যর কদম্বখণ্ড আছে। ছত্রবন—এখানে সখাগণ শ্রীকৃষ্ণকে রাজা করিয়াছিলেন। শ্রীদাম কৃষ্ণের মস্তকোপরি ছত্র ধরিয়াছিলেন এবং অন্যান্য সখাগণ ভৃত্য, অমাত্য প্রভৃতি হইয়াছিলেন। এই কৌতুক-লীলার জন্ত স্থানের নাম ছত্রবন বা ছাতাই হইয়াছে, শ্যামরী ছত্রবনের চারিমাইল অগ্নিকোণ অবস্থিত। ইহা শ্যামাসখীর গ্রাম। এখানে শ্রীকৃষ্ণ শ্যামাসখীর বেশ ধারণ করিয়া শ্রীরাধারানীর মানভঞ্জন করিয়াছিলেন। শাঁখীগ্রাম—এখানে শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খচূড়কে বধ করিয়াছিলেন। উজানগাঁও বা উজানী—যমুনার তীরবর্তী-স্থান। শ্রীকৃষ্ণ বংশীধ্বনি করিলে শ্রীযমুনা উজান বহিয়াছিল। আরয়ারি—এখানে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে হোরী রণলীলা করিবার জন্ত শ্রীরাধিকাসখীগণ সঙ্গে আসিয়াছিলেন। রণবাড়ী—এখানে শ্রীরাধারানীর সহিত কৃষ্ণের হোরীরণ হইয়াছিল। এই গ্রামে নিক্ত কৃষ্ণদাস বাবাজীর সমাধি আছে। উমরাও—এখানে পৌর্ণমাসী দেবী শ্রীরাধিকাকে শ্রীবৃন্দাবনেস্বরী পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন অর্থাৎ রাধারানীই গ্রামের অধিকারিণী। কৃষ্ণসখা মধুমঙ্গল এখানে আসিয়া উমরাও গ্রামের অধিবাসীকে যথাযথ সন্মান প্রদর্শন না করায় রাধারানীর গণ মধুমঙ্গলকে বাঁধিয়া তাহার পরিচয় ও অস্তিত্ব খবর সংগ্রহ করিলেন। এই লীলা শ্রীজীবগোস্বামিপাদ তাহার মাধব-মহোৎসব গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছিলেন। উমরাও গ্রামের পশ্চিমে শ্রীকিশোরীকুণ্ডের তটে শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর ভজনকুটীর। গোস্বামীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া শ্রীরাধাবিনোদবিহারী বিগ্রহ ঐ কুণ্ড হইতে প্রবর্ত হইয়াছিলেন। শ্রীরাধা-

বিনোদ বর্তমানে জয়পুরে আছেন। কামাই গ্রাম—বিশাখা সখীর জন্মস্থান। কামাই গ্রামের দক্ষিণে শীওপদস্তগ্রাম। মথুরা যাইবার সময় ‘শীল আসিতেছি’—এই কথা শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন এবং “পরশু” আসিব পরশু গ্রামে বলিয়াছিলেন। করেলী গ্রাম—ললিতা সখীর জন্মস্থান। পেশাই গ্রাম—শ্রীকৃষ্ণ পিপাসার্ত্ত হইলে বলদেব জলপান করাইয়াছিলেন, এখানে রহণ ও মনোরম কদম্ববন আছে। আতনক গ্রাম—এখানে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধারাগীকে অঞ্জন পরাইয়াছিলেন।

ক্রমে ক্রমে শ্রীল মহারাজশ্রী শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা শ্রবণে অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধপ্রায় হইয়া পুতলিকাবৎ অবস্থান করিলেন।

বিহারবন—আমরা ভক্তগৃহে মধ্যাহ্নের প্রসাদ গ্রহণ করিয়া—বিশ্রামান্তে বিহারবনে প্রবেশ করিলাম। এই বনের প্রাকৃতিক শোভা এখনও সগর্বে বিস্তার করিয়া পরিক্রমাকারী ভক্তবৃন্দের চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছে। ব্রজমণ্ডলের অধিকাংশ বনই পরিক্রমা করিলাম কিন্তু বিহার বন এখনও তাহার নিজস্ব ধারায় অবস্থান করিয়া কৃষ্ণ-বলরামের স্মৃতিকে ধরিয়া রাখিয়াছে। আমরা বনের মধ্যে পথ ভুলিয়া এদিক ওদিক ভ্রমণ করিতেছি। আর কীৰ্ত্তনের ধ্বনি শ্রবণে তাহার অহুগমন করিবার চেষ্টা করিতেছি। বন পরিক্রমাকালে কাহারও বসন, ওড়না, কাহারও চাদর ছিঁড়িয়া গিয়াছে বনের দুর্গমত্বের জন্ত। কাহারও চুলের খোঁপা আটকে গিয়াছে কাঁটার তাড়ায়। গিলুবনের ক্ষিতর প্রবেশ করিতে করিতে যাত্রীগণ আকর্ষণীয় পিলুফল সংগ্রহ করিলেন। অবশেষে বিহার বনে বলরামের রাসসুন্দরীতে আমরা সকলে একত্রিত হইলাম। তথা হইতে মন্দিরে ত্রিবিগ্রহগণকে দর্শন করিয়া মন্দির মংলয় কুণ্ডের জল স্পর্শ করিলাম। কৃষ্ণামুসন্ধানে গোপীগণ যেমন বনে বনে ঘুরিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, আমরাও তদ্রূপ বনের অধিষ্ঠিত শ্রীবলদেব প্রভুর মন্দির অহুসন্ধানে বনে বনে ঘুরিয়া ক্লান্তদেহে বনের ছায়াপথে বসিয়া পড়িলাম। যাত্রাপথের শেষে বিহার বনের স্মৃতি স্মরণ করিয়া আমরা বাসের সন্নিকটে উপস্থিত হইলাম, স্থানা বাস তার যাত্রীর জন্য অপেক্ষমান।

সকলে আমরা বিহারবনের সন্নিকটে সমবেত হইয়া বিহারবনকে দণ্ডাৎ জ্ঞাপন করিলাম। শ্রীল মহারাজশ্রীর আদেশে আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের যাত্রী বীর্য্য শ্রীপাদ বিশ্বরূপ প্রভু ও শ্রীপাদ হরিশাধন প্রভুর তত্ত্বাবধানে

জাসিয়াছিলেন তাঁহারা সকলে শ্রীল নারায়ণ মহারাজকে দণ্ডবৎ প্রণাম জানাইয়া ও সমবেত ভক্তবৃন্দের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া অশ্রুসিক্ত নেত্রে শ্রীবৃন্দাবনের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। বিদায়ক্রণের দৃশ্য চিত্তকে অভিভূত করিয়া দিল। অবশেষে আমরা শ্রীল মহারাজজীর অনুসরণে দ্বিতীয়বারে মথুরার উদ্দেশে যাত্রা করিয়া রাত্রি ৭৩০ মিঃ মথুরাস্থিত শ্রীকেশবজী মঠে নির্বিঘ্নে পৌঁছলাম।

তালবন—পরদিন প্রত্যুষে পরমপূজাপাদ নারায়ণ মহারাজের নিয়ামকস্বত্রে তালবন যাত্রা আরম্ভ করিলাম বাসযোগে। বাস হইতে নামিয়াই আমরা পদব্রজে পরিক্রমা আরম্ভ করিয়া সর্বাগ্রে দূর হইতে তালবন দর্শন করিলাম এবং বনে প্রবেশের যাত্রা আরম্ভ হইল। নামে তালবন কিন্তু বর্তমানে কোন তালবৃক্ষ দৃষ্ট হইল না। আমার অপ্রাকৃত দর্শনের অভাবই উহার একমাত্র কারণ। সেবোমুখ বৃত্তিদ্বারা সবই সম্ভব হইতে পারে। যাহা হউক, আমরা বৈষ্ণবগণের অনুগত্যে সংকীর্ণন শোভাযাত্রার অনুগমনে অগ্রসর হইতেছি। তালবনের বর্তমান নাম তারণী। দূর হইতে উচ্চভূমিতে তালবনের মন্দির দেখা যাইতেছিল। আমরা পরিক্রমা করিতে করিতে ‘বলভদ্র কুণ্ডে’ উপস্থিত হইলাম, শ্রদ্ধাপূর্বক পুরিণীর জল স্পর্শ করিয়া মস্তকে ধারণ করিলাম ও সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করিয়া তালবনে মন্দির দর্শন করিলাম। মন্দিরের অভ্যন্তরে সিংহাসনে মধ্যবর্তীস্থানে শ্রীবলদেব, দক্ষিণে বংশীধারী ত্রিভঙ্গ শ্রীকৃষ্ণমূর্তি, বলদেবের বামে শ্রীরেবতীজী। রামানন্দী সম্প্রদায় এই মন্দিরের পূজারী, পরমপূজাপাদ নারায়ণ মহারাজ সংক্ষেপে তালবনের লীলাকথা বর্ণন করিলেন, তালবনে শ্রীবলদেব ধেনুকাসুর বধ করিয়াছিলেন। একদিন শ্রীরাম-কৃষ্ণ সখাগণের সহিত বৃন্দাবনের বিভিন্ন বনে প্রবেশ করিয়া গোচারাদি ক্রীড়া করিতেছেন, এমন সময় শ্রীদাম, সুধল, শ্রোককৃষ্ণ সখাগণ তালবনের তালফল খাইবার বাসনা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু মহাবলশালী ধেনুকাসুর গর্দভের রূপ ধারণ করিয়া সর্দেহাই ঐ তালবনে অবস্থান করে। সুপক্ব তালের গন্ধে মাতোয়ারা সখাগণের মনোবাসনা বলদেব ছুরায়া ধেনুকাসুরকে বধ করিয়া পূরণ করেন। ভগবান গো-পালনকালে প্রিয় সখাগণের সুখের নিমিত্ত বহু ক্রৈশ্বর্য প্রকাশ করেন। তন্মধ্যে ‘তালবন’ লীলা অন্যতম। যাহারা এই লীলারস আবাদন করিতে চান, তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।১৫শ অধ্যায়) আলোচনা করিবেন।

“তাল বনে প্রভু তাল-রক্ষক অনুরে ।

বধিল কোতুকে সুখ সবার অনুরে ॥” (ভঃ রঃ মে ভঃ)

কুমুদবন—তালবন হইতে প্রায় ২ মাইল পশ্চিমে ‘কুমুদ বন’ বা কুদর বন। স্থানীয় লোকেরা ইহাকে ‘কুদর বন’ বলিয়া থাকেন। রাস্তা তাল না থাকার দরুন আমরা দূর হইতে কুমুদবনের উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রগতি জ্ঞাপন করিলাম। কুমুদশোভিত স্বচ্ছ সরোবরে ত্রিকুণ্ড জলকেলি লীলা করিয়াছিলেন, সেইজন্য এইস্থান ‘কুমুদবন’ নামে কথিত হইয়াছে। এইস্থান ‘জল-শয্যা বিহার স্থান’ বলিয়াও প্রসিদ্ধ। ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর দ্বাদশবন-ভ্রমণ-লীলা প্রকটকালে এইস্থান পদাঙ্করঞ্জিত করিয়াছিলেন। এই বনে শ্রীকল্যাণচরণের বৈঠক আছে।

মধুবন—দ্বাদশবনের মধ্যে মধুবনই প্রথমবন। মধুবনে মধুদৈত্যের বাসস্থান ছিল। তাহারই নামানুসারে “মধুবন” নাম হইয়াছে। মধুবনে ভগবান্ হরি মধুদৈত্যাকে বধ করিয়াছিলেন। এখানে শ্রীবলদেব মধুপান লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

রামায়ণে বর্ণিত আছে যে মধুদৈত্য মহাদেবকে তপস্শ্রায় তুষ্ট করিয়া মথুরা বা মধুপুরী প্রতিষ্ঠা করেন। তৎপুত্র নাবনাশুরকে পরাজিত করিয়া রামচন্দ্রের আদেশে শত্রুত্ব অধিকার করেন, সূর্য্যবংশীয় হর্ষাঙ্গ মধুদৈত্যের কন্যাকে বিবাহ করিয়া মথুরাতে রাজধানী স্থাপন করেন।

মধোর্বনং প্রমথতো যত্র বৈ মথুরাপুরী ।

মধুদৈত্যো হতো যত্র হরিণা বিশ্বমুক্তিনা ॥

(ছান্দে মথুরা-মাহাত্ম্য, ২৩শ অধ্যায়)

“মধুদৈত্য বধ এথা কৈল ভগবান্ ।

এই চেতু মধুবন মথুরা আখ্যান ॥” (ভক্তিরত্নাকর)

মধুবনের বর্তমান নাম মহোলি। মথুরাসহর হইতে প্রায় ৩ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমদিকে অবস্থিত। মধুবনে প্রবেশ করিয়া আমরা দূর হইতে ক্রবটীলা দর্শন করিলাম। মধুবনের আকর্ষণই ক্রবটীলা। মধুবনের মধুকুণ্ডের তীরে গিয়া কুণ্ডের জল স্পর্শ করিয়া দণ্ডবৎ জ্ঞাপন করিলাম। যাত্রীদের কেহ কেহ কুণ্ডের জল শঙ্কাপূর্ব্বক সংগ্রহ করিলেন নিজস্ব পাতে। মধুকুণ্ডের সন্নিহিতে মধুবন বিহারীর মন্দির দর্শন করিলাম, মন্দিরের চূড়া নাই; সাধারণ গৃহের আকার। মধুবনবিহারী বিষ্ণুমূর্ত্তি। তাঁহার ডানহাতে মালা ও বামহাতে খড়্গা বাহা-দ্বারা তিনি মধুদৈত্যাকে বধ করিয়াছিলেন। মহোলির কিছু দূরে

একটি গোঁফা আছে যেখানে মধুবনতা বাস করিত ও উহার বধস্থান।
যাহা হটক শ্রীমধুগন বিহারীর নিকট শ্রীমতীর দর্শন মিলিল না।

ক্রবটীলা—মধুগন হইতে মথুরার দিকে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে উচ্চ-
টীলার উপর ক্রবের তপস্তাস্থান। পরিক্রমাকারী ভক্তবৃন্দ গভীর আগ্রহে
মহোলিঙ্গায়ের মাঠ পার হইয়া আস্তে আস্তে টীলার উপর ক্রবের তপস্তাস্থান
দর্শন করিবার জন্য উপনীত হইলেন। মধুবনে পঞ্চমবর্ষীয় বালক ক্রব
নারদের উপদেশে পদ্মপলাশলোচন নারায়ণের উপাসনা আরম্ভ করেন।
স্বাস্থ্যমুগুর পত্র উত্তানপাদেব দুই জাঁ ছিলেন—সুনীতি ও সুরূচ। সুনীতির
গর্ভে ক্রব ও কনিষ্ঠা জী সুরূচির গর্ভে উভয়ের জন্ম হয়। সুরূচির কঠোর
নির্মম বাক্যেই ক্রব ভবিষ্যৎজন্মের জন্য বনে বাহির হইলেন। ক্রবটীলাতে
৬ মাস কঠোর আরাধনা করিয়া ক্রব শ্রীভগবদর্শন লাভ করেন।
শ্রীহরির আদেশে ক্রব ৩৬ হাজার বৎসর রাজত্ব করিয়া ক্রবলোকে গমন
করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ৪র্থ স্কন্ধ, ৭ম অধ্যায়ে ক্রব মহারাজের লীলার কথা
আস্বাদন করা যায়। দেবর্ষি নারদ ক্রবকে উপদেশ দান করেন, যথা—

তস্মাত গচ্ছ ভদ্রং তে যমুনয়াস্তটং স্কটচ।

পুণ্যং মধুবনং যত্র সান্নিধ্যং নিত্যদা হরেঃ ॥ (ভাঃ ৪।৭।৪২)

অতএব হে বৎস, তোমার মঙ্গল হটক। তুমি যমুনা তটস্থিত পরম
পাবন বধুবনে গমন কর। কারণ, শ্রীহরি সেই মধুবনে নিত্য অবস্থান
করেন। বহু স্মৃতিকালে আমরা এই মধুবনে ক্রব মহারাজের তপস্তা স্থান
দর্শন লাভ করিলাম। ক্রবটীলার উপরে মন্দিরের অভ্যন্তরে চতুর্ভুজ
পদ্মপলাশলোচন শ্রীনারায়ণ মূর্তি, শ্রীগোপালদেব ও শ্রীশালগ্রাম, অপর
দুই প্রকোষ্ঠে ক্রব ও মহাবীর হনুমানজীর মূর্তিও দর্শন লাভ হইল। টীলার
নিম্নভাগে আশেপাশে ছোট ছোট বন আছে। ময়ূর ও অসংখ্য বন্য পক্ষীকুল
মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মধুবনের কঙ্ককুণ্ডের উত্তর দিকে দাউজী বা
বলদেবের মন্দির। আমাদের কীর্তনধ্বনি শ্রবণ করিয়া উক্ত মন্দিরের
সেবাইত আমাদের দাদরে আহ্বান করিলেন। মন্দিরে প্রবেশ করিয়া
প্রাণে তুলসীমঞ্চ দর্শন করিলাম। শ্রীমন্দিরে শ্রীবলদেব প্রভুর দক্ষিণ
হস্তে এবং বামহস্তে মধুগনপাতি। পবন পূজাপাদ নারায়ণ মহারাজের
অমুরোধে মন্দিরের সেবাইত মধুবনের লীলাকথা হিন্দিতে সুন্দরভাবে
পরিবেশন করিলেন। শ্রীল নারায়ণ মহারাজ বাংলা ভাষায় তাহা
পরিবেশন করিয়া উপস্থিত ভক্তবৃন্দের আনন্দ বর্ধন করিলেন। মধুকৃষ্ণ

মাধব হইতেই মধুবনের উৎপত্তি ইহাও অনেকে বিশ্বাস করেন। কৃষ্ণ সখাগণের সঙ্গে গোচারণ করিতে করিতে ভক্তিরস মধুপান করিতে করিতে বহু লীলাবস আশ্বাদন করেন ; ইহা সখালীলার স্থান। গুরুতত্ত্ব বলদেবের কৃপা প্রার্থনা করিয়া আমরা সংকীৰ্ত্তনের অনুগমনে বেলা ২টায় শ্রীকেশবজী গোড়ায় মঠে প্রত্যাবর্তন করিলাম।

ভাণ্ডীর বন—বৰ্ত্তমান ষাণ্মিকযুগ দূরত্বকে নিকট করিয়া দিয়াছে। হরিভজনপ্রিয় বৈষ্ণবগণও এই সুযোগ গ্রহণ করেন ষাণ্মিকযুগকে ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত করিয়া যন্ত্রের যথার্থ সদ্ব্যবহার করিতেছেন। আমরাও সেই সুযোগ গ্রহণ করিয়া ভাণ্ডীরবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা আরম্ভ করিলাম। সংকীৰ্ত্তন পরিক্রমার অনুগমনে। পরম পূজ্যপাদ নারায়ণ মহারাজ প্রচুর উৎসাহের সহিত আমাদেরকে কৃষ্ণলীলার স্থানদর্শন করাইবার জন্য বহু যত্ন করিয়া ভাণ্ডীর বনে সকাল ৭।০ ঘটিকায় উপস্থিত করাইলেন। ভাণ্ডীরবনে প্রবেশ করিয়া সঙ্গীত্রে আমরা ভাণ্ডীরবট বা অক্ষয়বট বৃক্ষের পাদদেশে উপস্থিত হইয়া সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ জ্ঞাপন করিলাম। স্থানীয় অধিবাসীগণ আমাদের সঙ্কীৰ্ত্তন ধ্বনি শ্রবণে অক্ষয়বটের নিকট সমবেত হইলেন। শ্রীল নারায়ণ মহারাজ কৃষ্ণলীলায় বিভাবিত হইয়া পরম আনন্দ সহকারে অক্ষয়বটের কথা পরিবেশন করেন। কক্ষবিরহে অক্ষয়বটের অন্তর্দ্বান। কৃষ্ণ সখাগণ সহ এখানে গোচারণে আসেন, অক্ষয়বট বা ভাণ্ডীর বট ১০।১২ মাইল বিস্তার লাভ করিয়া যমুনা নদীর এপার ওপার ডালপালা প্রসার করিয়াছিল। কৃষ্ণলীলা হইতেই অক্ষয় বট আরম্ভ হইয়াছে। নিকটে ছোট ছোট গুপ্তবন দৃষ্ট হইল। এইখানে ভাণ্ডীর কুণ্ড আছে। কৃষ্ণ সখাগণের তৃষ্ণা দূর করিবার জন্য বেণুদ্বারা কুণ্ড খনন করিয়া পাতাল হইতে জল আনয়ন করিয়াছিলেন। এই বেণুকুণ্ড প্রসিদ্ধ। সুবলবেশে শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের সহিত এইখানে মিলিত হইয়া নানাবিধ লীলা করিয়াছিলেন। বলরাম কংসের চর প্রলম্বাসুরকে এই বনে বধ করেন। রাসমঙ্গলীও বলা হয় এই স্থানকে সখীরা রাসের নৃত্যে প্রাক্তিকান্ত হইয়া পড়িলে কৃষ্ণ বেণুর ধ্বনিতে পাতাল হইতে জল আনয়ন করিয়া সখীদের প্রাপ্তি অপনোদন করেন। অষ্টদশী সুবল, হুদাম, মধুমঙ্গল প্রিচনম্বর্য সখাসহ কৃষ্ণ অদ্বুত অদ্বুত লীলা প্রকাশ করেন। এই ভাণ্ডীর বনেই ব্রহ্মা অগ্নিসাক্ষী করিয়া রাধারাক্ষীর সহিত কৃষ্ণের বিবাহ দিয়াছিলেন।

কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য প্রকাশ—সখাগণ গাভীগুলিকে ছাড়িয়া কৃষ্ণের সঙ্গে হস্তকৌতুক করিতেছিলেন। এদিকে গাভীগুলি কচিঘাসের আশায় শুজ্বনে প্রবেশ করিল। “কৃষ্ণবহিন্মুখ হইয়া ভোগ বাঞ্ছা করে। নিকটস্থ মায়া তাহা জাপটিয়া ধরে।” এইস্থানে কৃষ্ণের দর্শন করিয়া ভোগবৃদ্ধির লোভে গাভীগণ অনুভ্র চলিয়া গেল। কৃষ্ণ সখাগণ ও গাভীর সন্ধানে চলিলেন। কংসের অসুরের দ্বারা গাভী ও সখাগণ অগ্নিতে দগ্ধীভূত হইলে, সখাগণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া কৃষ্ণকে আহ্বান করিলেন। “‘কৃষ্ণ’ যদি মুখে বলে একবার। মায়াবন্ধ হইতে কৃষ্ণ তাহা করে পার।” এই বাণীর সার্থকতা কৃষ্ণ এখানে প্রয়োগ করিলেন। দাবানলে প্রজ্জ্বলিত গোপবালকগণকে কৃষ্ণ চক্ষু মুদ্রিত করিতে বলিলেন এবং কৃষ্ণ অগ্নি পান করত সখা ও গাভীদের উদ্ধার করিয়া অক্ষয়বটের নিকট উপস্থিত করিলেন। তাহারাও ব্রাহ্মকৃষ্ণ ও সখীগণকে এখানে উপস্থিত দেখিলেন। সখী ও সখাগণ যেখানে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই মল্লভূমিও আমরা দর্শন করিলাম। ভাণ্ডীর বনে পরিক্রমা করিয়া কৃষ্ণের বহু লীলার কিঞ্চিৎ দর্শন ও শ্রবণের সুযোগ হইল। যাত্রীবৃন্দ খুব উৎসাহের সঙ্গে বন পরিক্রমা করিলেন এবং গাভীর শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক কথা শ্রবণ করিলেন। ভাণ্ডীর বনের অধিবাসীরা মহারাজের চাতে দধিভাণ্ড দিয়া নিজদিগকে ধন্য মনে করিলেন, ভক্তবৃন্দও কিঞ্চিৎ দধি গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। ভাণ্ডীর বনেও বংশীবট দৃষ্ট হইল, এইস্থানে কৃষ্ণ মহারাস করিয়া ছিলেন। বংশীধ্বনি শুনিয়া গাভীগুলি আসিয়া উপস্থিত হইল। কামিনী, যমুনা, গঙ্গা সকলের সমাবেশ হইল। শ্যাম পলাইয়া গিয়া তমালবৃক্ষ দ্বারা পরিবৃত্ত হইলেন, আরো কত কি? বন ভ্রমণ না করিলে এইসব দেখা ও শ্রবণের ভাণ্ডা হয় না। সেইজন্য চাই শুদ্ধভক্ত-সঙ্গ।

মাঠবন—আমরা বাসযোগে মাঠ বনে উপস্থিত হইলাম, ইহা একটি উপবন। ভাণ্ডীরবন হইতে দুইমাইল দক্ষিণে এই বন। ইহা শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ-স্থান। মাঠ-অর্থে মাটির পাণ্ড। বৃহৎ বৃহৎ মাটির ভাঁড়, দধিভাণ্ড এইস্থানে প্রস্তুত হয় বলিয়া এই স্থানের নাম মাঠবন। গোপীগণ এইস্থান হইতে মাথায় করিয়া মাটির ভাঁড় বহন করিতেন। এইস্থানে আমরা নৃসিংহ-দেবের মন্দির ও গোরা দাউজী মন্দির দর্শন করিলাম। শ্রীমদ্বাহ্যপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভু এই বন দর্শন করিয়াছেন। মাঠবনে আমাদের শত শত গাভীর সমাবেশ দর্শন করিয়া কৃষ্ণলীলার উদ্দীপনা লাভ করিলাম।

দর্শনের বহু স্থান আছে। তবে আমাদের আরো অনেক পরিভ্রমণ করিতে হইবে বলিয়া মানস-সম্বোধন—গ্রামের নাম শিগ্রোধী, এখান হইতে পাণিগাঁও—যেখানে কৃষ্ণ দুর্কাসা মুনিকে ভোজন করাইবার জন্ত লীলা বিস্তার করিয়া শ্রীগোপীগণকে আনয়ন করিয়া তাঁহাদের দ্বারা দুর্কাসা ঋষিকে ভোজন করাইয়াছিলেন। যে-স্থলে গোপীগণ যমুনা পার হইয়াছিলেন, তাহার নাম পাণিঘাট। এইসব লীলা গর্গসংহিতাতে পাওয়া যায়। অতএব আমরা শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়াই শ্রীলদেবজ্ঞানীঅভিমুখে যাত্রা আরম্ভ করিলাম। কারণ শাস্ত্র বলেন, কর্ণের দ্বারাও দর্শন হয়। এই বিশ্বাস করিয়া শ্রীল মহারাজের আনুগত্যে আমরা আরো উত্তম উত্তম স্থান দেখিবার জন্ত বাসযোগে রওনা হইলাম।

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিভ্রমণ কালীন খেলব লীলাস্থলী আমরা দর্শন করিলাম সেই স্থানের নামের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রীকৃষ্ণলীলার উদ্দাপক স্থানগুলি শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলার সঙ্গে জড়িত। সেইহেতু স্থানের নামগুলিও লীলা-বিষয়ক। শ্রীকৃষ্ণের প্রণোদিত বজ্রনাভ মুনিস্বামিগণের উপদেশে চৌরাসী ক্রোশব্যাপী শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলাগুলির মধ্যবর্তী গ্রামসমূহের লীলাস্থলী নামকরণ করেন। অত্যাশিষ্ট গ্রামসমূহের সেই সকল নাম প্রচলিত রহিয়াছে।

মথুরার মেলা-মহোৎসবের সংক্ষিপ্ত দিন-পঞ্জী

মথুরাপুরী নিত্য মেলা-মহোৎসবময়ী, অকুষ্ঠানপর মেলা-মহোৎসবাদি তথায় নিত্য সংঘটিত হইয়া থাকে। নিম্নে কয়েকটি প্রসিদ্ধ মেলা-মহোৎসবের তালিকা দেওয়া হইল—

১। বৈশাখী শুক্লা চতুর্দশী নরসিংলীলা—গৌরপাড়া, মাণিকচক ও দ্বারকাবীশের মন্দিরে।

২। বৈশাখী পূর্ণিমা—মথুরা পরিভ্রমণ ‘বনবিহার’ নামে প্রসিদ্ধ বিশ্রামঘাট মেলা।

৩। কৈষ্ঠী শুক্লা-একাদশী—দশাশ্বমেধ ঘাট-এ দ্বিপ্রহরে শ্রীযমুনায স্নান এবং দক্ষায় গোকর্ণের টিলায় মেলা।

৪। আষাঢ়ী শুক্লা-দ্বিতীয়া—ব্রথযাত্রা।

৫। আষাঢ়ী শুক্লা একাদশী—শ্রীমথুরা, শ্রীগুরুভগোবিন্দ ও শ্রীবৃন্দাবন পরিভ্রমণ।

৬। শ্রাবণী পূর্ণিমা পর্যন্ত হিন্দোল-উৎসব; শ্রীরাধাগোবিন্দের কুলন বিশেষ প্রসিদ্ধ। শ্রাবণী শুক্লাপঞ্চমী হইতে পঞ্চতীর্থের মেলা আরম্ভ হয়। ষাতিগণ প্রথম দিন—বিশ্রামঘাট হইতে মধুবন; দ্বিতীয় দিন—শান্তনুকুণ্ড; তৃতীয় দিন—গোকর্নেশ্বর; চতুর্থদিনে দুটীকরাতে গুরুড়গোবিন্দ দর্শন করিয়া পঞ্চম দিনে বৃন্দাবনে ব্রহ্মকুণ্ডে উপনীত হন।

৭। শ্রাবণী শুক্লা একাদশী—মথুরা পরিক্রমা এবং পবিত্রারোপণ উৎসব।

৮। ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী—শ্রীকেশবদেবের মন্দিরে এবং মথুরার সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী-ব্রত। শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে বিশেষ প্রদর্শনী অনুষ্ঠান।

৯। ভাদ্রকৃষ্ণা একাদশী—সাধারণ বনবাত্রা এই দিবস হইতে আরম্ভ হইয়া ১৫ দিবসকাল স্থায়ী হয়। ঐ দিবস ভাঢ়ারা মধুবন, তালবন ও কুমুদবন ভ্রমণ করেন।

১০। আশ্বিনী কৃষ্ণাষ্টমী—মথুরা পরিক্রমা এবং ৫ দিন যাবৎ রাসলীলা উৎসব।

১১। আশ্বিনী শুক্লাদশমী—দশহরায় রাবণ বধ ও শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব।

১২। আশ্বিনী পূর্ণিমা—শরৎপূর্ণিমা, সারারাত্র ভগবদর্শন ও মেলা-মহোৎসব হয়।

১৩। কার্তিকী অমাবস্তায়—দীপদান উৎসব, শ্রীগোবর্দ্ধন-পরিক্রমা তৎপর দিবসে অন্নকূট-মহোৎসব।

১৪। কার্তিকী শুক্লা দ্বিতীয়া—গোবর্দ্ধন হইতে অন্নকূট দর্শনান্তর প্রত্যা-বর্তন করিয়া বিশ্রাটবাটে মেলা ও উৎসব হয়।

১৫। কার্তিকী শুক্লাষ্টমী গোপাষ্টমী ও গোষ্ঠাষ্টমী রাধাকুণ্ড ও মথুরা-পরিক্রমা।

১৬। কার্তিকী শুক্লা একাদশী—মথুরা গুরুড়গোবিন্দ ও বৃন্দাবন-পরিক্রমা।

১৭। মাঘী শুক্লা পঞ্চমী—বসন্ত উৎসব।

১৮। ফাল্গুনী পূর্ণিমা—হোলিলীলা-উৎসব।

১৯। চৈত্র শুক্লা নবমী—রামনবমী-উৎসব।

—শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিব্রহ্মণ

—সমাপ্ত—

পরমারাধ্য পরমগুরুদেবের বিরহ-বাসরে

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদগণের বক্তৃতার সারাংশ

শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ বিরহ-বাসরে হরিকথা বলার ও শোনার সুযোগ করিয়ে দেন। ভারতে ও বাহিরে সর্বত্র জন্ম ও মৃত্যু-তিথি উপলক্ষে সভা-সমিতি হইয়া থাকে। এইসব সভা-সমিতি সাধারণ কোন কর্মবীর, জ্ঞানবীর, যোগবীর প্রভৃতির প্রতি শ্রদ্ধা-সর্পণের উদ্দেশ্যেই হইয়া থাকে। সাধারণের এইসব সভা-সমিতির সহিত আমাদের সমিতির পার্থক্য কোথায়? তাহাদের যেকোন সভা-সমিতি আমাদেরও কি সেইরূপ?

শ্রদ্ধার পাত্র অনেকে আছেন। যারা আমাদের খাওয়া-দাওয়ার, পরার ব্যবস্থা করছেন, তাহারা আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র, আবার জন্মলাভ করি যার ঠিকসে, তিনিও শ্রদ্ধার পাত্র। শাস্ত্রে তিন রকম গুরুর কথা উল্লেখ আছে— জন্মদাতা পিতা প্রথম গুরু, যিনি উপনয়ন সংস্কারাদি প্রদান করেন, তিনি দ্বিতীয় গুরু এবং দিব্যজ্ঞান লাভ যার কাছ হইতে হয়, তিনি তৃতীয় গুরু। আমরা যে শ্রদ্ধা করি তা' এঁদের প্রতিই প্রযোজ্য। প্রাথমিক ও লৌকিক গুরুকেই জগতের অধিক সংখ্যক লোক জানেন এবং মানেন। আবার কিছু সংখ্যক যারা এর থেকে বেশী কিছু আছে জেনেছেন, বুঝেছেন। পারমার্থিক মঙ্গল যারা চান তাহারা অন্য কিছু চাইছেন। ব্রাহ্মণ-কুমারের উপনয়ন যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ তিনি শূদ্র। এইরূপভাবে বর্ণাশ্রম বিচারের কথা বলা আছে।

মদুগুরুর পদাশ্রয়ে শুকভক্তি লাভ হয়। আমরা নিজেদের বিচারকে বহুমান করি, কিন্তু শাস্ত্রের যে বিচার, তাহা অদ্রাস্ত। ব্যবহারিক গুরুকে-যথার্থ গুরু বলা হয় না।

মুক্ত পুরুষগণের দুইরূপ আচরণ আছে, কতকগুলো তাঁদের নিজস্ব এবং কিছু লোকশিক্ষার জন্ত। নিজস্ব শিক্ষাশ্রুতি কখন অসুসঙ্গীয় বা গ্রহণীয় নহে, সাধুগুরুগণের উচ্ছিন্নভোগী ভৃত্য আমরা, তাঁরা কৃপা করে যেটুকু অবশিষ্ট রাখবেন, সেইটুকু গ্রহণ করতে হবে। গুরু-বৈষ্ণবের বাক্য লজ্জার করে কিছু করতে গেলে পারমার্থিক লাভ হবে না। গুরু, বৈষ্ণব, ভগবান্ তিন একরূপ। “সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য হৃদয়ে করিয়া ঐক্য, সত্যত ভাসিব প্রেম মাঝে।” শাস্ত্র আলোচনায় জানা যায় গুরুদেব ভক্তরাজ, প্রিয়তম সেবক—শ্রেষ্ঠ সেবক, বৈষ্ণবপ্রবর, বৈষ্ণবই গুরু। গুরুদেব যদি বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ হন, তবে গুরুদেবের বন্দনার পর আবার পৃথক করে বৈষ্ণব

বন্দনা কেন? দীক্ষাগুরু একবচন আর শিক্ষাগুরু বহুবচন। দীক্ষাগুরু একজন হইবেন, কিন্তু শিক্ষাগুরু বহুজন হ'তে পারেন। সদগুরুতে পূর্ণ বৈষ্ণবতা দর্শন হইলেও শিক্ষাগুরুবর্গের বন্দনার প্রয়োজন, অনন্তকেটি জীব আমাদের শিক্ষাগুরু হইতে পারেন।

গৌড়ীয় দর্শনে চৈত্যান্তগুরু, দীক্ষাগুরু ও মহান্তগুরু প্রভৃতি তত্ত্বের আলোচনা করেছেন। আমরা রূপানুগা; রূপ-সনাতন গুরুত্ব সন্নিবেশে যে বিচারধারা দেখিয়েছেন তাহাই শ্রেষ্ঠ, তার চেয়ে আর কোন উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা নাই। তাঁহার শাস্ত্রসকল মন্বন করে সেইসব বিচার রেখে গেছেন জীবের দুঃখে দুঃখিত হয়ে, কিন্তু আমরা হতভাগ্য।

আমাদের গুরুবর্গ সেইসব গোস্বামীবর্গের দর্শনের উপর ভিত্তি ক'রে বলেছেন, অনেক ক্ষেত্রে রূপ-সনাতনের চেয়েও বেশী কিছু বলেছেন। রূপ-সনাতন যা বলেছেন তার অন্তর্নিহিত ভাব এবং যেটা তাঁরা চাপা দিয়ে রেখেছেন সেইগুলি গুরুবর্গ ক্রমশঃ প্রাজ্ঞল ভাষায় জানিয়েছেন। “বাপের চেয়ে ছেলে বড়” কথাটা হয়ে যাচ্ছে—তত্ত্ব সিদ্ধান্তের বিচার, যার সন্নিবেশ কোন ধারণাই নাই।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার মধ্য আছে “আমি রাধাগোবিন্দকে জানি না, গৌর-গদাধরকে চিনি না, নিতাই-গৌরকে জানি না, কিন্তু রূপ-সনাতনকে জানি।” রূপ-সনাতনের বদান্ততাকে লক্ষ্য করেছেন, তিনি তাঁর বক্তবোর মধ্য দিয়া রূপ-সনাতনের শিক্ষার চরম উৎকর্ষ স্থাপন করেছেন। পাদ-পূরণের কথা আছে—যেমন ভ্রমর গোস্বামীর গীতগোবিন্দের পাদপূরণ স্বয়ং ভগবান্ এসে করে গিয়েছিলেন। ভক্তের বিচারধারাকে ভগবান্ বহুমানন করে থাকেন, সেইরূপ ভক্তও ভগবানের মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন। ভগবানের বক্তব্য, তাঁর হৃদয়ের কথা ভক্ত প্রকাশ করেন। কোথাও ভক্ত ভগবানের ইচ্ছা পূরণ করেন, আবার ভগবানও ভক্তের ইচ্ছা পূরণ করেন। এইসব সূক্ষ্ম বিচার গুরুবর্গ না জানালে আমরা জানতে পারতাম না।

পশ্চবৎ যারা জীবন যাপন করছেন তাদের জন্য এইসব বিরহ-মহোৎসব নহে, গুরুবর্গের বৈশিষ্ট্য আলোচনা, কীর্তনের প্রয়োজন। আবির্ভাবে তিরোভাব-স্মৃতি ও তিরোভাবে আবির্ভাব-স্মৃতি—দুইই একতাৎপর্যাপন্ন—দুইই মঙ্গলকর।

বিরহ শব্দটা বলা হয় কেন? প্রাকৃত জগতের বিরহ, আর ভক্তের বিরহ-জালা কি একপ্রকার? প্রাকৃত জগতের বিরহ প্রাকৃত বিচ্ছেদ।

অপ্রাকৃত জগতে বিরহ-মিলন বোঝার জিনিষ। এর ব্যাখ্যা কে করবে— যিনি সেই অপ্রাকৃত বিরহ-মিলন অনুভব করেছেন, তিনিই বলতে পারবেন, যার সবজ্ঞানের উদয় হয়েছে তিনিই বলতে পারেন। অপ্রাকৃত বিরহ-মিলনকে যিনি হৃদয়ে ধারণ করেছেন, তিনি ব্যাখ্যা করবেন, কিন্তু অনুভব এক জিনিষ এবং ব্যাখ্যা আর এক জিনিষ। বিরহ-শব্দের ঠিক ঠিক অর্থ অনুভবের অনুভূতির বিষয়, সেটার প্রকাশ কি করে হবে? ভাষার দ্বারা এর রূপ দেওয়া যায় কি? যারা এটা অনুভব করেছেন, সেই অবস্থায় উন্নীত হয়েছেন, তাঁরাই ভাবের সাহায্যে বুঝবেন।

প্রাথমিক অবস্থায় এবং চরমেও সঙ্গুর পদাশ্রয়ের কথা বলা আছে। সাধুর বস্ত্র অঙ্গসংরক্ষণ। সাধু বলতে কাকে শ্রেষ্ঠ বলব—আমার গুরুপাদপদ্ম তিনি যদি জানিয়ে দেন তবেই বুঝব, জানব নইলে জানব না। গায়ত্রী প্রদাতা গুরু, তিনি তত্ত্ববস্তুকে জানাচ্ছেন; গুরুপাদপদ্মকে বাদ দিয়ে কিছু হবে না, কিছু পাওয়া যাবে না, তবে হয়তো ভাবতে পারি কিছু পেয়েছি বা জেনেছি।

বিরহ-শব্দ অপ্রাকৃত জিনিষ, যখন মিলন হয়েছে তখনই বিরহ, স্ব-স্ব ভূমিকায় বুঝবে। অপ্রাকৃত ভূমিকায় কল্পনার স্থান নাই। প্রাণ আছে তার, সে-হেতু প্রচার Practical ভূমো নহে, কল্পনা নহে—বাস্তব আচার প্রচার।

ভুল বিচার নিয়ে অনেকেই বসে রয়েছি। প্রভুপাদ তাই বলেছেন, আমি বা বলতে এসেছিলাম তা কেউ বুঝল না, নিল না, তাই চুপ করলাম। জগতের লোকেরা শুধু খাওয়া-পরা নিয়ে বাস্তব। অন্তরঙ্গ মুষ্টিমেয়কে তিনি বলেছেন, তার মধ্যে আমার গুরুপাদপদ্ম ছিলেন।

জুনিয়ার লোক হতভাগা; কে রাম, কে হরি জানে না, সেইজন্য প্রভুপাদ সেই কয়েকজনের মধ্যে বীজ রোপণ করে গেলেন, যাতে পরে সেই বীজ ফলে ফুলে শোভিত হয়। “বিধিমার্গ রত জনে স্বাধীনতা রত্ন দানে রাগমার্গে করান প্রবেশ।” বিধিমার্গ মেনে চলতে হবে। স্মরণপন্থী অপ্রাকৃত অনুভূতি যার নাই, সে কি স্মরণ করবে? কীর্তন প্রভাবে স্মরণ হবে—কীর্তন হবে শ্রবণের পর—এইরূপ process আছে—গৌড়ীয় গুরু-বর্গের এইসব বিচার।

গুরুবর্গের মহিমা কীর্তন করার জন্য এখানে আমাদের আহ্বান। জুনিয়ার লোকের দৈর্ঘ্য নাই, ত্যাগ স্বীকার নাই। পরস্পর আলোচনার

দ্বারা মঙ্গল, এর মধ্যে হিংসা, মাৎস্য নাই, 'পরমনির্মলসরানাং সত্যং' নির্মলসরগণের কথা কাহারও প্রতি অনুরাগ বিরাগের কথা নাই। পর ধর্মের কথা, ভাগবত-ধর্মের কথা; জড়বাদ নাই, খাওয়া-দাওয়ার কথা নাই এর মধ্যে।

বহু মায়াবাদীগণও হরিনাম করেন। কিন্তু শেষে ভগবানে মিলিয়ে যাব এইরূপ বুদ্ধি রাখেন। সত্যের প্রতি নির্ভী রাখা প্রয়োজন। দেব-দেবীর পূজা-পার্বণ করে নিজেদের ইন্দ্রিয়তর্পণ করা। অস্ত্রের ভাব শ্রদ্ধা-ভক্তি নিবেদন করতে হবে—পুষ্প শ্রদ্ধাভক্তির প্রতীক, পুষ্পের মাধ্যমে হৃদয়ের বৃত্তি গুরুর সামনে তুলে ধরা হয়।

বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ভেদ ও অভেদ দুইই আছে "বিরুদ্ধসাম্যন্তং ন চিত্তম্", যুগপৎ বিরুদ্ধভাব সামঞ্জস্য বিরহে মিলন প্রকাশ আর মিলনে বিরহ প্রকাশ—দুই পরস্পর পরিপূরক, পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত নিত্যত্ব বিচার।

বিরহ-মহোৎসব, বিরহ মানে ক্লেশ দুঃখ, ক্রন্দন এটা প্রাকৃত ভূমিকার কথা। মিলনেও ক্রন্দন রসশাস্ত্রের বিচার। বিরহে উদ্বেগিত আনন্দ তখনও ছিলেন এখনও আছেন এবং ভবিষ্যতে থাকবেন—নিত্যবাপার। মাধু-সজ্জনগণের আগমন নির্গমন দুই একতাৎপর্যাপর, প্রিয়বস্তুর হারিয়ে এখন হা-হতাশ। তত্ত্ববস্তুর আগমন-গমন দুইই মঙ্গলজনক—তাই বিরহ-মহোৎসব। বিরহ-তিথির মাধুর্য্য-বৈশিষ্ট্যের অনুভবের বিষয়।

সনাতন বৈষ্ণবধর্ম আনুগত্যের ধর্ম। গুরুবর্গ বলছেন, আমাদের যাকিছু সবই গুরুপাদপদের নিকট হতে পেয়েছি। তত্ত্বসিদ্ধান্ত আহরণ করে গুরুপাদপদ জগতে জানান। আমার গুরুপাদপদ তিনি তার গুরুদেবের কথা বলিলেও তাহার কিছু বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে।

মায়াবাদ নিরসনের জন্য গুরুপাদপদের বিশেষ চেষ্টা ছিল। জগতের লোকের অবস্থা এখন "ভাগমন্দ নাই হেরি, গরি চিন্তা হীন"—অপ্রয়োজনীয় বলে ভাবছি এইসব কথা। গুরুপাদপদের প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত শাস্ত্র আলোচনার দ্বারা মায়াবাদ দূর করার চিন্তা করে গেছেন, কারণ তিনি জানতেন মায়াবাদ দূর না হওয়া পর্য্যন্ত লোকের যথার্থতঃ মঙ্গল নাই।

তাহার নিজস্ব অবদান বেদান্তে ভক্তিবাদ বিশেষ বৈশিষ্ট্য, প্রভুপাদ তাঁকে দিয়ে বলিয়েছেন এবং এটা তিনি বিশেষ করে জগতে প্রচার করেছেন। প্রভুপাদের শিক্ষার আলোকে তিনি বেদান্ত অহুশীলন করে নামতত্ত্বের দার্শনিক বিচার জগতে প্রচার করিয়াছেন। বেদান্তস্বত্রের সঙ্গে নামের

বিশিষ্টা বেদান্ত আরম্ভ ও শেষ হয়েছে নাম দিয়ে—অনারুত্তি শব্দাৎ
অনারুত্তি শব্দাৎ—আরুত্তি রসকৃৎ।

এই সমিতির নামকরণ করেছেন গোড়ীয় বেদান্ত সমিতি—গোড়ীয়-বেদান্ত
ভক্তিবাদ জগতে প্রচার করেন। আনুগত্যের মধ্যে বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছেন
নবচুড়া শ্রীমন্দিরে নববিধা ভক্তি দেখিয়েছেন; চারি আচার্য্যের মূর্তি স্থাপন
করিয়াছেন।

অসং নিরসন-চেষ্টা তার মত আর কেউ করেনি, সেইজন্য ‘পাষণ্ডগজৈক-
সিংহ’ বলে অভিহিত করেছেন তাঁর এক সতীর্থ, বিক্রম মতবাদ, অপসিদ্ধান্ত
দূর করতে কঠোরভাবে প্রতিবাদ করেন। বিরোধীমতবাদগুলি কোনটাই
তাঁর চোখ এড়িয়ে যায়নি।

বাস্তব সত্যকথা বলতে ভয় কি? ‘ভারস্বরে কীৰ্ত্তন করব’ এই ছিল তাঁর
চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। তত্ত্বসিদ্ধান্ত লিখতে গেলে আশ্রয় করতে হবে, অতের
কাছে গেলে হবে না। গুরুবর্গের বিচারধারা গ্রহণীয়। গুরুদেবের কৃপাবলে
যুগ্মাধাতে সমস্ত বিরোধীতাব চূর্ণ-বিচূর্ণ করব; এটা তাঁর দাঙ্গিকতা নহে—
এর মধ্যে তৃণাদপি সূনীচেন ভাব। গোড়ীয় গুরুবর্গের কাছে তৃণাদপি
ভাব শিক্ষা করতে হবে। জীবগোস্বামী দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের কাছ হতে
লিখিত জয়টীকা ফেৎ নিয়ে, সেই পণ্ডিতকে বিচারে পরাস্ত করে, তাঁহার
গুরুদেবের প্রতি আনুগত্যের চরম উৎকর্ষতা দেখিয়েছেন—এর মধ্যে
তৃণাদপির চরমভাব।

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন,—“এত শুনে যে পাপী নিন্দা করে
তবে লাখি গার শিরের উপড়ে।” অপরদিকে শ্রীল কৃষ্ণদাস গোস্বামী
প্রভু বলেন,—পুণ্যবের কীট হতে মুঠ সে লঘিষ্ট। জগাই মাধাই হইতে
মুণ্ডি সে পাপিষ্ট ॥ মোর নাম লখ যেই তার পাপ হয়। মোর নাম লয়
যেই তার পুণ্য হয় ॥ এমন নিষ্পন্ন মোরে কেবা দয়া করে। এক নিত্যানন্দ
বিনা জগত মাঝারে ॥” এর মধ্যে স্নেহরভাবে দুইটি ভাবের সামঞ্জস্য।

গুরুদেবের সবটাই ভক্তি—শুধু হরিনাম এবং ভাগবত শ্রবণই ভক্তিকথার
সব কন্ড। এটা ঠিক নহে; আত্মশোধনের জন্য গুরুবর্গের গুণকীৰ্ত্তন।
বিরহ জাগবে কার, যাহার সঙ্কল্প হয়েছে—বিরহ-তিথির মধ্যে গুরুবর্গের
বাণী আলোচনা করব। “আবির্ভাব-তিরোভাব এই কহে বেদ।”

সংগ্রহীত—শ্রীমতী উমারানী দে

উজ্জ্বলকালে শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

অষ্টাদশ বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত সমিতির সেবক-বৃন্দের উদ্যোগে কার্তিকষতকালে শ্রীধাম-বৃন্দাবন-পরিক্রমার ব্যবস্থা হইয়াছিল। সমিতির সভাপতি-আচার্য্য মহারাজের আনুগত্যে ও সহঃ সভাপতি মহারাজের বিশেষ উদ্দীপনায় এই পরিক্রমা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

বিগত ২ই কার্তিক (ইং ২৫।১০।৮০) রবিবার হাওড়া ষ্টেশন হইতে রিজার্ভ বগিতে পূজাপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তকিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের বহুবাহনে প্রায় দেড়শত তীর্থযাত্রী ও অর্ধশত মঠবাসী সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ব্রজ-উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

তদুপরি শিলিগুড়ি হইতে উত্তরবঙ্গ তথা আসামের যাত্রিগণ বাহাতে ব্রজে গিয়া উক্ত পরিক্রমায় যোগদান করিতে পারেন তজ্জন্ত শিলিগুড়ি হইতেও একটি টুরিষ্ট কোচ রিজার্ভ করা হইয়াছিল। তাঁহারাও যথাসময়ে মথুরায় শ্রীকেশবজী গৌড়ীয়মঠে গিয়া উপনীত হন। উক্তর পাটি একমাসব্যাপী ব্রজে অবস্থান করত বন ও উপবনসমূহ পরিক্রমণ এবং দর্শন করিতে থাকেন। এই সময় শ্রীবৃন্দাবনের বিভিন্ন স্থানে রাত্রি যাপন তথা কীর্তনমুখে গিরিরাজ গোবর্দ্ধন-পরিক্রমাদিও হইয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত, রিজার্ভ বাসযোগে জহপুরে (রাজস্থান) শ্রীগোবিন্দ-গোপীনাথ-রাধাদামোদর ও করৌণীস্থ শ্রীমদনমোহন দর্শনেরও ব্যবস্থা ছিল এবং প্রত্যাবর্তনের কালে ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ আগ্রা অনেকেই দর্শন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত এলাহাবাদ (ত্রিবেণী), কানী, গয়া প্রভৃতিও দর্শনের ব্যবস্থা ছিল।

প্রায় একমাসব্যাপী তীর্থ-পরিক্রমণে যাত্রিগণ এতই প্রীত ও উল্লাসিত হইয়াছিলেন যে-বিদায়ের কালে তাঁহারা অশ্রুসিক্ত নয়নে বৈষ্ণবগণের নিকট বিদায় প্রার্থনাপূর্ব্ব করিয়াছিলেন, “প্রতিবৎসর এই ভাবে পরিক্রমার ব্যবস্থা করিলে ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণ কৃতকৃতার্থ হইবেন। পুনঃ পরিক্রমা করিলে কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে সংবাদ জানাইবেন। যদি অন্য তীর্থাদি পরিক্রমা করেন সেই পরিক্রমাসুগিতেও অংশ গ্রহণ করিবার আকাঙ্ক্ষা রহিল।”

বর্ষশেষে নিবেদন

শ্রীশ্রী-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় বৈকুণ্ঠবার্তাবহ “শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা” জগতের পারমাখিক ভাগ্যাকাশে উদ্ভিত হইয়া মায়া-জগতের সীমিত জ্ঞানের কাল-বিচারে এই সংখ্যা দ্বাত্রিংশ-বর্ষপূর্তি করিতেছেন। বহু প্রতিকূলতার মধ্যেও এই পত্রিকা শ্রীগুরু-গৌরাদেবের মনোহভীষ্ট পূরণের জন্য মরণের বিধীকায় অমৃতের বাণী ঘোষণায় বিরত হন নাই।

শ্রীগৌর ও গৌর-জনগণের মহিমা-কীর্তনই মুখ্যতঃ শ্রীপত্রিকার উদ্দেশ্য। বৈকুণ্ঠের বাণী বহন করাই ইহার প্রধান কৃত্য। বাস্তব সত্যকথা প্রকাশ করাই পত্রিকার লক্ষ্য। আত্যন্তিক মঙ্গল প্রদানেচ্ছাই ইহার বক্তব্য-বৈশিষ্ট্য। শ্রীমন্ন্যাসপ্রভুর অমন্দোদয়-দয়ার তাৎপর্য বিশ্লেষণ-চাতুর্য্যই ইহার প্রচেষ্টা। জগতে আমরা প্রত্যেকেই সুখ-শান্তি-মঙ্গল-আনন্দ-শ্রীতি প্রভৃতির আকাজক্ষী, কোন পরিহিতিতে ইহার ক্ষণভঙ্গুরতা অবস্থা ও নিত্যতার উপলব্ধি হইতে পারে তার প্রতি চেতনা-বিশিষ্ট যাহাতে লাভ হয় সেই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই শ্রীপত্রিকা প্রকাশিত হন। মরণের যুগে অমৃতের বাণী ঘোষণা করিতে গিয়া হয়তো অনেকে ইহাকে উদার মনে গ্রহণ করিতে কষ্টবোধ করিতে পারেন, কিন্তু নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া গভীরভাবে বিষয়-বস্তু অন্বেষণ করিলে উদারতার তাৎপর্য্য স্বয়ং করিতে অনুবিধা হয় না।

প্রেমঃকাম মনোবন্দন চিন্তাস্রোত পরিত্যাগ না করা পর্য্যন্ত প্রকৃততে চৈতন্যতা আসেনা। শ্রেয়ঃকামী আত্মধর্ম্মপিপাসা জাগরুক হইলে মনধর্ম্মের অসারতা উপলব্ধি হইতে পারে। আমরা নিয়তই অহুভব করিতে পারিতেছি যে, মনের স্থিরতা নাই বলিলেও অভ্যুক্তি হয় না; কেননা মন এখনই যাহা ভাল মনে করিয়া কামনা করে বা ভাল নয় বলিয়া বিবেচনা করে তাহা হয়তো পরক্ষণে বিপরীত জ্ঞান করিতে কুণ্ঠিত হয় না। সুতরাং ক্ষণে ক্ষণে যাহার এইরূপ পরিবর্তন তাহার উপর নির্ভর করিয়া নিত্যশান্তির অবকাশ কোথায়? যে-বস্তু পরিবর্তনশীল অর্থাৎ সনাতন নহে তাহা কখনই নিত্য সুখ বা নিত্য আনন্দ দিতে পারে না। এই জন্য মনধর্ম্ম কখনই আত্মধর্ম্ম নহে। তজ্জন্ম আত্মার নির্ম্মল আনন্দের কথা চিন্তা করিলে আত্মধর্ম্মের সাধনাই আত্যন্তিক মঙ্গলকামীগণের কাম্য। সুতরাং এই আত্মধর্ম্মের কথাই শ্রীপত্রিকা কীর্তনে ব্রতী।

আমি সর্ব-প্রকারে অযোগ্য হইলেও ঐহাদের অর্হৈতুকী অমনোদয়-দয়ায় শ্রীপত্রিকার সেবায় আমাকে নিযুক্ত রাখিয়া অর্হৈতুকী কৃপা প্রদর্শন করিতেছেন, সেই শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণকমলচরণে শিরে ধরিয়া দস্তে তৃণ ধারণপূর্বক শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবগণের জয়গানের প্রচেষ্টা করিতেছি। ইহার মধ্যে যদি কোন দোষ-ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় তবে উহা আমারই অজ্ঞতা ও অযোগ্যতা বিধায় সজ্ঞাতিত—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আর যে-সমস্ত গুণের সমাবেশ হয় বা হইবে তাহা সবই শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবগণের অর্হৈতুকী কৃপালেশ-এর পরিণতিই সুনিশ্চিত। অতএব সজ্জন সুধী পাঠকবৃন্দের নিকট সাহসনয় নিবেদন এই যে, ঐহাদের নিকট কোন দোষ-ত্রুটি পরিলক্ষিত হইলে উহা অপনোদনের নিমিত্ত অবগত করাইয়া বাধিত করিবেন বাহাতে আশ্রয় তাহা আলোচনাপূর্বক উহার বখাষধ মূল্যায়ন অনুধাবন করিতে পারি।

পরিশেষে আমার বিনীত নিবেদন এই যে, বিহ্বাতের অস্বাভাবিক বিভ্রাট, অন্যদিকে মুদ্রণের বিভিন্ন দ্রব্যাদির আত্যন্ত বদ্ধিত মূল্য হওয়ায় আর্থিক সম্ভতির অভাব এবং বহু সময় সমিতির বিশেষ নেতাকার্য্যের জন্ত স্থানান্তরে বাতায়িত করিতে বাধ্য হওয়ায় পত্রিকা যথারীতি প্রকাশে বাতীক্রম দেখা দিয়াছে। তজ্জন্ত সহৃদয় গ্রাহকবর্গের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। দ্রব্যাদির মূল্য অধিক বদ্ধিত হওয়ায় আগামী বর্ষের পত্রিকার বার্ষিক ভিক্ষা ৮.০০ টাকার স্থলে ১০.০০ টাকা ধার্য্য করিতে হইতেছে। গ্রাহকবৃন্দ কৃপাপূর্বক উহা সহানুভূতির সতিত গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে সেবার সুযোগ প্রদান করিবেন, এট নিবেদন জানাইয়া বর্ষান্তে বক্তব্য সমাপ্ত করিতেছি।

পাষণঃ পরিষেচিতোহমৃতরনৈর্নৈবাহুঃ সন্তবেৎ

লাঙ্গূলং সরমাপতেবিবৃণতঃ স্যাদস্য নৈবার্জবম্ ।

হস্তাবনয়তা বৃধাঃ কথমহো ধার্য্যং বিধোর্নগুণং

সর্বং সাধনমন্ত গৌরকরণাভাবে ন ভাবোৎসবঃ ॥

—প্রকাশক

। শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ ।

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,

প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি,

তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (মদীয়া)।

নিতালীলাপ্রবিশ্ট ও বিষ্ণুপাদ

ফোন—এন্-ডি-ডি-২৪৭

শ্রীমন্তস্ত্রিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সাদর সন্তোষপূর্বক নিবেদন—

কলিযুগ-পাবনাবতারাী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির নিখিল ভুবন-মঙ্গলময়ী আবির্ভাব-তিথিপূজা (ফাল্গুনী-পূর্ণিমা) উপলক্ষ্যে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের উদ্যোগে উপরি-উক্ত ঠিকানায় আগামী ১লা চৈত্র, ১৩৮৭ (ইং ১৫ই মার্চ, ১৯৮১) রবিবার হইতে ৭ই চৈত্র (ইং ১১ মার্চ) শনিবার পর্য্যন্ত সপ্তাহব্যাপী বিরাট মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে। এই মহদনুষ্ঠানে প্রত্যহ পাঠ, বক্তৃতা, কীর্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহ-সেবা, মহাপ্রসাদ বিতরণাদি বিবিধ ভক্তাঙ্গ যাজিত হইয়া থাকে।

বিশেষতঃ এতদুপলক্ষ্যে শ্রীনবদ্বীপধামের অন্তর্গত নয়টি (৯টি) দ্বীপ দর্শন, তত্ত্বস্থান-মহাত্মা-কীর্তন ও নগর-সঙ্কীৰ্তন-মুখে যোজন্যে শ্রীধাম-পরিক্রমা হইবে।

ধর্মপ্রাণ সজ্জন মহাদয়গণ উক্ত শুদ্ধ ভক্তানুষ্ঠানে সবাস্বব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে ভক্তানুখী স্মৃতি অর্জিত হইবে।

শ্রীশ্রীগৌরাজ মহাপ্রভুর জন্মোৎসব এবং শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা-পঞ্জী পরপূর্তায় প্রদত্ত হইল। ইতি—তাং ১৮/৮/১৩৮৭

তদন্ত-রূপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

পরিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জী

১। ১লা চৈত্র (ইং ১৫।৩।৮১), রবিবার ;—(১) **শ্রীগৌরমহাপ**
(কৌৰ্ণনাথ্য)—গঙ্গাস্পর্শান্তে শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম-মায়াপুর উদ্দেশ্যে
দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাভা, মুরভিকুঞ্জ, স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ,
স্ববর্ণ-বিহার, হরিহরক্ষেত্র, নৃসিংহপল্লী ; এবং (২) **শ্রীমধ্যদ্বীপ**
(স্রণাথ্য)—মাজিলা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা, হংসবাহন ।

২। ২রা চৈত্র (ইং ১৬।৩।৮১), সোমবার ;—(৩)—**শ্রীকোলদ্বীপ**
(পাদসেবনাথ্য)—গদখালির কোল, তেঘরিয়ার কোল, কোলের আমাদ,
কোলেরগঞ্জ, কোলেরদহ, সমুদ্রগড়, চাপাহাটি ; এবং (৪) **শ্রীঋতুদ্বীপ**
(অর্চনাথ্য)—রাতুপুর ।

৩। ৩রা চৈত্র (ইং ১৭।৩।৮১), মঙ্গলবার,—(৫) **শ্রীজহ্নুদ্বীপ**
(বন্দনাথ্য)—জাহ্নগর (জহ্নুমনি-স্থান), বিজ্ঞানগর (সার্বভৌম ভট্টাচার্যের
পাট) এবং (৬) **শ্রীমোদক্ৰমদ্বীপ** (দাসাথ্য)—মামগাছি (শ্রীল বৃন্দাবন-
দাস ঠাকুরের পাট), অর্কটীয়া বা একডালা, মায়াপুর (পঞ্চপাণ্ডবের
জ্ঞাতবাস) ।

৪। ৪ঠা চৈত্র (ইং ১৮।৩।৮১), বুধবার ;—(৭) **শ্রীরুদ্রদ্বীপ** (সখাথ্য)
—রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর ও গঞ্জেরডাঙ্গা এবং (৮) **শ্রীসীমন্তদ্বীপ**
(শ্রবণাথ্য)—শিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, শোনডাঙ্গা, মেঘারচর, বেলপুকুর ;
অতঃপর কোলদ্বীপস্থ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি ও
পোড়ামাকলা ।

৫। ৫ট চৈত্র (ইং ১৯।৩।৮১), বৃহস্পতিবার ;—(৮) **শ্রীঅমৃতদ্বীপ**
(আত্মনিবেদনাথ্য)—শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন,
শ্রীঅশ্বৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্যমঠ, (শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য-ভবন), জগদগুরু শ্রীল
প্রভুপাদের সমাধি মন্দির, শ্রীধর-অঙ্গন এবং শ্রীমুবাণী গুপ্তের পাট, চাঁদকাছির
সমাধি প্রভৃতি দর্শনান্তে মঠে প্রত্যাবর্তন ।

৬। ৬ট চৈত্র (ইং ২০।৩।৮১), শুক্রবার ;—**শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব** ।

৭। ৭ই চৈত্র (ইং ২১।৩।৮১), শনিবার ;—সাধারণ-মহোৎসব
(মহাপ্রসাদ বিতরণ) ।

জ্যেষ্ঠ্য :—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে
ইচ্ছা করিলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীশ্রীমন্তজিবেদান্ত বামন
অহাঙ্গাজের নিকট পূর্বপৃষ্ঠায় লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য ।

জ্ঞাতব্য :—যাত্রিগণ হাফা খানা ও ঘাট এবং ধাহারা মঠে রাজিবাসে ইচ্ছুক
তাঁহারা মশারীসহ বিহানা অবগ্রহই সঙ্গে আনিবেন ।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার নিয়মাবলী

- ১। “শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা” প্রতি বৎসর দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়। প্রতি মাসের অন্তিম দিবসের মধ্যেই শ্রীপত্রিকা প্রকাশিত হইবেন।
- ২। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার মডাক বার্ষিক ভিত্তি ৮'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৪'২৫ টাকা। ভারত ও বাংলাদেশবাসী সকলের পক্ষেই ভারতীয় মুদ্রায় ভিত্তি অগ্রিম দিতে হইবে। ভি. পি. তে লইলে ডাক-খরচ স্বতন্ত্র লাগিবে।
- ৩। যে-কোনও সময়ে শ্রীপত্রিকার গ্রাহক হইতে পারিবেন। অতীত সংখ্যা লইতে হইলে প্রকাশকের সহিত পৃথক্ বন্দোবস্ত করিতে হইবে।
- ৪। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে সত্বর প্রকাশকের নিকট জানাইবেন। সর্বদা গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিবেন। পত্রের উত্তর পাইতে ইচ্ছা করিলে জোড়া পোষ্টকার্ড লিখিবেন।
- ৫। শ্রীপত্রিকার কোন সংখ্যা না পাইলে পরবর্তী মাসের মধ্যেই জানাইবেন। নচেৎ কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী নহেন।
- ৬। শ্রীমদ্বৈষ্ণবপ্রভুর আচারিত ও প্রচারিত শিক্ষা-নব্বন্ধে প্রবন্ধাদি পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হয় না। ঈর্ষামূলে আক্রমণ-সূচক প্রবন্ধাদি শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইবে না। সং-আলোচনা সর্বদা আদরগীয়া।
- ৭। কোনও কিছু জানিতে বা টাটকা কড়ি পাঠাইতে হইলে “কার্য্যাব্যক্ষ” অথবা ‘প্রকাশক’ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়, তেঘরিপাড়া পোঃ নবদ্বীপ (নদায়া) — ঠিকানায় জানিতে বা পাঠাইতে হইবে।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রকাশিত শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী—

- ১। বিদ্যাস্বরূপ (ভাগ্য-বীঠকর) — ২০-০০, ২। শ্রীভগবত-পত্রিকা (হিন্দী) বার্ষিক-ভিত্তি — ৬-০০, ৩। শ্রীগৌড়ীয়গী-চিহ্ন — ৬-০০, ৪। বাণ্য-বালী — ০০-২৫, ৫। মায়াবাদের জীবনী — ৩-০০, ৬। প্রেম-প্রদীপ — ২-৫০, ৭। প্রবন্ধাবলী — ২-৫০, ৮। শরণাগতি — ০০-৭৫, ৯। শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ — ০০-৫০, ১০। শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিভ্রম — ১-০০, ১১। শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণতত্ত্ব) — ২-৫০, ১২। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতকম্ — ১-০০, ১৩। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য — ১-০০, ১৪। শ্রীশ্রীমদ্বৈষ্ণবপ্রভুর শিক্ষা — ২-৫০, ১৫। জৈবধর্ম (বাংলা) — ১২-০০, ১৬। ঐ (হিন্দী) — ১৫-০০, ১৭। বিজ্ঞানগ্রাম ও সম্মাসী — ১-১০, ১৮। শ্রীচৈতন্য-পত্রিকা — ৪-০০, ১৯। শ্রীদামোদরষ্টকম্ — ১-০০, ২০। অর্চন-দীপিকা — ১-৫০, ২১। শ্রীপিছনদা গৌড়ীয় মঠের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস — ১-৫০, ২২। শ্রীমত্তগবদ্বীতা — ১৮-০০, ২৩। শ্রীগৌরাদ — ৩'০০ ২৪। Shri Chaitanya Mahaprabhu — 1'00.

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালিত

শুদ্ধভক্তি-প্রচার-কেন্দ্রসমূহ

- ১। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ—তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ (নদীয়া)।
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক।
- ২। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ—চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ, (হুগলী)।
রক্ষক—ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত ত্রিবিংশ মহারাজ।
- ৩। শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ—কংসটীলা, মথুরা পোঃ, (মথুরা), ইউ, পি।
রক্ষক—ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত নারায়ণ মহারাজ।
- ৪। শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ—গৌরবাটমাঠি, পুরী পোঃ, (পুরী), উড়িষ্যা।
রক্ষক—শ্রীমুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারী।
- ৫। শ্রীগোলোকগঙ্গা গৌড়ীয় মঠ—গোলকগঙ্গা পোঃ, (গোয়ালপাড়া), আসাম।
রক্ষক—ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ।
- ৬। শ্রীপিছলুঙ্গা গৌড়ীয় মঠ ও পাদপীঠ—আশুতিয়াবাড় পোঃ, (মেদিনীপুর)।
রক্ষক—শ্রীমদ্ রাসবিহারীদাস বাবাজী মহারাজ।
- ৭। শ্রীসিকবাটি গৌড়ীয় মঠ—সিধাবাড়ী, কৃষ্ণনারায়ণপুর পোঃ, (বর্ধমান)।
রক্ষক—শ্রীমুরলীমোহন ব্রহ্মচারী।
- ৮। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি—৩৩/২, বোসপাড়া লেন, (কলিকাতা—৩)।
রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্জনাথ ব্রহ্মচারী।
- ৯। শ্রীগোপালজী গৌড়ীয়প্রচারকেন্দ্র, রাণ্ডিহাট পোঃ, (বালেশ্বর) উড়িষ্যা।
রক্ষক—ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত ত্রিজন মহারাজ।
- ১০। শ্রীকেশবগোস্বামী গৌড়ীয়মঠ—শক্তিগড়, শিলিগুড়ি পোঃ, (দার্জিলিং)।
রক্ষক—শ্রীজগন্নাথদাস ব্রহ্মচারী।
- ১১। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ—বালুগাঁও পোঃ, (গোয়ালপাড়া), আসাম।
রক্ষক—শ্রীবিশ্বকৃপদাস ব্রহ্মচারী, বি. ৬।
- ১২। শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ—ভুয়া পোঃ, (গারো পাহাড়) মেঘালয়।
রক্ষক—শ্রীসদাশিবদাস ব্রহ্মচারী।
- ১৩। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাতি—তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ (নদীয়া)।
রক্ষক—পণ্ডিত শ্রীমুকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী, ব্যাকরণজীর্ণ।
- ১৪। শ্রীত্রিগুণাতীত সমাধি আশ্রম—হৃদখালি, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)।
রক্ষক—ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ।
- ১৫। শ্রীগৌড়ীয় দাতব্য চিকিৎসালয়—দেয়ারপাড়া রোড, নবদ্বীপ (নদীয়া)।
রক্ষক—শ্রীধনুদেবদাস ব্রহ্মচারী।